গোস্ট রাইটার

অনীশ দাস অপু





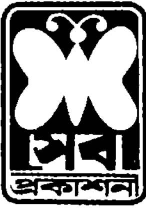


অনুবাদ

গোস্ট রাইটার

রূপান্তর: অনীশ দাস অপু

নন্দিত হরর ও থ্রিলার লেখক অনীশ দাস অপু তাঁর দুই যুগ ব্যাপী লেখালেখির জীবনে দুই শতাধিক রহস্য-রোমাঞ্চ ও অন্যান্য স্বাদের গল্প অনুবাদ করেছেন। সেখান থেকে বাছাই করে ত্রিশটি গল্প তিনি এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। এ বইয়ের গল্পগুলো কখনও তাঁকে স্তম্ভিত করেছে, কখনও হয়েছেন রোমাঞ্চিত, শিহরিত, আবার কিছু গল্প তাঁর চোখে এনে দিয়েছে জল। লেখক বলছেন, 'গল্পগুলো পড়ার পরে আপনারাও আপ্লুত হয়ে ভাববেন কী অসাধারণ সব কাহিনিই না রচনা করেছেন বিদেশী লেখকরা!' কি, লোভ হচ্ছে জানতে সেই দুর্দান্ত গল্পগুলো কী? তা হলে আর দেরি কীসের! বসে যান বইটি নিয়ে। কথা দিচ্ছি, উপভোগ করবেন।



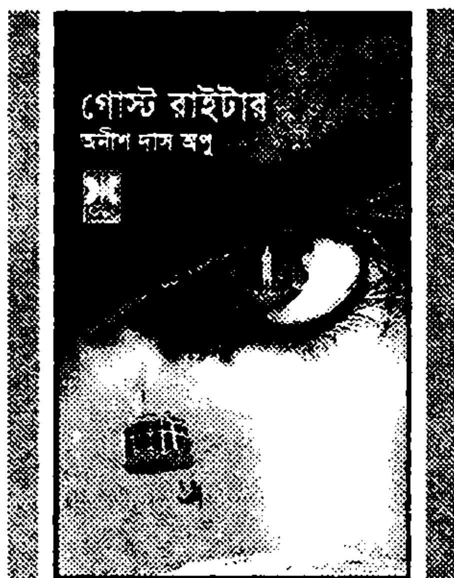
সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

অনুবাদ

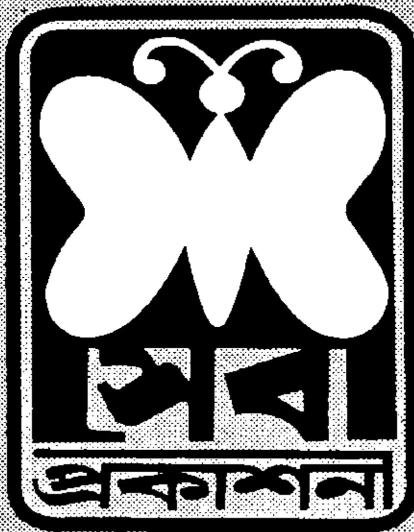
গোস্ট রাইটার

অনীশ দাস অপু





সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-3257-8



একশ' তিন টাকা

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০১৫

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
mail: alochonabibhag@gmail.com
webpage: facebook.com/shebaofficial

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

GHOST WRITER
A Collection of short stories
Trans. by: Anish Das Apu

সূচি

ভূমিকা

রহস্যপত্রিকায় প্রকাশিত বিশ্বসেরা লেখকদের অনূদিত গল্প দিয়ে কয়েকটি পাঠকপ্রিয় সংকলন বের করার পরে হঠাৎ মনে হলো, আমার নিজের অনুবাদ করা গল্পগুলো দিয়ে একটি বই বের করলে কেমন হয়? ভক্ত-অনুরাগীরা অনেক দিন ধরে তাগিদ দিচ্ছিলেন, তাঁরা আমার অনুবাদ করা গল্পের বই পড়তে চান। সেবা প্রকাশনীর কর্মকর্তারাও একই অনুরোধ করেছিলেন—একটি অনুবাদ সংকলন করার জন্য, যেখানে শুধু আমার গল্পই থাকবে। তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছেন, সম্পাদিত গ্রন্থের চেয়ে আমার নিজের লেখা বইয়ের কাটতি বেশি।

আমার নিজের লেখা গল্প নিয়ে অনেকগুলো হরর সংকলন বেরিয়েছে। সবগুলোই প্রত্যাশিত পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে। তবে সম্পাদনার বাইরে এটিই হবে আমার প্রথম অনুবাদ সংকলন। এতে যেসব গল্প ছাপা হয়েছে তা রহস্যপত্রিকা সহ নানান পত্রিকায় একদা প্রকাশিত হয়েছিল। আমি গল্প নির্বাচনে রহস্য, রোমাঞ্চ, সাই-ফাই, ফ্যান্টাসি, গোয়েন্দা, ভৌতিক, ইত্যাদি সব দিকেই নজর দিয়েছি; কিছু জীবনধর্মী গল্পও রয়েছে যা আমার মর্ম স্পর্শ করেছে, আপনাদেরও করবে।

আমি আমার গল্প, সে অনুবাদ হোক কিংবা ছায়া অবলম্বন, মুদ্রিত হওয়ার পরে আর পড়ি না। তবে এ সংকলনটির বেশ কিছু গল্প একাধিকবার পাঠ করেছি এবং প্রতিবারই শিহরিত ও রোমাঞ্চিত হয়েছি।

আসলে এ সংকলনের জন্য গল্প নির্বাচন করতে গিয়ে একটু ঝামেলাতেই পড়ে গিয়েছিলাম; কারণ, লেখালেখির দুই যুগে তো কম গল্প অনুবাদ করিনি। আর অধিকাংশ গল্পই আমার অতি প্রিয়। কোনটা ফেলে কোনটা রাখি! শেষে সিদ্ধান্ত নিলাম, সেই লেখাগুলোই চূড়ান্ত বাছাই পর্বে থাকবে যেগুলো আমাকে স্তম্ভিত, রোমাঞ্চিত, শিহরিত এবং বিচলিত করেছে। এবং বাছাই করার পরে আমার মনে হয়েছে, এ গল্পগুলো বেশির ভাগই পাঠকদেরকে অভিভূত করবে। কিছু গল্পের ফিনিশিং টাচ আক্ষরিক অর্থেই আমাকে স্তম্ভিত করে দেয়। আমি জানি, গল্পগুলো পড়ার পরে আপনাদেরও একই রকম অনুভূতি হবে। শ্রদ্ধায় আনত হবেন বিদেশী এই লেখকদের প্রতি। আপ্লুত হয়ে ভাববেন, কী অসাধারণ সব কাহিনিই না রচনা করেছেন তাঁরা!

এ বইটি প্রকাশের আলো দেখত না যদি না টিংকু ভাই (কাজী শাহনূর

হোসেন) উৎসাহ দেখাতেন! আমার সম্পাদিত অনুবাদ সংকলন *'আলীবাবার গুহা'*-র শিডিউল করার সময় তিনি আরেকটি অনুবাদ সংকলন দিতে বলেছিলেন। আমি তখন তাঁকে প্রস্তাব দিই নিজের একটি সংকলন করার জন্য। তিনি সানন্দে রাজি হন। তবে তাঁকে আমার সম্পাদিত একটি অনুবাদ সংকলন দিতেই হচ্ছে। ওই বইটির কাজও অবশ্য প্রায় শেষ পর্যায়ে। নিঃসন্দেহে ওটিও একটি চমৎকার সংকলন হতে চলেছে! সেই বইটি, অর্থাৎ *'মৃতের হাসি'* আপনাদের মুখে হাসি ফোটাতে আসছে শীঘ্রিই!

অনীশ দাস অপু

ঘাসের আড়ালে কে

বসন্তের এক চমৎকার দিনে আমি হাজির হলাম বাতেংগো। দক্ষিণ সাগরের পলিনেশিয়ান গ্রামগুলোর মত বাতেংগোও বিশিষ্ট হয়ে আছে লম্বা ঘাসের কারণে। আর ব্রনক্স বোটানিক্যাল গার্ডেনের জন্যে আমি এবার বিশেষ শ্রেণীর ঘাস খুঁজতেই বেরিয়েছি। বাতেংগোর সবেধন নীলমণি লঞ্চঘাটে নামার পরেই পরিচয় হলো ঘাট মাস্টার গ্রেভসের সঙ্গে। সুদর্শন, হাসিখুশি স্বভাবের এই তরুণ খুব সহজেই কাউকে আপন করে নিতে পারে। এমনকী আমার পোষা কুকুর ডন, যে কি না পলিনেশিয়ান কিংবা মেলানেশিয়ান কাউকেই পছন্দ করে না, সে পর্যন্ত গ্রেভসের ভক্ত হয়ে গেল দশ মিনিটের মধ্যে।

গ্রেভসের ঢেউ খেলানো লোহার ছাদের বাড়িটি আপাদমস্তক ঘোষণা করছে এটি একজন অবিবাহিত পুরুষের আবাসস্থল। গ্রেভস এই দ্বীপে আছে বছর তিনেক। গর্বিত সুরে জানাল, এই সময়ের মধ্যে একদিনও তাকে কেউ কর্তব্যকর্মে গাফিলতি করতে দেখেনি। বেশ কিছুদিন ধরে সাদা চামড়ার মানুষের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত সে। আমাকে দেখে এত খুশি হলো যে পরিচয়ের আধঘণ্টার মধ্যে জেনে ফেললাম তার শৈশবের সমস্ত ঘটনা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা।

অবশ্য ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাটি খুবই সরল। পরবর্তী ট্রিপে যে স্টীমারটি আসছে ওটায় চড়ে তার বান্ধবী আসবে আমেরিকা থেকে। তারা দু'জনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে এবং স্টীমারের ক্যাপ্টেন ওই অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন।

'বন্ধু,' বলল সে, 'আপনি হয়তো ভাবছেন আমার প্রেমিকা এখানে এসে খুবই একা অনুভব করবে। কিন্তু আপনি জানেন না আমি আমার সমস্ত ভালবাসার অর্ঘ্য তার পায়ের তলায় নিবেদন করব। নিঃসঙ্গতা তাকে ছুঁতেই পারবে না। একজন মানুষ, যে সারাদিন ভাবে কী করে তার প্রেমিকাকে সুখী করবে, সে তার স্বপ্নকন্যাকে কাছে পেলে কী করবে কল্পনা করুন তো একবার! আচ্ছা, আপনি না হয় এবার ভেতরে আসুন। ওর সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই।'

গ্রেভস আমাকে নিয়ে তার বেডরুমে ঢুকল, ড্রেসিং টেবিলের ওপর দেয়ালে বাঁধানো একটি বড় ছবির সামনে ধ্যানমগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

একজন সামান্য ঘাট মাস্টারের প্রেমিকা এত সুন্দরী হতে পারে এ আমি কল্পনাই করিনি। মেয়েটি শুধু রূপবতীই নয়, অদ্ভুত লাবণ্যময়ী। অদ্ভুত নিষ্পাপ একটি ভাব খেলা করছে তার সুন্দর মুখখানায়।

'খুব সুন্দরী,' বলল সে। 'তাই না?'

এতক্ষণ চুপচাপ গ্রেভসের কথাই শুনে গেছি আমি। এবার মন্তব্য করলাম,

'আমি এখন দিব্যি বুঝতে পারছি কেন আপনি এই অসাধারণ রূপবতী মেয়েটির ছবির দিকে তাকিয়ে নিজেকে একা ভাবেন না। এই মেয়ে কি সত্যি সামনের ট্রিপে এখানে আসছে? আমার এখনও ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না!'

'হ্যাঁ,' বলল গ্রেভস। 'সুন্দর না?'

'একজন ঘাট মাস্টার,' বলে চললাম আমি, 'তার নিঃসঙ্গতা কাটানোর জন্যে এমনকী তার পোষা কুকুর, বেড়ালের সঙ্গেও কথা বলে, কিন্তু এখন আমি বুঝতে পারছি আসল মানুষটিকে না দেখেও তার ছবির সঙ্গে কথা বলে দিনের পর দিন কাটিয়ে দেয়া যায় যদি সে হয় এরকম শ্বাসরুদ্ধকর সৌন্দর্যের অধিকারিণী। আসুন, হাত মেলাই।'

তারপর আমি গ্রেভসকে প্রায় একরকম টেনেই ও-ঘর থেকে বাইরে নিয়ে এলাম। কারণ আমার হাতে সময় খুব কম। যে কাজে এসেছি ওটার ব্যাপারে তাড়াতাড়ি খোঁজ-খবর নেয়া দরকার।

'আমি কী কাজে এসেছি তা কিন্তু এখনও আপনি জানতে চাননি,' বললাম আমি। 'তাই নিজে থেকেই বলছি। আমি ব্রনক্স বোটানিক্যাল গার্ডেনের জন্যে ঘাস সংগ্রহ করছি।'

'আচ্ছা!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল গ্রেভস। 'তা হলে আপনি ঠিক জায়গাতেই এসেছেন, ভাই। এই দ্বীপে একটা গাছও আপনার চোখে পড়বে কি না সন্দেহ। তবে চারদিকে কেবল ঘাসের বন্যাই দেখতে পাবেন। আমার বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যেই তো কমপক্ষে পঞ্চাশ রকমের ঘাস রয়েছে।'

'আঠারো পদের ঘাস অবশ্য ইতিমধ্যে আমার চোখে পড়েছে,' বললাম আমি। 'কিন্তু সেটা মুখ্য নয়। আসল কথা হচ্ছে বাতেংগো দ্বীপের ঘাসে কখন আঁটি হয়?'

'আপনি ভেবেছেন এই প্রশ্ন করে আমাকে বোকা বানাবেন, তাই না?' বলল সে। 'ঘাট মাস্টারের কাজ করলেও এসবেরও ছিটেফোঁটা খবর আমি রাখি, ভাই সাহেব। ওদিকে,' হাত তুলে দেখাল সে, 'ওগুলোকে আমরা বিচ নাট বলি—ওগুলোতে প্রথম আঁটি জন্মাবে। আর যতদূর জানি সপ্তাহ ছয়েকের মধ্যেই প্রক্রিয়াটি শুরু হয়ে যাবে।'

'সত্যি বলছেন?'

'আরে, আমি মিথ্যা বলতে যাব কোন্ দুঃখে?'

'সেক্ষেত্রে,' বললাম আমি, 'আপনি আমাকে নির্ধারিত সময়েই আবার এখানে দেখতে পাবেন।'

'সত্যি?' উদ্ভাসিত হয়ে উঠল গ্রেভসের মুখ। 'তা হলে তো আপনি আমাদের বিয়েতেও অংশ নিতে পারবেন।'

'ও ব্যাপারেও আমার যথেষ্ট আগ্রহ আছে। আমি আপনার স্বপ্নকন্যাকে বাস্তবে দেখতে চাই।'

'আপনি যাওয়ার পর আপনার কাজে লাগে এমন কিছু সাহায্য কি করতে

পারি? আমার হাতে এমনিতেই প্রচুর সময়...'

'ঘাস সম্বন্ধে যদি আপনার মোটামুটি একটা ধারণা থাকে...'

'তা অবশ্য নেই। তবে আমি ওদিকটাতে একবার যাব। যদিও যেতে হবে একাই। কারণ ওরা কেউ আমার সঙ্গে যেতে চায় না।'

'গ্রামের লোক?'

'হ্যাঁ। কুসংস্কারে বোঝাই সব। মানুষের চেয়ে ওই গ্রামে কাঠের দেবতার সংখ্যা বেশি। আর সবাই যেন আত্মহত্যার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। সব ক'টা পাগল...আলোইট!' হাঁক ছাড়ল গ্রেভস।

তার ডাক শুনে বাড়ির ভেতর থেকে হেলেদুলে বেরিয়ে এল দশ-বারো বছরের একটি ছেলে।

'আলোইট,' বলল গ্রেভস, 'এক দৌড়ে দ্বীপের পাহাড়টায় উঠে এই ভদ্রলোকের জন্য কিছু ঘাস নিয়ে আসতে পারবে? উনি তোমাকে এই জন্যে পাঁচ ডলার বকশিশ দেবেন।'

মুখ শুকিয়ে গেল আলোইটের। মাথা নাড়ল, যাবে না সে।

'পঞ্চাশ ডলার?'

এবার আরও জোরে মাথা নাড়ল আলোইট। আমি শিস দিয়ে উঠলাম। এতগুলো টাকার লোভ কেউ সামলাতে পারে নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাসই হত না।

'তা হলে ফোট, ব্যাটা কাপুরুষ,' ধমকে উঠল গ্রেভস। আমার দিকে ফিরে বলল, 'দেখলেন তো? টাকা-পয়সা, মারধর কোন কিছু দিয়েই ওদেরকে সাগর তীর থেকে এক মাইল দূরেও নিয়ে যেতে পারবেন না। ওরা বলে, পাহাড়ের কাছে ওই ঘাসের রাজ্যে গেলে সেই ভয়ঙ্কর ঘটনাটা আপনার জীবনেও ঘটতে পারে।'

'কোন্ ঘটনা?'

'বহু বছর আগে এক মহিলা গিয়েছিল ওখানে,' বলল গ্রেভস। 'মহিলাকে পরে লম্বা ঘাসের নীচে পড়ে থাকতে দেখা যায়। তার শরীর পুরোটা কালো হয়ে ফুলে গিয়েছিল। পায়ের গোছের ঠিক ওপরে কীসে যেন কামড় দিয়েছিল তাকে।'

'সাপ তো হতেই পারে না,' বললাম আমি। 'আমি খুব ভাল করেই জানি এসব দ্বীপে সাপ নেই।'

'সাপে কামড়েছে এমন কথা ওরাও বলেনি,' বলল গ্রেভস। 'ওরা বলেছে কামড়ের জায়গায় খুব ছোট ছোট দাঁতের দাগ দেখা গেছে। যেন খুব ছোট বাচ্চা কামড়েছে।' উঠে দাঁড়াল সে। আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বলল, 'এসব গাঁজাখুরি ব্যাপার নিয়ে কথা বলে লাভ নেই। আপনি যদি ঘাস খুঁজতে ওদিকে যেতে চান তো একাই যেতে হবে। আর যদি না যান তা হলে চলুন একবার ঘাটের দিকে যাই। একটা ব্রেক ভেঙে গেছে। ওটা মেরামত করা দরকার।'

হপ্তা পাঁচেক পর আমি আবার যাত্রা শুরু করলাম বাতেংগো দ্বীপের দিকে। এক মাসেরও বেশি সময় ধরে আমি মানুষজনের সঙ্গ থেকে একরকম বঞ্চিত।

তাই যতই বাতেংগোর লঞ্চ-ঘাটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের জলযান, ততই উৎফুল্ল হয়ে উঠছি আমি। গ্রেভস এবং তার ভাবি স্ত্রীর কথা ভাবছি। মেয়েটির সৎসাহসের প্রশংসা করতেই হয়। সবকিছু ছেড়ে দক্ষিণ সাগরের এই নির্জন দ্বীপে শুধু তার প্রেমিকের স্বার্থে বসবাস করতে আসা চাট্টিখানি কথা নয়।

অবশেষে তীরে এসে ভিড়ল তরী। হাঁটুর কাছে রাখা শটগানটি তুলে নিলাম হাতে। ডন ঘেউ ঘেউ করে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল। আমি ট্রিগারে চাপ দিলাম।

গুলির শব্দে বেরিয়ে এল গ্রেভস তার বাড়ি থেকে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটি রুমাল নাড়তে লাগল। আমি মেগাফোনে চিৎকার করে বললাম, তাকে দেখে খুব খুশি হয়েছি। জানতে চাইলাম সে বাতেংগোতে আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে কি না।

এতদূর থেকেও গ্রেভসের আচরণে কেমন একটা আড়ষ্ট ভাব লক্ষ করলাম আমি। কয়েক মিনিট পর মাথায় একটি টুপি চাপিয়ে বাড়ি থেকে বেরুল সে। দরজা বন্ধ করল। হাঁটতে শুরু করল গ্রামের দিকে। কিন্তু ওর হাঁটার ভঙ্গিতেও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবটি অনুপস্থিত। আমাকে দেখে সে খুব একটা খুশি হয়েছে বলে মনে হলো না।

'আশ্চর্য তো!' ডনকে উদ্দেশ্য করে বললাম আমি। 'গ্রেভসের ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসছে।'

ডনকে নিয়ে লঞ্চ থেকে নেমে পড়লাম আমি। এগোলাম তীর ধরে। অনেক গ্রামবাসী দাঁড়িয়ে আছে তীরে। এত অচেনা মানুষের উপস্থিতি ডনের জন্যে রীতিমত অস্বস্তিকর। সে আমার পায়ে পায়ে চলতে লাগল। গ্রেভস আসার আগেই তীরে পৌঁছে গেলাম আমরা। গ্রেভস ওখানে হাজির হতেই গ্রামবাসীরা সভয়ে সরে গেল দূরে, যেন কোন কুষ্ঠরোগীকে দেখছে। আমার দিকে তাকিয়ে শুকনো হাসল গ্রেভস, কথা বলার জন্যে মুখ খুলতেই পা শক্ত করে ক্রুদ্ধ গর্জন করে উঠল ডন।

'ডন!' চাপা গলায় ধমক দিলাম আমি। ডন গুটিসুটি মেরে গেল, কিন্তু ওর পিঠের লোম খাড়া হয়ে উঠল, ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে থাকল গ্রেভসের দিকে। গ্রেভসের মুখটা টানটান, রাগ-রাগ একটা ভাব। ছেলেমানুষি ভাবটা চেহারা থেকে একেবারেই উধাও। কিছু একটা ব্যাপারে ও খুব টেনশনে আছে, মনে হলো আমার।

'এই যে, বন্ধু,' বললাম আমি। 'খবর কী আপনার?'

গ্রেভস ডান আর বাঁয়ে তাকাল একবার, লোকগুলো সিঁটিয়ে গেল, পিছু হটল আর কয়েক পা।

'খবর তো নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছেন,' কাঠখোট্টা গলায় জবাব দিল সে। 'আমাকে একঘরে করা হয়েছে।' একটু থেমে আবার বলল, 'এমনকী আপনার কুকুরটাও তা বুঝতে পেরেছে। ডন, গুড বয়! এদিকে এসো!'

ডন গরগর করে উঠল।
'দেখলেন তো!'
'ডন!' ধারাল গলায় বললাম আমি। 'এই লোকটি আমার বন্ধু। তোমারও। যান, গ্রেভস। ওকে একটু আদর করুন।'
গ্রেভস এগোল ডনের দিকে। ওর মাথায় চাপড় মেরে আদুরে গলায় কী যেন বলতে লাগল।
ডন এবার আর গর্জন করল না বটে, তবে গ্রেভসের প্রতিটি চাপড়ে শিউরে উঠল সে, যেন খুব ভয় পাচ্ছে।
'তা হলে আপনাকে একঘরে করে রাখা হয়েছে, অ্যাঁ?' ব্যাপারটা আমার কাছে বেশ কৌতুককর মনে হলো। 'তা আপনার দোষটা কী?'
'কিছুই না। আমি শুধু ওই ঘাসের জঙ্গলে গিয়েছিলাম,' বলল গ্রেভস। 'আর আমার...আমার কিছু হয়নি বলে ওরা আমাকে একঘরে করেছে।'
'মাত্র এই?'
'হ্যাঁ।'
'আচ্ছা!' বললাম আমি। 'আমিও শিগ্গির একবার ওদিকে যাব। তার মানে আমাকেও ওরা একঘরে করে রাখবে। তা হলে ভালই হবে। একসঙ্গে দু'জনে একঘরে হব। আচ্ছা, আমার জন্যে ইন্টারেস্টিং কোন ঘাসের সন্ধান পেয়েছেন ওখানে?'
'ঘাসের খবর আমি জানি না,' বলল সে। 'কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং একটা জিনিসের সন্ধান পেয়েছি। ওটা আপনাকে দেখাব এবং আপনার কাছে কিছু পরামর্শও চাইব। যাবেন নাকি আমার বাড়িতে?'
'লণ্ডেই রাত কাটাব ঠিক করেছি,' বললাম আমি। 'তবে আপনি যদি জোরাজুরি করেন আর রাতের খাবারটা...'
'আমি আপনার জন্যে এখনই লাঞ্চের ব্যবস্থা করছি,' তাড়াতাড়ি বলল গ্রেভস। 'একঘরে হয়ে থাকার পর থেকে রান্নাবান্না সব নিজেকেই করতে হচ্ছে। অবশ্য আমার রান্না আপনার খুব একটা খারাপ লাগবে না আশা করি।'
গ্রেভসকে এখন অনেকটা হাসিখুশি দেখাচ্ছে।
'ডনকে সঙ্গে নেব?'
একটু ইতস্তত করল গ্রেভস, 'আ...ইয়ে...ঠিক আছে।'
'আপনার অসুবিধে হলে থাক।'
'ঠিক আছে, ওকে নিয়ে চলুন। দেখি ওর সঙ্গে আবার নতুন করে ভাব করা যায় কি না।'
হাঁটতে শুরু করলাম আমরা গ্রেভসের সঙ্গে। ডন আমার পায়ের সঙ্গে সেঁটেই থাকল।
'গ্রেভস,' বললাম আমি। 'এইসব অশিক্ষিত গ্রামবাসী আপনাকে একঘরে করে রেখেছে এটা আপনার মন খারাপের কারণ নয়। অন্য কিছু একটা হয়েছে।

কী সেটা? কোন খারাপ খবর?'

'আরে না,' বলল সে। 'ও ঠিকই আসছে। এটা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। আপনাকে আমি আস্তে আস্তে সব খুলে বলব। আমার ওপর রাগ করবেন না। আমি ঠিকই আছি।'

'কিন্তু তখন যে বললেন ঘাসের জঙ্গলে ইন্টারেস্টিং কী একটা জিনিসের সন্ধান পেয়েছেন?'

'পাথরের বিশাল একটি স্তম্ভ দেখেছি। জিনিসটা নিউ ইয়র্কের এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিঙের মতই বড়। হাজার বছর আগের পুরানো, খোদাই করা। মেয়েমানুষের মূর্তির মত। এ ছাড়াও অদ্ভুত ধরনের কিছু ঘাস চোখে পড়েছে—আপনার কৌতূহল জাগবে। আমি তো আর আপনার মত উদ্ভিদ বিজ্ঞানী নই, তাই ওগুলোকে আলাদাভাবে চিনতে পারিনি। ঘাসগুলোর নীচে লক্ষ লক্ষ ফুলও চোখে পড়ল...মানে কী বলব, এই জায়গাটাকে পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্লভ জায়গা বলে মনে হয়েছে আমার।'

দরজা খুলল গ্রেভস, একপাশে সরে দাঁড়াল আমাকে আগে যেতে দেয়ার জন্যে। আমি ভেতরে পা বাড়াতেই ঘেউ-ঘেউ করে উঠল ডন।

'শাট আপ, ডন!'

ঠাস করে একটা থাবড়া বসালাম ওর নাকে। চুপ হয়ে গেল ডন, আমার সঙ্গে ভেতরে ঢুকল ভদ্র ছেলের মত। কিন্তু শরীর আড়ষ্ট হয়েই থাকল ওর।

গ্রেভসের বুকশেলফের ওপর জিনিসটা চোখে পড়ল আমার। হালকা বাদামি রঙের কাঠ দিয়ে তৈরি, রক্তচন্দন হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, গোলাপি একটি আভাও রয়েছে। ফুটখানেক উঁচু, কাঠ দিয়ে খোদাই করা জিনিসটা একটি পনেরো-ষোলো বছরের মেয়ের মূর্তি। খোদাইয়ের কাজ এমন নিখুঁত যে মূর্তিটাকে দারুণ জীবন্ত লাগল আমার কাছে। এমন জিনিস পলিনেশিয়ান বা অন্য কোন দ্বীপে এ পর্যন্ত চোখে পড়েনি আমার।

মূর্তিটি নগ্ন। ওর চোখ দুটি ইস্পাত নীল, ভ্রূ আর চোখের পাতা ঠিক যেন রেশম, একদম রক্তমাংসের নারীর মত। মূর্তিটি বড্ড বেশি জীবন্ত, কেমন ভয়-ভয় করতে লাগল। ডনও চঞ্চল হয়ে উঠে চাপা গলায় গোঁ-গোঁ শুরু করল। আমি তাড়াতাড়ি ওর ঘাড় চেপে ধরলাম। মূর্তিটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার ইচ্ছে ওর একশো ভাগ।

মূর্তিটির দিকে চোখ তুলে তাকাতেই ভয়ের ঠাণ্ডা একটা স্রোত বয়ে গেল শিরদাঁড়া বেয়ে। ওটা কৌতূহল আর অবজ্ঞা নিয়ে তাকিয়ে আছে ডনের দিকে। তারপর ওটার ছোট, বাদামি বুক দুটো ফুলে উঠল, আবার সমান হলো, সব শেষে নাক দিয়ে সশব্দে একটা নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

আঁতকে উঠে এক লাফে পিছিয়ে এলাম আমি, পড়লাম গিয়ে গ্রেভসের গায়ে। হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম, 'মাই গড! ওটা জ্যান্ত!'

'সুন্দর, না?' বলল গ্রেভস, 'ওকে আমি ঘাসের জঙ্গল থেকে নিয়ে এসেছি। ভয়ানক দুষ্টু আর চঞ্চল ও। আপনার বন্দুকের আওয়াজ শোনার পর ওকে ওখানে তুলে রেখেছি, যাতে দুষ্টুমি করতে না পারে। অত উঁচু থেকে ও লাফাতে পারবে না।'

'ওকে আপনি ঘাসের জঙ্গল থেকে নিয়ে এসেছেন?' রুদ্ধ কণ্ঠে বললাম আমি। 'ওখানে এরকম আরও আছে নাকি?'

'থকথক করছে কোয়েল পাখিদের মত,' বলল সে। 'কিন্তু ওদের দেখা পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার।' জিনিসটার দিকে তাকাল গ্রেভস, মুচকি হাসল। 'কিন্তু তুমি কৌতূহল চাপতে না পেরে বেরিয়ে এসেছিলে, তাই না, খুকি? তারপর তোমার ঘাড়টা ক্যাঁক করে চেপে ধরে এখানে নিয়ে এলাম আমি। তুমি আমাকে কামড়াবার সুযোগই পাওনি।'

ওটার ঠোঁট দুটো ফাঁক হলো। সাদা, ঝকঝকে একসারি দাঁত ঝিকিয়ে উঠল। গ্রেভসের দিকে তাকাল সে, কঠিন চোখ দুটিতে ফুটে উঠল নমনীয়তা। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম গ্রেভসকে সে খুবই পছন্দ করে।

'ও এক অদ্ভুত পোষা প্রাণী, তাই না?' বলল গ্রেভস।

'অদ্ভুত?' বললাম আমি। 'বরং বলুন ভয়ঙ্কর। ওটাকে—ওটাকেও একঘরে করে রাখা উচিত। ডন ওটাকে মোটেই পছন্দ করেনি। জিনিসটাকে খুন করতে যাচ্ছিল সে।'

'ওকে দয়া করে জিনিস বলবেন না,' অনুরোধ করল গ্রেভস। 'আর অমন তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যও করবেন না। আপনার কথা বুঝতে পারলে খুবই মাইণ্ড করবে।' তারপর সে ফিসফিস করে কথা বলতে শুরু করল ওটার সঙ্গে। ভাষাটা গ্রীক বলে মনে হলো। জিনিসটা কথা বলার সময় বারবার উঁচু গলায় হেসে উঠল। হাসিটা মিষ্টি, যেন ঘণ্টা বাজল টুং টাং করে।

'আপনি ওর ভাষা জানেন?'

'অল্প অল্প—টং মা লাও?'

'আনা টন সাগ আটো।'

'নান টেন ডম উড লন আড়ি।'

ফিসফিস করে, খুব নরম গলায় কথা বলছে ওরা। আমার দিকে ফিরল গ্রেভস। 'ও বলছে কুকুরটাকে সে ভয় পায় না। আর সে একা থাকতেই বেশি পছন্দ করবে। আপনার কুকুরটা যেন তাকে বিরক্ত না করে।'

'ডনের তেমন কোন ইচ্ছেও নেই,' বললাম আমি। 'এখন দয়া করে বাইরে চলুন। ওকে আমার মোটেও ভাল লাগছে না। ভয় পাচ্ছি আমি।'

জিনিসটাকে শেলফ থেকে নীচে নামাল গ্রেভস, তারপর বেরিয়ে এল বাইরে।

'গ্রেভস,' বললাম আমি, 'আপনার ওই একমুঠি জিনিসটা কোন শুয়োর কিংবা বানর নয়, একটি মেয়ে। আপনি ওকে তার আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে ছিনিয়ে এনে অপহরণের মত মারাত্মক অপরাধ করেছেন। এখন আমার পরামর্শ হচ্ছে

যেখান থেকে ওকে এনেছেন সেখানে ওকে রেখে আসুন। তা ছাড়া মিস চেস্টার ওকে দেখলেই বা কী ভাববেন?'

'ওকে নিয়ে আমি চিন্তিত নই,' বলল গ্রেভস। 'কিন্তু আমি অন্য একটা ব্যাপার নিয়ে চিন্তায় আছি–খুবই চিন্তায় আছি। কথাটা কি এখন বলব, নাকি লাঞ্চের পর?'

'না, এখনই বলুন।'

শুরু করল গ্রেভস। 'আপনি চলে যাওয়ার পর আমিও উদ্ভিদ বিজ্ঞান সম্পর্কে বেশ আগ্রহী হয়ে উঠি। আপনার জন্যে ঘাসের নমুনা সংগ্রহ করতে দু'বার ওদিকে গিয়েছিলাম। দ্বিতীয়বার আমি একটি গভীর উপত্যকার মত জায়গায় ঢুকে পড়ি। ওখানকার ঘাসগুলো বুক সমান উঁচু। আর ওখানেই বিশাল এক পাথরের স্তম্ভ পড়ে থাকতে দেখি। একই সঙ্গে আমার চোখে পড়ে কিছু জীবন্ত প্রাণী। ওরা আমাকে দেখে ছুটে পালাচ্ছিল। আমি ওদের পিছু ধাওয়া করি। ওখানে প্রচুর আলগা পাথর ছড়ানো-ছিটানো ছিল। একটা পাথর হাতে তুলে নিই ওগুলোর কোনটাকে কব্জা করা যায় কি না ভেবে। হঠাৎ দেখি কতগুলো ঘাসের আড়াল থেকে এক জোড়া ছোট, উজ্জ্বল চোখ উঁকি দিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে পাথরটা ছুঁড়ে মারি জিনিসটাকে লক্ষ্য করে। ধপাস করে পাথরটা ঘাসের মধ্যে পড়তেই গোঙানির আওয়াজ শুনতে পাই আমি। কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে যাই ওদিকে। তারপর ওকে দেখতে পাই আমি।

'আমাকে দেখে তেড়ে কামড়াতে এসেছিল ও। আমি চট করে ওর ঘাড়টা দু'আঙুল দিয়ে চেপে ধরতেই নিস্তেজ হয়ে যায়। তা ছাড়া, পাথরের আঘাতে বেশ আহত হয়েছিল ও। আমার হাতে মড়ার মত পড়ে ছিল। ওকে ওভাবে মরতে দিতে মন চায়নি আমার। তাই ওকে বাড়িতে নিয়ে আসি। হপ্তাখানেক খুবই অসুস্থ ছিল। তারপর ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠে। আমার সঙ্গে খেলতে থাকে। আমার টেবিলের নীচের দেরাজটা খুলে প্রায়ই ওটার মধ্যে লুকিয়ে থাকে ও। আর আমার রাবারের বুট জুতো জোড়াকে বানিয়েছে খেলনা বাড়ি। সঙ্গী হিসেবে ও পোষা বেড়াল, কুকুর কিংবা বানরের মতই ভাল। তা ছাড়া ও এত ছোট যে ওকে আমার পোষা একটি প্রাণী ছাড়া অন্য কিছুই ভাবতে পারি না। তো এই হচ্ছে ওর গল্প। এরকম ঘটনা যে-কারও জীবনে ঘটতে পারে, পারে না?'

'হুম, তা পারে,' বললাম আমি। 'কিন্তু প্রথম দর্শনেই যে মানুষকে ভয় পাইয়ে দেয় তাকে পোষার কোন মানে আছে বলে আমার মনে হয় না। আমার কথা যদি শোনেন তা হলে বলব, ওকে যেখানে পেয়েছেন সেখানে রেখে আসুন।'

'চেষ্টা করেছিলাম,' বলল গ্রেভস। 'কিন্তু ওকে ছেড়ে আসার পরদিন সকালেই দেখি আমার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদছে–চোখ দিয়ে জল পড়ছে না, কিন্তু কাঁদছে...আপনি অবশ্য একটা কথা ঠিকই বলেছেন–ও শুয়োর কিংবা বানর নয়–একটি মেয়ে।'

'আপনি কি বলতে চাইছেন ওটা আপনার প্রেমে পড়েছে?' ঠাট্টার সুরে

বললাম আমি।

'সম্ভবত তাই।'

'গ্রেভস,' এবার সিরিয়াস হলাম আমি। 'মিস চেস্টার সামনের ট্রিপের স্টীমারেই আসছেন। এর মধ্যে যা করার করতে হবে।'

'কী করব?' অসহায় গলায় বলল গ্রেভস।

'এখনও জানি না। তবে আমাকে ভাবতে দিন,' বললাম আমি।

মিস চেস্টার আর সপ্তাহখানেক পরে আসবে। ইতিমধ্যে গ্রেভস বার দুই চেষ্টা করেছে বো-কে (ওটার নাম 'বো' রেখেছে সে) ঘাসের জঙ্গলে ছেড়ে আসতে। কিন্তু দুইবারই তাকে পরদিন ভোরবেলা দেখা গেছে বারান্দায় বসে কাঁদতে। আমরা বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেছি বো-র আত্মীয় স্বজনকে খুঁজে বের করতে। গ্রেভস ওকে নিজের জ্যাকেটের পকেটে পুরে বেরিয়েছে। কিন্তু কোনবারই সফল হইনি। বো ইচ্ছে করলেই পথ দেখাতে পারত। কিন্তু ইচ্ছে করেনি। খোঁজাখুঁজি পর্বের পুরো সময়টা আমরা তাকে দেখেছি গোমড়া মুখ করে থাকতে। গ্রেভস যে ক'বার তাকে মাটিতে নামিয়ে রাখতে চেয়েছে, ততবার সে গ্রেভসের জামার হাতা ধরে ঝুলে থেকেছে। হাত থেকে তাকে ছোটাতে রীতিমত বেগ পেতে হয়েছে ওকে।

খোলা জায়গায় বো-র গতি ইঁদুরের মতই দ্রুত। আর তাকে ছুঁড়ে ফেলেও নিস্তার নেই, এক দৌড়ে ছুটে এসে ধরত সে আমাদের। কিন্তু ঘন ঘাসের মধ্যে ভালভাবে চলতে পারত না। আমরা ওকে ফেলে দ্রুত চলে যাচ্ছি, এই সময় কাঁদতে শুরু করত বো। এই কান্না সহ্য করা সত্যি কঠিন।

আমাকে দু'চোখে দেখতে পারে না বো। তবে আমার ওপর চড়াও হওয়ার সাহসও পায় না। কারণ সে দেখছে গ্রেভসের ওপর আমার যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। আর আমিও বো-কে কখনও ঘাঁটাতে যাই না। মানুষ সাপ কিংবা বড় ইঁদুরকে যেমন ভয় পায়, বো-কে আমিও তেমনি ভয় পাই। এমনিতে বো-কে দেখলে যে-কোন লোকেরই ভাল লাগবে। কিন্তু ও যখন লাফ মেরে মাছি কিংবা ঘাসফড়িং ধরে কচকচিয়ে জ্যান্ত চিবিয়ে খায়, কিংবা ওর সঙ্গে একটু ইয়ার্কি করতে গেলেই যখন ওর কান দুটো বেড়ালের মত মিশে যায় মাথার পেছনে এবং হিস হিস শব্দে দাঁত বেরিয়ে পড়ে, তখন দেখে খুবই ভয় লাগে, ভালবাসতে ইচ্ছে করে না।

ডনও বো-র সঙ্গে লাগতে যায় না। ইতিমধ্যে সে বুঝে গেছে তার প্রতিপক্ষ খুবই শক্তিশালী। বো তার দিকে কোন কারণে তেড়ে আসলে সে রুখে দাঁড়ায় না, উল্টো লেজ উল্টে পালায়। আমার মত ডনও বুঝতে পেরেছে বো-র মধ্যে সাংঘাতিক কিছু একটা আছে যা প্রকৃতিবিরুদ্ধ। সুতরাং ওকে না ঘাঁটানোই ভাল।

একদিন ভোরবেলা, দিগন্ত রেখায় ধোঁয়া দেখতে পেলাম আমরা। গ্রেভস তাড়াতাড়ি তার রিভলভার বের করে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল। উদ্ভাসিত মুখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওর স্টীমার আসছে।'

'হ্যাঁ,' সায় দিয়ে বললাম আমি। 'তাই তো মনে হচ্ছে। তবে এখনই আমাদের একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে।'

'বো-র ব্যাপারে?'

'অবশ্যই। বো-কে দিন কয়েকের জন্য আমার কাছে রাখব। তোমরা দু'জনে মিলে ঘরসংসার একটু সাজাও। তারপর মিসেস চেস্টার, মানে মিসেস গ্রেভস ঠিক করবেন কী করা যায়। তবে বো-কে এসব ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আভাস দিয়ো না। ওকে আমার লঞ্চে নিয়ে এসো। তারপরের সব দায়িত্ব আমার।'

খুশি মনে আমার পরামর্শ মেনে নিল গ্রেভস। বো-কে নিয়ে সে আমার লঞ্চে চলে এল। বো চারদিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল। ওকে দ্রুত আমার কেবিনে পুরে বাইরে থেকে তালা মেরে দিলাম। যেই বুঝল ওকে বন্দি করা হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ ঘরের মধ্যে পাগলের মত ছোটাছুটি শুরু করল বো, কাঁদতে কাঁদতে।

গ্রেভসের মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। শুকনো গলায় বলল, 'তাড়াতাড়ি চলো। আমার খুব খারাপ লাগছে।'

অবশ্য মিস চেস্টারকে দেখা মাত্র মন ভাল হয়ে গেল গ্রেভসের। খানিক পর সম্ভবত সে ভুলেই গেল বো-র কথা।

মিস চেস্টারকে দেখে আবার মুগ্ধ হলাম আমি। ছবির চেয়েও সুন্দরী সে। এমন একটি মেয়ের স্বামী হতে পারা ভাগ্যের ব্যাপার। গ্রেভস নিঃসন্দেহে ভাগ্যবান।

ওদের বিয়েটা খুব দ্রুত এবং ছিমছামভাবে হয়ে গেল। কন্যা সম্প্রদান করলেন স্টীমারের সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিটি। ক্যাপ্টেন বিয়ে পড়ালেন। আর নাবিকরা সমস্বরে গাইল একটি মধুর বিয়ের গান। শ্যাম্পেন এবং কেক দিয়ে সারা হলো সকালের নাস্তা। শ্বেতশুভ্র পোশাক পরা পরীর মত মিস চেস্টার তার স্বামীর হাত ধরে লাজুক হেসে তীরে বাঁধা নৌকায় উঠল খানিক সমুদ্র ভ্রমণ করে দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্যে। পরপর সাতাশবার পেতলের কামান দেগে অভিনন্দিত করা হলো নব দম্পতিকে। ওদেরকে নিয়ে নৌকা ভেসে পড়ল সমুদ্রে।

এত দ্রুত সবকিছু শেষ হয়ে গেল যে আমি খুবই নিঃসঙ্গ বোধ করতে লাগলাম। ফিরে এলাম নিজের আস্তানায়। কোন কাজ নেই বলে বসে বসে রাইফেল আর রিভলভারটি পরিষ্কার করলাম। কিছুক্ষণ নোট লিখলাম দক্ষিণ সাগরের ঘাস সম্পর্কে। তারপরও কিছুই ভাল লাগছে না বলে ডনকে নিয়ে দিগম্বর হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম সমুদ্রে। অনেকক্ষণ হুটোপুটি করলাম সাগর জলে। তীরে উঠে চিৎ হয়ে পড়ে থাকলাম উজ্জ্বল সূর্যের নীচে। আস্তে আস্তে সন্ধ্যা নামল। উঠে পড়লাম আমরা। সোজা চলে এলাম লঞ্চে। ধীরে সুস্থে ডিনার খেলাম। তারপর আবার কেবিনে গিয়ে ঢুকলাম বো-র অবস্থা দেখতে।

বুনো বেড়ালের মত ছুটে এল বো আমার দিকে। ঝট করে সরে গিয়েছিলাম

বলে রক্ষে, নইলে নির্ঘাত কামড় খেতাম। কিন্তু তারপরও আমার প্যান্টের কাপড় ছিঁড়ে নিয়েছে বো। বিদ্যুৎগতিতে কাজ করল আমার পা, ধাঁই করে লাথিটা গিয়ে লাগল ওর গায়ে, ছিটকে কেবিনের এক কোনায় গিয়ে পড়ল বো। তাড়াতাড়ি একটা মোমবাতি জ্বেলে নিলাম, সতর্ক একটা চোখ রেখেছি বো-র ওপর। ও একটা চেয়ারের নীচে গিয়ে ঢুকল। ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ দেখাচ্ছে। আমি আরেকটা চেয়ারে বসে কথা বলতে শুরু করলাম।

'এতে কোন লাভ হবে না,' বললাম আমি। 'তুমি বেহুদা আমাকে কামড়ে দিতে চাইছ। তুমি জানো তোমাকে এক লাথিতে আমি ভর্তা বানিয়ে ফেলতে পারি। কিন্তু তোমাকে আমি মারতে চাই না। তারচে' আমার কাছে এসে বসো। এসো, আমরা বন্ধু হই। অবশ্য তুমি আমাকে পছন্দ করো না তা আমি জানি। আর আমিও যে তোমাকে দু'চোখে দেখতে পারি না সে কথাও তোমার অজানা নয়। তবে কিছুদিনের জন্যে আমাদের সহাবস্থান করতেই হবে। আর ওটা যাতে ভালভাবে হয় সেই চেষ্টাই আমাদের করা উচিত। সুতরাং চেয়ারের নীচ থেকে বেরিয়ে এসো, আমার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করো। আমি তোমাকে বাদাম খাওয়াব।'

বাদাম খাওয়ার লোভেই বোধহয় সে বেরিয়ে এল চেয়ারের তলা থেকে। আমি পকেট থেকে কিছু বাদাম বের করে মেঝেতে রাখলাম, ও দ্রুত এগিয়ে এল সামনে, কুটকুট করে খেতে লাগল ওগুলো।

এক মিনিটের মধ্যে বাদামগুলো সাবড়ে সে তাকাল আমার দিকে। তার চোখে অসীম বেদনা, যেন বলছে, 'আমি কী দোষ করেছি? আমাকে কেন তোমার সঙ্গে থাকতে হবে? আমি তোমার সঙ্গে থাকতে চাই না। আমাকে গ্রেভসের কাছে যেতে দাও।'

আমি ওকে ব্যাপারটা বোঝাতে চাইলাম। ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করলাম। কিন্তু কোন কাজ হলো না। তার চোখে আমার জন্যে উপচে পড়ছে ঘৃণা। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিলাম। একটা বালিশ ছুঁড়ে দিলাম ওর দিকে। ইচ্ছে হলে ঘুমাবে। তারপর বেরিয়ে এলাম বাইরে। দরজা বন্ধ করতেই সে কান্না জুড়ে দিল আমার খুব কষ্ট হতে লাগল। আবার দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলাম। খুব নরম গলায় ভাল-ভাল ভালবাসার কথা বলতে লাগলাম। কিন্তু সে আমার দিকে ফিরে তাকাল না পর্যন্ত। উপুড় হয়ে শুয়ে একভাবে কাঁদতেই থাকল।

এবার মেজাজ চড়ে গেল আমার। ঘাড় ধরে ওকে শূন্যে তুলে ফেললাম। মাথা ঘুরিয়ে ও আমাকে কামড়ে দেয়ার চেষ্টা করল। আমি লক্ষ করলাম ও কাঁদছে, কিন্তু চোখে এক বিন্দু জল নেই। ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত। পরীক্ষা করে দেখতে ইচ্ছে হলো। একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে ওকে পরীক্ষা করতে লাগলাম। জলকণার চিহ্ন মাত্র নেই চোখের তারায়। ওর ঘাড়টা বোধহয় খুব জোরে চেপে ধরেছিলাম আমি, ব্যথা পেয়ে ওর ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে যেতে

লাগল, বেরিয়ে পড়ল দাঁত।

এই সময় গ্রেভসের গল্পটা মনে পড়ল আমার। ঘাসের জঙ্গলে মৃত অবস্থায় যে মহিলাকে পাওয়া গিয়েছিল তার সমস্ত শরীর কালো হয়ে গিয়েছিল, দাঁতের দাগ ছিল পায়ের গোছের ওপর। ছোট ছোট দাঁত–বাচ্চাদের।

আমি জোর করে বো-র মুখ হাঁ করালাম। মোমবাতিটা দাঁড় করালাম মুখটার সামনে। কিন্তু ও এত বেশি শরীর মোচড়াচ্ছে যে বাধ্য হয়ে মোমবাতিটা মাটিতে রেখে ওর ঠ্যাং দুটো মুক্ত হাতটা দিয়ে চেপে ধরতে হলো। ইতিমধ্যে যা দেখার দেখে নিয়েছি আমি। সমস্ত শরীর আমার ঠাণ্ডা হয়ে গেল দ্রুত। একসারি ইঁদুরের দাঁতের দুই পাশে ছুঁচাল দুই ছেদক দন্ত নিয়ে যে শরীরটা আমার হাতের মধ্যে মোচড় খাচ্ছে আর হিস হিস শব্দ তুলছে, ওটা কোন নারী শরীর নয়–বিষাক্ত একটা সাপ! ওটাকে আমি একটা সাবানের পরিত্যক্ত কাঠের বাক্সে ঢুকিয়ে ওপরে কাঠের ছিলকা মেরে দিলাম। ওকে আসলে উচিত লোহার বাক্সে পুরে সমুদ্রে ডুবিয়ে দেয়া। কিন্তু গ্রেভসের সঙ্গে কথা না বলে কাজটা করা ঠিক হবে না ভেবে প্ল্যানটাকে আপাতত স্থগিত রাখলাম।

কোন দুর্ঘটনায় যাতে পড়তে না হয় সেজন্যে আগেভাগে কিছু সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। কারণ, কে বলতে পারে, বো-র ভাই-ব্রাদাররা সুযোগ পেলে প্রতিশোধ নিতে আসবে না। তাই পকেটে একটা তীক্ষ্ণধার ছুরি, রাবার ব্যাণ্ডেজ এবং এক বাক্স পারম্যাঙ্গানেট ক্রিস্টাল (সাপে কামড়ানো রোগীর ফার্স্ট এইডের মহৌষধ) পুরে ডেকে গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

চমৎকার তারাজ্বলা রাত। ফুরফুরে হাওয়া বইছে। ঘুমটা জমবে ভাল, কিন্তু ঘুমাবার আগে বো-র অবস্থাটা একবার দেখে আসা উচিত ভেবে উঠে পড়লাম। দরজা বন্ধ করতে নিশ্চয়ই ভুলে গিয়েছিলাম আমি। কারণ, ভেতরে ঢুকে দেখি বো নেই। পালিয়েছে। মাথা দিয়ে বাড়ি মেরেই বোধহয় ও নরম কাঠের বাক্সটা ভেঙেছে। ওর শারীরিক সামর্থ্যকে অবজ্ঞা করা উচিত হয়নি আমার।

লঞ্চের লোকজন লণ্ঠন জ্বেলে তন্ন তন্ন করে খুঁজল বো-কে। কিন্তু কোথাও ওর টিকিটিও দেখা গেল না। তার মানে জলে নেমে গেছে বো। অবশ্য সাপদের জন্যে সাঁতার কাটা কোন সমস্যা নয়।

আমি ছোট একটা নৌকায় চড়ে দ্রুত তীরে চলে এলাম। ডনকে সঙ্গে করে, হাতে লোড করা শটগান নিয়ে হনহন করে হাঁটতে শুরু করলাম তীর ধরে। পথ শর্টকাট করার জন্যে ঘাসের একটা জঙ্গলে ঢুকে দ্রুত এগোতে থাকলাম। হঠাৎ ডন কাঁপতে শুরু করল, ঘাসের গায়ে নাক লাগিয়ে কী যেন শুঁকছে।

'গুড, ডন,' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। 'গুড বয়, ওর পিছু নাও! খুঁজে বের করো ওকে!'

প্রকৃতি পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে। আমরা গ্রেভসের বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছি। দূর থেকে বারান্দায় দুই ছায়ামূর্তিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। দেখেই বুঝলাম গ্রেভস এবং তার বউ। আমি ওকে সাবধান

করার জন্যে মুখ খুলেছি, বলতে যাচ্ছি বো পালিয়ে গেছে এবং বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে, এই সময় তীক্ষ্ণ এবং তীব্র একটা চিৎকার বিস্ফোরণের মত আঘাত হানল কানে। দেখলাম গ্রেভস বিদ্যুৎবেগে ঘুরে গেল তার স্ত্রীর দিকে। মেয়েটা পড়ে যাচ্ছে, দু'হাতে জড়িয়ে ধরল তাকে।

মিসেস চেস্টার এখনও জ্ঞান হারায়নি, দাঁতে দাঁত চেপে আছে, ঘাম ফুটে উঠেছে কপালে। আমি তাড়াতাড়ি ওর পা থেকে খুলে ফেললাম মোজা। আঙুল এবং গোড়ালির মাঝের জায়গাটায় কামড় বসিয়েছে বো। বিষের ক্রিয়ায় ইতিমধ্যে জায়গাটা কালো হয়ে ফুলে উঠেছে। ডাক্তারি ছুরিটা দিয়ে আমি ক্ষতচিহ্নটা চিরে ফেললাম, ওষুধ লাগিয়ে জায়গাটা ব্যাণ্ডেজ করে দিলাম।

'গ্রেভস,' ওকে একপাশে ডেকে নিয়ে বললাম। 'তোমার স্ত্রী জ্ঞান হারাতে শুরু করলে অল্প অল্প করে তাকে ব্র্যাণ্ডি খাইয়ে দিয়ো। তবে ভয়ের কিছু নেই বলেই আমার বিশ্বাস। কারণ, ঠিক সময়ই ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে। আর শোনো, ভুলেও বলতে যেয়ো না, কেন এবং কীসে তাকে কামড়েছে...'

বলে আর দেরি করলাম না আমি। ডনকে বারান্দায় একটি থামের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিলাম। ও খুবই অস্থির হয়ে উঠেছে। তাড়াতাড়ি ওর বাঁধন খুলে ছুটলাম বো-র পায়ের চিহ্ন লক্ষ্য করে।

উজ্জ্বল চাঁদ দিন করে রেখেছে চারদিক। বালির ওপর বো-র ছোট ছোট পায়ের দাগ স্পষ্ট চেনা যাচ্ছে। ডনকে শোঁকালাম ওই দাগ, তারপর তাড়া দিলাম, 'খোঁজো ওকে, ডন! শিগ্‌গির খুঁজে বের করো।'

পায়ের দাগ ধরে আমরা ক্রমশ ঢুকে পড়লাম দ্বীপের ভেতরের অংশে। ঘাসের গন্ধ তীব্রভাবে নাকে ধাক্কা মারছে। ডনের চলার গতি হঠাৎ মন্থর হয়ে গেল, শরীর হয়ে উঠল আড়ষ্ট, তীক্ষ্ণ চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখার চেষ্টা করল। আমি মাথা বাড়ালাম। কিছুই চোখে পড়ল না, এদিকে ডন তার লেজের ডগা বিপুল বেগে নাড়াতে শুরু করেছে, শরীরটা ক্রমশ মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে লাগল, ঘন এক গোছা ঘাসের দিকে এগিয়ে নিল মাথাটা। এক পা সামনে বাড়াল ডন, ওর ডান থাবাটা উঠে গেল শূন্যে, লেজ নাড়ানো থেমে গেল একই সঙ্গে। শক্ত, লোহার মত হয়ে উঠল ওটা।

'দাঁড়াও, ডন!' প্রায় ফিসফিস করে বললাম আমি। শটগানটা স্থির করলাম ঘন ঘাসের গোছাকে লক্ষ্য করে, ট্রিগারে আঙুলের চাপ পড়ল...

'তোমার স্ত্রী এখন কেমন আছে?'

'আগের চেয়ে ভাল। পরপর দুটো গুলির শব্দ শুনলাম। শিকার মিলল কিছু?'

মূলঃ গভর্নর মরিস

খুদে আতঙ্ক

সেদিন সন্ধ্যায় ন্যান্সির ছোট্ট জীবনে যে অলৌকিক এবং অতি অবাক করা ঘটনাটি ঘটে গেল, তা যেমন ভয়াবহ তেমনই রক্ত হিম করা। তবে ন্যান্সির জীবনে দারুণ পরিবর্তন এনে দেয়া এ ঘটনাটি ঘটার সময় অলৌকিকতার অনুষঙ্গ হিসেবে প্রকৃতিতে বিদঘুটে কোন ব্যাপার ঘটল না। এমনকী আকাশ কাঁপিয়ে বজ্রপাতও হলো না। ঘটনাটি ঘটার সময় ন্যান্সির মা কিছুই টের পেলেন না, ন্যান্সির বাবা তখন অফিস থেকে ফিরে চায়ের পেয়ালায় আয়েশ করে চুমুক দিচ্ছিলেন। প্রকৃতির মাঝে হুলস্থুল ফেলে দেয়া কোন ঘটনা ঘটলে নাকি পশু-পাখিরাও টের পেয়ে যায়। কিন্তু ন্যান্সির জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাটি পৃথিবীর ইতিহাসে সবচে' বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনা হলেও আশ্চর্যের বিষয়–কেউ তা টের পেল না। হয়তো স্বর্গে বসে বিশপ বার্কলে (১৬৮৫-১৭৫৩) সবই দেখতে পেয়েছেন এবং তিনি ফিকফিক করে হাসছেনও। তবে সাইকিয়াট্রিস্ট জো হল্টের সামনে এ ঘটনা ঘটলে কী হত, বলা যায় না। হয় তিনি ব্যাপারটা হজম করে তার বিপরীতে ব্যাখ্যা দাঁড় করাবার চেষ্টা করতেন, অথবা অজ্ঞান হয়ে যেতেন। তবে মোদ্দা কথা এই, সেদিন সন্ধ্যায় অলৌকিক এবং ভয়াবহ যে ঘটনাটি ঘটে গেল তা ঘটেছে খুবই নীরবে, কাউকে জানান না দিয়েই। আর এজন্য দায়ী করা যায় ন্যান্সির দাদু মি. রেগানকে।

মি. রেগান ন্যান্সির আপন দাদু নন। ওরা কেনসিংটন স্ট্রিটে বেন্থাম সাহেবের ভাড়াটে ছিল রিটায়ার্ড জজ সাহেবটির ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনিরা সবাই অস্ট্রেলিয়ায় সাত বছরের ন্যান্সি তাঁর কলজের টুকরো। ন্যান্সিরা প্যারাডাইস ভ্যালিতে নিজেদের বাড়িতে চলে এলেও হপ্তায় একদিন ন্যান্সিকে না দেখলে মি. রেগানের বুকের ভেতরটা খাঁ-খাঁ করে। সাধারণত বিষ্যুদবার বিকেলে পুরো সময়টা ন্যান্সির সাথে কাটাতে ওদের বাসায় চলে আসেন তিনি। আজ বিষ্যুদবার। সন্ধ্যার আগে আগে তিনি ন্যান্সির কাছে বিদায় নিতে চাইলেন। সাড়ে ছ'টায় তাঁর ডাক্তারের সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, ওখানে যাবেন।

ন্যান্সি স্থির হয়ে কখনও দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। সব সময় লাফাতে থাকে। দাদুকে নিয়ে সে লাফাতে লাফাতে গেটের কাছে এল। সন্ধ্যা লাগল বলে। পশ্চিমাকাশটা লাল টকটকে।

গেট খুলে মি. রেগান ঝুঁকলেন ন্যান্সির দিকে, চুমু খাবেন। ন্যান্সি অনিচ্ছাসত্ত্বেও তার দাদুকে চুমু খেতে দিল। দাদু চুমু খেলেই গালে থুতু লাগিয়ে দেয়। ন্যান্সি গাল মুছতে মুছতে, যেন পাওনাদারের কাছে টাকা ফেরত চাইছে, এমন ভঙ্গিতে হুকুম করল, 'কয়েন ভ্যানিশ করার খেলাটা, দাদু।'

একান্ত বাধ্যগত ছাত্রের মত ন্যান্সির দাদু পকেট থেকে একটা আধুলি বের করে বুড়ো আঙুল আর মধ্যমার মাঝে ওটাকে আটকালেন। সময় দিলেন তিনি ন্যান্সিকে আধুলিটা দেখার। ন্যান্সি দম বন্ধ করে রইল। মি. রেগান দ্রুত আঙুল ঝাঁকালেন। অদৃশ্য হয়ে গেল কয়েন।

মিষ্টি হাসিতে ভরে গেল ন্যান্সির মুখ। 'আবার, দাদু।'

মি. রেগান আবার একটা কয়েন নিলেন। ন্যান্সি কয়েনের সাথে প্রায় মুখ লাগিয়ে ওটা দেখতে লাগল। তার চেহারায় মুগ্ধ বিস্ময়। দ্বিতীয়বারের মত অদৃশ্য হয়ে গেল কয়েন।

'এটা কি সত্যি জাদু?' খানিকটা দ্বিধা নিয়ে প্রশ্ন করল ন্যান্সি। পরী বা রাক্ষস-খোক্ষস বলতে যে কিছুর অস্তিত্ব নেই, তা সে ইদানীং আবিষ্কার করতে শুরু করেছে।

'এটা সত্যি জাদু,' বললেন মি. রেগান।

'কীভাবে করলে দেখাও না,' মিনতি করল ন্যান্সি। 'প্লি-ই-জ।'

ন্যান্সির দাদু ওর কানে ফিসফিসিয়ে বললেন, 'আমি বলেছি ওগলডিবু। আর ওটা অদৃশ্য হয়ে গেল। তুমি বলতে পারবে?'

ন্যান্সিও ফিসফিস করল, 'ওগলডিবু।'

'বেশ, বেশ।' সিধে হলেন রেগান। 'তুমি এই কয়েনটাকে ওগলডিবু বলো, তারপর দেখো কী হয়।'

দুই আঙুলের ফাঁকে আরেকটা আধুলি ধরলেন তিনি।

ন্যান্সি কয়েনটার দিকে তাকিয়ে হাসল ফিকফিক করে। বলল, 'ওগলডিবু।'

তার দাদু ঝাপটা মারলেন হাতে। নেই হয়ে গেল কয়েন। উজ্জ্বল হাসিতে মুখ ভরে গেল ন্যান্সির। 'আবার, দাদু।'

'ঠিক হ্যায়,' সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন মি. রেগান। আবার আরেকটা কয়েন বের করলেন পকেট থেকে, ধরলেন দুই আঙুলের ফাঁকে। ঝিকিয়ে উঠল ন্যান্সির চোখ। গভীর গলায় বলল, 'ওগলডিবু।'

অদৃশ্য হয়ে গেল কয়েন। মি. রেগানকে খানিকটা বিস্মিত দেখাল। অবশ্য এটাই স্বাভাবিক। কারণ, কস্মিনকালেও তিনি বিশপ বার্কলের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা নিয়ে লেখা তত্ত্বের কথা শোনেননি। তবে ন্যান্সির দিকে তাকিয়ে চেষ্টাকৃত একটা হাসি উপহার দিলেন তিনি।

'এবার আমাকে ছাড়ো, দাদুভাই। দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

ন্যান্সি হাসিমুখে তার দাদুকে বিদায় দিল। যতক্ষণ রেগান সাহেবকে দেখা গেল, তাঁকে 'টাটা' দিয়েই চলল সে। উনি রাস্তার মোড় ঘুরতেই লাফাতে লাফাতে বাগানে ঢুকল ন্যান্সি। সে খেয়াল করেনি, মি. রেগান যাবার সময় বারবার কোটের হাতায় ঝাঁকি মারছিলেন। যেন ভেতর থেকে কিছু একটা বের হয়ে আসবে–কিন্তু জিনিসটা বেরোয়নি।

ন্যান্সির খেলার জায়গা হলো বাড়ির সামনের লন লাগোয়া বাগান। তার

তেমন বন্ধু নেই। আর ন্যান্সি একাই খেলা করতে ভালবাসে। গেট খোলার আগে গোলাপ ঝাড়টার পাশে একটা কেন্নোকে শরীর গোল করে, মটকা মেরে পড়ে থাকতে দেখেছে সে। দাদুর ভয়ে ওটার দিকে নজর দিতে পারেনি ন্যান্সি। লাল টকটকে রঙের কীটটাকে দেখলেই গা ঘিনঘিন করে ওর। দেখল, এখনও আগের জায়গায় পড়ে আছে কেন্নো। তীব্র বিতৃষ্ণা নিয়ে ওটার দিকে তাকিয়ে ন্যান্সি বলল, 'ওগলডিবু।'

সাথে সাথে ভ্যানিশ হয়ে গেল কেন্নো। এবার খুশি মনে ঘরে ঢুকল ন্যান্সি। মা ডাকছেন। লক্ষ্মী মেয়ের মত রাতের খাবারটা খেয়ে নিল ন্যান্সি। কিন্তু দুধ খেতে ইচ্ছে করছে না। মা কঠিন গলায় বললেন, 'রোজ দুধ খাওয়ার সময় বাহানা। এজন্যেই তো এমন কাঠি হচ্ছ দিন দিন। নাও, দুধ খেয়ে নাও।'

ন্যান্সি বেজার মুখ করে কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় ভেতর ঘরে বেজে উঠল ফোন। মা ফোন ধরতে গেলেন। ন্যান্সি গ্লাসের দুধের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল, গভীর গলায় বলল, 'ওগলডিবু।' দুধটুকু উবে গেল গ্লাস থেকে।

হাসিমুখে বিছানায় গেল ন্যান্সি। বাবা-মাকে চুমু খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল দ্রুত। তবে ঘুমের মধ্যে কোন স্বপ্ন দেখল না সে।

এই যে একটার পর একটা অবাক করা ঘটনা ঘটল, কেউ কিন্তু তা লক্ষ করল না। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও ছন্দপতন হলো না, কেউ আঁতকে উঠল না ভয়ে, অবিশ্বাসে কারও চোখও বড় হলো না। অ্যাংলিকান চার্চের রেভারেণ্ড জর্জ বার্কলে, যিনি দর্শনের ওপর বই লিখেছেন, এবং মারা গেছেন ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে, তাঁর কথাও কারও মনে পড়ল না।

পরদিন ফ্রেশ মুড নিয়ে ঘুম ভাঙল ন্যান্সির। তাকে সকালের নাস্তা খাওয়াতে কোন রকম ঝক্কিও পোহাতে হলো না ন্যান্সির মায়ের। জেলি মাখানো ব্রেড, ডিম পোচ আর কলা খেল সে নীরবেই। শুধু সুজির হালুয়ার প্লেটের দিকে তাকাল বিরক্তি নিয়ে। হপ্তায় চারদিন নাস্তায় তাকে বিশ্রী এ জিনিসটা খেতেই হয়। আজ সেই রুটিনের শেষ দিন। কিন্তু পেট ভরে গেছে ন্যান্সির। অথচ টেবিল ছেড়ে ওঠার উপায় নেই। মা তার মুখোমুখি বসে আছেন, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেয়ের খাওয়া দেখছেন। ন্যান্সিকে এবার বাঁচিয়ে দিল দুধওলা। সে কড়া নেড়ে হাঁক ছাড়ল, 'ম্যাডাম, দুধ নেন।'

ন্যান্সির মা দুধ আনতে গেলেন। এসে দেখেন হালুয়ার বাটি শূন্য। খুশি হয়ে গেলেন তিনি। আদর করে চুমু খেলেন মেয়েকে। ন্যান্সি শুধু হাসল মুখ টিপে।

চমৎকার ঝকঝকে সকাল। বাড়ির পেছন দিকে চলে এল ন্যান্সি। এদিকে দেয়ালটাকে আরও উঁচু করে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘিরে দেবেন বলে ইট-সুরকি-বালু এনে গাদা করে রেখেছেন ন্যান্সির বাবা। এখানেও খেলা করার নতুন জায়গা পেয়ে গেছে ন্যান্সি। সে মহা উৎসাহে বালু দিয়ে প্রাসাদ নির্মাণ শুরু করে দিল। গান গাইতে গাইতে কাজটা করছে ন্যান্সি, হঠাৎ সেখানে হাজির হলো পাশের বাড়ির চার্লস। ন্যান্সি তার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসল, তবে তার বুকের

ভেতর গুড়গুড় ডাকতে শুরু করেছে শঙ্কার মেঘ। চার্লস ন্যান্সির চেয়ে এক বছরের ছোটই হবে, কিন্তু ভয়ানক পাজি। সে এসেই আছাড় খেল ন্যান্সির সদ্য তৈরি করা বালুর ঘরে। ন্যান্সির মুখ থেকে নিভে গেল হাসি, রাগ ফুটল চোখের তারায়। কিন্তু তার নীরব শাসন বিন্দুমাত্র পাত্তা না দিয়ে চেঁচাতে শুরু করল চার্লস, 'সাবধান। শত্রুর হাত থেকে সাবধান! ব্যাটম্যানরা আক্রমণ করতে আসছে। শিগ্গির পালাও।'

ন্যান্সি মাথা নেড়ে বলল, কোথাও পালাবে না সে।

'তা হলে চলো, সিন্দাবাদ সাজি। আমি সিন্দাবাদ, তুমি মিভ,' উত্তেজনায় লাফাতে শুরু করেছে চার্লস। 'এই যে আমার তরবারি,' বলে অবিকল টিভি-সিরিজের সিন্দাবাদের মত একটা তরবারি সাঁই সাঁই ঘোরাতে শুরু করল সে।

'ওই দেখো দস্যু জিঙ্গালা আসছে। সাবধান! সাবধান! সাবধান! না, শয়তান, মিভকে তোর হাতে কিছুতেই ছেড়ে দেব না,' এবার প্রকাণ্ড এক লাফ মারল চার্লস অদৃশ্য শত্রুকে উদ্দেশ্য করে। তার পায়ের চাপে ভর্তা হয়ে গেল ন্যান্সির বালুর ফোয়ারা।

কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল ন্যান্সির চেহারা। কোন মতে চোখের জল আটকে বলল, 'চার্লস, ভাল হবে না বলছি!'

'কী ভাল হবে না?' তলোয়ার বাগিয়ে এল চার্লস। রীতিমত হুমকির সুরে বলল, 'তোমাকে আমি দস্যু জিঙ্গালার হাত থেকে বাঁচাতে চাইছি, আর তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ! কী করবে শুনি?'

'এখান থেকে চলে যাও,' কর্কশ গলায় বলল ন্যান্সি। 'না গেলে তোমার খবর আছে!'

চার্লস ভাবল, ন্যান্সি হয়তো তার মা'র কাছে নালিশ করবে। সে ওসবের থোড়াই কেয়ার করে। সে জানে, ন্যান্সি নালিশ করলেও তার মা তাকে কিছুই বলবে না। সে চিৎকার করে উঠল, 'ওই যে দস্যু জিঙ্গালা এসে পড়েছে। তবে রে, শয়তান, এবার দেখাচ্ছি মজা।'

বিপুল উৎসাহে চার্লস কোপ মারল দস্যু জিঙ্গালাকে উদ্দেশ্য করে। তাতে অদৃশ্য দস্যু সর্দারের কিছুই হলো না, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট কোপ গিয়ে পড়ল ন্যান্সির অতিযত্নে গড়া সর্বশেষ বালুর প্রাসাদে এবং তাসের ঘরের মতই ওটার দফারফা হয়ে গেল।

প্রচণ্ড রাগে এবং সব হারানোর বেদনায় শোকার্ত ন্যান্সি চেঁচিয়ে উঠল, 'ওগলডিবু!' মুহূর্তেই বাতাসের সাথে মিশে গেল চার্লস। সব আবার আগের মত শান্ত এবং নীরব হয়ে গেল। ন্যান্সি নতুন করে তার বালুর প্রাসাদ তৈরির কাজে মন দিল। ঘণ্টাখানেক পরে ঘরে ঢুকল সে। খিদে পেয়েছে। বিস্কুট খাবে।

ন্যান্সির মা জিজ্ঞেস করলেন, 'চার্লস কোথায়? ও তোমার সাথে খেলছিল না?'

বিস্কুটে কামড় দিয়ে উদাস গলায় ন্যান্সি বলল, 'ওকে আমি ওগলডিবু

বললাম, আর ও চলে গেল।'

ন্যান্সির মা মেয়ের কথা শুনে হাসলেন। হেঁশেলে ঢুকলেন তিনি, অনেক কাজ পড়ে আছে। এখানেই মারাত্মক ভুলটা করলেন। তাঁর উচিত ছিল চার্লসের ব্যাপারে আরও খোঁজ-খবর নেয়া। কারণ, ন্যান্সির কাছে চার্লসকে অদৃশ্য করে দেয়ার ব্যাপারটি স্বাভাবিক মনে হলেও, বিশপ বার্কলে যদি বেঁচে থাকতেন, এই ঘটনা দেখলে আঁতকে উঠতেন ভয়ে। ১৬৮৫-তে জন্ম বিশপ বার্কলের, মৃত্যু ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে। দার্শনিক এই রেভারেণ্ডটি তাঁর দর্শনের বইতে বলে গেছেন, পদার্থের অস্তিত্ব রয়েছে, কারণ মানুষ তার অস্তিত্ব আছে বলে মনে করে। কিন্তু ন্যান্সি অসম্ভব দুর্লভ একটি গুণের অধিকারিণী হয়ে পড়েছে–সে ইচ্ছে করলেই ভাবতে পারছে, অমুক জিনিসটির অস্তিত্ব নেই। তার ভাবনাটা এত জোরাল এবং আত্মবিশ্বাসে ভরপুর যে, সত্যি সেই জিনিসের অস্তিত্ব আর থাকছে না। এরকম প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী ভাবনা প্রাপ্তবয়স্কদের নেই, এমন জোরালভাবে ভাবার ক্ষমতাও তাদের নেই। বিশপ বার্কলের তত্ত্ব অনুযায়ী পদার্থকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার এই, ক্ষমতাটি আসলে এক ধরনের প্রাকৃতিক বিস্ফোরণ–ন্যান্সি চাইলেই যে-কোন পদার্থকে অদৃশ্য করে দিতে পারছে। আমরা সবাই মনে মনে কত কিছুই তো কামনা করি, কিন্তু পাই না। ন্যান্সি যা চাইছে, তা পাচ্ছে।

দুপুর বেলা চার্লসের মা এলেন ছেলের খোঁজে। খানিক 'চার্লস! চার্লস! এই, চার্লি!' বলে নানা সুরে গুণধর সন্তানকে ডেকে চললেন তিনি, শেষে সাড়া না পেয়ে ন্যান্সিদের ঘরে ঢুকলেন। ন্যান্সি তখন ফিশ বল খাচ্ছে মজা করে। ন্যান্সির মা গেলেন চার্লসের মা'র সাথে কথা বলতে।

ন্যান্সি শুনল মা বলছেন, 'কই না তো! চার্লসকে সকালের পর আর দেখিনি তো। ন্যান্সির সাথে খেলা করছিল ও। তারপর সে চলে যায়।' গলা বাড়ালেন তিনি, 'মা-মণি! তুমি জানো, চার্লস কোথায় গেছে?'

'না, মাম্মি,' গানের সুরে বলল ন্যান্সি, আরেকটা বল তুলে নিল হাতে। ফিশ বল খুব প্রিয় ওর। একটু পরে ন্যান্সির মা এলেন ওর কাছে। ভুরু কোঁচকানো। বললেন, 'ভাবছি, ছেলেটা কোথায় গেল। দুষ্টু হলেও চার্লস তো কখনও বাড়ির বাইরে যায় না। ও কোথায় গেছে, তুমি সত্যি দেখোনি?'

এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল ন্যান্সি।

'কারও সাথে যেতেও দেখোনি?' অস্বস্তি নিয়ে প্রশ্ন করলেন তিনি।

চোখ বুজে ফিশ বল চিবুতে চিবুতে আবার দু'পাশে মাথা নাড়ল ন্যান্সি।

'না,' জবাব দিল সে। 'আমি ওকে বললাম–ওগলডিবু। আর ও চলে গেল।'

ন্যান্সিকে আর এ নিয়ে প্রশ্ন করলেন না ন্যান্সির মা। তবে তাঁকে অসন্তুষ্ট দেখাল। চার্লসের মা তাঁর ছেলেকে খুঁজে না পাবার দোষ না আবার ন্যান্সির কাঁধে চাপিয়ে দেন। মহিলা ঝগড়াটে আছেন বেশ। তাঁকে ন্যান্সির মা তেমন পছন্দ না করলেও পড়শি হিসেবে যতটুকু সৌজন্য দেখানোর দরকার, সেটুকু দেখিয়ে চলেন। শত হলেও এ পাড়ায় চার্লসরা আছে অনেক দিন ধরে। আর তাঁরা

এসেছেন বলতে গেলে এই সেদিন।

ন্যান্সিকে নিয়ে বিকেলে বেরোলেন ন্যান্সির মা। ড্রিম প্লাজার সবচে' বড় পোশাকের দোকান আর্স্টিন-এ প্রচণ্ড ভিড়। তারা সব রকম পোশাকের 'মূল্য হ্রাস' ঘোষণা করেছে। ওই দোকানে অনেক কষ্টে ন্যান্সিকে নিয়ে ন্যান্সির মা ঢুকেছেন, কোত্থেকে পাহাড়ের মত শরীর নিয়ে এক মহিলা প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল রোগা-পাতলা ন্যান্সির গায়ে। ধাক্কার চোটে ন্যান্সি ছিটকে গেল কাউন্টারের এক কোনায়, ব্যথায় কেঁদে ফেলল সে, সজল চোখে ঠিকরে বেরুল আগুন, মানুষ-পর্বতের দিকে তাকিয়ে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'ওগলডিবু।' নেই হয়ে গেল মোটা মহিলা।

ভয়ে-বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল একটা নারী কণ্ঠ, কিন্তু চোখের সামনে ঘটে যাওয়া দৃশ্যটা যেন বিশ্বাস করতে চাইল না কেউ। ওদিকে পেছন থেকে হুড়মুড় করে কারা যেন ঢুকে পড়ল ভেতরে, চোখ পলকে মোটা মহিলার ফাঁকা জায়গাটা পূরণ হয়ে গেল। ন্যান্সি বেরিয়ে আসতে যাচ্ছিল, আবার আটকা পড়ে গেল কাউন্টারের ধারে। ওর মা কোন রকমে মেয়েকে টেনে-হিঁচড়ে বের করে আনলেন দঙ্গলের মাঝ থেকে। ন্যান্সির খুবই মন খারাপ হয়ে গেল দেখে, তার মাথার ঝালর দেয়া হ্যাটটা কুঁচকে, ভাঁজ নষ্ট হয়ে গেছে।

'তোকে নিয়ে ভিড়ের মধ্যে ঢোকা উচিত হয়নি রে, মা,' আফসোস করলেন ন্যান্সির মা। 'চল। আমরা ওপরে যাই। ওদিকে লোকজন মনে হয় কম।' প্লাজার চলন্ত সিঁড়িতে পিঁপড়ের মত মানুষ। সে তুলনায় লিফটে ভিড় কম। ন্যান্সির মা ওকে নিয়ে লিফটের দিকে এগোলেন।

ন্যান্সির দুর্ভাগ্য নাকি ওদের নিয়তি, কে জানে, ন্যান্সির মা মেয়েকে নিয়ে মাত্র লিফটে ঢুকেছেন, কোত্থেকে একটা পরিবার, বুড়ো-ধাড়ি-বাচ্চা মিলিয়ে জনা আটেক তো হবেই, হুড়হুড়িয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে, বেচারী ন্যান্সিকে একেবারে চিড়ে-চ্যাপ্টা করে দিয়ে। আতঙ্কিত ন্যান্সি সভয়ে চিৎকার করে উঠল, 'ওগলডিবু।' লিফটে ওরা মা-মেয়ে এবং লিফটম্যান ছাড়া আর কেউ রইল না। চোখের সামনে থেকে জলজ্যান্ত সাত-আটজন মানুষকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখে মুখ হাঁ হয়ে গেল লিফটম্যানের, হাঁ হয়েই থাকল, অনায়াসে একটা পেস্ট্রি ঢুকিয়ে দেয়া যাবে মুখের ভেতর। ন্যান্সির মা'র চোখ জোড়া রোদ চশমার আড়ালে বড় বড় হয়ে গেল। তিনি চোখের সামনে ঘটে যাওয়া ঘটনাটা বিশ্বাসই করতে পারছেন না। সানগ্লাসটা খুলে রুমাল দিয়ে ঘষে ঘষে মুছলেন কাচ জোড়া। বিড়বিড় করে কী যেন বলছেন।

আর ন্যান্সি? ওর কোন ভাবান্তর নেই। বরং বিশ্রী চাপাচাপির হাত থেকে রক্ষা পেয়ে তাকে খুশি এবং সন্তুষ্ট দেখাচ্ছে। খুশির কারণ, তাকে আর ভিড়ের মধ্যে পড়তে হবে না; আর সন্তুষ্টিবোধ করছে এই ভেবে, সে জানে ভিড়ের মধ্যে পড়লেও দিব্যি নিজের জন্য জায়গা করে নিতে পারবে।

লিফট তিনতলায় চলে এল। কেউ কোন কথা বলল না। ন্যান্সির মা দ্রুত একটা স্ন্যাক্সের দোকানে ঢুকলেন। মেয়েকে মিল্কশেক কিনে দিয়ে শূন্য চোখে

তাকিয়ে রইলেন গ্লাস ডোরের বাইরে। গরমে নিশ্চয়ই চোখে ধাঁধা দেখেছেন, ভাবছেন ন্যান্সির মা। বাইরে যা কড়া রোদ! তাপের চোটে মগজ গলে যাওয়ার উপক্রম। প্রচণ্ড গরম থেকে তিনি হঠাৎ ঢুকে পড়েছেন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে। হঠাৎ গরম থেকে হঠাৎ ঠাণ্ডা–ব্রেনে নির্ঘাত কোন প্রতিক্রিয়া ঘটিয়েছে। ডিল্যুশন না ভ্রম কী যেন বলে, ওটা হয়েছে তাঁর, ইত্যাদি নানা কথা ভেবে সান্ত্বনা পেতে চাইছেন ন্যান্সির মা, কিন্তু ভেতরের কাঁপুনিটা কিছুতেই কমানো যাচ্ছে না। ওদিকে ন্যান্সির মিল্কশেক খাওয়া শেষ। মা'র কনুই ধরে টান দিল সে, 'মাম্মি, চলো!'

তিনতলার একটা গার্মেন্টিসের দোকান থেকে ন্যান্সির জন্য একটা ড্রেস কিনলেন ন্যান্সির মা। তাঁর নিজের জন্যও কিছু কেনাকাটার দরকার ছিল। কিন্তু ইচ্ছে করছে না। তিনি ঠিক করেছেন, বাসায় ফিরেই তাঁদের পারিবারিক বন্ধু সাইকিয়াট্রিস্ট জো হল্টকে ফোন করবেন। চোখের সামনে থেকে সাত-আটজন মানুষ গায়েব। এর ব্যাখ্যা কী? মাগো, ভাবতেই দেখো গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে।

পেনসিলভানিয়া এভিন্যুতে এসে জ্যামে পড়ে গেল ন্যান্সিরা। যানজটটাকে আরও ভয়ানক করে তুলেছে আর্ট ইনস্টিটিউটের একটা দল। সম্ভবত আজ তাদের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী জাতীয় কিছু একটা। অনেক ছেলে-মেয়ে, রঙ-চঙে পোশাক পরে কেউ সং সেজেছে, কেউ ঢোল বাজাচ্ছে, কেউ-বা বাঁশিতে ফুঁ দিচ্ছে। সব মিলে এলাহি কাণ্ড। তবে ন্যান্সিকে সবচে' আকর্ষণ করল ড্রাগনটা। ড্রাগনটা বিশাল। ঘাড়টাই হবে কমপক্ষে বিশ ফুট লম্বা। লাল ক্যানভাস দিয়ে তৈরি, ঘাড়ের শেষে জোড়া লাগানো মাথাটার আয়তন পাঁচ ফুটের কম হবে না। মাথায় আবার ছোট ছোট শিংও আছে। চোখ জোড়া বড় পিরিচের সমান, যেন জ্বলছে, নাকের ফুটো দিয়ে হঠাৎ-হঠাৎ গলগল করে বেরিয়ে আসছে ধোঁয়া। ড্রাগনের ঘাড় নড়ছে, সেই সাথে এপাশ-ওপাশ দুলছে মাথা, মাঝে মাঝে ছুটে যাচ্ছে পথচারী, ট্যাক্সি বা গাড়ির আরোহীদের দিকে। বাচ্চারা ভয় এবং উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠছে।

গোটা ব্যাপারটা একই সাথে রোমহর্ষক এবং মজাদার মনে হলো ন্যান্সির কাছে। সে গাড়ির মধ্যে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারছে না, লাফিয়ে উঠছে বারবার।

ড্রাগনটা হঠাৎ ছুটে এল ন্যান্সির দিকে। বিকট, লম্বা মুখটা একেবারে ওর মুখের সামনে। সশব্দে নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল রূপকথার দানব, চোখ জোড়া ভাঁটার মত জ্বলছে, কয়েক সেকেণ্ড স্থির হয়ে তাকিয়ে রইল ওর চোখে চোখ রেখে।

খিল খিল হেসে উঠল ন্যান্সি, গলা ফাটিয়ে চেঁচাল, 'ওগলডিবু।'

দিড়িম শব্দে রাস্তার ওপরে এক হাঁড়ি ফাটল, ধোঁয়ার মেঘ উঠল ওটা থেকে। এক লোক চিৎ হয়ে পড়ে গেল, সেই সাথে একটা মোটর ট্রাকও ছিটকে গেল। জিনিসটা এতক্ষণ ড্রাগনের শরীরের মধ্যে লুকানো ছিল। লোকটা হাঁচড়ে পাঁচড়ে

উঠে বসল, বোকার মত তাকিয়ে আছে শূন্য হাতের দিকে। কয়েকটা রশি ছিল তার হাতে, ওগুলো দিয়ে এতক্ষণ ড্রাগনের কাঁধ আর মাথা নাড়াচ্ছিল সে। রশিটা অদৃশ্য, সেই রশি ধরে রাখা চারজন মানুষও যেন মিলিয়ে গেছে শূন্যে। এরা মোটর ট্রাকটার ওপরে ছিল, ক্যানভাসের নিচে তারাই ড্রাগন সেজে বাচ্চাদের ভয় দেখাচ্ছিল। এখন ড্রাগন নেই, ওরাও নেই।

বিশ ফুট লম্বা ড্রাগন হঠাৎ চোখের সামনে থেকে 'নেই' হয়ে যাবার পরে পেনসিলভানিয়া এভিন্যুতে যে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হলো, তা ভাষায় প্রকাশ করার নয়। দীর্ঘ যানজটে যারা পেছনে ছিল তারা বুঝতে পারল, সামনের দিকে মারাত্মক কিছু একটা ঘটে গেছে যার জন্য বিকট হই-হল্লার আওয়াজ ভেসে আসছে। লম্বা, নির্জীব পাইথনের মত বিশাল জট হঠাৎ ঝাঁকি খেল, যেন খুলে যেতে লাগল গিঁটগুলো, উন্মাদের মত ছোটাছুটি শুরু করে দিল নানা সাইজের বাহন এবং নানা কিসিমের পথচারী। কীভাবে যে ওই নরক থেকে মেয়েকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন ন্যান্সির মা, নিজেই জানেন না।

বাসায় ফিরে থ হয়ে বসে রইলেন ন্যান্সির মা। স্রেফ বোবা বনে গেছেন। ন্যান্সির বাবা তাঁর উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা দেখে 'কী হয়েছে? কী হয়েছে?' বলতে লাগলেন। ন্যান্সিও অবাক হয়ে জানতে চাইল, 'মাম্মি, তোমার কী হয়েছে?'

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন ন্যান্সির মা, 'জো হল্টকে খবর দাও জলদি। আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। আমাকে সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাও।' বলে সোফার ওপর নেতিয়ে পড়লেন তিনি চোখ বুজে।

ন্যান্সির বাবা বলতে এসেছিলেন এখনও চার্লসের খোঁজ পাওয়া যায়নি, ও-বাড়িতে মরা কান্নার রোল উঠেছে, কিন্তু স্ত্রীর অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে গেলেন তিনি। স্ত্রী তাঁর প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন না দেখে মেয়ের দিকে ফিরলেন ন্যান্সির বাবা। 'কী হয়েছে রে?'

ন্যান্সি জবাব দেয়ার আগেই চোখ খুললেন ন্যান্সির মা। উঠে বসলেন, চোখ বড় বড় করে বললেন, 'আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। জো হল্টকে শিগ্‌গির খবর দাও। অদ্ভুত সব জিনিস ঘটতে দেখেছি আজ, যার ব্যাখ্যা উনি ছাড়া কেউ দিতে পারবেন না। জলদি ওনাকে ফোন করো।' আবার চোখ বুজলেন তিনি, শ্বাস ফেলছেন ঘন ঘন।

ন্যান্সির বাবা এক দৌড়ে বেডরুমে ঢুকলেন, ডায়াল করলেন সাইকিয়াট্রিস্ট জো হল্টের নাম্বারে। তাঁর গলায় জরুরি আবেদন এমন ব্যাকুলভাবে ফুটে উঠল যে, দশ মিনিটের মধ্যে নিজের বাসা থেকে ন্যান্সিদের বাড়িতে হাজির হয়ে গেলেন জো হল্ট। তাড়াহুড়োর চোটে ভদ্রলোক বাথরুমের স্যাণ্ডেল পরেই চলে এসেছেন। মাথায় চিরুনি চালানোর সময় পাননি, চুলগুলো কাকের বাসা হয়ে আছে। তাঁকে দেখাচ্ছে একটা পাগলের মত।

'কী হয়েছে?' উদ্বিগ্ন গলায় জানতে চাইলেন তিনি।

অবিশ্বাস্য গল্পটা খুলে বললেন ন্যান্সির মা। মোটা মহিলার কথা বলতে গিয়ে

শিউরে উঠলেন তিনি। বিস্মিত চোখে তাকালেন ন্যান্সির দিকে।

অসহায় একটা ভঙ্গি করল ন্যান্সি। 'আমার দিকে ওভাবে তাকাচ্ছ কেন, মাম্মি? আমি মহিলার কিছু করিনি তো। শুধু বলেছি, ওগলডিবু।'

'তারপর আমার চোখের সামনে থেকে লিফট ভর্তি মানুষ কর্পূরের মত উবে গেল। মাগো!' হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠলেন তিনি। ন্যান্সিকে দেখিয়ে বললেন, 'ও কী যেন বলল আর সাথে সাথে...'

ম্লান গলায় ন্যান্সি বলল, 'আমার কোন দোষ ছিল না, মাম্মি। ওরা আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিচ্ছিল। আর তাই ওদের বলেছি, ওগলডিবু। চার্লসটাও আমাকে অমন ডিস্টার্ব করছিল। ওকে ওগলডিবু বলতে সে-ও চলে গেল।'

রীতিমত ঝাঁকি খেলেন ন্যান্সির মা। বিস্ফারিত হয়ে গেছে চোখ, হঠাৎ শান্ত হয়ে গেলেন তিনি, হাত ধরে কাছে টানলেন মেয়েকে, নরম গলায় শুধালেন, 'তাই নাকি, সোনা?' জো হল্টের দিকে মুখ তুলে চাইলেন।

'দেখলেন, মি. হল্ট, শুধু আমি নই, আমার ছোট্ট মেয়েটার মাথায়ও গোলমাল পাকিয়ে গেছে। আগে ওকে দেখুন। তারপর আমাকে।'

জো হল্ট ন্যান্সির রেশমি চুলে হাত বোলাতে বোলাতে মধুর গলায় বললেন, 'তা হলে, মা-মণি, তুমি জিনিসপত্র অদৃশ্য করে দিতে পারো? বেশ, বেশ। তা কীভাবে কাজটা করো বলবে আমাদের?'

মিষ্টি হাসল ন্যান্সি। জো আঙ্কেলকে তার খুব পছন্দ। যখনই বাসায় আসেন, ন্যান্সির জন্যে ক্যাডবেরি নিয়ে আসতে ভোলেন না কখনও। সে মি. রেগানের জাদুর গল্প শোনাল। 'দাদুর মত আমিও কয়েনটার দিকে তাকিয়ে বললাম, ওগলডিবু।' হাসিটা মুখে ধরে আছে ন্যান্সি। 'ব্যস, ওটা অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর ওগলডিবু বললাম কেন্নোটাকে, দুধের গ্লাসটাকে, সুজির হালুয়ার বাটিটাকে, চার্লসকে, এক ইয়া মোটা মহিলাকে, লিফটের লোকগুলোকে এবং সবশেষে ড্রাগনটাকে। কাজটা খুব সহজ। করে দেখাব?'

গুঙিয়ে উঠলেন ন্যান্সির মা। জো হল্ট বেশ মজা পেয়েছেন, বললেন, 'নিশ্চয়ই দেখব আমরা। আচ্ছা, ওই ফুলদানিটাকে অদৃশ্য করে দিতে পারবে তুমি?'

সোফার পাশে রাখা খুবই সুন্দর একটা ফ্লাওয়ার ভাসের দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি। এটা ন্যান্সির মা গত বছর বেইজিং বাণিজ্য মেলা থেকে দুই হাজার ডলার দিয়ে কিনেছেন। বাধা দিলেন তিনি, 'না, ওটা থাক।' তারপর কী মনে করে বললেন, 'ঠিক আছে, সোনা। ওটাকে অদৃশ্য করে দিতে পারো তুমি।'

মধুর হাসি হেসে তার মা'র সবচে' প্রিয় জিনিসের একটি, চিনের মিং ডাইন্যাস্টির ফুলদানিটির দিকে তাকাল ন্যান্সি, বলল, 'ওগলডিবু।'

এবং যথারীতি দুই হাজার ডলার দামের ফুলদানিটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

রাত দুটোর সময়, কুকুর-বেড়াল বৃষ্টিতে কাক ভেজা হয়ে ন্যান্সির বাবা তাঁর বন্ধু

জো হল্টকে নিয়ে মি. রেগানের বাড়িতে এলেন।

'আপনাকে আমাদের বাসায় যেতে হবে, স্যার,' তাঁকে ঘুম থেকে তুলে বললেন ন্যান্সির বাবা। 'ন্যান্সি আপনার কাছ থেকে যে সাইকোলজিক্যাল অ্যাকোসমিস্টিক আইডিয়া পেয়েছে, ওটা তার মন থেকে দূর করে দিতে হবে।'

জো হল্ট কর্কশ গলায় বললেন, 'আইডিয়া নয়, অ্যাবিলিটি–ক্ষমতা। এটা সাইকোকাইনেটিক অ্যাবিলিটি।'

গলা চড়িয়ে জানতে চাইলেন মি. রেগান, 'হেঁয়ালি না করে আসল কথা বলুন। ন্যান্সির কী হয়েছে? অসুস্থ হয়ে পড়েছে? তা হলে শিগ্‌গির চলুন।'

রেইনকোটটা বগলদাবা করে পাজামার কষি বাঁধতে বাঁধতে প্রায় ছুটে বেরিয়ে এলেন তিনি ঘর ছেড়ে। বৃষ্টির বেগ বেড়েছে আরও। গুরুগম্ভীর আওয়াজে বাজ পড়ল দূরে কোথাও। গাড়ি নিয়ে এসেছেন জো হল্ট, রেগান সাহেব গাড়িতে উঠে বসতে ঝড়ের গতিতে তিনি ছুটিয়ে চললেন টয়োটা করোলা।

মি. রেগান প্রায় ধমকের সুরে প্রশ্ন করলেন, 'ন্যান্সির অবস্থা কী? অসুস্থ হয়ে পড়ল কখন?'

'ও খালি ওগলডিবু বলে,' গুঙিয়ে উঠলেন ন্যান্সির বাবা। 'আর যাকে উদ্দেশ্য করে বলে সে-ই অদৃশ্য হয়ে যায়।'

ঘোঁত ঘোঁত করে উঠলেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, 'ওগলডিবু বলে তো কী হয়েছে? আমিও তো বলি কথাটা। ন্যান্সিকে আমিই শিখিয়েছি মন্তরটা।'

'আর সর্বনাশটাও হয়েছে সেখানে,' ঢোক গিলে বললেন সাইকিয়াট্রিস্ট। 'আপনি ওকে কয়েন ভ্যানিশ করার জাদু দেখিয়েছেন। ন্যান্সি সেটাই বিশ্বাস করেছে। এটাকে–এটাকে মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলে ভাববাদী অবস্তুবাদ...উউফ্!' আঁতকে উঠলেন তিনি হুইল ঘোরাতে ঘোরাতে, অল্পের জন্য একটি টেলিফোন বারের সাথে ধাক্কা খেতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে রক্ষা পেয়ে গেল গাড়িটা, সাঁৎ করে ওটাকে পাশ কাটিয়ে গেল।

'ওটা বিশপ বার্কলের তত্ত্ব,' আবার গুঙিয়ে উঠলেন ন্যান্সির বাবা। 'জো বইটা দেখিয়েছে আমাকে। দার্শনিক রেভারেণ্ড বিশপ বার্কলে বলেছেন, মন বা চিন্তা-চেতনা ছাড়া কোন পদার্থের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়। পদার্থের অস্তিত্ব অনুভব করার জন্য মনের ভেতর গভীর বিশ্বাস থাকতে হবে। এ ব্যাপারটার সত্যাসত্য নিয়ে লক, হিউম, কান্ট, হেগেলের মত বিশ্বখ্যাত দার্শনিকরা অনেক তর্ক করেছেন।'

রাস্তায় প্রায় হাঁটু-পানি, বাধ্য হয়ে স্পিড কমাতে হলো জো হল্টকে, চাকার টানে ফোয়ারার মত পানি ছুটছে রাস্তার দুই পাশে, আর ঝুমঝুম বৃষ্টির তো বিরতিই নেই।

'অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা,' ঢোক গিললেন সাইকিয়াট্রিস্ট। 'প্রচণ্ড বিশ্বাস করার দুর্লভ ক্ষমতাটা পেয়ে গেছে ন্যান্সি। সে বিশ্বাস করে পদার্থকে বাতাসের সাথে মিশিয়ে দেয়ার ক্ষমতা তার আছে। আপনি ওগলডিবু বলে কয়েন উধাও করে

দিয়েছেন। ন্যান্সি বিশ্বাস করেছে ওটা সত্যি জাদু। বিশপ বার্কলের তত্ত্ব অনুযায়ী, কেউ যদি মনে-প্রাণে পদার্থের অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে চায়, সে পারবে। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্কদের মনে গলদ রয়েছে, রয়েছে সন্দেহ। ন্যান্সির বাস ফ্যান্টাসির জগতে। ফ্যান্টাসিকেই সে সত্যি করে দেখছে। আর তাই এই অদ্ভুত জিনিসগুলো ঘটছে। থ্যাঙ্ক, গড! এই ক্ষমতাটা শুধু ন্যান্সিরই আছে।' অন্যদের দুর্লভ ক্ষমতাটা থাকলে পৃথিবীর দশা কী হত ভেবে শিউরে উঠলেন জো হল্ট।

সাদা চুলে হাত বুলাতে বুলাতে মি. রেগান শুধু শব্দ করলেন, 'হুম।'

বাসায় পৌঁছতে পৌঁছতে তাঁর জানা হয়ে গেল, ন্যান্সিকে এই মহাসমস্যার হাত থেকে উদ্ধার করতে হলে কী-কী করতে হবে।

মি. রেগানকে দেখে বুক থেকে দশমণি পাথরটা নেমে গেল ন্যান্সির মা'র। 'আপনি এসেছেন। এত খুশি হয়েছি আমি–' কৃতজ্ঞতায় গলা বুজে এল তাঁর।

'ন্যান্সি কোথায়? ঘুমোচ্ছে?' জিজ্ঞেস করলেন রেগান।

'জী।'

লিভিংরুমের অবস্থা হয়েছে গোয়ালঘরের মত। ন্যান্সির মা'র শখের পিয়ানোটা অদৃশ্য। দেয়ালে ভ্যান গখ আর বার্তোচেল্লির দুটি চমৎকার রিপ্রিন্ট ছিল, তাও নেই। এক সেট সোফা মিশে গেছে বাতাসে। বাকি সব জিনিসপত্র এলেবেলে অবস্থায় পড়ে আছে।

'আমরা ব্যাপারটা নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়েছিলাম,' মুখ অন্ধকার করে বললেন জো হল্ট। 'ন্যান্সি ফুলদানিটাকে অদৃশ্য করে দিল। ব্যাপারটা চোখের সামনে ঘটতে দেখেও বিশ্বাস হয়নি। তারপর পিয়ানোটাকেও ওগলডিবু বলল। গেল ওটাও। তারপর দেয়ালের চিত্রকর্ম দুটি। শেষের দিকে মজা পেয়ে যায় ন্যান্সি। যেন জিনিস অদৃশ্য করা মজার একটা খেলা। হাসিমুখে ও শুধু ওগলডিবু বলে চলেছিল। একবার আমার দিকেও তাকিয়েছিল–' শিউরে উঠলেন তিনি।

মি. রেগানের বিশ্বাস হতে চাইছে না। এ কী অবস্থা! তিনি থ মেরে দাঁড়িয়ে রইলেন। হঠাৎ রিনরিনে কণ্ঠে 'দাদু' ডাক শুনে ফিরে চাইলেন। লিভিংরুমের চৌকাঠে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে ন্যান্সি। পরনে মিকি মাউসের ছবিঅলা গাঢ় নীল রাত পোশাক। ঘুম লেগে আছে চোখে। কিন্তু হাসি দিয়ে বুঝিয়ে দিল ন্যান্সি, দাদুকে দেখে সে খুব খুশি।

'মাম্মি বলছিল তোমাকে নিয়ে আসতে বাসায় যাচ্ছে পাপা আর আঙ্কেল। আমি ঘুমাতে চাইনি। মাম্মি জোর করে ঘুম পাড়াল।'

'কেমন আছ, মা-মণি?' সস্নেহে জানতে চাইলেন দাদু। এগিয়ে গেলেন ন্যান্সির দিকে।

'ভাল।' মিষ্টি হাসল ন্যান্সি। 'জানো, তোমার মত আমিও জাদু শিখেছি। দেখবে?'

ভেতরে ভেতরে দারুণ চমকে গেলেও মুখে হাসি ফুটিয়ে মি. রেগান বলেন,

'অবশ্যই দেখব। কী জাদু দেখাবে তুমি?'

ন্যান্সি কিছু বলার আগেই জো হল্ট বলে উঠলেন, 'ধরো, তোমার দাদুর রেইনকোটটাকে অদৃশ্য করে দিলে। পারবে?' র‍্যাকে ঝোলানো বর্ষাতির দিকে আঙুল তুলে দেখালেন তিনি। খিল খিল হাসল ন্যান্সি। নরম, স্পষ্ট গলায় সেই ভয়ঙ্কর শব্দটা উচ্চারণ করল সে। দাদুর রেইনকোট উধাও হয়ে গেল র‍্যাক থেকে। ধপাস করে সোফায় বসে পড়লেন মি. রেগান। ন্যান্সি তাঁর হাঁটুর মধ্যে গিয়ে সেঁধুল।

চোখে বিস্ময় ফুটিয়ে ন্যান্সি বলল, 'দাদু, কাঁপছ কেন? শীত লাগছে?'

ঢোক গিললেন মি. রেগান। গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, সোনা। বৃষ্টিতে ভিজেছি তো, তাই শীত করছে। তবে রেইনকোটটা দরকার আমার। নইলে ঠাণ্ডায় কাবু হয়ে পড়ব যে, মা! রেইনকোটটা ফিরিয়ে আনতে পারবে, মা-মণি?'

এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল ন্যান্সি। 'তোমার কোট কীভাবে ফিরিয়ে আনব, তা তো জানি না, দাদু!'

'আ–ইয়ে মানে, ধরো, তুমি ওগলডিবুর বদলে অন্য একটা মন্ত্র পড়লে। তা হলে নিশ্চয়ই আমার কোটটা ফিরে আসবে।'

'ওগলডিবুর বদলে কী বলব?'

'ধরো, ওবিডেলাগু বলবে। ওবিডেলাগু বললেই আমার কোট ফিরে আসবে। দাঁড়াও! দাঁড়াও! শুধু আমার কোট নয়, অন্য যাদেরকে তুমি ওগলডিবু বলেছ, তাদেরকে ওবিডেলাগু বলে ফিরিয়ে আনো দিকি, সোনা। তা হলে আরও মজা হবে, তাই না?'

'না,' বলল ন্যান্সি। 'চার্লসকে ফিরিয়ে আনব না। ও খুব পাজি। আমার রাজপ্রাসাদ ভেঙে দিয়েছে।'

বিষম খেলেন জো হল্ট।

ন্যান্সির মা মধুর গলায় বললেন, 'কিন্তু ও আর তোমার প্রাসাদ ভাঙবে না, মা। তুমি খালি একবার ওবিডেলাগু বলে ওদের সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো।'

'ওদেরকে এনে দিলে আমাকে কী দেবে?' ন্যান্সিও কম চালাক নয়। দাঁও মারার এ সুযোগ সে হারাবে কেন?

'তুমি যা চাইবে তা-ই,' একসাথে বলে উঠলেন ওরা তিনজন।

'চার্লস একটা নতুন রকেট কিনেছে, ওটা এনে দাও,' বলল সে।

মনে মনে প্রমাদ গুনলেন ন্যান্সির বাবা-মা। এখন রকেট পাবেন কোথায়? মি. রেগান বললেন, 'মা-মণি, অনেক রাত হয়েছে তো, সব দোকান বন্ধ। কাল সকালবেলায় তোমাকে নিউ মার্কেটে নিয়ে গিয়ে চার্লসের চেয়েও সুন্দর রকেট কিনে দেব।'

খুশি হয়ে গেল ন্যান্সি। দাদু যখন বলেছে, কাল সকালেই সে তার জিনিস পেয়ে যাবে। ন্যান্সি এরপর একদম স্বাভাবিক গলায়, শূন্যে হাত নেড়ে বলল, 'ওবিডেলাগু।'

ন্যান্সির কথা মাত্র শেষ হয়েছে, সাথে সাথে ঘটতে শুরু করল অলৌকিক ঘটনাগুলো। প্রথমেই এল মিং ডাইন্যাস্টির দুই হাজার ডলার দামের ফুলদানি, যেন বাতাস ফুঁড়ে বেরুল, তারপর মি. রেগানের রেইনকোট, পিয়ানো, বিখ্যাত তৈলচিত্র দুটো, সোফা সেট, ইত্যাদি, ইত্যাদি। লন থেকে ভেসে এল কচি কণ্ঠের চিৎকার, 'ওয়াও!' ওটা চার্লস। হঠাৎ নিজেকে আবিষ্কার করেছে সে বৃষ্টি ভেজা বাগানে। চোখ বুজলেন ন্যান্সির মা। কল্পনায় দেখার চেষ্টা করলেন এরপর কী-কী ঘটছে। দেখলেন, পাহাড়-প্রমাণ শরীর নিয়ে এক মহিলা রাত দুপুরে হাজির হয়েছে ড্রিম প্লাজার নীচতলায়, একই সময় লিফটের মধ্যে সেই পরিবার এমন অসময়ে নিজেদেরকে দেখে নিশ্চয়ই বিস্ময়ে হতচকিত হয়ে পড়েছে। আর পেনসিলভানিয়া এভিন্যু? ওখানে নাইট গার্ডের চোখ কপালে উঠে গেল বলা নেই কওয়া নেই, জ্যান্ত একটা ড্রাগনকে নির্জন রাস্তায় দেখে। এমনকী সেই কেন্নোটাও তার অদৃশ্য জায়গা থেকে ফিরে এল গোলাপ ঝাড়ের পাশে। বৃষ্টির ফোঁটা গায়ে পড়তে কিলবিল করে সে এগোল ঝাড়টার নীচে, নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে।

খানিক পরে দেখা গেল, মি. রেগান তোষামোদের সুরে ন্যান্সিকে বলেছেন, 'মা-মণি, তোমাকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। তোমার ওগলডিবুতে আর কাজ হবে না। আমার জাদুশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে, তোমারটাও তাই। এই দেখো না, এই কয়েনটা আমি ভ্যানিশ করতে পারছি না,' বলে জো হল্টকে ইশারা করতেই তিনি পার্স খুলে দ্রুত একটা কয়েন ধরিয়ে দিলেন তাঁর হাতে। মি. রেগান কয়েনটা দু'আঙুলের ফাঁকে ধরলেন, বললেন, 'ওগলডিবু।' কিন্তু কয়েন তাঁর হাতেই রয়ে গেল।

খুবই হতাশ দেখাল ন্যান্সিকে। অবিশ্বাসের গলায় প্রশ্ন করল, 'সত্যি তোমার জাদুশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে, দাদু?'

'হ্যাঁ,' বললেন মি. রেগান। 'এই দেখো না, কয়েনটা ভ্যানিশ হচ্ছে না।'

কয়েনটার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল ন্যান্সি, 'ওগলডিবু।'

বাবা-মা, জো হল্ট এবং মি. রেগান লাফিয়ে উঠলেন একসাথে। কিন্তু অদৃশ্য হলো না কয়েন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন ওরা চারজন। সবার মুখে লজ্জার হাসি। দীর্ঘশ্বাস ফেলল ন্যান্সি। মা'র দিকে ফিরে বলল, 'মাম্মি, ঘুমাতে চলো। খুব ঘুম পাচ্ছে।'

খুব ভোরে ঘুম ভাঙল ন্যান্সির। তখনও ভাল করে ফোটেনি দিনের আলো। ভোরের পাখিরা সবে কিচিরমিচির শুরু করেছে। বাবা-মা এখনও গভীর ঘুমে অচেতন। ন্যান্সিও এত ভোরে সাধারণত ঘুম থেকে ওঠে না। আজ উঠেছে, কারণ ওর অবচেতন মনে কেমন যেন একটা অস্বস্তি। অস্বস্তিটা এ মুহূর্তে বেশ জোরাল হয়ে উঠেছে। কাঁটার মত খচখচ করছে মনের ভেতরটা। না, এমনটি হতেই পারে না। ওর ওগলডিবু কিছুতেই বৃথা যেতে পারে না। কাজ হতেই হবে ওর জাদুর।

ঘরের ভেতর নীল ডিম লাইট স্বপ্নীল আলো ছড়াচ্ছে। সেই আলোতে প্রচণ্ড

একটা ইচ্ছেশক্তি নিয়ে ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। আয়নার ভেতর নিজের আবছা কায়াটাকে ভারি সুন্দর লাগছে ওর। এত সুন্দর নিজেকে আর কখনও লাগেনি ন্যান্সির। মুখে মৃদু হাসি নিয়ে আয়নাটাকে উদ্দেশ্য করে গভীর গলায় বলল ও, 'ওগলডিবু!'

না, আয়নাটা অদৃশ্য হলো না। ঠিকই দাঁড়িয়ে রইল ড্রেসিং টেবিলসুদ্ধ। শুধু ন্যান্সি নেই আয়নার সামনে। মিলিয়ে গেছে বাতাসে।

মূলঃ উইল এফ. জেংকিনস

ধাওয়া

স্পেসশিপ 'ইলকর' প্লুটোর কক্ষপথ অতিক্রম করে সৌর জগতের বাইরে অনন্ত যাত্রার উদ্দেশে শুরু করল তাদের ওভার ড্রাইভ। কিছুক্ষণ পরে হন্তদন্ত হয়ে এক অফিসার এসে ঢুকল কমাণ্ডারের ঘরে, চেহারায় উদ্বেগের ছাপ।

'এক্সেলেন্সি,' হাঁফাতে হাঁফাতে বলল সে। 'মারাত্মক এক ভুল হয়ে গেছে। এক টেকনিশিয়ানের দায়িত্বহীনতার কারণে আমরা পৃথিবীতে একটি টাইপ এইচ-নাইন রামকে ফেলে এসেছি।' রাম হলো অত্যন্ত দামী, শক্তিশালী এবং বিধ্বংসী রোবট। এরা নিজেরাই নিজেদের শক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা রাখে।

অফিসারের কথা শুনে কমাণ্ডারের চেহারায় রাগের ছাপ পড়ল। চোখ বুজে কী যেন ভাবলেন তিনি কয়েক সেকেণ্ড। তারপর অফিসারের দিকে তাকিয়ে থমথমে গলায় বললেন, 'এই মুহূর্তে পৃথিবীতে ফিরে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে কয়েক হপ্তা পরে যখন ফিরব তখন ওটাকে স্পেসশিপে তুলে নেব। আর হ্যাঁ,' শীতল গলায় আদেশ দিলেন তিনি, 'যে লোক এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন কাজ করেছে তার জন্য ভয়ঙ্কর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।'

কিন্তু অভিযান শেষে ফিরে আসার পথে ক্রুজারের সাথে রিগেল গ্রহে মুখোমুখি সংঘর্ষ হলো সমতল, রিং আকৃতির একটি রেইডারের। ভয়াবহ আকাশ যুদ্ধ শেষ হবার পরে দুটো আকাশ যানই ধ্বংস হয়ে গেল।

পৃথিবীতে মাত্র তখন প্রাগৈতিহাসিক যুগের সূচনা হয়েছে।

সাপ্লাই-এর সর্বশেষ বাক্সটা মাটিতে নামিয়ে রেখে আবার সি-প্লেনে চড়ে বসল ওয়াল্ট লিওনার্ড। তার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল জিম আর্ভিন।

'আমার স্ত্রীর কাছে চিঠিটা পৌঁছে দিতে ভুলো না যেন,' চেঁচিয়ে বলল সে।

'ভুলব না,' গলা চড়াতে হলো লিওনার্ডকেও, কারণ এঞ্জিনে স্টার্ট দিয়ে ফেলেছে সে।

'তুমি কিন্তু এ এলাকা থেকে যেভাবে পারি ইউরেনিয়াম খুঁজে বের করবেই। এক মুঠো ইউরেনিয়ামের সন্ধানও তোমার বউ আর ছেলের ভাগ্য বদলে দিতে পারে, জানোই তো!' দাঁত বের করে হাসল লিওনার্ড। 'আর হ্যাঁ, খামোকা গ্রিজলি ভালুকদের সাথে নাক ঘষাঘষি করতে যেয়ো না যেন—মুখোমুখি হলে গুলি করে ফেলে দেবে, কিন্তু ওদের ভয় পাইয়ে দিয়ো না। তা হলে ওরা তোমার খবর করে দেবে!' সি-প্লেনটা পানির ওপর দিয়ে দৌড় শুরু করেছে, পেছনে ফেনার মেঘ সৃষ্টি হলো। উভচারী যানটা আকাশে পাখা মেললে অদ্ভুত ধরনের শীতলতা অনুভব করল জিম। আগামী তিন হপ্তা ওকে কানাডিয়ান পার্বত্য অঞ্চলের এই প্রত্যন্ত

এলাকায় নির্বাসনে থাকতে হবে, একাকী। নির্দিষ্ট সময়ে প্লেনটা যদি ফিরে না আসে তা হলে জিমের মৃত্যু অবধারিত। সাথে প্রচুর খাবার থাকলেও কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় বরফে আচ্ছাদিত ওই বিশাল পাহাড়ের চুড়োয় ওঠা কিংবা পায়ে হেঁটে শত মাইল গহীন, বুনো অরণ্য পাড়ি দেয়া। তবে চিন্তার কিছু নেই। ওয়াল্ট লিওনার্ড শিডিউল মোতাবেক ফিরে আসবে, এখন জিমের ওপর নির্ভর করছে তারা ওকে খুঁজে পাবে কি না সে ব্যাপারটি। এই উপত্যকায় যদি সত্যি ইউরেনিয়াম থেকে থাকে তা হলে তার হাতে একুশ দিন সময় আছে জায়গাটা খুঁজে দেখার। এখন আলতু ফালতু চিন্তা না করে কাজে লেগে পড়লেই হলো।

অভিজ্ঞ কাঠুরের মত এক খণ্ড বিশালাকার ঝুলন্ত পাথরের নীচে সাময়িক আস্তানার ব্যবস্থা করে ফেলল জিম ঝটপট। গ্রীষ্মের এই তিন হপ্তার মধ্যে আটচালার মত ঘরটা দিব্যি কাজে দেবে। ভোরের সূর্যের তাপ ক্রমশ প্রখর হতে শুরু করেছে। ঘামে ভেজা শরীর নিয়ে এক মনে কাজ করে যেতে লাগল জিম আর্ভিন। পাথুরে তাকটার নীচে রসদগুলো সব জড়ো করল সে। প্যাকেটগুলো ওয়াটারপ্রুফ তারপুলিন দিয়ে ভাল করে মোড়ানো। বড় ধরনের প্রাণীর হামলাতেও কোন ক্ষতি হবে না। ডিনামাইটের বাক্সটা বয়ে নিয়ে এল জিম সাবধানে, আর্দ্রতার হাত থেকে সতর্কভাবে রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে বিস্ফোরকগুলোকে। অবশ্য কোন গর্দভ না জেনে বাক্সটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লে সাথে সাথে–বুম!

প্রথম দুটো হপ্তা কেটে গেল দ্রুত, কোন কিছুর সন্ধান মিলল না। তৃতীয় হপ্তার শেষ দিনে জিম ঠিক করল সে উপত্যকার উত্তর-পূর্ব দিকে অভিযান চালাবে। ওদিকটাই শুধু এখনও দেখা বাকি।

গাইগার কাউণ্টারটা (তেজস্ক্রিয়তা মাপার যন্ত্র) সাথে নিল জিম, কানে লাগাল ইয়ার ফোন, এতে সাধারণ খুঁটিনাটি শব্দের যন্ত্রণা থেকে সে মুক্ত থাকবে, তারপর হাত বাড়াল রাইফেলের দিকে। এটা একটা .৩০-০৬ ক্যালিবারের ভারী অস্ত্র। জিনিসটার ওজন বরাবরই জিমের জন্য অস্বস্তিকর, তবে কানাডার গ্রিজলি ভালুক হত্যায় রাইফেলটা বেশ কাজে দেবে। সে তার .২২ পিস্তলটা সঙ্গে নিল না, ভেড়ার চামড়ার হোলস্টারে পুরে রেখে এল আস্তানায়।

বাতাসে কুয়াশার গন্ধ, সূর্যের ঝকঝকে রশ্মি ঠিকরে পড়ছে নীল-সাদা বরফের মাঠগুলোতে, চমৎকার মনোহর একটা দৃশ্য। তবে মনটা বেজার হয়ে আছে জিমের যার উদ্দেশ্যে এতদূর আসা তার সন্ধান এখনও মেলেনি বলে। জিম ঠিক করেছে টানা ছত্রিশ ঘণ্টা অভিযান চালাবে এবার নতুন এলাকায়, তারপর দুপুর নাগাদ ফিরে আসবে নিজের সাময়িক আশ্রয় কেন্দ্রে। ইতিমধ্যে সি-প্লেনের আসার কথা তাকে নিয়ে যাবার জন্য। ইমার্জেন্সি প্যাকেট ছাড়া খাবার-দাবার বা পানি নেয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি জিম। বেশি খিদে পেলে দু'একটা খরগোশ মারলেই চলবে। আর ঝর্ণার জলে ট্রাউট মাছেরও কোন অভাব নেই এদিকে। সারাটা সকাল জিম হাঁটল এই আশায় কাউণ্টারটা বুঝি সঙ্কেত দেবে। কিন্তু ওটা

মরা মানুষের মত চুপ হয়েই থাকল। এ উপত্যকার কোন তেজস্ক্রিয় মূল্য নেই, স্রেফ পাথুরে চলার পথ ছাড়া। সামান্য ইউরেনিয়ামের খোঁজ পেলেও চলত। তবে এখনই হাল ছেড়ে দিতে রাজি নয় জিম আর্ভিন। দরকার হলে রাতে ঘুমাবে না সে, এত পরিশ্রমের মূল্য নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

দুপুরের দিকে পেট মোচড় দিয়ে জানান দিল খিদে পেয়েছে। জিম ঠিক করেছে বড়শি দিয়ে মাছ ধরবে। সে ঘাসে মোড়া একটা গোলাকার টিলার কাছে আসতেই সামনের দৃশ্যটা দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, হাঁ হয়ে গেল মুখ।

এ যেন কোন কসাইয়ের দোকানের বাইরেটা। থরে থরে সাজানো রয়েছে পশুর শরীর, যতদূর চোখ যায় দেখা গেল তিন সারিতে সাজিয়ে রাখা হয়েছে ওগুলোকে। আর কী ওগুলো! কাছের সারিতে স্তূপ হয়ে রয়েছে হরিণ, ভালুক, কুগার এবং পাহাড়ী ভেড়া। তার পরের সারি বোঝাই জবুথুবু হয়ে পড়ে থাকা অদ্ভুত আধা-শরীরের কিছু রোমশ প্রাণীতে, তাদের পেছনে–আরি সর্বনাশ! দুঃস্বপ্নের মত প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ারদের বিশাল একটা পিণ্ড। একটা প্রাণীকে দেখে সাথে-সাথে চিনতে পারল জিম। এই জন্তুর কঙ্কাল জাদুঘরে দেখেছে সে।

কোন সন্দেহ নেই ওটা একটা ছোট স্টেগোসর, টাট্টু ঘোড়ার চেয়ে বড় হবে না আকারে।

বিস্ময়ে স্তম্ভিত জিম টিলা ছাড়িয়ে সামনে আরও কয়েক পা বাড়াল, গলা বাড়িয়ে দেখল মাটিতে শুয়ে থাকা নোংরা, হলুদ রঙের আঁশযুক্ত অতিকায় গিরগিটিটার একটা চোখের পাতা তিরতির করে কাঁপছে। সাথে সাথে আসল ব্যাপারটা ধরে ফেলল জিম। জন্তুগুলো মরেনি একটাও, অদ্ভুত কোন উপায়ে সব ক'টাকে চলৎশক্তিহীন করে রাখা হয়েছে। সংরক্ষিত করা হয়েছে আশ্চর্যভাবে। কপালে ঘামের রেখা ফুটল ওর। কত কোটি বছর আগে স্টেগোসররা এই অঞ্চলে বিচরণ করত। এটা এখনও বেঁচে আছে কীভাবে?

হঠাৎ আরেকটা অদ্ভুত ব্যাপার নজর কাড়ল জিমের। শিকারগুলোর সবার আকার বা আকৃতি প্রায় একই রকম। বইতে ডাইনোসরদের যে বর্ণনা পড়েছে সে বা জাদুঘরে ছবি দেখেছে, সেরকম বিশালদেহী সরীসৃপ একটিও দেখা যাচ্ছে না। সবগুলো প্রাণীই আকারে বড়সড় ভেড়ার চেয়ে বেশি নয়। কোন টাইরানোসর বা রোমশ হাতির চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। অদ্ভুত এই বৈসাদৃশ্য নিয়ে কপাল কুঁচকে ভাবছে জিম, হঠাৎ কাছাকাছি ঝোপের আড়ালে মৃদু খসখস শব্দ শুনে সতর্ক হয়ে গেল সে।

পারদ নিয়ে একবার কাজ করার অভিজ্ঞতা হয়েছে জিম আর্ভিনের, এক সেকেণ্ডের জন্যে তার মনে হলো সামনের খোলা জায়গাটাতে তরল ধাতব পদার্থে বোঝাই একটা চামড়ার বস্তা বোধহয় গড়িয়ে এল। আপাত দৃষ্টিতে মনে হলো গোলাকার জিনিসটা বেশ ওজনদার, গড়ানোর ভঙ্গিতে গতিও আছে। তবে চামড়ার তৈরি কোন বস্তু নয় ওটা; প্রথমে যেটাকে স্ফীত, বিশ্রী আঁচিলের মত মনে হয়েছিল, হঠাৎ কাছিয়ে এলে জিনিসটা অস্বাভাবিক এবং বিকট একটা যান্ত্রিক

মেকানিজমে আকৃতি পেল। জিনিসটা যা-ই হোক, ওটাকে খুঁটিয়ে দেখার সময় খুব কমই পেল জিম, কারণ গোলাকার পিণ্ডটা হঠাৎ শরীরের ভেতর থেকে সপাং করে বেশ কয়েকটা ধাতব রড বের করে দিয়েছে, প্রতিটির মাথায় গাছের কন্দের মত লেন্স, হড় হড় করে গড়িয়ে ওর দিকে আসতে শুরু করল। গতিবেগ ঘণ্টায় পাঁচ মাইলের কম হবে না। ওটাকে আসতে দেখে অন্তরাত্মা খাঁচা ছাড়া হবার জোগাড় হলো জিমের। ওর মনে কোন সন্দেহই রইল না গোল আলুর মত দেখতে বিকট জিনিসটা ওকে একবার বাগে পেলে বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে। প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীগুলোর মতই হয়তো ওকে পঙ্গু করে ফেলবে।

মুখ দিয়ে 'ঘোঁত' জাতীয় শব্দ করে এক লাফে পিছিয়ে এল জিম, চট করে কাঁধ থেকে রাইফেল নামাল। জিমের জানার কথা নয়, এটা সেই মডেল টাইপ এইচ-নাইন রাম, যেটাকে কোটি বছর আগে ভিনগ্রহবাসীরা ভুলে পৃথিবীতে ফেলে গিয়েছিল। সেলফ-এনার্জি সিস্টেমের কারণে বিধ্বংসী রোবটটা এখনও নিজস্ব শক্তি উৎপাদন করে টিকে আছে ধরিত্রীর বুকে। বুনো প্রাণীগুলো যে প্যারালাইজড হয়ে আছে সেটা এরই কীর্তি।

জিমকে আঁতকে উঠে পেছনে সরতে দেখেও রামের যান্ত্রিক কাঠামোয় কোন পরিবর্তন লক্ষ করা গেল না। জিমের কাছ থেকে সে ত্রিশ গজ দূরে, চলার গতি অব্যাহত রইল তার, অদম্য রাম এগিয়ে আসতেই থাকল।

দ্রুত বোল্ট স্পর্শ করল জিম, অভ্যস্ত হাতে একটা কার্তুজ ঢোকাল চেম্বারে। গালের সাথে ছোঁয়াল বন্দুকের কুঁদো, পিপ সাইট ব্যবহার করে আড়াআড়িভাবে লক্ষ্যস্থির করল ক্রমশ অগ্রসরমান ভারী আকৃতিটির দিকে–বিকেলের উজ্জ্বল সূর্যালোকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে টার্গেটকে। ঠোঁটে ভয়াল এক টুকরো হাসি ফুটল জিমের, টেনে দিল ট্রিগার। ১৮০ গ্রেনের, মেটাল জ্যাকেট পরানো, সেকেণ্ডে ২৭০০ ফুট বেগে ছুটে যাওয়া এই বন্দুকের বুলেটের কার্যকারিতা সম্পর্কে কোনই সন্দেহ নেই জিমের। সে জানে বুলেটের সাথে সংঘর্ষে টার্গেটের কী ভয়ঙ্কর দশা হতে পারে।

দুম! বন্দুক থেকে গুলি ছুটে যাওয়ার সাথে সাথে বিপরীত ক্রিয়ায় কাঁধে যেন কুঁদোর প্রচণ্ড লাথি খেল জিম। ব্যথায় আর্তচিৎকার করে উঠল সে। মুখ হাঁ করে বাতাস টানল। তারপর সামনের দিকে তাকাতে চোয়াল ঝুলে পড়ল তার।

শক্তিশালী বুলেট আঘাত হানতে সমর্থ হয়নি গোল পিণ্ডটার গায়ে। তির্যক গতিতে গুলি ছিটকে চলে গেছে। আগের গতিতেই এগিয়ে আসছে ওটা।

উন্মাদের মত পরপর দু'বার গুলি চালাল জিম। কিন্তু অপ্রতিরোধ্য বস্তুটার তাতে বিন্দুমাত্র ক্ষতি হলো না। দুটো বুলেটই মিস হলো। অদ্ভুতভাবে শরীর বাঁকিয়ে ফেলছে ওটা শেষ মুহূর্তে। রাম যখন মাত্র ছয় ফুট দূরে, সূর্যের আলো লেগে ঝিকিয়ে উঠল ওটার রডের সাথে যুক্ত আঙুলের মত বাঁকানো হুকগুলো, মুখের জায়গায় বড় একটা গর্ত, তাতে সারি সারি কাঁটা বসানো, সবুজ রঙের তরল একটা পদার্থ গড়িয়ে পড়ছে হাঁ করা মুখ থেকে, থেকে থেকে কেঁপে উঠছে

জিনিসটা। বীভৎস! ওটার দিকে দ্বিতীয়বার আর তাকাল না জিম, প্রাণ ভয়ে ঝেড়ে দৌড় দিল।

জিম আর্ভিনের ওজন প্রায় দেড়শো পাউণ্ড। হালকা-পাতলা শরীরটা নিয়ে পেছনের জিনিসটার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় সে জিতে যাবে ভেবেছিল। কারণ রাম তার গতি বাড়ায়নি এক ফোঁটাও। কিংবা বলা যায় ঘণ্টায় পাঁচ মাইলের বেশি এগোবার সামর্থ্যও তার নেই। কিন্তু আতঙ্কের চোটে কয়েকশো গজ দৌড়াবার পরেই ক্লান্ত হয়ে গেল জিম।

সাথে যেসব মালপত্র আছে সেগুলোর ওজন নেহায়েত কম নয়। সে এবার এক-এক করে ভারমুক্ত হতে শুরু করল। রাইফেলটা ফেলে দিতে গিয়ে দ্বিধায় পড়ে গেল জিম। যদিও অস্ত্রটা কিম্ভূত জিনিসটার বিরুদ্ধে অর্থহীন বলে প্রমাণিত হয়েছে, কিন্তু জিমের মিলিটারি ট্রেনিং তাকে শিক্ষা দিয়েছে দেয়ালে পিঠ ঠেকে না গেলে সমরাস্ত্রের মায়া ত্যাগ করতে নেই। মন যুক্তি দেখাল, এ ধরনের সমস্যার মুখে রাইফেলটা যেহেতু কোন কাজেই লাগছে না, সুতরাং অহেতুক একটা বাড়তি ওজন বয়ে বেড়ানোর মানে হয় না। তবু বন্দুকটা ফেলে দিতে পারল না জিম। এক কাঁধ থেকে আরেক কাঁধে ঝোলাল সে ওটাকে। গাইগার কাউন্টারটা যত সাবধানে সম্ভব সমতল একটা পাথরের ওপর রেখে দিল, দৌড়ের গতি তার কমলই না বলা চলে।

দৌড়াতে-দৌড়াতে আকাশের দিকে মুখ তুলে চাইল জিম। সূর্যের গায়ে আবিরের ছোঁয়া। সাঁঝ হতে আর দেরি নেই। ভয়ে ধক করে উঠল কলজে। পেছনের পৈশাচিক জিনিসটার হাত থেকে রাতের বেলা কি রক্ষা পাওয়া যাবে? মনে হয় না। যেভাবে ওটা তাকে ধাওয়া শুরু করেছে, নাগালে না পাওয়া পর্যন্ত এই অনুসরণ পর্বের সমাপ্তি যে ঘটবে না তা ভাল করেই বুঝতে পারছে জিম। কিন্তু একটা জিনিস ওর মাথাতে কিছুতেই ঢুকছে না, ওটা তার পিছু নিয়েছে কেন? আর প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ারগুলোই বা কার বা কীসের জন্য ওভাবে স্তূপ করে রাখা হয়েছে? ধাওয়ার কারণ উদ্‌ঘাটন করতে না পারলেও জিম সার বুঝেছে এটুকুই–কিছুতেই বিকট জিনিসটার হাতে ধরা পড়া চলবে না। আর অনিবার্য সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে কৌশল অবলম্বন করতে হবে, এভাবে আর কতক্ষণ দৌড়ে মরবে সে?

মুখ হাঁ করে শ্বাস নিতে-নিতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারপাশে চোখ বুলিয়ে চলেছে জিম। খুঁজছে এমন কোন অবলম্বন যার সাহায্যে এই ভয়ঙ্কর প্রতিযোগিতা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। তবে জিমের ভাগ্য ভাল, উপত্যকাটিতে ঘন অরণ্য বিরল; ফলে ঝোপঝাড় বা গাছপালার কারণে তাকে কোথাও বাধা পেতে হচ্ছে না। দৌড়ের গতিতে সমান তাল থাকছে।

হঠাৎ একটা দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল জিম। ট্রেইলের মাথায় মস্ত বড় একটা পাথরের বোল্ডার ঝুলে আছে। মনে-মনে দ্রুত হিসেব কষে ফেলল জিম। মালয়ী ফাঁদের কথা মনে পড়তে মুচকি হাসল। একবার এই ফাঁদ পেতে নিশ্চিত

মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল সে। খুদে একটা টিলার ওপরে লাফিয়ে উঠল জিম, ফিরে চাইল ঘাসে মোড়া সমতল ভূমির দিকে। শেষ বিকেলের সূর্য লম্বা ছায়া ফেলেছে, তারপরও অনুসরণকারীকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, যেন গন্ধ শুঁকে এগিয়ে আসছে জিমের ট্রেইল ধরে। ঘৃণা আর বিতৃষ্ণা মেশানো উদ্বেগ নিয়ে ওটার দিকে তাকিয়ে রইল জিম। সন্দেহ নেই, আর মিনিট বারোর মধ্যে হারামীটা এখানে এসে পড়বে। জিমের পায়ের চিহ্ন নিখুঁতভাবে অনুসরণ করছে ওটা।

লাফিয়ে টিলা থেকে নেমে পড়ল জিম আর্ভিন। তারপর ঝুলন্ত বোল্ডারের নীচে গিয়ে পা ঘষে হেঁটে গেল। প্রায় দশ গজ এগোবার পরে আবার আগের জায়গায় ফিরে গেল সে। মাটিতে পায়ের ছাপ স্পষ্ট ফুটে আছে দেখে সন্তুষ্ট চিত্তে লাফ মেরে ট্র্যাক থেকে সরে গেল, বিশালকায় পাথর খণ্ডটার পেছনে এসে দাঁড়াল।

কোমর থেকে এবার ভারী ছোরাটা বের করে হিসেব মত মাটি খুঁড়তে শুরু করল জিম। বোল্ডারটা মাটির যে অংশে ভর করে ঝুলে আছে ঠিক সেখানের মাটি খুঁড়ে চলল। কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘেমে গোসল হয়ে গেল। কাজ শেষে ছুরিটা যথাস্থানে রেখে দিল। পাথরের গায়ে আঙুল ছোঁয়াতে দুলে উঠল ওটা। বোল্ডারের নীচে এই মুহূর্তে অবলম্বন বলতে প্রায় কিছুই নেই। খুশি মন নিয়ে বোল্ডারের পেছনে লুকাল জিম।

একটু পরেই ধূসর রঙের গোলাকার বস্তুটিকে দেখা গেল। সোজা বোল্ডারের দিকে এগিয়ে আসছে। দাঁতে দাঁত চেপে রাখল জিম, নিঃশ্বাস নিতেও ভুলে গেছে। শরীরের সমস্ত পেশি টানটান হয়ে আছে উত্তেজনায়, বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে সামনে। মনে মনে জপছে, 'আয়! আয়, ব্যাটা! সামনে আয়!' জিমের সন্দেহ হলো ধূর্ত গোল-আলু ওর ফন্দি টের না পেয়ে যায়।

সন্দেহ করার কিছু ছিল না। রাম অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে জিমের পায়ের ছাপ পরীক্ষা করে এগোচ্ছিল, দেখতে-দেখতে এসে পড়ল প্রায় শূন্যে ভাসমান প্রকাণ্ড পাথরের নীচে। সাথে-সাথে বিদ্যুৎ খেলে গেল জিমের শরীরে, মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল বুনো চিৎকার, সর্বশক্তি দিয়ে বোল্ডারটাকে ঠেলে দিল সে সামনের দিকে। বারো ফুট উঁচু থেকে পাঁচ টন ওজনের পাথরটা সরাসরি আছড়ে পড়ল রামের ঘাড়ে, যেন মাটির সাথে পিষে দিল। হুড়মুড় করে টিলা থেকে নেমে পড়ল জিম। বোল্ডারটার দিকে তাকিয়ে ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, 'শুয়োরের বাচ্চাকে পিষে আলু ভর্তা করে দে!' পাথরের গায়ে একটা লাথি মেরে হা হা করে হেসে উঠল সে, 'শালা গোলালুর বাচ্চা! তোর কসাইয়ের দোকান থেকে আমি আর ওয়াল্ট খানিকটা মাংস নিয়ে যাব'খন। ইউরেনিয়াম পাইনি তো কী হয়েছে? ডাইনোসরের মাংস বেচে প্রচুর কামাতে পারব। তবু ভাল এ যাত্রায় একেবারে লস হয়নি। তুই নরকের কীট নরকে যা! হা! হা! হা!'

হঠাৎ বিষম খেল জিম, থেমে গেল হাসি। কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইল চোখ। দানব পাথরটা নড়তে শুরু করেছে! পাঁচ টন ওজনের প্রকাণ্ড বোল্ডার

ট্রেইল থেকে খসে পড়ল আস্তে, তারপর পেছনে মাটির বড় বড় ঢেলা উড়িয়ে ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠল; খরখরে, মৃদু একটা আওয়াজ ভেসে এল ওটার নীচ থেকে। তীব্র অবিশ্বাস নিয়ে জিম দেখল একদিকে কাত হয়ে গেল অতবড় পাথরটা, এক ধার থেকে মাথা তুলল ধূসর রঙের ফোলানো শরীরের একটা অংশ। গলা দিয়ে ভোঁতা আওয়াজ বেরিয়ে এল জিমের, পড়িমরি করে ছুটল সে।

ট্রেইল ধরে মাইল খানেক টানা দৌড়াল প্রাণভয়ে ভীত জিম আর্ভিন। শেষে থেমে দাঁড়াল, তাকাল ঘাড় ঘুরিয়ে। ফেলে দেয়া পাথরটা থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে গাঢ় রঙের একটা বিন্দু, ধীর গতিতে কিন্তু নিয়মিত ছন্দে এবং অপ্রতিরোধ্যভাবে ওটা তার পায়ের চিহ্ন দেখে এগিয়ে আসছে এদিকেই। জিম ধপ করে বসে পড়ল মাটির ওপর, দু'হাত দিয়ে চেপে ধরল মাথা। আর সয় না শরীর। অন্তত বিশ মিনিটের পথ এগিয়ে আছে সে রামের চেয়ে। শুয়ে পড়ল জিম। একটু বিশ্রাম না নিলে আর চলছে না। জ্যাকেটের পকেট থেকে ইমার্জেন্সি রেশনের পাতলা প্যাকেটটা বের করল সে। দ্রুত চিবিয়ে গিলে ফেলতে লাগল পেমিকান, বিস্কুট এবং চকোলেট। খুদে একটা ঝর্ণাধারা থেকে পান করল বরফ শীতল পানি তারপর আবার প্রস্তুত হয়ে নিল অদ্ভুত সংগ্রামের জন্য। যাত্রা শুরুর আগে তিনটে বেনজেড্রাইন বড়ি গিলে নিল জিম। শারীরিক অসুস্থতা বা ক্লান্তির জন্য জরুরি চিকিৎসা হিসেবে ওষুধগুলো সবসময় নিজের সাথে রাখে সে। এখন বেশ কাজে দিচ্ছে। শরীরে বল পাচ্ছে জিম, হাড়ের ভেতর ঢুকে যাওয়া ভয়টাও যেন অনেকখানি কমেছে। রাম যখন আর মিনিট দশেক দূরের পথে, এই সময় আবার ছুটতে শুরু করল সে। মিনিট পনেরো দৌড়ানোর পরে একটা পাথুরে দেয়ালের সামনে চলে এল জিম। দেয়ালটা খাড়া, প্রায় ত্রিশ ফুট উঁচু। দেয়ালের আরেক পাশে প্রবেশের অগম্য রাস্তা। গিরিখাদের ফাঁদ, তীক্ষ্ণ কাঁটাযুক্ত ঝোপ আর খুরের মত ধারাল পাথর ডিঙিয়ে যাওয়া এক কথায় অসম্ভব। জিম যদি কোন মতে এই দেয়ালের ওপর উঠতে পারে তা হলে রামকে অবশ্যই বাঁক ঘুরে যেতে হবে। তার মানে ওটাকে বেশ কিছুক্ষণের জন্য পেছনে ফেলে রাখার সুযোগ পাবে জিম।

আকাশের দিকে চাইল ও। সূর্যটাকে লাল টকটকে প্রকাণ্ড একটা থালার মত লাগছে। দিগন্ত রেখা স্পর্শ করল বলে। জিমকে আরও দ্রুত এগোতে হবে। রক ক্লাইমার নয় সে, তবে পাহাড়ে কীভাবে চড়তে হয় জানে। দেয়ালের খাঁজ, ফাটল বা ফুটোতে হাত এবং পা রেখে অনেক কষ্টে শরীরটাকে টেনে নিয়ে এল সে চুড়োয়। ও যখন চুড়োয় উঠেছে ঠিক তখন রাম গড়াতে গড়াতে পৌঁছে গেছে দেয়ালের নীচে।

জিম জানে দিনের আলো থাকতে থাকতে প্রতিটি মূল্যবান মুহূর্তের সদ্ব্যবহার করা উচিত তার। প্রতিটি সেকেণ্ড এখন অমূল্য, কিন্তু কৌতূহল এবং আশার দোলাচল তাকে থামিয়ে রাখল। মনকে বোঝাল জিম, তার ধাওয়াকারী যে মুহূর্তে বাঁক ঘুরতে শুরু করবে, তখুনি সে চুড়ো থেকে নেমে বাতাসের বেগে ছুটবে। তা ছাড়া এমনও হতে পারে, ওটা তার আশা হয়তো ছেড়েই দিল। তা হলে এখানেই

দিব্যি ঘুমিয়ে নিতে পারবে জিম। ঘুম! আহা, শরীরটা ঘুমের জন্য যে কী উচাটন!

কিন্তু বাঁক নিয়ে ঘুরল না রাম। প্রাচীরের পাদদেশে কয়েক সেকেণ্ড ইতস্তত করল ওটা। তারপর হঠাৎ সব ক'টা নব খুলে গিয়ে পরিণত হলো শক্ত, ধাতব লাঠিতে। লাঠিগুলোর মাথায় লেন্স লাগানো, দুলতে লাগল বাতাসে। সরে যেতে দেরি করে ফেলল জিম–শূন্যে ভীতিকরভাবে নড়তে থাকা যন্ত্রটার লেন্স বা চোখগুলো দেখে ফেলেছে ওকে, জেনে গেছে পাহাড় চুড়োয় আশ্রয় নিয়েছে শিকার। উপুড় হয়ে শুয়ে, নীচের দিকে তাকিয়ে মনে মনে নিজেকে অভিশাপ দিল জিম, কেন মাতব্বরী করতে সে এতক্ষণ চুড়োয় দাঁড়িয়ে ছিল।

ধাতব হাতগুলো হঠাৎ ফিরে এল নিজেদের জায়গায়, পরিবর্তে ভিন্ন আরেকটা নব থেকে নমনীয় আকৃতির একটা রড বেরিয়ে এল, সূর্যের বিদায়ী আলোয় মনে হলো রক্তস্নান করেছে ওটা, সটান সরসর করে উঠে যেতে শুরু করল জিম যেখানে শুয়ে আছে, সেদিকে। রডটাকে দেখে স্রেফ পাথর হয়ে গেল জিম, ওটার মাথার কাঁটাওয়ালা নখ চুড়োর ধারে, নাকের ঠিক নীচেটায় খামচে ধরল।

লাফিয়ে উঠল জিম। রডটা ইতিমধ্যে আবার খাটো হয়ে যেতে শুরু করেছে। এবার রাম গড়াতে গড়াতে মাটি থেকে পাহাড় বাইতে শুরু করল। ওটার গা থেকে বেরিয়ে আসা লম্বা একটা হুক কিলবিল করে সাপের মত এগিয়ে গেল জিমের পা লক্ষ্য করে।

জিম 'বাবা গো!' বলে পা সরিয়ে নিল। তারপরই রেগেমেগে লাথি বসিয়ে দিতে গেল হুকের গায়ে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে সামলে নিল নিজেকে। বদলে চুড়োর ধারের ঝোপ থেকে শুকনো একটা ডাল ভেঙে নিল সে, হুকটাকে গুঁতো দিতে শুরু করল।

হঠাৎ চোখ ঝলসানো আলো জ্বলে উঠল; সাদা, আঁকাবাঁকা আলোর রেখা বৈদ্যুতিক শকের মত যেন ঢুকে গেল শুকনো ডালের ভেতরে, প্রবল ঝাঁকুনি খেল জিম হাতে। আর্তনাদ করে উঠে সাথে সাথে লাঠিটা ফেলে দিল সে, সব ক'টা আঙুল অসাড় হয়ে গেছে, টলতে টলতে কয়েক পা পিছিয়ে এল জিম। নিষ্ফল আক্রোশে ফুঁসছে। একবার ইচ্ছে করল ঝেড়ে দৌড় দেয়। হঠাৎ কাঁধে ঝোলানো রাইফেলটার কথা মনে পড়তে নিজেকে সামলাল সে। সেবার রাম বাছাধন অনেক দূরে ছিল বলে টার্গেট মিস হয়েছে তার। এবার আর লক্ষ্য ভণ্ডুল হবার কোন কারণ নেই। আজ ওর একদিন কি আমার একদিন! দাঁতে দাঁত চেপে প্রতিজ্ঞা করল জিম।

দ্রুত কমে আসছে আলো, হাঁটু গেড়ে বসল জিম, ধৈর্যের সাথে বাঁকানো হুকটাকে টার্গেট করল, তারপর টেনে দিল ট্রিগার। 'ধপ' করে একটা শব্দ হলো রাম মাটিতে পড়ে যেতেই। আনন্দে চিৎকার করে উঠল জিম। যতটা আশা করেছিল রাইফেলটা তার চেয়ে অনেক বেশি কাজে দিয়েছে। গুলির আঘাতে ওটার ধাতব নখগুলো শুধু উড়েই যায়নি, চুড়োর এক ধার গুঁড়িয়ে দিয়ে সেখানে মস্ত একটা গর্তের সৃষ্টি করেছে। এখন আর এ ধার থেকে রাম বাবাজীকে উঠতে হবে না।

নীচে তাকাল জিম। মাটির ওপর বস্তার মত পড়ে আছে রাম। খিক খিক হাসল জিম। শয়তানটা যতবার হুকের সাহায্যে ওপরে উঠতে চাইবে ততবার গুলি করে ওকে ফেলে দেবে সে। পকেটে গুলি আছে প্রচুর, আর খানিক পর চাঁদ উঠবে। তখন চাঁদের আলোয় ওটাকে গুলি করা যাবে। অবশ্য ওই জিনিসটা, যা-ই হোক না কেন ওটা—ঘটে বুদ্ধি আছে বলেই মনে হয়। অসম যুদ্ধ নিশ্চয়ই চালিয়ে যেতে চাইবে না। এখন হোক আর কয়েক ঘণ্টা পরে হোক, মোড় ঘুরতে ওকে হবেই। রাতের বেলা হয়তো ওর ট্রেইলটা চোখে পড়বে না রামের। এই সময় নীচের দিকে আবার তাকাতেই গলা দিয়ে বিদঘুটে আওয়াজ বেরিয়ে এল জিমের। অন্ধকারে গোলাকার পিণ্ডটা থেকে তিনটে হুক সহ রড বেরিয়ে এসেছে একসাথে, অবিকল ফ্যানের মত ঘুরতে ঘুরতে ছড়িয়ে পড়ল সব ক'টা। প্রতিটি হুক চার ফুট অন্তর দূরত্ব বজায় রেখে পাহাড় বাইতে শুরু করল।

জিম আর্ভিন চট করে কাঁধে তুলল রাইফেল। ঠিক আছে—এবার ক্রমাগত গুলিবর্ষণ শুরু হবে। অন্ধকারে যদিও সবগুলো হুককে ভালভাবে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু হাল ছাড়ার পাত্র নয় জিম।

জিমের সৌভাগ্যই বলতে হবে, প্রথম গুলিটাই একটা হুকের গায়ে বিঁধল। প্রচুর ধুলো উড়িয়ে ওটা ভেঙে অকেজো হয়ে গেল। দ্বিতীয় গুলিটাও প্রায় প্রথমটার মত লক্ষ্যভেদ করল। আরেকটা হুককে পাঁচিলের গা থেকে সরিয়ে দিল। তিন নম্বর হুকটাকে গুলি করতে গিয়ে জিম আবিষ্কার করল এতক্ষণ ধরে বৃথা চেষ্টা করছে সে।

প্রথম যে হুকটা ভেঙে গিয়েছিল সেখানে টিকটিকির কাটা লেজের মত আরেকটা হুক গজিয়েছে। জিম যতই গুলি করুক, অবিনাশী হুকগুলোর আসলে ধ্বংস নেই। কারণ, একটা না একটা হুক রামকে ওপরে টেনে তুলবেই। জিম হাতের রাইফেলটা একটা খাটো গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে নেমে পড়ল পাহাড় থেকে, ঝেড়ে দৌড় দিল, মিশে গেল অন্ধকারের মধ্যে। দিগ্বিদিক্‌শূন্য হয়ে ছুটতে লাগল সে। জানে না কোথায় যাচ্ছে। জানা নেই কী করবে এখন। পৈশাচিক জিনিসটা, যেটা ওকে ধাওয়া করে আসছে পেছনে, জিম জানে না ওটার গতি কীভাবে রুদ্ধ করবে সে।

হঠাৎ ডিনামাইটের কথা মনে পড়ে গেল ওর। এবার দিক পরিবর্তন করল জিম। ফিরে চলল লেকের ধারে, তার ক্যাম্পে। মাথার ওপর হাজারো তারার দ্যুতিতে পথ চলতে অসুবিধে হচ্ছে না। তবে সময়জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে জিম। খিদেও লাগছে না। একবার ভাবল আস্তানায় গিয়ে চারটে মুখে দেবে। পরক্ষণে নাকচ করে দিল চিন্তাটা। তারচে' শারীরিক ক্লান্তি দূর করতে বেনজেড্রাইন ট্যাবলেট কাজে দেবে। কিন্তু পকেট হাতড়ে কোন বড়ি পেল না জিম। আকাশে চাঁদ উঠেছে। জিম শুধু শুনতে পাচ্ছে রাম আরও কাছিয়ে আসছে ওর। আরও কাছে চলে আসছে।

উদ্‌ভ্রান্তের মত এগোচ্ছে জিম। একবার মনে হলো সামনে ওর স্ত্রী সেলে

দাঁড়িয়ে আছে দু'বাহু বাড়িয়ে। 'যাও এখান থেকে!' তাকে ধমকে উঠল জিম। 'শিগ্গির পালাও! দেখতে পাচ্ছ না ওটা আমাকে ধাওয়া করেছে। দু'জনেই মরতে চাও নাকি?' জিম দেখল দৌড়ে চলে গেল সেলে। খানিক পরেই বুঝতে পারল আসলে চোখে ভ্রম দেখেছে সে।

আরেকবার মনে হলো ওর সামনে বিশালকায় এক গ্রিজলি ভালুক দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু ভালুকটাকে দেখে ভয় পেল না সে, বরং গ্রিজলিটাই যেন বিরক্ত হয়ে পথ ছেড়ে দিল জিমের।

পরদিন ভোরে, সূর্য ওঠার খানিক পরে, লেকের ধারে পৌঁছে গেল জিম। রাম তার কাছ থেকে বেশি দূরে নেই। গড়িয়ে আসার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। জিম চোখ বুজে, হোঁচট খেতে-খেতে হাঁটছে। হঠাৎ নাকে দড়াম করে আঘাত পেল সে, ঝাঁকি খেয়ে খুলে গেল চোখ, দেখল নিজের আস্তানায় চলে এসেছে সে, পাঁচিলের সাথে ধাক্কা খেয়েছে। অদূরে পড়ে রয়েছে বিস্ফোরকের ভাণ্ডার–ডিনামাইট। ডিনামাইটগুলোকে দেখে যেন নতুন করে বাঁচার আশ্বাস পেল জিম, উজ্জীবিত হয়ে উঠল! অনেক কষ্টে ভেতরের উদ্বিগ্ন ভাবটাকে দূর করে দিল জিম আর্ভিন। ভাবতে বসল ডিনামাইটগুলোকে কীভাবে কাজে লাগানো যায়। ফিউজ ব্যবহার করবে? না। ট্রেইলে ফিউজ লাগানো ডিনামাইট রেখে সটকে পড়া সম্ভব হবে না। কারণ, ঠিক কোন্ সময় তাকে বিস্ফোরণ ঘটাতে হবে তা আগে থেকে অনুমান করা মুশকিল। ঘামে জামা-কাপড় লেপ্টে আছে জিমের গায়ে। প্রচণ্ড ক্লান্ত শরীর। মাথাটাও ঠিক মত কাজ করতে চাইছে না। দূর থেকে এমন সময় বিস্ফোরণ ঘটাতে হবে ঠিক যখন রাম ওই রাস্তা ধরে এগোতে থাকবে। কিন্তু লম্বা ফিউজ ব্যবহার করতে সাহস পেল না জিম। লম্বা তার জ্বলতে সময় নেয় অনেক। তা হলে কি করা যায়? গভীর চিন্তায় পড়ে গেল সে। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে লাফিয়ে উঠল। হ্যাঁ, উপায় আছে। .২২ পিস্তলটা এবার কাজে দেবে। অস্ত্রটা ফেলে রেখে গিয়েছিল সে তার আস্তানায়।

দ্রুত কাজ শুরু করে দিল জিম। ডিনামাইটের বাক্সটা বয়ে নিয়ে এল রাস্তার মাথায়, পাথুরে একটা বাঁক থেকে বিশ গজ দূরে, জিমের আগের ট্র্যাক। এ রাস্তা দিয়ে সে হেঁটে এসেছে। ডিনামাইট স্টিকগুলো নাড়াচাড়া করার সময় ভয়-ভয় লাগল ওর। বড্ড ঝুঁকি নেয়া হচ্ছে–যে-কোন সময় সামান্য ঝাঁকুনি লাগলেই বিস্ফোরিত হতে পারে ডিনামাইট। বিস্ফোরণে মরতে রাজি আছে জিম, তবু রামের দ্বারা পঙ্গুত্বের শিকার হতে রাজি নয়।

ডিনামাইটগুলো যথাস্থানে ফিট করে রেখে বিধ্বস্ত শরীরটাকে পাথুরে একটা আড়ালের পেছনে কোন মতে টেনে নিয়ে এল জিম। দেখল ওর নাছোড়বান্দা অনুসরণকারী আর পাঁচশো গজ দূরেও নেই। দাঁতে দাঁত ঘষল জিম, হঠাৎ পাথুরে চত্বরটার মাঝে আড়াআড়ি একটা গর্ত চোখে পড়ল ওর। পরীক্ষা করে বুঝল এই গহ্বর থেকে ডিনামাইটের দিকে নজরও রাখা যাবে আর বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে ঢাল হিসেবেও কাজ করবে পাথর খণ্ডটা। জিম যেখানে আত্মগোপন করে আছে সেখান

থেকে ডিনামাইটের ফাঁদ মাত্র বিশ গজ দূরে।

পেটের ওপর ভর দিয়ে শুয়ে পড়ল জিম, দেখছে রাম আসছে। দপ দপ করছে মাথাটা, যেন হাতুড়ি পিটছে কেউ। ঈশ্বর! শেষ কবে ঘুমিয়েছে ও? এই প্রথম টানা কয়েক ঘণ্টা নির্ঘুম কেটেছে ওর। ঘণ্টা নাকি দিন? মনে করতে পারছে না জিম। পেশিতে খিঁচ ধরে আছে, শরীরের ভেতর অসম্ভব জ্বালাপোড়া। পিঠে সূর্যের আলোর ছোঁয়া পেল সে। উষ্ণ, আরামদায়ক...ঘুমে বুজে আসতে চাইল দু'চোখ। না! এখন কিছুতেই ঘুমানো চলবে না। তা হলে ওই হারামজাদাটার নিশ্চিত শিকার হতে হবে। হাজার বছর ধরে জনশূন্য এই প্রান্তরে প্যারালাইজড্ রোগীর মত পড়ে থাকতে হবে, নড়তে-চড়তে পারবে না। পিস্তলের ট্রিগারে আঙুল পেঁচাল জিম। ওকে জেগে থাকতেই হবে। যদি সে হেরে যায়–বিস্ফোরণের হাত থেকে রক্ষা পায় রাম–তা হলে শেষ মুহূর্তে নিজের মস্তিষ্কে পিস্তলের একটা গুলি ঢুকিয়ে দেবে জিম।

চকচকে পিস্তলটার দিকে একবার তাকাল জিম, তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল ওর পাতা ফাঁদের দিকে। যেভাবে সময়ের হিসেব করেছে সে তা যদি খাপে খাপে মিলে যায়, তা হলে রামের এবার আর রক্ষা নেই। একটু স্বস্তি অনুভব করল জিম। কাছে পিঠে কোথাও মৃদু শিস দিয়ে উঠল একটা পাখি, লেকের পানিতে ঝিলিক দিল মাছের রুপালি ডানা।

হঠাৎ শরীর টানটান হয়ে গেল জিমের। যা, শালা! একটা গ্রিজলি আসছে এদিকে হেলে দুলে। জিমের ক্যাম্প খালি। ব্যাটা নিশ্চয়ই ডিনামাইটের বাক্সটাকে বিয়ার বা খাবারের বাক্স বলে ভেবেছে। রোমশ দানবটা সতর্কভাবে বাক্সটাকে শুঁকল, নাকটাকে ঘোরাল চারপাশে, গম্ভীর, ঘড়ঘড়ে একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল গলার ভেতর থেকে। মানুষের গন্ধ পেয়েছে! জিম দম বন্ধ করে পড়ে থাকল। ডিনামাইটের ক্যাপে যদি সামান্য ছোঁয়া লাগে, সাথে সাথে–বুম!

বাক্স থেকে মাথা তুলল গ্রিজলি, গর্জে উঠল কর্কশ গলায়। বাক্সটাকে অগ্রাহ্য করল সে, মানুষের গন্ধের কথাও ভুলে গেল বেমালুম। নতুন শত্রুর দেখা পেয়েছে সে। পাশবিক, ছোট চোখ দুটো দিয়ে স্থির দৃষ্টিতে গ্রিজলি দেখল গোলাকার রামকে, গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে। আর মাত্র চল্লিশ গজ দূরে আছে। জিম চাপা গলায় হেসে উঠল খিক খিক করে। উত্তর আমেরিকায় শুধু নয়, সারা বিশ্বের হিংস্র প্রাণীকুলের মধ্যে সে যমের মত ভয় পায় দানবাকৃতির গ্রিজলি ভালুকদের। এবার জমবে মজা। দুই ভয়ঙ্কর প্রাণী (রামকে ভিনগ্রহের কোন প্রাণী ধরে নিয়েছে জিম) মুখোমুখি হতে যাচ্ছে প্রবল প্রতিহিংসা নিয়ে। দেখা যাক কে জেতে। একবার পিস্তলটার দিকে তাকাল জিম, তারপর ফিরে চাইল ডিনামাইটের দিকে। এই মুহূর্তে এই দুটোর অস্তিত্বই তার কাছে প্রধান। ভালুকের কাছ থেকে ছয় হাত দূরে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল রাম। পিঠ কুঁজো হয়ে গেল গ্রিজলির, ক্রোধ আর রাগে ফেটে পড়তে চাইছে। লাল ঠোঁট দুটো ফাঁক করল সে, বেরিয়ে পড়ল ক্ষুরধার, ঝকঝকে দাঁতের সারি। আবার গড়াতে শুরু করল রাম, কাটাতে চাইছে গ্রিজলিকে।

ভালুকটা পা বাড়াল সামনে, গর্জন করছে মুহুর্মুহু। রোমশ, বিশাল বাহু দুটো বাড়িয়ে ছুটে গেল রামের দিকে। প্রকাণ্ড দুই থাবা গ্রিজলির, খুরের চেয়েও ধারাল, গণ্ডারকে পর্যন্ত ছিঁড়ে ফালা ফালা করে দেয়ার তাগত রাখে হিংস্র থাবা জোড়া। ভালুকটাকে ছুটে আসতে দেখে পেছনে সরে গেল রাম, দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপর গ্রিজলিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বড় একটা বৃত্ত নিয়ে অন্য দিকে এগোল সে।

কিম্ভূত জিনিসটাকে রণে ভঙ্গ দিতে দেখে আরও রেগে গেল জঙ্গলের রাজা। লড়াইয়ের উন্মাদনা জেগেছে তার শিরায়, প্রতিযোগীকে এত সহজে ছেড়ে দেবে না। প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে বিদ্যুৎ বেগে ঘুরল গ্রিজলি, শৈল্পিক ছন্দে পা ফেলল একপাশে, তারপর বিপুল শক্তিতে মরণ আলিঙ্গনে বেঁধে ফেলল রামকে। ভয়ানক শক্তিশালী কালচে হাত দুটোর বন্ধন দৃঢ়তর হলো, বিকট হাঁ-টা যেন বিশাল এক গর্ত, কামড় বসাল গ্রিজলি রামের ঘাড়ে। উত্তেজনায় প্রায় লাফ মেরে দাঁড়াল জিম। 'ধরো ওকে!' ব্যাঙের মত ফ্যাঁসফেঁসে গলায় চিৎকার করে উঠল সে। হঠাৎ ধূসর শরীরে উজ্জ্বল, রুপালি আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল। অত্যুজ্জ্বল, ভয়ঙ্কর আলোক রেখাটা চোখ ঝলসে দিল জিমের। সাথে সাথে জঙ্গলের রাজার বীর বিক্রমের গর্জন পরিণত হলো বিকট আর্তনাদে, গলা দিয়ে ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরিয়ে এল তার কয়েক সেকেণ্ড পরে, প্রায় এক টন ওজনের পাহাড় সমান দেহ নিয়ে আছড়ে পড়ল গ্রিজলি মাটিতে। ওটার গলা নিখুঁতভাবে দু'ভাগ হয়ে গেছে—গলগল করে রক্ত পড়ছে। জিম দেখল রামের শরীরের মাঝে ভোজবাজির মত তীক্ষ্ণধার একটা ব্লেড অদৃশ্য হয়ে গেল, রক্তাক্ত।

দানব ভালুকের লাশের পাশ দিয়ে গড়াতে শুরু করল রাম, ধৈর্যের সাথে জিমের পায়ের ছাপ পরীক্ষা করছে। এগিয়ে আসছে ওর দিকেই। ওকে, বেবি, মুচকি হাসল জিম, এবার আর তোমার রক্ষা নেই। এসো, যাদুধন! আরও কাছে এসো। খুব শান্তভাবে, অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পিস্তলের ট্রিগারে আঙুল জড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল জিম আর্ভিন। রাম এগিয়ে এল, সোজা ডিনামাইট বক্সের দিকে, পাশ কাটাচ্ছে এইবার। ট্রিগারে আঙুলের চাপ পড়ল। প্রবল বিস্ফোরণের একটা শব্দ। ভাইব্রেশনের চোটে মাটি থেকে শূন্যে উঠে গেল জিমের শরীর। তারপর আর কিছু মনে নেই ওর।

প্রকৃতি আশ্চর্য নীরব। পাখিদের কল-কাকলিও শোনা যাচ্ছে না। কয়েক গজ দূরে, ঘাসের সাথে কীসের যেন ধাক্কা লেগে থপ করে ভোঁতা একটা আওয়াজ হলো। তারপর আবার নেমে এল অদ্ভুত নৈঃশব্দ।

ধীরে ধীরে মাথা তুলল জিম আর্ভিন। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য জ্ঞান হারিয়েছিল সে। সারা শরীর ব্যথায় টনটন করছে। যেখানে ডিনামাইটের বাক্সটা ছিল ওখানে বিশাল এক গর্তের সৃষ্টি হয়েছে, ধোঁয়া বেরুচ্ছে এখনও। গর্ত থেকে কয়েক গজ দূরে ওটাকে দেখতে পেল জিম। ধূসর শরীরে পাউডার লেগে রয়েছে, আরও বিকট লাগছে রামকে।

লম্বা একটা পাইন গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছে রাম। কানের ভেতর অবিরাম

ড্রাম বাজাচ্ছে কে যেন, বিস্ফারিত চোখে জিম দেখল গড়িয়ে আসতে শুরু করেছে ওটা।

পাগলের মত পিস্তল খুঁজল জিম। পেল না। বিস্ফোরণের ধাক্কায় কোথাও পড়ে গেছে। প্রার্থনা করতে ইচ্ছে করল ওর। কিন্তু বাইবেলের একটা শ্লোকও মনে পড়ল না। জিম বোকার মত ভাবতে লাগল, 'আমার বোন ইথেল কিংকর্তব্যবিমূঢ় বানান করতে জানে না। আমার বোন ইথেল...'

রাম আর এক হাত দূরে, শিউরে উঠে চোখ বুজে ফেলল জিম। ঠাণ্ডা, ধাতব আঙুলের পরশ পেল সে গায়ে, ওকে টিপেটুপে যেন পরীক্ষা করে দেখছে। মোচড় খেল জিম, থরথর করে কাঁপছে। প্রতি মুহূর্তে আশা করছে এই বুঝি সবুজ তরল পদার্থে বোঝাই ভয়ঙ্কর এক সিরিঞ্জ ওর শরীরের ভেতর ঢুকে গেল। মানস চোখে জিম স্পষ্ট দেখতে পেল প্রাগৈতিহাসিক গিরগিটিটা এক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে, কাঁপছে চোখের পাতা।

জিমের শরীর মাটি থেকে কয়েক ইঞ্চি ওপরে উঠে গেল। জিম ভাবল, রাম ওকে ধরে আছাড় দিতে যাচ্ছে। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পরে আবার পিঠের নীচে মাটির স্পর্শ পেল সে।

নামিয়ে রেখেছে রাম ওকে। তারপর কিছুক্ষণ কোন সাড়াশব্দ নেই। ভয়ে ভয়ে চোখ মেলল জিম। চলে যাচ্ছে রাম ফুটবলের মত গড়াতে গড়াতে। ওর যাওয়া দেখতে-দেখতে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল জিম।

কতক্ষণ পরে, জানে না ঠিক জিম, হয়তো কয়েক মিনিট পরে বা কয়েক ঘণ্টা পরে সে সি-প্লেনের এঞ্জিনের শব্দ শুনতে পেল। চোখ বন্ধ করে ছিল জিম। তাকাতে দেখল ওয়াল্ট লিওনার্ড ঝুঁকে আছে তার দিকে।

পরে, প্লেনে, উপত্যকা থেকে পাঁচ হাজার ফুট ওপরে যখন ওরা, ওয়াল্ট হাসতে-হাসতে জিমের পিঠে চাপড় মারল, চেঁচিয়ে বলল: 'জিম, দোস্তো, এবার আমরা বড়লোক হয়ে যাব। ডাইনোসরের যে সংগ্রহ এনেছি মিউজিয়ামগুলো তা দেখলে হুমড়ি খেয়ে পড়বে।'

জিমের গর্তে বসা চোখ দুটো উদ্ভাসিত হলো, 'ঠিকই বলেছ,' সায় দিল সে। 'তবে কি জানো, নিজেকে আমার খুব আহাম্মক মনে হচ্ছে। ওই অদ্ভুত জিনিসটার আমাকে মেরে ফেলার কোন ইচ্ছেই ছিল না। হয়তো ও পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছিল আমি কে বা কী। আমাকে ও ছুঁয়ে দেখল, তারপর চলে গেল! অথচ আমি ভেবেছি ও আমাকে মেরে ফেলতে চাইছে।'

'হ্যাঁ, খামোকাই দৌড়ে মরেছ তুমি,' বলল ওয়াল্ট। 'তবে তোমার সাহসের প্রশংসা করি আমি, দোস্তো। এক রাতের ধাওয়ায় শরীরের যে কী অবস্থা হয়েছে তোমার! পুরো দশ পাউণ্ড ওজন কমে গেছে, তা জানো?'

মূল: আর্থার পোর্জেস

প্রতিদ্বন্দ্বী

ওয়ার্নার এবং ক্লাউস ইনসব্রাক থেকে একত্রে পাহাড়ী গ্রাম ডুরাচে চলে এল দিন দুই হচ-ডুরাচে স্কি করে কাটাবে বলে। হচ-ডুরাচ হলো ডুরাচ থেকে দশ হাজার ফুট উঁচুতে একটি স্কি-ফিল্ড।

ওয়ার্নার এবং ক্লাউস বাল্য বন্ধু। এক সময় দু'জনের মাঝে দারুণ ঘনিষ্ঠতা ছিল। এখনও যে বন্ধুত্ব নেই তা নয়, পরস্পরের সাহচর্য ওরা দু'জনেই মাঝে মাঝে বেশ উপভোগ করে। কিন্তু ব্রিজিত প্রসঙ্গ এলে মুহূর্তে পাল্টে যায় পরিবেশ, তখন কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলে না, হয়ে ওঠে পরস্পরের শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বী মনোভাবাপন্ন।

ব্রিজিত জ্যাচ হলো অপূর্ব সুন্দরী এক নারী যার প্রেমে ওয়ার্নার এবং ক্লাউস দু'জনেই সাংঘাতিক দিওয়ানা। ফুটন্ত গোলাপের মত মেয়েটিকে দেখামাত্র ওরা প্রেমে পড়ে গিয়েছিল। ইনসব্রাক স্ট্রীটে, ওদের প্রতিবেশী হয়ে যেদিন এল ব্রিজিত, সেদিন থেকেই ওয়ার্নার এবং ক্লাউস বুঝতে পেরেছিল–খোদা হাফেজ, দোস্তী! ব্রিজিতের ব্যাপারে কেউ এক চুল ছাড় দিতে রাজি নয়। তাকে এক মুহূর্তের জন্যেও চোখের আড়াল করার কথা ভাবতে পারে না তারা। চোখের আড়াল করতে হলে দু'জনকেই তা একসাথে করতে হবে–এটাই হলো পারস্পরিক সমঝোতামতে সিদ্ধান্ত। তাই ডুরাচে একত্রে স্কি করতে এসেছে ওয়ার্নার এবং ক্লাউস। ব্রিজিতের ব্যাপারে কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না বলেই এই ব্যবস্থা। একজন উইক এণ্ড কাটাবে আর সেই সুযোগে অপরজন ব্রিজিতের প্রণয় যাচনা করার সুযোগ নেবে–তা হয় নাকি? ওরা ঠিক করেছে ডুরাচের একই হোটেলে দু'জনে উঠবে, হচ-ডুরাচের স্কি-ফিল্ডে স্কিও করবে একসঙ্গে, শেষে একই বাসে চড়ে ফিরে যাবে ইনসব্রাকে।

ব্রিজিত ওদের পাড়ায় এসেছে বেশিদিন হয়নি। কিন্তু এই ক'টা মাস দু'জনেরই খুব অশান্তিতে কেটেছে পরস্পরকে সন্দেহ আর শত্রুতার চোখে দেখার কারণে। এখন, উইক এণ্ড কাটাতে ডুরাচে এসে দু'জনেই যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে ব্রিজিতকে নিয়ে ক'টা দিন অন্তত দুশ্চিন্তা করতে হবে না ভেবে। ভাবনাটা ওদের এমনই স্বস্তি দিয়েছে যে দু'জনেই একটা সময় স্বতঃস্ফূর্তভাবে ডুবে গেল বাল্য স্মৃতিকে আবার উজ্জীবিত করার কাজে। অনুভব করল ব্রিজিতকে নিয়ে এতদিন পরস্পরের মাঝে সন্দেহের যে বিশ্রী একটা মানসিক চাপ ছিল তা থেকে মুক্ত হতে পেরে বেশ আনন্দ লাগছে।

ডুরাচ গ্রাম থেকে হচ-ডুরাচের পাহাড়ী উপত্যকায় পৌঁছানোর দুটো রাস্তা আছে। একটা খুব দুর্গম, খাড়া ঢাল বেয়ে উঠতে হয়, কিন্তু সেখানে বাতাসের

তাণ্ডব এত বেশি যে তিন মাইল রাস্তা পার হতে অতি বড় ড্রাইভারেরও বুক কাঁপে সরু ট্র্যাকটার ওপরে সারাক্ষণই ঝড়ো হাওয়ার চাপে লম্বা গাছগুলো মাথা ভেঙে পড়ে যায় বা মোচড় খেয়ে নুয়ে পড়তে থাকে বলে। এটা একটা ওয়ান ওয়ে রোড আর গাড়িও চালাতে হয় খুব আস্তে। একটু অসতর্ক হলেই সোজা রাস্তার পাশে মুখ হাঁ করে থাকা অন্ধকার খাদের মধ্যে গিয়ে পড়তে হবে। অন্য ব্যবস্থাটা হলো চেয়ার-লিফট। বিরাট একটা কেব্‌ল্ বা তারে ডজনখানেক চেয়ার আকাশ ছোঁয়া গাছের সারির মাথার ওপর দিয়ে হেলে দুলে এগোয়, এক পাইলন (ইস্পাতের তৈরি ইলেকট্রিক তারের উঁচু থাম) থেকে আরেক পাইলন অতিক্রম করে ধীর গতিতে, পাহাড় থেকে তখন চেয়ারগুলোর উচ্চতা দাঁড়ায় কমপক্ষে দু'হাজার ফুট। মাঝে মাঝে অবশ্য চেয়ার-লিফটের উচ্চতা মাটি থেকে খুব কমই হয়ে থাকে, বড় জোর ত্রিশ-চল্লিশ ফুট। তবে দু'হাজার ফুটে ওঠার পরে নীচের দিকে তাকালে বুক কেঁপে ওঠে সবারই, যদিও প্রকৃতির আশ্চর্য নীরবতা এবং শান্ত পরিবেশের মুগ্ধ করার মত সৌন্দর্য ভীতিকর পরিস্থিতিটাকে দ্রুত স্বাভাবিক করে তুলতে সাহায্যও করে।

ওয়ার্নার এবং ক্লাউস শুক্রবার সন্ধ্যায় হাজির হয়ে গেল তাদের গন্তব্যে, ক্রোন হোটেলে রাত্রি যাপন করল। পরদিন সকালে চেয়ার-লিফটের লাইনে গিয়ে দাঁড়াল, অপেক্ষা করতে লাগল নিজেদের পালা আসার জন্যে। সুযোগ যখন এল, অ্যাটেনড্যান্ট লোকটা দ্রুত ওয়ার্নারের গায়ে মুড়ে দিল একটা কম্বল, চেয়ারটা দুলতে দুলতে ওর কাছে চলে এল। লাফিয়ে চেয়ারে উঠে বসল ওয়ার্নার এক হাতে স্কি জোড়া নিয়ে, একটা ঝাঁকি খেয়ে এঞ্জিন-হাউস থেকে ক্রমশ দূরে সরে যেতে লাগল, এগোল ঢালের ওপরের বনভূমির দিকে। কী মনে করে পেছন ফিরে তাকাতে দেখল ক্লাউসও আসছে আরেকটা চেয়ারে বসে। ক্লাউসের জন্যে এই প্রথম ওর দুঃখ হলো ভেবে যে লোকটা খামোকা ব্রিজিতকে নিয়ে দিবা-স্বপ্ন দেখছে। ক্লাউসকে ব্রিজিতের যোগ্য বলা যাবে না কিছুতেই। কারণ, ব্রিজিত ওয়ার্নারের মত লম্বা, কালো চুলের ফর্সা মানুষ পছন্দ করে, সোনালি চুলঅলা চাল কুমড়ো ক্লাউসকে নয়। আসলে ক্লাউসের উচিত ব্রিজিতের মন জয় করার এই অসম প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়ানো। বাটকু ক্লাউসকে ব্রিজিত কোনদিনই বিয়ে করবে না।

একটা পাইলনের বাহুর ওপর দিয়ে ঠনঠন শব্দ তুলে এগিয়ে যাচ্ছিল চেয়ার, হঠাৎ মৃদু ঝাঁকি খেল, কৌতূহলী হয়ে নীচের দিকে তাকাল ওয়ার্নার। অনেক নীচে নীলচে ছায়া ঘেরা, বরফ ঢাকা পাহাড় সারি। বনভূমির ওপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে ওরা, পাইনের সারির ফাঁকে হচ-ডুরাচের একটা স্কি-রান দেখা গেল বেশ কিছু স্কিয়ার সহ। প্রথম দলটা ইতিমধ্যে স্কি করতে নেমে পড়েছে: এক্সপার্টরা সবার সামনে, আর ক'জন ইন্সট্রাক্টরদের পেছনে, তাদেরকে অনুসরণ করে চলেছে। একটি মেয়েকে দেখল ওয়ার্নার ভিড় থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল, ঠিক ওর চেয়ারের নীচে দারুণ একটা বাঁক নিয়ে ছুটতে শুরু করল। মেয়েটি স্লিম,

সুগঠিত শরীর। ব্রিজিত ঠিক এই স্টাইলে স্কি করে। ওয়ার্নারের দুঃখ লাগল, এত চমৎকার একটা জায়গায় এ মুহূর্তে ব্রিজিত নেই ভেবে।

কেব্‌লটা এখন বরফ ঢাকা একটা খাদের ওপর দিয়ে এগোচ্ছে। খাদের নীচেটা গভীর এবং অন্ধকার। খাদ পার হয়ে আবার গাছের সারির মধ্যে ঢুকল চেয়ার-লিফট। এখানে, সুগভীর অরণ্যে দুপুরের আগে ছাড়া উপত্যকায় সূর্যের আলো ঢুকতে পারে না। ওয়ার্নার গায়ের কম্বলটা চেপে ধরল দু'হাতে। ছমছম করে উঠল গা।

ওয়ার্নারের পিছু নিয়ে আসছে ক্লাউস। ওয়ার্নারকে এক মুহূর্তের জন্যে চোখের আড়াল হতে দিতে রাজি নয়। সেবার অলিম্পিক জাম্পের সময় সুযোগ পেয়ে এমন একটি কাণ্ড করে বসেছিল ওয়ার্নার। ওরা দু'জনে মানুষের ভিড়ে মিশে স্কি জাম্পিং দেখছিল। ক্লাউস হঠাৎ আবিষ্কার করে ওয়ার্নারকে কাছে-পিঠে দেখা যাচ্ছে না। পরে জানা গেল, ব্রিজিত ওই অনুষ্ঠান দেখতে এসেছে কি না তা জানার জন্যে ওয়ার্নার চুপিচুপি তার সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছিল। ব্যাপারটা মোটেই ভাল লাগেনি ক্লাউসের। ওয়ার্নার এক সময় তার ভাল বন্ধু ছিল এ কথা অস্বীকার করে না ক্লাউস। তবে ব্রিজিতের ব্যাপারে ওকে তিল পরিমাণ বিশ্বাস করে না সে। অবশ্য এর মানে এ নয় যে, ওয়ার্নার ব্রিজিতের জন্যে যোগ্য পুরুষ ভেবে তাকে ভয় পাচ্ছে। ক্লাউসের চোখে ওয়ার্নার হলো রুক্ষ, গোঁয়ার স্বভাবের মানুষ। তার তুলনায় ক্লাউস নিজে অনেক হাসিখুশি, স্বতঃস্ফূর্ত। ব্রিজিত নিশ্চয়ই ওয়ার্নারের মত একটা গোঁয়ার গোবিন্দকে পছন্দ করবে না।

চেয়ারগুলো হঠাৎ সূর্যালোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, অন্ধকার অরণ্য এবং বরফ ঢাকা ঢাল ছাড়িয়ে উঠে এসেছে ওপরে। ওদের সামনে বেশ কিছু কুটির সহ হচ-ডুরাচের হোটেল দেখা যাচ্ছে, পাহাড় চুড়োর চোখ ধাঁধানো সাদা, ঝকঝকে নীল আকাশের পটভূমিতে জুড়িয়ে দিল নয়ন। অনেক লোক দেখতে পেল ওরা, বরফের গায়ে ঝলসে ওঠা কুঁজ বা ভাঁজের মত লাগছে, হাঁটার সময় ছোটখাট ঢালে হোঁচট খাচ্ছে।

চেয়ার থেকে নামার পরে অ্যাটেনড্যান্ট ওদের গা থেকে কম্বলগুলো খুলে নিল। তারপর চেয়ারের সারি ঘুরে, আবার দুলতে দুলতে যাত্রা শুরু করল নীচে, ডুরাচের দিকে।

ওয়ার্নার অপেক্ষা করল ক্লাউসের জন্যে, সে এলে দু'জনে রওনা হয়ে গেল আরেকটা ছোট লিফটের দিকে। এই লিফটে চড়ে ওরা বরফ ঢাকা বিশাল পাহাড়ের মাথায় চলে এল, তারপর শুরু করল স্কি। ফুরফুরে, তাজা বাতাসে নরম বরফের ওপর হিসহিস শব্দ তুলল দু'বন্ধুর স্কি, সূর্যের সোনালি রশ্মি ছুঁয়ে যেতে লাগল আনন্দে উজ্জ্বল দুই মুখ।

সারাটা সকাল ওরা পাহাড়ে স্কি করে কাটাল, বেশ কয়েকবার ছোট লিফটে উঠল সূর্যতাপ সরাসরি গায়ে লাগাবে বলে। ওদের হাসি-আনন্দ দেখে বোঝার উপায় নেই কখনও কখনও ওরা পরস্পরের চরম শত্রু হয়ে ওঠে। মুক্ত প্রকৃতির

সাথে মিশে গিয়ে ক্লাউস এবং ওয়ার্নার দু'জনেই ভুলে গেল বিগত কয়েক মাসের তিক্ত স্মৃতি, বরং ছেলেবেলার সোনালি দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করল বেশি-বেশি। সে একটা সময় ছিল যখন একজন অপরজনকে ছাড়া অন্য কাউকে, অন্য কিছুকে চিনত না। শৈশব আর কৈশোরের স্মৃতি আহরণে ব্যস্ত দুই বন্ধু একবারের জন্যেও ব্রিজিতের কথা মুখে আনল না। যেন ইচ্ছে করেই ভুলে থাকল তাদের সকল অশান্তির মূল মেয়েটার কথা।

আলপেন ব্লিক হোটেলে লাঞ্চ করল ওরা। হাতে বিয়ারের লম্বা গ্লাস নিয়ে টেরেসে, রোদে গিয়ে বসল। নানা জাতের, নানা ধরনের মানুষ দেখা যাচ্ছে এখানে। ডাচ, ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান, বেলজিয়ান, আমেরিকান...কে নেই?

'এমনকী অস্ট্রিয়ানরাও আছে!' হেসে উঠল ক্লাউস।

দু'একজন পরিচিত লোকেরও দেখা মিলল, তবে আলাপ জমাতে উৎসাহ বোধ করল না কেউই। তারচে' নিজেদের গল্পে ভালই বুঁদ হয়ে আছে দু'জনে।

লাঞ্চ শেষে আবার ডুরাচে ফিরে গেল ওরা বিশাল স্কি-লিফটে চড়ে। আবার স্কি করবে। মাত্র দু'দিনের ছুটিতে এসে স্কি করার মওকা স্রেফ কথা বলে নষ্ট করার মানে হয় না। এবার ওরা 'গ্রীন রান' ধরে ছুটল, আগের চেয়ে দ্রুত এবং দক্ষতার সাথে। স্কি করার লোকের অভাব নেই এখানে। বিশেষ করে যারা প্রথম স্কি করতে এসেছে তারা তো ইন্সট্রাক্টরদের পিছুই ছাড়তে চায় না। এদের কাজই হলো বেশিরভাগ ট্র্যাক দখল করে রাখা। ফলে ক্লাউস এবং ওয়ার্নার চাইলেও মনের মত ট্র্যাক ধরে স্কি করতে পারছে না। এই ব্যাপারটা নিয়ে যখন ক্ষোভ প্রকাশ করছিল ওয়ার্নার, ক্লাউস তাকে জানাল, 'আমরা কিন্তু আজকে আর স্কি করার বেশি সময় পাচ্ছি না। কারণ, লিফট বন্ধ হয়ে যাবে আর মিনিট দশেকের মধ্যে।'

'ধ্যাত্তেরি!' বিরক্তি প্রকাশ করল ওয়ার্নার। 'এ দেখছি শুরু করতে না করতেই শেষ হয়ে গেল।'

ওরা ট্র্যাকের এক কোণে দাঁড়িয়ে প্ল্যান করতে লাগল সন্ধ্যায় কী করা যায় তা নিয়ে। সিদ্ধান্ত নিল গোল্ডেন রোজের বারে সন্ধ্যা কাটিয়ে, ঘুমাতে যাবার আগে ঘণ্টাখানেক ইডেলওয়েসে নাচানাচি করলে মন্দ হবে না।

দুই বন্ধু কথা বলছে, এমন সময় একটা মেয়েকে দেখল স্কি করে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। মেয়েটি ওদের সাথে ইনসব্রাক স্কুলে পড়ত।

'আরে, অ্যানলিজ!' বলল ওয়ার্নার। 'তুমি এখানে জানতাম না তো!'

'না জানারই কথা,' শুকনো গলায় জবাব দিল মেয়েটা, 'তোমরা তো ব্রিজিতের কথাও জানো না।'

'ব্রিজিত? সে এখানে আসেনি। আসতে পারে না,' বলে উঠল ক্লাউস।

'খুব পারে। এই তো বিকেল বেলা ওকে দেখলাম তার কাজিনের মার্সিডিজে চড়ে আসতে।'

'ব্রিজিতের কাজিন? ভিয়েনার সেই বুড়োটা?' অবাক গলায় প্রশ্ন করল

ওয়ার্নার।

'বুড়ো? কাকে বুড়ো বলছ তুমি? বয়স একটু বেশি হলেও যথেষ্ট হ্যাণ্ডসাম লোকটা। তোমাদের চেয়ে তো বটেই।' ইচ্ছে করেই খোঁচাটা দিল অ্যান।

ব্রিজিতকে ঈর্ষা করে অ্যানলিজ। তার খুব ইচ্ছে ছিল ওয়ার্নার এবং ক্লাউসকে ভেড়া বানিয়ে রাখবে। কিন্তু বোকা দুটো ব্রিজিতের প্রেমে এমন পাগল যে অ্যানের দিকে ফিরেও তাকায় না। আর সেটাই অ্যানের গা জ্বলার কারণ।

কিন্তু ব্রিজিত এখানে এসেছে, ক্লাউস এবং ওয়ার্নার কেউই সেটা বিশ্বাস করতে পারছে না, ওরা অ্যানলিজের সাথে তর্ক করতে যাচ্ছিল, এক ধমকে ওদের চুপ করিয়ে দিল মেয়েটা। 'ব্রিজিত এসেছে। নিজের চোখে ওকে দেখেছি আমি,' আবার স্কি শুরু করতে যাচ্ছে অ্যান, পেছন থেকে ওকে ডাকল ওয়ার্নার।

'এক মিনিট! ব্রিজিত এখন কোথায়?'

'বার্গে। আজ রাতটা ওখানেই কাটাবে ওরা। তবে আলাদা রুমে ঘুমাবে শুনেছি।'

'বার্গ? সে তো হচ-ডুরাচে,' বিড়বিড় করল ক্লাউস। 'আর দুই-তিন মিনিটের মধ্যে লিফট বন্ধ হয়ে যাবে।'

হঠাৎ কটমট করে ওর দিকে তাকাল ওয়ার্নার। ব্যাটা কি হচ-ডুরাচে যাবার ফন্দি আঁটছে? ওখানে গিয়ে ব্রিজিতের সাথে ভাব জমানোর বুদ্ধি? উহুঁ, ওয়ার্নার বেঁচে থাকতে তা হতে দেবে না। অবশ্য ওরা নীচে পৌঁছুবার আগেই হয়তো লিফট বন্ধ হয়ে যাবে, আর চেয়ারগুলো শেষ রাউণ্ড ঘুরে আসবে শূন্য অবস্থায়, গেটও বন্ধ হয়ে যাবে। তখন হচ-ডুরাচে যেতে হবে বিপদ সঙ্কুল তিন মাইল রাস্তা ঠেঙিয়ে। অবশ্য ওয়ার্নার সে ভয়ে ভীত নয়। কারণ হাঁটতে হলে ক্লাউসের আগেই গন্তব্যে পৌঁছে যাবে সে। তার পা জোড়া বেঁটে ক্লাউসের চেয়ে শক্তিশালী এবং লম্বা।

ক্লাউসও একই বিষয় নিয়ে চিন্তা করছিল। তাই দেখা গেল অ্যানলিজ চলে যাবার পরপরই দু'জনে একটিও কথা না বলে হনহন করে অন্ধকার ট্র্যাক ধরে হাঁটা শুরু করে দিয়েছে। ওয়ার্নার দ্রুত হাঁটতে পারে বটে, কিন্তু শরীর ভারী বলে তার আগে ক্লান্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা বেশি।

ওরা নীচে এসে দেখল একটা পাইলন তখনও একটা চেয়ার-লিফট কেব্‌ল্ টেনে আনছে, অন্ধকারে ভূতের মত লাগছে দেখতে। চেয়ারগুলো দুলছে, হয়তো আরও কিছুটা সময় যাত্রী ছাড়াই চলতে থাকবে। ক্লাউসের মাথায় ঝট করে বুদ্ধিটা খেলে গেল। ওর মনে পড়ল ওয়ার্নার উচ্চতাকে ভীষণ ভয় পায়, পাহাড়ে চড়ার অভিজ্ঞতা তার নেই, ক্লাউসের আছে। ক্লাউস দ্রুত পাইলনের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে পড়ল, বিদ্যুৎগতিতে পা থেকে স্কি খুলে নিয়ে পাইলন বেয়ে উঠতে শুরু করল।

'ক্লাউস! করছ কী তুমি?' চেঁচিয়ে উঠল ওয়ার্নার। সে-ও দাঁড়িয়ে পড়েছে। ক্লাউস কী করতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে রাগ উঠে গেল মাথায়, এক ঝটকায় স্কি

খুলে ওপরে উঠতে শুরু করল। রাগের চোটে উচ্চতা-ভীতি চলে গেছে তার। ওয়ার্নার ওকে ধরার আগেই ক্লাউস খপ করে পাশ দিয়ে চলে যেতে থাকা একটা চেয়ারের কোণ ধরে ফেলল, শূন্যে একটা দোল খেয়ে উঠে বসল সীটে। চেয়ারটা ভীষণভাবে ঝাঁকুনি খেল। চেয়ারটা সোজা পাহাড়ের ওপর উঠে যাচ্ছে দেখে ঢোক গিলল ওয়ার্নার, কপালে ঘাম ফুটল, সামান্য ইতস্তত করে পাইলন বেয়ে আরও ওপরে উঠে এল সে, এক হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল পাশ দিয়ে যেতে থাকা আরেকটা চেয়ার। ক্লাউস জানে তার উচ্চতা-ভীতি আছে। হারামজাদা ইচ্ছে করে চেয়ার-লিফটে উঠেছে। ভেবেছে ওয়ার্নার ভয়েই ওতে উঠবে না। কিন্তু বেঁটে বাঁটুল তো আর জানে না ওয়ার্নার কী চিজ। ক্লাউস আগে চেয়ারে উঠেছে তো কী হয়েছে! সে তো এক চেয়ার পেছনেই আছে।

দোল খাওয়া চেয়ারে উঠতে গিয়ে আরেকটু হলে হাত পিছলে পড়ে যাচ্ছিল ওয়ার্নার। শক্ত মুঠিতে চেয়ারের একটা পাশ ধরে সীটের ওপর শরীরটাকে টেনে আনল সে। তার সামনে ক্লাউস, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল, গোধূলির আবছা আলোতেও দেখা গেল হিংস্র শ্বাপদের মত চোখ জ্বলছে তার। ওকে উদ্দেশ্য করে কী একটা গালি দিল ক্লাউস, বোঝা গেল না।

বিশাল গাছের অরণ্যের ভেতর দিয়ে শুধু দু'জন এগিয়ে চলেছে, ভাবলে কেমন শিরশির করে ওঠে গা। সন্দেহ নেই, গোটা ঢালে ক্লাউস এবং ওয়ার্নার ছাড়া অন্য কোন স্কিয়ার নেই। বিশাল, অন্ধকার বরফ রাজ্যে কাউকে স্কি করতে দেখা গেল না, সার বাঁধা চেয়ারগুলো শূন্যই থাকল।

দ্রুত, যেন লাফিয়ে নামতে শুরু করল আঁধার; শুধু নীচে ধবধবে সাদা বরফ এখনও উজ্জ্বল লাগছে চোখে, গাছগুলো ঢাকা পড়ে যাচ্ছে অন্ধকারে।

কেবলের সাথে ঝোলানো চেয়ারগুলো একটু পরে মাটি থেকে খানিক ওপরে চলে এল, দুই পাইলনের মাঝখানে একটা গভীর খাত পার হতে লাগল।

হঠাৎ দুটোরই চলার গতি ধীর হয়ে এল, তারপর থেমে গেল।

ক্লাউস এবং ওয়ার্নার ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করল চেয়ার-লিফট আবার চালু হবে সে আশায়। ওরা ভেবেছে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে থেমে গেছে লিফট। কিন্তু অনেকটা সময় পার হবার পরেও চেয়ারগুলো মূর্তির মত ঝুলে আছে দেখে ওরা বুঝতে পারল হিসেবে গোলমাল হয়ে গেছে। আজ রাতের মত বন্ধ হয়ে গেছে চেয়ার-লিফট সার্ভিস।

'যা, শালা!' ভাবছে ক্লাউস। 'এখন গলা ফাটিয়ে চিৎকার করা ছাড়া উপায় নেই।' পরক্ষণে ওর মনে পড়ে গেল লিফটের এই সেকশনের ধারে-কাছে কোন রাস্তা বা স্কি-রান নেই, চিৎকার করলেও লাভ হবে না।

'হয়তো কোন ইন্সট্রাক্টরের চোখে পড়ে যেতে পারি,' ভাবছে ওয়ার্নার। 'স্কি ক্লাস শেষে এদিক দিয়েই যেতে পারে সে।' তবে ওদেরকে এই অবস্থায় কেউ দেখতে পেলে দু'জনের কারও জন্যেই সুখকর হবে না বিষয়টি। কারণ, ওরা অবৈধভাবে লিফটে চড়ে গুরুতর অন্যায় করেছে। ধরা পড়লে দু'জনেরই মোটা

অঙ্কের জরিমানা হবে। সব বাঁটুলটার দোষ, দাঁত কিড়মিড় করল ওয়ার্নার। হঠাৎ ওর মনে পড়ে গেল খানিকটা সামনে একটা স্কি-রান রয়েছে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ক্লাউসকে ডেকে সে বলল, 'দু'জনে মিলে চিৎকার দিলে কেউ না কেউ অবশ্যই শুনতে পাবে।'

ক্লাউস রাজি হলো ওয়ার্নারের প্রস্তাবে। দু'জনে মিলে গলা ফাটিয়ে সাহায্যের জন্যে চেঁচাতে শুরু করল। কিন্তু চেঁচাতে চেঁচাতে গলা ব্যথা করাই সার হলো, কেউ শুনতে পেল না ওদের চিৎকার। যেসব স্টেশন আছে, সেগুলোর অবস্থান অনেক দূরে আর ঢেউ খেলানো পাহাড়ের সারি ওগুলোকে আড়াল করে রেখেছে।

ওয়ার্নার পেছন ফিরে দেখার চেষ্টা করল কাছের পাইলনটা কত দূরে, ওটা বেয়ে যদি নেমে পড়া যায়। কিন্তু পাইলনটা নাগালের বাইরে, অনেকটা দূরে

'তোমার পাইলনটা কি কাছে?' এক মুহূর্তের জন্যে রাগ ভুলে জানতে চাইল সে।

'বেশ দূরে, পাহাড়ের ওপর। তোমারটার নাগাল পাচ্ছ না?'

ওয়ার্নার মুখ তুলে লম্বা টিউবটাকে দেখল। ওটা কেব্‌লের সাথে চেয়ারটাকে সংযুক্ত করে রেখেছে। পিচ্ছিল আর বরফ ঠাণ্ডা হবার সম্ভাবনাই বেশি। আর কেব্‌ল্‌টা বেশ সরু, হাত কেটে যেতে পারে। কাজেই কেব্‌ল্ ধরে পাইলনের কাছে পৌঁছুবার চিন্তাটা নাকচ করে দিতে হলো ওয়ার্নারকে।

'কোন আশা নেই,' বলল সে চেঁচিয়ে।

তারপর দু'জনে চুপচাপ বসে রইল। কান পেতে শোনার চেষ্টা করছে কারও পায়ের শব্দটব্দ পাওয়া যায় কি না। কিন্তু স্থির প্রকৃতি পাথর হয়ে রইল, বিশাল আকাশ আর বরফ ঢাকা পাহাড় বিরাট শূন্যতা বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। হঠাৎ গাছের পাতা কেঁপে উঠল বাতাসে, গুঙিয়ে উঠল, ফিসফিস করল, চেয়ারগুলোর পাশ দিয়ে পাক খেতে খেতে চলে গেল। আবার নিঝুম হয়ে গেল চারদিক, অসহ্য নীরবতা নেমে এল আগের মত হিম শীতল প্রকৃতিতে।

'আবার শুরু করো!'

ভেঙে খান খান হয়ে গেল নীরবতা ওদের হেঁড়ে গলার চিৎকারে। কিন্তু এল না কোন প্রত্যুত্তর।

গায়ে কম্বল জড়ানো থাকলেও স্কিয়াররা শীতে ঠক-ঠক করে কাঁপতে থাকে, আর এই মুহূর্তে ওদের কারও গায়ে কম্বল নেই। ফলে শীতে জমে যাবার অবস্থা হলো দু'জনেরই। যত সময় যাচ্ছে ঠাণ্ডা যেন ততই বেড়ে চলেছে। আর নিস্তব্ধতা শীতের চেয়েও বেশি কাবু করে দিচ্ছে ওদেরকে।

ক্লাউস নীচের দিকে তাকাল। ঢালটা খুব বেশি দূরে নয়। আর ওখানে দুই-তিন ফুট বরফ থাকার কথা। সে যদি তার কোট আর জার্সি দিয়ে দড়ি বানাতে পারে তা হলে ওটা বেয়ে নীচে নামতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না। তবে কোট আর জার্সি ছাড়া ও শীতে জমে যেতে পারে। অবশ্য নড়াচড়ার মধ্যে থাকবে বলে ঠাণ্ডা অতটা না-ও লাগতে পারে। গভীর বরফে স্কি ছাড়া হাঁটা মুশকিল। কখন

সাহায্য আসবে তার আশায় থেকে জমে বরফ না হয়ে এটা করা বরং বেশি বুদ্ধিমানের কাজ হবে। ক্লাউস কোট খুলে ফেলল, একটা হাতা দিয়ে চেয়ারের একটা কোণে বাঁধল, তারপর জার্সি খুলে কোটের অন্য হাতার সাথে গিঁঠ দিল। জিনিসটা ওর ভার সইতে পারবে তো? নাকি গিট্ঠু খুলে যাবে? কিম্ভূত দড়িটা টেনেটুনে দেখল ক্লাউস। শেষে সন্তুষ্ট হলো। না, জিনিসটা শক্ত হয়েছে মনে হচ্ছে। কোট আর জার্সি ছাড়া ক্লাউসের প্রায় দাঁত কপাটি লেগে গেল ভয়ানক হিমে। এত দ্রুত শরীর ঠাণ্ডা হয়ে আসছে যে সে ভয়ই পেয়ে গেল।

ওয়ার্নার পেছন থেকে ক্লাউসের নড়াচড়া সন্দেহের চোখে লক্ষ করছিল। অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছিল না ক্লাউস কী করছে। সে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল। শেষে আসল ব্যাপারটা ধরতে পেরে আঁতকে উঠল ওয়ার্নার।

'ওরে, শালা!' হিস হিস করে উঠল সে। 'তুমি তা হলে দড়ি বানিয়ে নেমে পড়ার তাল করছ যাতে ব্রিজিতের কাছে আগে পৌঁছানো যায়!' ওয়ার্নার দম বন্ধ করে ক্লাউসের কাণ্ডকারখানা দেখতে লাগল।

ক্লাউস দড়ি বেয়ে নামতে শুরু করেছে, হাতের মুঠিতে জিনিসটা পিছলে যেতে চাইছে। টের পেল খুলে যাচ্ছে গিঁঠ। এখনই লাফ না দিলে উপায় নেই। জমিন বোধহয় খুব একটা দূরে নয়।

নিজেকে খসে পড়ে যেতে দিল ক্লাউস। তবে মহা পতন শুরু হলো ওর। পড়ছে তো পড়ছেই। মাটি তো এত দূরে থাকার কথা নয়! প্রচণ্ড জোরে বাড়ি খেল ক্লাউস শক্ত পাথরের গায়ে, শরীরের সবগুলো হাড় ভেঙে চুরচুর হয়ে গেল, ব্যথার তীব্র একটা ঢেউ গ্রাস করল ওকে, সেই সাথে ছিনিয়ে নিল চেতনা।

ওয়ার্নার ওকে পড়ে যেতে দেখল, পাথরের সাথে সংঘর্ষের বিশ্রী 'থ্যাচ' শব্দটাও কানে এল। তারপর পাঁচ মিনিট কিছুই শুনতে পেল না সে। অবশেষে স্থির বাতাসে ভেসে এল অমানুষিক এক গোঙানির আওয়াজ, উঁচু এবং সরু গলায় কাতরানোর শব্দ। ওয়ার্নারের গায়ের রোম খাড়া হয়ে গেল।

জ্ঞান ফিরে পাবার পরে ক্লাউস বুঝতে পারল তার দুটো পা-ই জনমের মত ভেঙেছে, পাঁজরের একটা হাড়ও বোধহয় আস্ত নেই। সে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেই পায়ের ভাঙা হাড়ে খট্ শব্দ উঠল, প্রচণ্ড ব্যথায় চোখে লাল-নীল তারা ফুটল। ওয়ার্নারের মত গোঙানির আওয়াজ সে-ও শুনল, তবে প্রথমে বুঝতেই পারল না গোঙানিটা আসলে তার গলা থেকেই বেরিয়েছে। নিজের অবস্থান সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন হয়ে ওঠার পরে ক্লাউস তারস্বরে ডাকতে শুরু করল ওয়ার্নারকে সাহায্যের জন্যে।

'ওয়ার্নার! ওয়ার্নার! বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও!' কিন্তু ভয়-আতঙ্ক এবং ঘৃণা নিয়ে ওয়ার্নার পাথর হয়ে বসে থাকল নিজের জায়গায়, বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে সাদা বরফের গায়ে চিৎ হয়ে পড়ে থাকা ছায়ামূর্তিটির দিকে। তার দাঁতে ঠকাঠক শব্দ হচ্ছে।

ওই অবস্থার জন্যে ক্লাউস নিজেই দায়ী! মনে মনে ওকে গালি দিল ওয়ার্নার।

ও-ই ব্রিজিতের কাছে যাবার জন্যে ফাল দিয়ে উঠেছিল, মাতব্বরী করে আবার লিফটেও উঠে পড়েছিল, ওর কারণে ওয়ার্নারকেও বিপদে পড়তে হয়েছে। তারও এখন জীবন-সংশয় দেখা দিয়েছে। কারণ, তাকেও সাহায্য করার কেউ নেই। এত মাতব্বর ক্লাউস, তো যাক না নিজে নিজে রাস্তায় গিয়ে উঠুক?

রোমহর্ষক গোঙানির আওয়াজ একবার চড়া হলো, আবার ম্লান শোনাল, ভৌতিক এবং গা ছমছমে। বারবার চলতে লাগল এভাবে।

'চুপ! চুপ!' খেঁকিয়ে উঠল ওয়ার্নার।

কিন্তু ওয়ার্নারের ধমক শুনতে পায়নি ক্লাউস। ভয়াবহ ঠাণ্ডা বাতাস তার পাতলা শার্ট ভেদ করে ভাঙা হাড়ে ধারাল বর্শার মত খোঁচা দিতে শুরু করেছে। আহত স্থান থেকে বেরিয়ে আসা রক্ত ইতিমধ্যে জমাট বেঁধে গেছে, আর রক্ত বেরুচ্ছে না। সীমাহীন ব্যথার স্রোত একের পর এক ধাক্কা মারছে ওকে, গলা দিয়ে একটানা গোঙানি বেরিয়ে আসছে। আস্তে আস্তে ম্লান এবং অস্পষ্ট হয়ে এল আওয়াজটা।

টানা এক ঘণ্টা গুঙিয়ে চলল ক্লাউস ক্লান্ত গলায়। তারপর একটা সময় আর কোন শব্দ শোনা গেল না। সেই ভৌতিক নিস্তব্ধতা আবার ফিরে এল বরফ ভূমিতে। বড্ড সুনসান, খুব বেশি নীরব চারদিক, ওয়ার্নার মনে প্রাণে চাইল আবার যেন গুঙিয়ে ওঠে ক্লাউস। কিন্তু আর গোঙানির শব্দ শোনা গেল না।

ওয়ার্নার এখন একা। ক্লাউস ওকে একা রেখে চলে গেছে। অথচ ক্লাউস ওর বন্ধু ছিল। এই তো কয়েক ঘণ্টা আগেও বন্ধুর মত কত কথা বলেছে ওরা, কত কিছু করেছে। এখন ক্লাউস নেই। ওকে ফেলে রেখে চলে গেছে একা।

ব্রিজিতের আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী রইল না, হঠাৎ কথাটা মনে হলো ওয়ার্নারের। রইল শুধু কাজিনটা।

চুপচাপ বসে রইল ওয়ার্নার গা হিম করা ঠাণ্ডার মধ্যে, বরফের ওপর পড়ে থাকা স্থির ছায়ামূর্তিটার দিকে তাকিয়ে আছে। ওকেও তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যেতে হবে: বোকার মত বসে থেকে লাভ নেই। কেউ ওর সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসবে না।

বার দুই ওপরের দিকে মুখ তুলে চাইল ওয়ার্নার, কেব্‌ল্‌টার দূরত্ব সম্পর্কে ধারণা পেতে চাইল। তার ধরে ঝুলে ঝুলে ওকে পাইলনের কাছে পৌঁছুতে হবে। তবে আগে হাত দুটো গরম করে নেয়া দরকার। ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া হাত দিয়ে সে কিছুই করতে পারবে না। বেশি মাতব্বরী করতে গেলে পড়ে যেতে হবে ক্লাউসের মতই। সে হাত দুটো কোলের মধ্যে রাখল। নড়াচড়া করা যাবে না। তা হলে শরীরের তাপ দ্রুত ক্ষয় হয়ে যাবে। কাজেই বসে থাকো চুপচাপ।

আবার ছায়াটার দিকে তাকাল ওয়ার্নার। ওভাবে দড়ি বেয়ে নামা আর আত্মহত্যার চেষ্টা করা একই কথা। ওকে ওপরে উঠতে হবে। কেউ এদিকে আসলে আসতেও পারে। কে জানে চেয়ারগুলো হয়তো আবার স্টার্ট হয়ে যেতে পারে, ওকে সরিয়ে নিয়ে যাবে এখান থেকে, বরফের ওপর পড়ে থাকা ছায়াটার

কাছ থেকে সরিয়ে নেবে দূরে। ওয়ার্নারের প্রচণ্ড শীত করছে। হাড় জমে যাচ্ছে। দাঁতে দাঁত লেগে আরও বেশি ঠকঠক শব্দ হচ্ছে। কিন্তু ওর নড়তে ইচ্ছে করছে না। জানে নড়াচড়া করলে ঠাণ্ডাটা ওকে আরও বেশি পেয়ে বসবে। তারচে' চুপচাপ বসে থাকাই ভাল।

বেচারা ক্লাউস।

ক্লাউসের জন্যে হঠাৎ ওর খুব দুঃখ হতে লাগল। ব্রিজিতকে না-ই বা পেলাম, ভাবছে ওয়ার্নার, ক্লাউস বেচারা যদি বেঁচে থাকত!

আকাশে সবগুলো তারা ফুটে গেছে, যেন পাহাড়চুড়ো থেকে নেমে আসছে নীচে, গাছের মাথা ছুঁইছুঁই করছে। শীতটা আরও বেশি জেঁকে বসতে শুরু করেছে, শরীরের কাঁপুনি ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না কোনমতে। নিজেকে চোখ রাঙাল ওয়ার্নার। নড়াচড়া বন্ধ। চুপচাপ বসে থাকো। যতই নড়বে ততই শরীরের উত্তাপ হারাবে। কাজেই স্থির হয়ে থাকো।

পাহাড়চুড়োয় সবার আগে গিয়ে পৌঁছুল ওয়ার্নার। সকাল হতে লিফটও চলতে শুরু করল। হচ-ডুরাচের অ্যাটেনড্যান্ট দিনের শুরুতেই একজন যাত্রীকে দেখে খুবই অবাক হলো। লিফট চালু হবার দশ মিনিটের মধ্যে কোন প্যাসেঞ্জার আসতে দেখেনি সে এতদিন। প্যাসেঞ্জার চেয়ার-লিফটে চড়ে যত কাছে আসতে লাগল ততই অ্যাটেনড্যান্টের বিস্ময় বাড়তে লাগল। আরোহী নীল চোখ মেলে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। অ্যাটেনড্যান্ট ভয়ানক শক খেল যাত্রীর হাত ধরে তাকে চেয়ার থেকে নামাতে গিয়ে। হাতটা পাথরের মত শক্ত হয়ে আছে।

ব্রিজিত ইনসব্রাকে ফিরেই তার কাজিনকে বিয়ে করে ফেলল। অবশ্য আর কাউকে বিয়ে করার কথা সে কস্মিনকালেও ভাবেনি।

মূলঃ ডায়ানা বাটেনশ

খেলা

ম্যানহাটনের নতুন ফ্ল্যাট বাড়িটাতে আসার প্রায় বছরখানেক পর একটা আইডিয়া এসেছে জেনিফারের মাথায়। আজ রাতেও বাবা-মা বাড়িতে থাকবেন না, পার্টিতে যাবেন। কাজেই চমৎকার সময় পাওয়া যাবে ওদের ফ্ল্যাটের অপজিটে, মোনা টাওয়ারের ছ'তলার ওই দম্পতিকে পর্যবেক্ষণ করার।

জেনিফারকে সবাই বোকা ভাবে। সবার ধারণা ওর মাথায় বুদ্ধিশুদ্ধির বালাই নেই, খালি গোবর পোরা। কিন্তু অতটা বোকা জেনিফার আদৌ নয়। বোকা হলে কি এমন চমৎকার একটা পিপ-শো দেখার বুদ্ধি বার করতে পারত? গোটা ব্যাপারটাই মজাদার একটা খেলা জেনিফারের কাছে। আর ওর খেলার অনুষঙ্গ হলো মানুষ। মানুষকে সার্কাসের পুতুল বানিয়ে, নিজেকে পাপেট মাস্টার ভেবে দারুণ পুলকিত হয় জেনিফার। নিজেকে প্রায় ঈশ্বরের সমকক্ষ মনে হয়।

জেনিফারের বাবা-মা বাইরে যাবার জন্যে রেডি হচ্ছেন। একমাত্র বড় ভাইটা রোজকার মত টাংকি মারতে গেছে সেই মেয়েটার কাছে। মেয়েটা হোস্টেলে থাকে। জেনিফার ঠিক করেছে, আর আধ-ঘণ্টার মধ্যে ঘরের বাতি নিভিয়ে পর্দাটা টেনে দেবে। তার পুতুলগুলো যদি বাড়িতে থাকে, তা হলে খেলা শুরু হতে বেশি সময় লাগবে না।

জেনিফাররা যখন প্রথম এ ফ্ল্যাটে এল, ফ্ল্যাটটির ব্যাপারে তেমন আগ্রহ দেখায়নি। আসলে সে তার আঠারো বছরের জীবনে এত বেশিবার বাসা বদল করেছে যে ব্যাপারটাতে তার ঘেন্না ধরে গেছে। একটা বাড়িও তার মনের মত হয়নি। সবগুলোই নোংরা এবং অনাকর্ষণীয় মনে হয়েছিল। এ বাড়িটাও আগেরগুলোর মতই। কিন্তু কিছুদিন যেতে জেনিফার টের পেল এখানে ব্যতিক্রমধর্মী কিছু জিনিস আছে। জেনিফারের বাবা একটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির পারচেজ ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার। ধাপে ধাপে তাঁর পদোন্নতি হয়েছে। আর সেই সাথে স্ট্যাটাস বজায় রাখার খাতিরে চলেছে বাসা বদল। সব শেষে ঠাঁই নিয়েছেন আকাশ ছোঁয়া এই অট্টালিকাতে।

জেনিফারের নামটি সুন্দর হলেও দেখতে সে সুন্দরী নয় মোটেই। ভয়ানক মোটা ও। ভোঁতা চেহারাটা অভিব্যক্তিহীন। কোটর ছেড়ে চোখ জোড়া ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। মাথায় জট পাকানো চুল। শরীরের কোথাও কোন বাঁক নেই। জেনিফারের পা দুটো হাতির মত, হাত জোড়া থলথলে, মাংসল। লোকে বলে, জেনিফার অ্যাবনরমাল। শরীর বেড়েছে ঠিকই, মন মানসিকতা এখনও শিশুর মতই রয়ে গেছে। কিন্তু ওরা জেনিফারকে ঠিক চিনতে পারেনি। ওর মস্তিষ্কে সামনের বিল্ডিং-এর মানুষ দুটোকে নিয়ে যে খেলার পরিকল্পনা চলছে, জানতে

পারলে ওরা নির্ঘাত চমকে যেত। জেনিফার নিজেকে অনেকের চেয়ে বুদ্ধিমতী ভাবে।

বেশ কিছুদিন আগে, এক সন্ধ্যাবেলার ঘটনা ছিল সেটা। সেদিনও জেনিফারকে তার বাবা-মা একা ঘরে তালা মেরে রেখে গেছেন। জেনিফারকে কখনওই বাবা-মা বাইরে নিয়ে যান না লোকের সামনে অপদস্থ হবার ভয়ে। জেনিফার যখন আরও ছোট ছিল তখনও অবশ্য বাবা-মা ওকে একা রেখে কোথাও যেতেন না। একবার ওকে একা বাড়িতে রেখে যাওয়ায় জানালার পর্দায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল ও। টিভিতে কী একটা ছবিতে এরকম আগুনের দৃশ্য দেখার পর জেনিফারের খুব লোভ জাগে খেলাটা খেলতে। খেলাই তো! জেনিফারের কাছে স্রেফ নির্জলা আনন্দ ছাড়া কিছু নয়। ভাগ্যিস সেবার মিসেস প্যাকমান পাশের বাড়িতে ছিলেন। কাপড় পোড়া গন্ধ পেয়ে ঘরে ঢুকে তিনি দেখেন জানালায় আগুনের শিখা দাউদাউ করছে আর তাঁর হাবাগোবা মেয়েটা আনন্দে হাততালি দিচ্ছে। আগুন নেভাতে দমকল ডাকতে হয়েছিল। আর জেনিফার খেয়েছিল প্রচণ্ড মার। সেই জেদে জেনিফার তাঁর মা'র শখের কয়েকটা কবুতরের বাচ্চা (তিনি ব্যালকনিতে কবুতর পুষতেন) ফেলে দিয়েছিল নীচে। মা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলেন কি না, কে জানে। তবে জেনিফারকে কিছু বলেননি। হিতে বিপরীত হবার ভয়েই হয়তো শাসন করেননি। আর তাতে জেনিফার মজা পেয়ে গেল আরও। বাবা একবার বাজার থেকে বেশ কতগুলো মুরগির বাচ্চা এনেছিলেন। ভাইয়ার তখন অসুখ। গায়ে জোর হবে বলে মুরগির সুপ খেতে বলেছিলেন ডাক্তার। মুরগির বাচ্চাগুলোকে আদর করছিল জেনিফার। ওদের গা বেশ গরম ঠেকছিল ওর কাছে। জ্বর হয়েছে ভেবে সব ক'টা বাচ্চাকে ওদের ডীপ ফ্রিজে পুরে রেখেছিল জেনিফার। ভেবেছিল ঠাণ্ডায় জ্বর কমে যাবে। হায় হায়! সকালে ফ্রিজের মধ্যে মরে শক্ত হয়ে যাওয়া মুরগির বাচ্চা দেখে সে কী কাণ্ড! ভাইয়া জ্বর শরীর নিয়ে বকতে বকতে প্রচণ্ড এক চড় বসিয়ে দিয়েছিল জেনিফারের গালে। উঃ, মা! হাত ছোঁয়ালে গালটা এখনও টনটন করে ওঠে ব্যথায়। ভাইয়ার ওপর ঘেন্না ধরে যায় জেনিফারের তখন থেকে। তারপর সেবার যে ভয়ানক বন্যা হলো, শহর ডোবে ডোবে অবস্থা, জেনিফাররা তখন যেখানে থাকে, সেখানে বন্যার্ত মানুষের সাহায্যে এসেছিল একদল লোক। জেনিফার তার ভাইয়ার সব জামা কাপড় দিয়ে দিয়েছিল ওই লোকগুলোকে। এমনকী নতুন কেনা জিন্স প্যান্টটা পর্যন্ত। ঘরে ফিরে ভাইয়া জেনিফারকে এই মারে তো সেই মারে! ছেলেমানুষ, না বুঝে কাজটা করে ফেলেছে; বলে মা অনেক কষ্টে সেদিন ফিরিয়েছেন ভাইয়াকে।

এসব অনেক আগের ঘটনা। এখন জেনিফার অনেক বড় হয়ে গেছে। আগের মত আর দুষ্টুমি-ফাজলামি করতে গিয়ে কোন অঘটন ঘটায় না। কিন্তু তারপরও সারাক্ষণ ওকে একা বসে থাকতে হয় ঘরে। প্রতিবাদ করে লাভ হবে না জেনে জেনিফার এতদিন নীরব থেকেছে। কিন্তু ম্যানহাটনের এই বাড়িতে আসার পরে যেদিন বিপরীত দিকের অ্যাপার্টমেন্টের মানুষ দু'জনকে নিয়ে চমৎকার এক

বুদ্ধি ফাঁদল সে, তারপর থেকে বেশ উত্তেজনার মাঝে কেটে যাচ্ছে সময়।

জেনিফারের শোবার ঘর থেকে মোনা টাওয়ারের দম্পতির ফ্ল্যাট স্পষ্ট দেখা যায়। বোঝাই যায় ওরা খুব ধনী। ওদের দুটো গাড়ি, লক্ষ করেছে জেনিফার। আর মাঝে মাঝেই বাড়িতে কোন না কোন পার্টি থাকে। জেনিফার এটাও লক্ষ করেছে ওই দম্পতির শোবার ঘর কিংবা ড্রইংরুমের পর্দা কখনও টানা থাকে না। ওরা হয়তো জানেও না জেনিফার নামের একটা মেয়ে ওদেরকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। বিশেষ করে গা জ্বলা গরমের এই সময়টাতে দখিনা বাতাসের লোভেই হয়তো ওরা জানালাগুলো খুলে রাখে।

জেনিফারের ঘর থেকে মোনা টাওয়ারের বেশ ক'টা ফ্ল্যাট পরিষ্কার দেখা যায়। একবার চারতলায় দুই মহিলাকে বিকট মুখভঙ্গি করে ঝগড়া করতে দেখেছিল সে। পাঁচতলায় এক গণ্ডা বাচ্চাকাচ্চা আর বৌকে নিয়ে থাকে এক রাশান। পুতুল পুতুল বাচ্চাগুলোকে দেখলেই জেনিফারের খামচে দিতে ইচ্ছে করে।

ছয়তলার দম্পতিদের দিকে নজর আটকে যায় জেনিফারের। সেই রাতে ওই দম্পতির বাসায় জম্পেশ কোন পার্টি ছিল। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই দেখতে আকর্ষণীয়। দু'জনেই বেশ লম্বা। মেয়েটি সবুজ রঙের একটি দামী ড্রেস পরেছিল। ফর্সা রঙের সাথে মানিয়ে গিয়েছিল বেশ। আর ছেলেটির পরনে ছিল কমপ্লিট স্যুট। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল দু'জনেই, হাত নেড়ে বিদায় জানাচ্ছিল ধোপ দুরস্ত পোশাক পরা আমন্ত্রিত মেহমানদেরকে।

অতিথিরা চলে যাবার পর ওরা দু'জনে এসে ঝুল-বারান্দায় বসে। ছেলেটি একটি সিগারেট ধরায়। মেয়েটির হাতে ছিল সোনালি তরল পদার্থ ভরা একটি গ্লাস, সম্ভবত হুইস্কি। ওরা কী যেন বলছিল আর খুব হাসছিল। তারপর মেয়েটি প্রবলভাবে মাথা নেড়ে আপত্তি জানায়। কিন্তু ছেলেটি তার কথা না শুনে মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরে এবং চুমু খেতে শুরু করে। একটু পরে মেয়েটিও সাড়া দেয়।

প্রবল অস্বস্তি নিয়ে দৃশ্যটা দেখছিল জেনিফার। একই সাথে তার শরীরের ভেতর জাগছিল উত্তেজনা এবং রাগ। ওরা দু'জনেই অত্যন্ত আকর্ষণীয়, সন্দেহ নেই। তাই বলে খোলামেলা জায়গায় এত বেশি খোলামেলা আচরণ বরদাশত করা যায় না। জেনিফারের গলা শুকিয়ে গিয়েছিল যখন দেখল ছেলেটা প্রায় পাঁজাকোলা করে মেয়েটিকে ঘরের ভেতর নিয়ে গেল। ওদের বেডরুমে আলো জ্বলছিল। ছেলেটি এবার মেয়েটির ইভনিং ড্রেসের শোল্ডার স্ট্র্যাপ খুলে ফেলে, বেরিয়ে পড়ে ফর্সা অনাবৃত কাঁধ। মেয়েটি ছেলেটিকে হেসে হেসে কী যেন বলে। ছেলেটি এগিয়ে যায় জানালার দিকে। ফেলে দেয় ভারি পর্দা।

তারপর থেকে জেনিফারকে পেয়ে বসে অদ্ভুত এক নেশায়–ওই দম্পতিকে প্রতিদিন দেখা চাই। এখন তো ব্যাপারটা রীতিমত অবসেশনে পরিণত হয়েছে। জেনিফার এখন ওই দম্পতির আদ্যোপান্ত সব জানে। ছেলেটির নাম

ড্যানিস হুইটলি। সে একটি বিদেশী ব্যাংকের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। মেয়েটি মারিয়া শ্রিভার। এক সিনেটরের মেয়ে। মারিয়া জেনিফারের চেয়ে মাত্র বছর তিনেকের বড়। আর এ কারণেই মারিয়াকে ঘৃণা করতে শুরু করে জেনিফার। কারণ, মারিয়া অনেক সুন্দরী, অনেক কম বয়স, অনেক ধনী এবং অনেক হ্যাণ্ডসাম এক স্বামীর স্ত্রী। সে তুলনায় জেনিফার কী? কী আছে তার? ঈশ্বর তাকে কী দিয়েছেন? কিছুই না। অথচ মারিয়া সব পেয়েছে বেশি-বেশি। খুব বেশি। এত বেশি পাওয়া উচিত হয়নি তার। মারিয়ার সুখ, তার সুখের সংসার জেনিফারের বুকে জ্বালা ধরায়। একই সাথে ঘৃণা হয় তার ড্যানিস হুইটলির প্রতি। কেন ড্যানিস হুইটলি তার জীবনে এল না? কেন মারিয়া তার জীবনসঙ্গিনী হলো? অর্থহীন যুক্তি। অন্তত সাধারণ মানুষের কাছে। কিন্তু জেনিফারের কাছে নয়। জেনিফার তার ভাইয়ের প্রেমিকাকেও সহ্য করতে পারে না। জানে হোস্টেলের ওই মেয়েটাকেই ভাইয়া বিয়ে করবে। অথচ সে বিয়েতে তাকে যেতে দেয়া হবে না। যদি কোন অঘটন ঘটিয়ে ফেলে জেনিফার, তখন?

এত বৈষম্য মেনে নিতে পারে না জেনিফার। সবাই যেন তাকে নিয়ে খেলা করছে। সে যেন একটা পুতুল। কদর্য, বোকা একটা পুতুল। যাকে দেখলেই হাসি পায়। জেনিফার বুঝতে পারে সব। মনে মনে হাসে। সিদ্ধান্ত নেয় সে-ও ওদেরকে নিয়ে খেলবে।

জেনিফার হুইটলি দম্পতির কাছে প্রথম চিঠিটি পাঠাল ওদেরকে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করার ছয় হপ্তা পর। চিঠিটি লেখার আগে বহুবার ভাবতে হয়েছে তাকে। কতবার যে কাগজ ছিঁড়েছে! তারপর গোটা গোটা অক্ষরে, যতটা পরিষ্কারভাবে প্যারা যায়, লিখল সে: 'মি. হুইটলি, আপনি যখন বাইরে থাকেন, জানেন আপনার স্ত্রী তখন কী করে? ওকে নিয়ে পড়শীরা নানা কথা ছড়াতে শুরু করেছে।' জেনিফার ঠিকানা লিখল: মি. ড্যানিস হুইটলি। ৬/বি মোনা টাওয়ার, ম্যানহাটন, নিউ ইয়র্ক। বাবা-মা বাইরে, এরকম সুযোগে নীচের লেটার বক্সে চিঠিটা ফেলে দিয়ে এল জেনিফার।

ফলাফল হলো সন্তোষজনক। সেদিও হুইটলি দম্পতি পার্টির আয়োজন করেছে, খাওয়া-দাওয়ার পর যথারীতি সবাই চলে গেলে ওরা দু'জন ঝুল-বারান্দায় এসে সেই আর্ম-চেয়ার দুটোতে বসল। একটু পরে হুইটলি জেনিফারের চিঠিটি পকেট থেকে বের করে স্ত্রীর হাতে দিল। হাসছে সে, তবে জেনিফার স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, হাসিটা খুব একটা আন্তরিক নয়। মারিয়া চিঠি পড়ছে। হুইটলি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে আছে, লক্ষ্য করছে প্রতিক্রিয়া। ভ্রূ কুঁচকে উঠল মারিয়ার। সুন্দর দুই টানা ভ্রূর মাঝখানে কপালের ভাঁজটাও নিখুঁত দেখতে পেল জেনিফার বিনকিউলারে চোখ লাগিয়ে। শক্তিশালী এই বিনকিউলারটা বাবা তার জন্মদিনে গিফট দিয়েছিলেন। এতদিন পরে যথার্থ কাজে ব্যবহার হচ্ছে যন্ত্রটা। এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল মারিয়া, তারপর হেসে ফেলল। হাসি ফুটল না হুইটলির মুখে। কী যেন বলল সে স্ত্রীকে। প্রথমে শান্তভাবে কথা বলল দু'জনেই,

তারপরই উত্তপ্ত হয়ে উঠল পরিবেশ। উত্তেজিত হয়ে উঠছে মারিয়া এবং হুইটলি। মারিয়ার কী একটা কথায় হুইটলি এমন রেগে গেল যে ঠাস করে চড় বসিয়ে দিল স্ত্রীর গালে। মুখে হাত-চাপা দিল মারিয়া, মুখ গুঁজল চেয়ারের হাতলে, থেকে থেকে কেঁপে উঠল পিঠ। হুইটলি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল স্ত্রীর পেছনে। এত বেশি সময় যে জেনিফারের আর দেখার ধৈর্য থাকল না। চেয়ে থাকতে থাকতে ব্যথা হয়ে গেছে চোখ। তা ছাড়া মা-বাবা ফেরার সময়ও হয়ে গেছে। ওরা এসে যদি দেখেন জেনিফার জেগে আছে এখনও, খুব রাগ করবেন। আজ অবশ্য তাড়াতাড়িই বিছানায় গেল জেনিফার। সন্তুষ্ট মন নিয়ে।

মাসখানেক পর জেনিফার ফোন করল হুইটলিকে। এমন কিছু কথা বলল যে মারিয়ার সাথে ঝগড়া বাধানোর জন্যে তা ছিল যথেষ্ট। জেনিফার প্রফুল্ল মন নিয়ে দেখল ফোনে কথা বলার পর হুইটলি মারিয়াকে রেগে রেগে কী যেন বলল। মারিয়া চোখে জল নিয়ে দৌড়ে বেরোল ড্রইংরুম থেকে, ঢুকল বেডরুমে। পেছনে দরজা বন্ধ হলো সশব্দে। দরজা বন্ধের শব্দ এখান থেকে শোনা না গেলেও জেনিফার কল্পনায় ভেবে নিয়েছে তা-ই।

মাস দুই পর আবার কাজে লাগল জেনিফার। অপজিট ফ্ল্যাটের দম্পতিদের সাংসারিক অশান্তি উস্কে দেয়া যাচ্ছে ভালভাবেই। ওরা রুটিন মাফিক এখনও ঝুল-বারান্দায় বসে বটে, কিন্তু দু'জনের মধ্যে কোনই কথা হয় না। হুইটলি খবরের কাগজ পড়তে থাকে। মাঝে মাঝে হাতের কাপে চুমুক দিয়ে চা বা কফি পান করে। আর মারিয়া নিজেকে ডুবিয়ে রাখে বইয়ের মাঝে।

একদিন, বেশ উত্তেজনাকর একটি ঘটনার সূত্রপাত হলো। অন্তত জেনিফারের কাছে ঘটনাটা উত্তেজনা বয়ে আনল। ওই দিন সন্ধ্যার পরে, মিসেস হুইটলির বাড়িতে নতুন এক লোকের আগমন ঘটল। মারিয়ার মুখোমুখি ড্রইংরুমের সোফায় বসল লোকটি। দু'জনের মাঝে দূরত্ব যদিও খানিকটা ছিল, কিন্তু জেনিফার স্পষ্ট বুঝতে পারছিল লোকটি মারিয়াকে গদগদ কণ্ঠে কী যেন বলে ভজাতে চেষ্টা করছে। সম্ভবত তার গুণকীর্তন করছে; মারিয়াও বেশ মজা পাচ্ছে, উপভোগ করছে অতিথির সান্নিধ্য। হুইটলির উপস্থিতি লক্ষ করা যাচ্ছে না ধারে কাছে কোথাও। তার মানে এখনও সে ফেরেনি অফিস থেকে। তারপর থেকে প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যার পরে লোকটি নিয়মিত হাজিরা দিতে থাকল ওই বাসায়। বেশিরভাগ সময় ওদের মাঝে কোন কথা হয় না, শুধু চোখে চোখে চেয়ে থাকা। জেনিফার লক্ষ করেছে হুইটলিদের বাসায় কাজের লোকের বালাই নেই। মারিয়া একাই সব কাজ করে। অবশ্য এতে মেয়েটার সুবিধেও হয়েছে। পরকীয়া (শব্দটির সাথে জেনিফার পরিচিত) চালিয়ে যেতে পারছে স্বচ্ছন্দে।

একদিন লোকটা চলে যাবার জন্যে উঠেছে, মারিয়া তাকে 'গুডবাই' জাতীয় কিছু বলল। জেনিফার চাপা উল্লাস নিয়ে দেখল লোকটা মারিয়ার হাত চেপে ধরেছে এবং ওকে চুমু খেতে মুখ নামাচ্ছে। মারিয়া সামান্য ধস্তাধস্তি করল নিজেকে ছাড়াতে। তবে জেনিফার হলফ করে বলতে পারে তার মধ্যে শক্তি

প্রয়োগের কোন ব্যাপার ছিল না। বরং লোকটিকে আরও উস্কে দেয়া হলো। দু'জনের মুখ অনেকক্ষণ এক হয়ে থাকল। যখন মারিয়া নিজেকে ছাড়িয়ে নিল তখন রীতিমত হাঁপাচ্ছে সে।

ভেতরে ভেতরে হাঁপিয়ে উঠল জেনিফারও। তার ভেবে অবাক লাগল মারিয়ার সাহস দেখে। মারিয়া কি জানে না ওদের বাসা থেকে মোনা টাওয়ারের সবকিছু পরিষ্কার দেখা যায়? হয়তো মারিয়ার কল্পনাতেও আসেনি একজন পিপিংটম তাদের সমস্ত নিষিদ্ধ কার্যকলাপ দেখে ফেলেছে। অবশ্য জেনিফার খুব সাবধানে কাজটা করছে। তাদের ঘরের সমস্ত পর্দা ফেলা থাকে। যখন পিপ-শো দেখার জন্যে বিনকিউলারটা হাতে নেয় জেনিফার, ঘরের আলো নিভিয়ে দিতে ভুল করে না কখনওই। কাজেই বিপরীত ফ্ল্যাট থেকে বোঝার উপায় নেই এখানে একজন পিপিংটম আছে।

মারিয়া যে পরকীয়ায় মেতে উঠেছে সে ব্যাপারে জেনিফারের মনে কোন সন্দেহ নেই। দু'জনের সম্পর্ক যত গাঢ় হচ্ছে, আগুনে আরও ঘি ঢালার সময় হয়ে আসছে জেনিফারের।

জেনিফার পরদিন সকালে ড্যানিস হুইটলিকে দ্বিতীয় চিঠিটি লিখল: 'প্রিয় মি. হুইটলি, আপনি কি জানেন প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যার পরে আপনার ঘরে একজন পুরুষ অতিথির আগমন ঘটে এবং আপনার স্ত্রী তার সাথে পরকীয়ায় মেতে ওঠেন? আমার কথা বিশ্বাস না করলে কোন এক মঙ্গলবার তাড়াতাড়ি এসে ওদের দু'জনকে হাতে নাতে ধরে ফেলেন না কেন?'

এখন শুধু পরবর্তী মঙ্গলবারের প্রতীক্ষা। জেনিফার জানে না শুধু মঙ্গলবারেই কেন লোকটি মারিয়ার কাছে আসে। অবশ্য কারণ উদ্‌ঘাটনের তেমন চেষ্টা করেনি। এখন তার সামনে একটাই কাজ–মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর বাবা-মা যাতে বাড়িতে না থাকেন তার ব্যবস্থা করা।

জেনিফার তার পলি খালাকে ফোন করল। বানিয়ে বলল মা নাকি প্রায়ই পলি খালার কথা বলেন। দূর সম্পর্কের বোন বলেই নাকি পলি খালা মা'র খোঁজ-খবর নিচ্ছেন না। এজন্যে মা বেশ কষ্টে আছেন। শুনে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন পলি খালা। বললেন, 'সে কী! আমিই তো এতদিন ভেবেছি তোর মা আমাদের ভুলে গেছে।'

জেনিফার বলল, 'তুমি তা হলে বাবা-মাকে একদিন দাওয়াত দাও। তোমাদের মাঝে সমস্ত ভুল বোঝাবুঝির অবসান হোক।'

খুশি হলেন পলি খালা। বললেন, 'ঠিক বলেছিস, কেন যে লোকে তোকে বোকা বলে!'

হাসি চেপে জেনিফার বলল, 'শোনো, আগামী মঙ্গলবার বাবার অফিস ছুটি। ওই দিন তুমি ওঁদেরকে ডিনারের দাওয়াত দাও।'

'তুই সাথে আসছিস তো?' জানতে চাইলেন পলি খালা।

'না-না। আমাকে যেতে বোলো না। আমার কোথাও যেতে ভাল লাগে না। একা থাকতেই ভাল লাগে।'

ব্যস, মঙ্গলবার রাতের পিপ-শো দেখার নির্বিঘ্ন আয়োজন হয়ে গেল। মা পলি খালার আকস্মিক দাওয়াত পেয়ে অবাক হলেন। তবে যেতে অরাজি হলেন না। ওরা রাত আটটার দিকে চলে গেলেন খালার বাসায়। কিছুক্ষণ পরেই সেই লোকটি এল মারিয়ার বাসায়। পৌনে ন'টার দিকে ওরা হাতে হাত রাখল, ন'টার সময় মারিয়া বাহুলগ্ন হয়ে পড়ল তার প্রেমিকের। ঠিক তখন ড্রইংরুমের দরজা প্রচণ্ড ধাক্কায় খুলে গেল, ভেতরে ঢুকল ড্যানিস হুইটলি।

প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেল ঘরে। হুইটলি এবং লোকটি, জেনিফারের মনে হলো, বুঝি হাতাহাতি শুরু করে দেবে। কিন্তু মারিয়া ঠেকিয়ে রাখল ওদেরকে। রাগে গনগনে মুখ দেখে অবশ্য বোঝা যাচ্ছিল দুই পুরুষই একে অপরকে গালি-গালাজে তুলোধুনো করে ছাড়ছে। শেষে মারিয়া তার প্রেমিককে ঠেলতে ঠেলতে ঘরের বাইরে নিয়ে গেল। হুইটলি বোধহয় কিচেন বা অন্য কোথাও ঢুকল। একটু পরেই ঢাউস একটা মদের বোতল হাতে তাকে ড্রইংরুমে ফিরে আসতে দেখল জেনিফার। পরপর দুই গ্লাস মদ খেয়ে ফেলল হুইটলি। অপেক্ষা করছে মারিয়ার জন্যে। মারিয়া ঘরে ঢুকতেই আবার ফেটে পড়ল হুইটলি। ভয়ানক ঝগড়া শুরু হলো দু'জনের। হুইটলির এমন রুদ্রমূর্তি আগে দেখেনি জেনিফার। সে মারিয়ার মুখে প্রচণ্ড এক চড় কষাল। মারিয়া প্রত্যুত্তরে কী যেন বলতেই উন্মাদ হয়ে গেল হুইটলি। গলা টিপে ধরল সে মারিয়ার, ঝাঁকাতে শুরু করল। নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে প্রাণপণ চেষ্টা করল মারিয়া, লাথি মারতে লাগল। শেষে কোনমতে নিজেকে মুক্ত করে দৌড় দিল দরজার দিকে, পিছু ধাওয়া করল হুইটলি। মারিয়া হাতের কাছের বড়সড় টেবিল ল্যাম্পটা তুলে ধরল মাথার ওপর। হুইটলি ওকে থামাতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সোফায় পা বেঁধে। তাকে ব্যাঙের মত হাত-পা ছড়িয়ে পড়তে দেখে খিলখিলিয়ে হাসল জেনিফার। শুয়ে শুয়েই মারিয়ার পেটে লাথি মারল হুইটলি। ব্যথায় বিকৃত দেখাল মারিয়ার চেহারা। রাগে আর শারীরিক যন্ত্রণায় নিজের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল সে। চিৎকার করে ভারি টেবিল ল্যাম্পটা বিদ্যুৎবেগে নামিয়ে আনল স্বামীর মাথার ওপর।

উত্তেজনা আর আনন্দে এবার জোরে হেসে উঠল জেনিফার। চোখ চকচক করছে।

স্বামীর মাথায় টেবিল ল্যাম্প ভাঙার পর হাঁটু মুড়ে পাশে বসল মারিয়া। কিছুক্ষণ ফোঁপাল। হুইটলির নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেছে দেখে ভয়ের ছাপ ফুটে উঠল মুখে। বুকে মাথা লাগিয়ে কী যেন শোনার চেষ্টা করল। তারপর ছুটে গেল টেলিফোনের দিকে।

বাহ্, চমৎকার একটা দৃশ্য দেখা গেল বটে। এখন কী? জেনিফার কব্জিতে বাঁধা ঘড়ির দিকে তাকাল। সর্বনাশ! ঘুমাতে যাবার সময় হয়েছে। বাবা-মা এসে পড়বেন এখুনি। এখানে আর বসে থাকার মানে হয় না। কাল সকালে তো সব জানাই যাবে।

খবরটা বাতাসের গতিতে ছড়িয়ে পড়ল সবখানে। ম্যানহাটন এলাকায় খবর

রটল ব্যাংক কর্মকর্তা মি. ড্যানিস হুইটলি মারাত্মক অ্যাক্সিডেন্ট করেছেন। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু কাজ হয়নি কোন। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে মারা গেছেন তিনি।

মারা গেছে! হুইটলি মারা গেছে! মৃত্যু হয়েছে সুদর্শন লোকটার!

উত্তেজনায় বুক ধড়ফড় শুরু হলো জেনিফারের। তার পরিকল্পনা এমন খাপে খাপ মিলে যাবে ভাবতে পারেনি সে। বেশ বেশ! এখন তা হলে মারিয়ার পালা। ধনী আর সুন্দরী হবার খেসারত এবার তাকে দিতে হবে।

জেনিফার থানায় ফোন করল। ওধার থেকে জবাব আসতে সে বলল, 'আমি একটা হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে রিপোর্ট করতে চাই। আমার নাম জেনিফার প্যাকমান, ঠিকানা–আট বাই এইচ, ড্যাফোডিল প্লাজা, ম্যানহাটন, আমি ওখান থেকে ফোন করছি।' জেনিফারের রক্ত চলাচল বেড়ে গেছে, নিজেকে এত সুখী আর মনে হয়নি কখনও।

'হত্যাকাণ্ড?'

'জী।'

'আচ্ছা, ধরুন একটু।'

'ধন্যবাদ।'

এক সেকেণ্ড পর আরেকটি কণ্ঠ শোনা গেল ফোনে, 'ইন্সপেক্টর রথম্যান।' ভরাট গলা পুরুষটির।

'আমি জেনিফার প্যাকম্যান, আট বাই এইচ, ড্যাফোডিল প্লাজা, ম্যানহাটনে থাকি,' দ্রুত বলল জেনিফার। ওর শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত এবং ঘন হয়ে উঠেছে। বেশি উত্তেজনা হলে এমন হয়। 'গত রাতে ছয় বাই বি, মোনা টাওয়ার, ম্যানহাটনের বাসিন্দা মি. ড্যানিস হুইটলি এবং মিসেস মারিয়া শ্রিভারের মধ্যে প্রবল ঝগড়া হতে দেখি আমি। তিনি হুইটলি সাহেবকে ভারি একটি টেবিল ল্যাম্প দিয়ে মাথায় আঘাত করেন। কাজটা স্পষ্ট তাঁকে আমি করতে দেখেছি। আমার বেডরুমের জানালা থেকে ওদের ড্রইংরুম, বেডরুম সব দেখা যায়। তা ছাড়া কাল রাতে ওদের দরজা এবং জানালার সবগুলো পর্দাই সরানো ছিল। কাজেই যা ঘটেছে পরিষ্কার দেখতে পেয়েছি আমি। হুইটলি সাহেবকে পরে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, শুনেছি আমি, ভেবেছিলাম তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন। তাই পুলিশে খবর দেয়ার প্রয়োজন অনুভব করিনি। কিন্তু এখন শুনছি তিনি মারা গেছেন। তাই আসল ঘটনাটা আপনাদেরকে জানালাম নাগরিক কর্তব্যবোধ থেকে।'

'আচ্ছা,' উদ্বিগ্ন শোনাল ইন্সপেক্টরের কণ্ঠ। 'আপনি এখানে এসে রিপোর্ট দিতে পারবেন, মিস জেনিফার?'

'দুঃখিত, তা সম্ভব নয়,' দুঃখী-দুঃখী ভাব ফোটাল জেনিফার গলায়। 'বাবা-মা আমাকে কোথাও যেতে দেন না। বিশেষ করে থানার মত জায়গায় তো কখনোই যেতে দেবেন না।'

'ঠিক আছে। আমিই তা হলে আপনাদের ওখানে আসছি। ধন্যবাদ, মিস

প্যাকম্যান।'

'ধন্যবাদ, মি. রথম্যান।'

জেনিফার রিসিভার রেখে দিল। রান্নাঘরে গিয়ে ফ্রিজ খুলে ডেজার্টের একটা বাটি বের করল। ওর যে স্বাস্থ্য, জানে জেনিফার, মিষ্টি খাওয়া উচিত নয়। কিন্তু একটা দিন মিষ্টি খেলেই তো আর সে আরও হস্তিনী হয়ে উঠবে না। তা ছাড়া এমন মজা আর রোমাঞ্চ কি প্রতিদিন মেলে? দিনটাকে মিষ্টি খেয়ে সেলিব্রেট করা উচিত।

লিভিংরুমে এসে বসল জেনিফার বাটি নিয়ে। সুস্বাদু মিষ্টিগুলো গিলতে লাগল টপাটপ। গোটা ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছে সে। লোকে ওকে বোকা ভাবে! আবার হাসি পেল জেনিফারের। যেটাকে ও মজা আর খেলা মনে করে লোকের কাছে সেটাই অশ্লীল আর অপরাধ মনে হয়। তাতে কিছু যায় আসে না জেনিফারের। এবারের খেলাটাতে রোমাঞ্চ ছিল দারুণ। যারা ওকে পছন্দ করে না, ভালবাসে না, কুৎসিত বলে ঘৃণা করে, তাদের সবাইকে নিয়ে এমন খেলা খেলবে জেনিফার। ভাইয়ার ওপর শোধ নেবে। দেখে নেবে ভাইয়ার প্রেমিকাটাকেও। রূপের গরবে মাটিতে পা পড়ে না, না? দাঁড়াও, এবার মজা দেখাব। মজা দেখাবে সে চারতলার মিসেস হিলারিকেও। মহিলার সাথে সেধে যতবার কথা বলতে গেছে জেনিফার, মিসেস হিলারি ততবারই এড়িয়ে গেছেন তাকে। জেনিফার দেখে নেবে নীচের ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ছোকরা কর্মচারী টনিকেও। হারামজাদাটা জেনিফারকে দেখলেই কেমন বিশ্রী মুখভঙ্গি করে। নিজের বাবা-মা'র ওপরও শোধ নেবে জেনিফার। তাকে একা গৃহবন্দি করে রেখে যাবার মজা টের পাইয়ে দেবে। প্রত্যেককে তার পাওনা বুঝিয়ে দেয়ার ভবিষ্যৎ সুখ কল্পনায় বিভোর হয় জেনিফার, রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে শরীর।

জেনিফারের সুখ কল্পনায় ব্যাঘাত ঘটাল কলিংবেলের শব্দ। এ সময়ে আবার কে এল? মিষ্টির বাটিটা টেবিলে রেখে গায়ের কাপড় ঠিকঠাক করল সে। তারপর দরজা খুলল।

'মিস প্যাকম্যান?' দরজায় দাঁড়ানো দীর্ঘদেহী আগন্তুক ভরাট গলায় জানতে চাইল; পরনে মেট্রোপলিটান পুলিশের পোশাক।

'জী,' বলল জেনিফার। তার চোখ আটকে গেল আগন্তুকের পেছনে দাঁড়ানো মহিলার দিকে। মারিয়া। মারিয়ার হাতে দু'টুকরো কাগজ। দেখেই চিনতে পারল জেনিফার। তার লেখা সেই চিঠি দুটো!

মূল: ডুলসি গ্রে

গোস্ট রাইটার

এডিসন ঠিকই বলেছিলেন।

জিনিয়াস বা প্রতিভা হলো এক পার্সেন্ট অনুপ্রেরণা, বাকি নিরানব্বই পার্সেন্ট হলো পারস্পিরেশন বা ঘাম।

রিও'র বিমানবন্দরে প্লেন অবতরণের অনেক আগে থেকেই ঘামছিল জেরি ক্রিবস। কাস্টমস ইন্সপেকশনের সময়েও তার শরীরের ঘর্মাক্ত ধারা অব্যাহত রইল। কালো ব্যাগটিতে রয়েছে তার সকল গোপনীয়তা, ওটি একমুহূর্তের জন্যেও হাতছাড়া করল না জেরি। এয়ারপোর্ট থেকে কোতাকারানা হোটেলের দীর্ঘ ট্যাক্সি যাত্রায় ব্যাগটি কোলের মধ্যে আঁকড়ে ধরে রইল। রিও ডি জেনিরোর বিশ্রী যানজট থেকে রেহাই মেলার পরে সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, কিন্তু জেরি নিজের হোটেল রুমে ঢোকার পরেও ঘেমে চলছিল। ব্যাগ নিয়েই শাওয়ারে ঢুকল সে। কিন্তু গোসল করেও লাভ হলো না। ঘেমেই চলল জেরি।

গা মুছল জেরি, পোশাক পরা এবং দাড়ি কামানো-এই স্বল্প সময়টুকুর ব্যবধানেই ঘেমে নেয়ে গেল আবার। বসে বসে ঘামতে লাগল আর অপেক্ষা করল কখন বেজে উঠবে ফোন। কালো ব্যাগটি যথারীতি তার কোলে, জড়িয়ে ধরে রেখেছে তার গোপনীয়তাকে–তার জিনিয়াস ব্যাগটির স্পর্শই তাকে পরম নির্ভরতা দিচ্ছে।

ফোন আসছে না কেন এখনও?

তার প্রশ্নের জবাব দিতেই যেন দরজায় কেউ কড়া নাড়ল। ওরা নিশ্চয় ফোন ব্যবহার করার ঝুঁকিতে যেতে চায়নি; ব্যক্তিগত যোগাযোগের ওপর ভরসা করতে চেয়েছে।

সত্যি কি তাই?

জেরি খাটের নীচে ব্যাগটি চালান করে দিল। এগোল দরজায়।

বাইরের হলওয়ে থেকে মৃদু স্বর ভেসে এল, 'মি. ক্রিবস?'

কুঁকড়ে গেল জেরি। নীচতলায় রেজিস্টার খাতায় সে নিজের নাম সই করেছে মি. ব্রাউন, ইচ্ছে করেই ছদ্মনাম নিয়েছে কারণ নিজের উপস্থিতি জানান দেয়ার কোন খায়েশ তার নেই। কিন্তু দরজার পেছনের আগন্তুকটি তার আসল নাম জানে। একদিক থেকে ব্যাপারটা খারাপও নয়, তবু সে নিশ্চিত হতে চাইল।

'কে আপনাকে পাঠিয়েছে?' ফিসফিস করল জেরি।

'বিগ বার্ড।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে দরজা খুলে দিল জেরি।

ঘরে প্রবেশ করল কামানো মাথার কৃষ্ণকালো এক দৈত্য। জেরির দিকে তাকিয়ে ভদ্রতাসূচক মাথা ঝাঁকাল। লোকটির পরনে অলংকার শোভিত ইউনিফর্ম, যেন একজন ব্রাজিলীয় জেনারেল, কিংবা শোফার–তবে এতে কিছু এসে যায় না, কারণ বিগ বার্ড যাকে খুশি পাঠাতে পারেন।

'আমার সঙ্গে আসুন, প্লিজ,' বলল দৈত্য।

ঘুরল জেরি, দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, একটা হাত চেপে ধরল তার কাঁধ।

'আপনি বোধহয় কিছু ভুলে যাচ্ছেন,' মন্তব্য করল কালো দানব।

'সরি।' দাঁড়িয়ে পড়ল জেরি, খাটের নীচে লুকানো ব্যাগটি টেনে বের করল। ওটা নেয়ার জন্য হাত বাড়াল দানব, কিন্তু তাকে মাথা নেড়ে মানা করল ও। 'আমিই এটা নিতে পারব,' বলল সে।

কাঁধ ঝাঁকাল কালুয়া। 'আপনার যা ইচ্ছা।' সে জেরির পেছন পেছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল, চলল হলওয়ে ধরে। এলিভেটরে উঠে কিংবা নীচে লবিতেও সে কোন কথা বলল না, এবং তার এই নীরবতা বজায় থাকল হোটেলের এণ্ট্রান্সের বাইরে, ফুটপাতে পার্ক করা প্রকাণ্ড লিমুজিনে জেরিকে নিয়ে উঠে বসার পরেও।

জেরি বসল পেছনের আসনে, তার এসকর্ট দখল নিল হুইলের।

কালো দানব শোফার কি না সে বিষয়ে জেরির কোন সন্দেহ থাকলেও তা শীঘ্রি দূরীভূত হয়ে গেল রিও'র দুপুরের ব্যস্ত রাস্তায় লোকটার দক্ষ ড্রাইভিং দেখে–এ সত্যিকারের জেনারেলের মতই গাড়ি চালাচ্ছে।

জেটিতে লাঞ্চ সারার পরে লোকটি প্রমাণ করল সে একজন অ্যাডমিরালও বটে। জেটি থেকে বোট ছুটল তীর গতিতে এবং দেখতে দেখতে চলে এল খোলা সাগরে। জেরি তখন বো-তে তার দুই কম্পমান হাঁটুর মধ্যে কালো ব্যাগটি রেখে কুঁজো হয়ে বসে আছে।

সামনে ফুটে উঠল ঝাঁ চকচকে ইয়টের সারি, ঢেউয়ের তালে দুলছে। একটি ইয়টের পশ্চাদভাগে ওরা এসেছে, জেরি দেখল সোনার পাতায় লেখা জলযানটির নাম: The Water Closet।

ইঞ্জিন বন্ধ করল কৃষ্ণকায় দানব, দুই হাত গোল করে মুখের সামনে এনে হাঁক ছাড়ল, 'আহোয়!'

ওপরের ডেকে আবির্ভূত হলো দাড়িঅলা এক নাবিক। 'মই নামাও,' বিড়বিড় করল কালো দৈত্য।

দাঁতের সারির ফাঁকে কালো ব্যাগের হাতল কামড়ে ধরে রেখে দড়ির মই বেয়ে ইয়টে ওঠা সহজ কাজ নয়। তবে জেরি পারল। ডেকে ওঠার পরে কালো দানবের পেছন পেছন এগোল। এক সারি অভিজাত স্টেটরুম, সাউনা (বাষ্পীয় স্নানঘর), একটি ব্যক্তিগত প্রজেকশন রুম এবং একটি গলি পার হয়ে তারা দাঁড়িয়ে পড়ল একটি আউটডোর বারের পেছনে। এর সঙ্গে রয়েছে অলিম্পিক সাইজের একটি সুইমিং পুল। 'উনি আপনাকে আশা করছেন,' বলল কালো

মানুষটা।

সুইমিং পুলের দিকে চোখ কুঁচকে তাকাল জেরি। পুল থেকে তারস্বরে রক মিউজিক ভেসে আসছে, সূর্যের ঝলমলে আ[illegible]য় পানিতে হুটোপুটি করছে আধডজন সম্পূর্ণ নগ্ন সুন্দরী।

হোস্টকে চিনতে কষ্ট হলো না জেরির, কারণ ছয় নারীর মধ্যে তিনিই একমাত্র পুরুষ।

'মি. বাযার্ড?' অনুচ্চ গলায় বলল জেরি।

টাকমাথা, হাড্ডিসার, ছোটখাট গড়নের মানুষটি উঠে এলেন সুইমিং পুল ছেড়ে, চোখে রোদ পড়তে খেঁকিয়ে উঠলেন, অপেক্ষমাণ এক অ্যাটেনড্যান্ট সঙ্গে সঙ্গে সোনালি রঙের বহুমূল্য একটি রোব দিয়ে ঢেকে দিল তাঁর শরীর।

মাথা ঝাঁকালেন বিগ বার্ড। 'আমি আল বাযার্ড,' বললেন তিনি। 'আমার স্ত্রীর সঙ্গে তো আপনার আগেই পরিচয় হয়েছে।' সুইমিং পুলের নগ্ন সুন্দরীদের দিকে আবছা ইঙ্গিত করলেন।

'ওহ্ শিওর।'

'তা হলে আসুন,' দু'হাত সামনে বাড়িয়ে দিলেন বাযার্ড। সতর্ক অ্যাটেনড্যান্ট তাঁর এক হাতে ঝাপসা কাচের গ্লাস ভর্তি মার্টিনি ধরিয়ে দিল, অপর হাতে গুঁজল জ্বলন্ত আতাম্যান সিগার। ঘুরলেন বাযার্ড। জেরিকে নিয়ে জাহাজের পেছন দিকে পা বাড়ালেন।

স্টেটরুমে ঢুকে এটির আয়নাঘেরা দেয়াল এবং ছাদ, চিতাবাঘের চামড়া দিয়ে আবৃত কিংসাইজের গোলাকার বিছানা দেখে জেরি অনুমান করল সে ক্যাপ্টেনের কেবিনে এসেছে।

হাড্ডিসার মানুষটি বন্ধ করে দিলেন দোর। আশ্চর্য দ্রুততার সঙ্গে এক ঢোকে গ্লাস বোঝাই ড্রিংক শেষ করে ওটা মিংক কার্পেটের ওপর রেখে দিলেন। বিছানায় গিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লেন এবং সিগার ফুঁকতে ফুঁকতে বেশ মুড নিয়ে তাকালেন তাঁর দর্শনার্থীর দিকে।

'এমন সময় কি আপনার জীবনে কখনও এসেছে যে মনে হয়েছে কোনকিছুই ঠিকঠাক চলছে না?' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। 'ওটা দেখুন।' খালি গ্লাসের দিকে ইঙ্গিত করলেন। 'ট্রিপল মার্টিনিতে মাত্র দুটো জলপাই দিয়েছে! আমরা আন্তর্জাতিক জলসীমায় প্রবেশ করা মাত্র আমাকে মনে করিয়ে দেবেন যে বারটেণ্ডারটাকে পানিতে ফেলে দেব।'

'কিন্তু, মি. বাযার্ড, এটা কি লঘু পাপে গুরু দণ্ড...'

'হাহ্, থামুন তো!' নাক সিটকালেন বাযার্ড। উঠে বসলেন বিছানায়। 'আপনি দেখছি বারাবাসের মত কথা বলছেন।'

'বারাবাস?'

'আমার প্রকাশক। গত সপ্তাহে এখানে এসেছিল। আনন্দ-উৎসবের সময় সে আমাকে বলে কী, "একটু হাওয়া বদলের জন্য আপনি জীবনের উজ্জ্বল দিকটির

দিকে তাকাচ্ছেন না কেন? শত হলেও আপনি কনওয়ে ম্যানের পরেই বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক। আপনার ঝুলিতে রয়েছে দশটি অল টাইম বেস্টসেলার, আটটি ব্লকবাস্টার মুভি, একটি হিট টেলিভিশন সিরিজ যা গত একটা পুরো সিজন ধরে চলছে–আপনার আর কী চাই? ড্রানো এবং সানি ফ্লাশের মত আপনিও এখন ঘরে ঘরে উচ্চারিত একটি নাম।"'

'তো, উনি তো ঠিকই বলেছেন।'

'না–ঠিক বলেনি। মিথ্যা বলেছে। আমি কনম্যানের চেয়ে অনেক বেশি জনপ্রিয়। সে এবং তার সেক্সি রোমান্সগুলো–'

'কিন্তু আপনি তো ধনী এবং বিখ্যাত,' আয়নাঘেরা দেয়ালে ইঙ্গিত করল জেরি। 'আপনি এত বড় একটা ইয়টে থাকছেন, এমন সুন্দরী একটি স্ত্রী আছে আপনার–'

শ্রাগ করলেন বাযার্ড। 'বোট আমাকে সি সিক করে তোলে। তবু ইয়টেই থাকতে হচ্ছে, কারণ যে মুহূর্তে মাটিতে পা রাখব, সঙ্গে সঙ্গে I.R.S আমার বিরুদ্ধে পঁয়ত্রিশ মিলিয়ন ডলারের কর ফাঁকির মামলা ঠুকে দেবে। আর আমার বউ অত সুন্দরী নয়–প্রথম নয়জন ওর চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণীয়া ছিল। মুশকিল হলো, ওরা কেউ আমাকে বুঝতে পারেনি। বর্তমানেরটাও না। এমনকী আমার কোন রক্ষিতাও বোঝে না আমি কী চাই। এরা বলে আমার সঙ্গে এদের কেমিস্ট্রি নাকি ঠিক মেলে না। কেমিস্ট্রি না মিললে আমি কী করব?'

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বাযার্ড, সিধে হলেন, পোর্টহোল দিয়ে টুসকি মেরে ফেলে দিলেন হাতের সিগার। যখন ফিরে এলেন তখন একদম ভিন্ন মানুষ। সোনালি রোবের নীচে তাঁর কাঁধজোড়া সোজা হয়ে আছে, পুঁতির মত ছোট-ছোট চোখজোড়া জ্বলজ্বল করছে। 'এখন কাজের কথায় আসুন,' বললেন তিনি। 'জিনিসটা এনেছেন?'

'ব্যাগের মধ্যে আছে।'

জেরি কালো ব্যাগটি এগিয়ে দিল। বাযার্ডের বাঁকা আঙুলগুলো চেপে ধরল হাতল। তিনি ওটা বিছানায় নিয়ে গেলেন, তালা খোলার জন্য হাতড়াতে লাগলেন।

'চাবি!' হাঁপাতে-হাঁপাতে বললেন তিনি। 'চাবি কোথায়?'

জেরি প্যান্টের পা গুটিয়ে নিয়ে গোড়ালিতে অ্যাডহেসিভ টেপ দিয়ে আটকানো চাবিটি বের করল। বাযার্ডকে দিল। তিনি তালায় চাবি ঢুকিয়েই জোরে একটা মোচড় দিলেন। ফট্ করে খুলে গেল ব্যাগ, ভেতরের জিনিসপত্র ছড়িয়ে পড়ল চিতাবাঘের চামড়ার চাদরে।

বাযার্ড বিছানার দিকে পলকহীন চোখে তাকিয়ে রইলেন। হাতে হাত ঘষছেন।

'কত পৃষ্ঠা?' জানতে চাইলেন তিনি।

'তিনশো।'

'সব আছে?'
'শেষ চ্যাপ্টারটা বাদে সবই আছে। আগামী হপ্তায় কাজটি শেষ করে ফেলব ভেবেছিলাম, এমন সময় আপনার তার বার্তা এল–'
'ফিরে গিয়েও আপনি কাজটা শেষ করতে পারবেন,' বললেন বাযার্ড। 'আমি এমাসের শেষের দিকে পুরোটাই প্রকাশকের হাতে তুলে দেব ভেবেছি। কনওয়ে ম্যানের আগেই আমরা বইটি বাজারে বের করে ফেলব। শুনেছি সে নাকি দারুণ একটা জিনিস নিয়ে এবারে আসছে, তবে তার আগেই আমরা কাজ হাসিল করব।' বিরতি দিলেন তিনি, সন্দেহের চোখ বুলালেন জেরির ওপর। 'ওই লেখাটা ভাল হয়েছে তো?'
'আমার তো তাই ধারণা।'
'ধারণা? আপনাকে তো ধারণা করার জন্য টাকা দিই না আমি–লেখার জন্য দিই।' বিশ্রী মুখভঙ্গি করলেন বাযার্ড। 'ভাল হতেই হবে। কারণ, লেখক হিসেবে আমার একটা সুনাম আছে বাজারে।'
'চিন্তা করবেন না, মি. বাযার্ড। আপনি এতে একবার চোখ বুলান, তা হলেই বুঝতে পারবেন মানের প্রশ্নে কোন আপস করা হয়নি।'
'আচ্ছা-আচ্ছা, পরে দেখব'খন।' আল বাযার্ড কাগজগুলো একত্রিত করছেন। 'এখন একটু স্বস্তিবোধ করছি যা হোক। বারাবাসের আশা করি পছন্দই হবে।' কপালে ভাঁজ পড়ল। 'কার্বন কপি কই?'
'বাড়িতে, নিরাপদ স্থানে।'
'গুড,' মাথা ঝাঁকালেন বাযার্ড। 'বাড়ির কথায় মনে পড়ে গেল, এখান থেকে পরবর্তী ফ্লাইটে আপনাকে তুলে দেব। আপনাকে লাঞ্চ পর্যন্ত থেকে যেতে বলতাম, কিন্তু যেহেতু এখনও একটা চ্যাপ্টার লেখা বাকি, তাই আর আপনার সময় নষ্ট করব না। তা ছাড়া, প্লেনে বসেই স্যাণ্ডউইচ বা এ ধরনের কিছু একটা খেয়ে নিতে পারবেন।'
'আ–একটা কথা বোধহয় আপনি ভুলে যাচ্ছেন, মি. বাযার্ড।'
খেঁকিয়ে উঠলেন বাযার্ড। 'মনে আছে আমার। আমার মত একজন সৃজনশীল মানুষের সঙ্গে আপনার মত একজনের এখানেই পার্থক্য। আপনারা, লেখকরা টাকা ছাড়া কিছু ভাবতেই পারেন না।'
ফোঁসফোঁস শ্বাস ফেলতে ফেলতে তিনি একটি বন্ধ ধাতব বাক্স বের করলেন। 'এই নিন আপনার জিনিস।'
কমবিনেশন মেলাতেই খুলে গেল তালা, বিছানার ওপর ছড়িয়ে পড়ল একরাশ উজ্জ্বল পাথর।
'যাশ্‌শালা!' বিড়বিড় করলেন বাযার্ড। 'বললাম না আজকের দিনটা আমার খুব খারাপ যাচ্ছে। ভুল বাক্স–ভুল করে হীরের বাক্সটি খুলে ফেলেছি!'
বাযার্ড সামনে ঝুঁকে বাক্স হাতড়ে প্রথমটির মত দেখতে আরেকটি ধাতব কণ্টেইনার বের করলেন। ওটার টাম্বলার ক্লিক করে উঠল, খুলে গেল ঢাকনি।

ভেতরে অনেকগুলো নোটের তাড়া দেখে চোখ চকচক করে উঠল জেরির।

'নগদ টাকা,' বললেন বাযার্ড। 'শুধু পঞ্চাশ আর একশো ডলারের নোট।' তিনি এক তাড়া নোট তুলে নিয়ে গুনতে লাগলেন। 'হিসাব করে দেখি। তিনশো পৃষ্ঠার বই। প্রতি পৃষ্ঠা দশ ডলার করে হলে...'

'এবারে আপনি পনেরো করে দেবেন বলেছিলেন, মি. বাযার্ড।'

'ওহ্-হ্যাঁ, পনেরো ডলার করে তিনশো পৃষ্ঠায়–'

'চার হাজার পাঁচশো ডলার,' বলল জেরি।

'আমি কি গুনতে জানি না নাকি?' খেঁকিয়ে উঠলেন বাযার্ড। জেরির হাতে বেশ কতগুলো নোট গুঁজে দিলেন। 'অনেক টাকা দিলাম। বলা যায় অনেক বেশিই দিয়েছি।'

'কিন্তু বইটি লিখতে আমার প্রায় ছয় মাস সময় লেগেছে, মি. বাযার্ড। আজকাল একজন জুতোর মিস্ত্রিও তিন সপ্তাহে এরচে' বেশি টাকা আয় করে।'

'তা হলে টাকাটা নিয়ে জুতোর মিস্ত্রির কাজ দেখুন গে,' বললেন বাযার্ড। 'আগে শেষ চ্যাপ্টারটা শেষ করবেন। সঙ্গে কাগজ কলম থাকলে প্লেনে বসেই লেখা শুরু করে দিন।'

কিন্তু প্লেনে উঠে জেরি একটা লাইনও লিখল না। বসে বসে ঝিমাল।

উঁচু উঁচু পাহাড়ের মাঝ দিয়ে উড়ে চলল বিমান, ল্যাটিন আমেরিকার আকাশে বার কয়েক এয়ার পকেটে পড়ে ঝাঁকি খেল, তারপর চোরের মত ছুটে পালাল আটলান্টিক কোস্ট ধরে। কেনেডি এয়ারপোর্টে যখন অবতরণ করল বিমান, তখনও ঝিমাচ্ছে জেরি।

'ডার্লিং–কী হয়েছে?'

টার্মিনাল এক্সিটের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল জেরি, অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল অ্যান রেমিংটনের চিন্তিত মুখশ্রীর দিকে। তারপর ওকে চুমু খেল। 'তোমাকে পরে বলব,' বলল সে।

কাস্টমসের ঝামেলা পার হয়ে অ্যানের গাড়িতে চড়ে বসল জেরি। এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে এল ওরা, রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল।

গাড়িতে বসে নিজেকে যেন বন্ধনমুক্ত করল জেরি। 'দেখতে পাচ্ছ না?' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে। 'সেই একই গল্প।'

'কিন্তু গল্পটা তো ভাল,' বলল অ্যান। 'গতরাতে তোমার একটি কার্বন কপি পড়ছিলাম। তোমার হিরো ল্যান্স পুস্টুলকে আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। মাত্র আট বছর বয়সে সে তার বাবা-মাকে হত্যা করে–পাঠকদের সমবেদনা উথলে উঠবে তার জন্য। এতিমদেরকে সবাই খুব মায়া করে।'

'অ্যান, প্লিজ–'

'যে দৃশ্যে ছেলেটাকে তার দাদীমা রেপ করে ওটা তো সাংঘাতিক! টেলিভিশন নেটওয়ার্কের কর্তৃত্ব পেতে সে যেসব হত্যাকাণ্ড ঘটায়, টর্চার করে–দারুণ! ড্রাগস, ভায়োলেন্স এবং সেক্সের মিশেলটা তো অসাধারণ! ভাল

কথা, বইটির কী নাম দিয়েছ?'

'দ্য অ্যারিস্টোক্রেটস।'

'পারফেক্ট!'

মাথা নাড়ল জেরি। 'আল বাযার্ডের জন্য আমি সাড়ে চার হাজার ডলারে বই লিখে দিচ্ছি, অথচ ওটা বিক্রি করে সে কোটি কোটি টাকা কামাবে। এর মধ্যে পারফেক্টের কী দেখলে? ব্যাটা শুধু তার বিরাট ইয়টে বসে থাকে, বউদেরকে ডিভোর্স দেয়, আর মুভি তারকা এবং উঠতি ফ্যাশন মডেলদের সঙ্গে স্ফূর্তি করে–'

'এ জন্যেই তো সে টাকা পায়,' বলল অ্যান। 'ওসব করে সে সেলেব্রিটি বনে গেছে। তার লাইফস্টাইল খবরের কাগজের প্রথম পাতায় ছাপা হয়, কাজেই সে যখন বই লেখে ওটাও কাগজে চলে আসে।'

'কিন্তু সে যা করে না তা হলো একটি বইও নিজে লেখে না। আমি লিখি এবং এ থেকে যা পাই তা দিয়ে তোমাকে বিয়ে করার সাহসও পাই না,' সশব্দে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল জেরি। 'যদি আমার নিজের নামে বইগুলো লিখতে পারতাম–'

'লিখছ না কেন?'

'কারণ, সে সময়টা আমি পাই না আর টাকাও তো পাই না।'

হাসল অ্যান। 'আমরা ম্যানেজ করে নেব। ট্রাভেল এজেন্সিতে আমার সেক্রেটারির কাজটা তো আছেই।'

'আমি তোমার বেতনের টাকা দিয়ে সংসার চালাতে চাই না।'

অ্যানের মুখের হাসিটি ম্লান হয়ে গেল, সে সজোর মুঠিতে চেপে ধরল স্টিয়ারিং হুইল, গাড়িটাকে ঘোরাল ভাঙাচোরা, জীর্ণ চেহারার একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের ফুটপাতের সামনে। এখানেই হতচ্ছাড়াদের মত জীবনযাপন করে জেরি।

'আমি আসলে তোমাকে বুঝতে পারি না,' বিড়বিড় করল অ্যান। 'সেকেলে ধ্যান ধারণা নিয়ে বেঁচে থাকা একটা মানুষ কী করে এমন চালু আধুনিক পর্নো উপন্যাস লেখে?'

'কারণ, আমি সেকেলে টাইপেরই মানুষ,' গাড়ি থেকে ব্যাগট্যাগগুলো বের করল জেরি। 'আর আমি যখন বই লিখি তখন চালু ফ্যাশনের কথা মনে রাখি না। একটি ভাল উপন্যাসের সস্তা সুড়সুড়ির দরকার হয় না।' অ্যানও গাড়ি থেকে নামতে যাচ্ছিল, তাকে হাত ইশারায় মানা করল ও। 'তোমাকে আসতে হবে না। বইয়ের শেষ চ্যাপ্টারটা আমার এখুনি লিখতে হবে। বিশাল আইডেন্টিটি ক্রাইসিসের দৃশ্য যেখানে ল্যান্স অবশেষে আবিষ্কার করে–সে তার স্ত্রী এবং গার্লফ্রেণ্ডকে ত্যাগ করে এবং শিশু নির্যাতনকারীতে পরিণত হয়।'

'তোমার সঙ্গে কবে দেখা হবে?'

'কাল রাতের মধ্যে সমস্ত কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। কাল সন্ধ্যার পরে এসো। একসঙ্গে ডিনার করব। সাতটার দিকে চলে এসো।'

ওরা একমুহূর্ত একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে থাকল, তারপর অ্যান গাড়ি নিয়ে

চলে গেল এবং জেরি সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত ওপরে উঠতে লাগল লেখার কাজটা শেষ করার জন্য।

দু'জনের কেউই খেয়াল করেনি অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের প্রবেশপথের একটি পিলারের আড়ালে লুকিয়ে ছিল ছোটখাট একটি মানুষ। ওদের ওপর নজর রাখছিল। 'সাতটা,' ফিসফিসিয়ে বলল সে। 'কাল রাতে।'

কাজটা খারাপ হয়নি, মনে মনে বলল জেরি। তিন হাজার শব্দ, এর মধ্যে বেশিরভাগ জুড়ে রয়েছে চার অক্ষরের কথাটি, বারো পৃষ্ঠা জুড়ে সলিড হার্ডকোর সেক্স এবং ভায়োলেন্স। আল বাযার্ড এবং তার পাঠকরা খুব খুশি হবে আর লেখাটি শেষ করতে পেরে জেরিও সন্তুষ্ট।

সে গোসল করল, দাড়ি কামাল এবং সাতটা বাজার একটু আগে যখন ডোরবেল বেজে উঠল ততক্ষণে সে রেডি।

ছিটকিনি তুলে দরজা খুলল জেরি।

'অ্যান–' বলল সে।

'ভুল,' বলল দোরগোড়ায় দাঁড়ানো ছোটখাট মানুষটি, জেরির দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছে।

কপাল কোঁচকাল জেরি, হতভম্ব। 'কে আপনি?'

'দুঃখিত, পরিচয় দেয়ার সময় নেই,' ক্ষুদ্রকায় লোকটি ওকে পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়ল ঘরে। 'আপনি আমার সঙ্গে যাচ্ছেন।'

'আপনার সঙ্গে যাচ্ছি মানে?'

'বললাম তো ব্যাখ্যা দেয়ার সময় নেই,' অনুপ্রবেশকারী হুমকির ভঙ্গিতে একটি আঙুল তুলল। 'চলুন।'

'প্রশ্নই ওঠে না,' আগন্তুকের চোখে চোখ রেখে বলল জেরি। এ লোক যে-ই হোক কিংবা যা-ই চাক না কেন, এই বাঁটকুলের চোখ রাঙানিতে কোথাও যাচ্ছে না সে।

ঘুরল জেরি এবং ভুলটাও করল।

কারণ, দোরগোড়ায় তার পেছনে রাবারের একটা গদা উঁচিয়ে হাজির হয়েছে বিশালদেহী এক লোক।

গদাটা দুম করে নেমে এল জেরির খুলি বরাবর, ছোটখাট মানুষটি তার কব্জিতে বাঁধা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সন্তুষ্টচিত্তে মাথা ঝাঁকাল।

'ছ'টা উনপঞ্চাশ,' বলল সে। 'ঠিক সময়েই এসে পড়েছ।'

'হুঁ,' বলল প্রকাণ্ডদেহী। সে অজ্ঞান জেরিকে একটা চটের বস্তার মধ্যে পুরল। বস্তাটা কাঁধের ওপর ফেলে হলওয়ে ধরে চলল ভবনের পেছন দিককার সিঁড়ি অভিমুখে।

বেঁটে লোকটি তাকে অনুসরণ করল। দু'জনে মিলে একসঙ্গে নামতে লাগল সিঁড়ি বেয়ে।

বিরাট মানুষ বেঁটে মানুষটির দিকে উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকাল। 'Mach Schnell,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে। 'কেউ আমাদেরকে দেখে ফেলতে পারে।'

'ও নিয়ে চিন্তা কোরো না,' বলল ছোটখাট লোকটি। 'মাল তো বস্তার মধ্যে।'

চটের বস্তার মধ্যে জ্ঞান ফিরে পেল জেরি। গুনগুন একটা শব্দ আসছে কানে, তারপর দূরাগত বজ্রপাতের আওয়াজ। ক্রমে মিলিয়ে গেল শব্দগুলো।

তারপর একটা ছুরি দিয়ে কেটে ফেলা হলো তার মাথার ওপরের কাপড়। ভাঁজ হয়ে কাঁধের ওপর পড়ল কাটা চটের বস্তা। সিধে হলো জেরি। কাঁধ থেকে খসে পড়ল বস্তা। চারপাশে চোখ পিটপিট করে তাকাতে লাগল।

সে একটি প্রাইভেট প্লেনের সুপরিসর কেবিনে দাঁড়িয়ে আছে। এটি একটি লিয়ার জেট, চেহারা দেখে বোঝা যায়। দেয়ালে বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা ছবি। খুব ধনী মানুষ ছাড়া এত বড় বিমান এবং এত দামী দামী চিত্রশিল্পের মালিক হওয়া সম্ভব নয়।

ছবিগুলোর মধ্যে রেনোয়াঁ, পিকাসো এবং মোদি গ্লিয়ানির কাজ চিনতে পারল জেরি। ঘুরে দাঁড়াতেই কেবিনের শেষ প্রান্তে ছবিগুলোর মালিককে দেখতে পেল ও।

কারুকাজ করা চিপেন ডেল ডেস্কের পেছনে হ্যাট মাথায় বসে থাকা দাড়িঅলা লোকটিকে চিনতে মোটেই ভুল করল না জেরি। টিনটেড গ্লাসের ফাঁক দিয়ে তিনি ওর দিকে তাকিয়ে আছেন। টেলিভিশনের সাক্ষাৎকার প্রোগ্রামগুলো যারা একবার দেখেছে, এ লোককে চাক্ষুষ করার সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারবে।

'কনওয়ে ম্যান!' হাঁপিয়ে ওঠার মত শব্দ করল জেরি।

দাড়িঅলা লেখক মাথা দোলালেন। হেসে তাঁর ডেস্কের সামনে রাখা হেপেলহোয়াইট চেয়ারে বসার জন্য ইঙ্গিত করলেন জেরিকে।

'আমার আস্তানায় স্বাগতম,' বললেন তিনি। 'আশা করি আমার স্থূল আমন্ত্রণের ধরনটি ক্ষমার চোখে দেখবেন, মি. গিবস। তবে আপনার সঙ্গে দেখা করা খুবই দরকার ছিল।'

'ক্রিবস।'

'ও, হ্যাঁ,' মোটা একটা হাত দিয়ে তিনি ডেস্কের ড্রয়ার হাতড়ালেন, হলুদ কতগুলো বড়ি উদয় হলো তাঁর তালুতে, পরক্ষণে ওগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল দাড়িঅলা মুখের মধ্যে। বড়িগুলো গিলে নিয়ে বললেন, 'আপনি হয়তো ভাবছেন কেন আপনাকে এখানে ধরে নিয়ে আসা হলো।'

'সে আমি বুঝতে পেরেছি,' বলল জেরি। 'দুই গুণ্ডা এবং একটা চটের বস্তা।'

'মাই ডিয়ার হিবস–'

'ক্রিবস।'

'ও, হ্যাঁ,' আবার ড্রয়ারে ফিরে গেল হাত, এবারে এক তাড়া কাগজ এগিয়ে দিলেন তিনি। 'পাবলিশার্স উইকলিতে এ বিজ্ঞাপনটি যাবে। অনুগ্রহ করে একটু চোখ বুলান। আপনি আগ্রহ বোধ করতেও পারেন।'

পূর্ণপৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনটির বড়-বড় অক্ষরগুলোর দিকে চোখ বিস্ফারিত করে তাকিয়ে রইল জেরি।

মর্মস্পর্শী!

অবিশ্বাস্য কেলেঙ্কারি!

দারুণ উত্তেজনাকর!

মাথা খারাপ করা সেক্স...ভয়ঙ্কর ভায়োলেন্স...দুর্দান্ত সুড়সুড়ি...এ এমন এক উপন্যাস যা আমেরিকার ক্ষমতালোভী প্রভুদের দরজার আড়ালে লুকিয়ে থাকা সমস্ত গোপন অভিলাষ এবং লালসাকে উন্মুক্ত করে দেবে...নিজেদের নিষিদ্ধ আনন্দ উপভোগ করতে যখন তাঁরা বুনো জন্তুর মত ছুটে চলেন এক শয়নকক্ষ থেকে আরেক শয়নকক্ষে! এ বই কিছুতেই মিস করবেন না যেন!

THE TASTEMAKERS

লিখেছেন

কনওয়ে ম্যান

SCRIBBLERS N SONS-এর বেস্টসেলিং ব্লকবাস্টার লেখক।

ডেস্কটপের ওপর বিজ্ঞাপনটি নামিয়ে রাখল জেরি। 'আপনার নতুন উপন্যাস?'

'তা তো বটেই।'

'ভাল?'

কাঁধ ঝাঁকালেন কনওয়ে ম্যান। 'সেটা নির্ভর করবে আপনার ওপর। আপনি এ বইটি লিখে দেবেন।'

'থামুন, থামুন—'

'আমি থেমেই আছি, মি. ড্রিবস। তবে বেশিক্ষণ থেমে থাকতে পারব না। এমাসের শেষ নাগাদ উপন্যাসটি প্রকাশককে দেয়ার কথা।'

'একটা ব্যাপার আগে পরিষ্কার হয়ে নিই। আপনি বলছেন যে আপনার বইগুলো নিজে লেখেন না?'

'তাতে অবাক হওয়ার কী আছে? ওই হারামী আল বাযার্ডও তো নিজে লেখে না।'

'আপনি তা হলে ব্যাপারটা জানেন?'

'অবশ্যই জানি। তা হলে কেন আপনাকে এখানে নিয়ে এলাম?' ডানে-বামে মাথা নাড়লেন কনওয়ে ম্যান। 'আমাকে ভুল বুঝবেন না। এ কাজ আমি নিজেই করতে পারি, কিন্তু সম্প্রতি আমি রাইটার'স ব্লকে ভুগছি। কিছু লিখতে পারছি না।'

'কবে থেকে এর শুরু?'

'১৯৫৯ সাল থেকে,' লাল ক্যাপসুল মুখে পুরলেন লেখক। 'সামনে

অনেকগুলো কাজ পড়ে আছে আমার। সে কমিটমেন্টগুলো রক্ষা করতে হবে। বড়-বড় লেখকদের তাদের দায়িত্ব পালন করতেই হয়। এজন্য সৃষ্টিশীলতাকেও অনেক সময় কোরবানি দিতে হয়। সে যাক গে, এজন্যই আপনাকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে।'

'এবং এজন্যই আমি এখান থেকে বেরিয়ে যাব,' বলল জেরি।

'চল্লিশ হাজার ফুট উঁচু থেকে?' আবার কাঁধ ঝাঁকালেন কনওয়ে ম্যান। 'বেশ তো, আপনার যেমন অভিপ্রায়।'

'দেখুন,' চেঁচিয়ে উঠল জেরি। 'আপনি আমাকে কিডন্যাপ করেছেন। এটা একটা দণ্ডনীয় অপরাধ। আমি আপনার বিরুদ্ধে মামলা করব।'

'আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে আপনাকে আর পৃথিবীর আলো-বাতাস ভোগ করতে হবে না।'

'কিন্তু আমি কেন?' বলল জেরি। 'আপনার নিশ্চয় কোন গোস্ট রাইটার আছে যে আপনার নামে গল্প-উপন্যাস লিখছে। তার কী হয়েছে?'

'সে আর লিখবে না বলেছে,' বিড়বিড় করলেন কনওয়ে ম্যান। 'ওকে কোথায় কবর দেয়া হয়েছে দেখতে চান?'

কনওয়ে ম্যান, যাঁর খ্যাতি এবং সম্মান ধূলিসাৎ হতে চলেছে তিনি নিশ্চয় মিথ্যা কথা বলছেন না। তাঁর মোটা হাতটা আবার ডেস্ক ড্রয়ারের দিকে এগোতে দেখে জেরি আশঙ্কা করল এখন নিশ্চয় ওই হাতে ঝলসে উঠবে রিভলভার।

বদলে উঠে এল এক তাড়া ডলার।

'ছয় হাজার,' বললেন দাড়িঅলা, 'অ্যাডভান্স।'

'ছয় হাজার?'

'কিপপুস বাযার্ড এর চেয়ে আপনাকে কম দেয় বলেই আমি আমার গুপ্তচরদের কাছে শুনেছি,' মোটা হাতখানা বাড়িয়ে দিলেন তিনি। 'টাকাটা নিয়ে কেটে পড়ুন—কবে লেখাটা দিতে হবে জানেনই তো।'

'কিন্তু এক মাসের মধ্যে আমি গোটা একটা উপন্যাস লিখতে পারব বলে মনে হয় না,' বলল জেরি।

'পারবেন এবং আপনাকে পারতেই হবে,' বললেন কনওয়ে ম্যান। 'নইলে কপালে কী আছে জানেনই তো।'

কম্পিত হাতে টাকাগুলো পকেটে রাখল জেরি। 'আমি চেষ্টা করব,' বলল ও। 'তবে বইটি কী নিয়ে হবে তা কিন্তু আপনি আমাকে বলেননি।'

'উনিশ হাজার শব্দের মধ্যে বইটি লিখবেন,' টেবিলের ওপরে রাখা কাগজটির দিকে ইঙ্গিত করলেন কনওয়ে ম্যান। 'এ বিজ্ঞাপন দিয়ে গল্পের প্লট তেমন কিছু বোঝা যায় না। কাজেই আপনি আপনার মত করে লিখবেন। আপনি তো জানেনই পাঠক কী ধরনের লেখা পছন্দ করে। রাজনীতির অন্তরালে কী ঘটছে, সমাজের রাঘব বোয়ালরা কী করছে, ইত্যাদি। সম্ভব হলে স্যানফ্রান্সিসকোতে নেক্রোফিলিয়ার (জাদুবিদ্যার সাহায্যে মরা মানুষের সঙ্গে

আলাপচারিতা–অনুবাদক) একটু ছোঁয়া দেবেন, জাতিসংঘে প্রেতপূজার ঘটনা থাকবে, হোয়াইট হাউসে হবে উন্মত্ত যৌনাচার–আপনার ওপর সব ছেড়ে দিলাম।'

গভীর দম নিল জেরি। 'আমি যথাসাধ্য ভালটা দেয়ার চেষ্টা করব।'

'আপনার যথাসাধ্য ভালটা দিলে হবে না,' বললেন কনওয়ে ম্যান। 'আপনার সবচেয়ে জঘন্যটা দেবেন।'

চেয়ার ছাড়লেন তিনি, ডেস্ক ঘুরে এলেন, তাকালেন ঘড়ির দিকে। 'আমি পাইলটকে বলছি আপনাকে নামিয়ে দিতে। তারপর আমার ছেলেরা আপনাকে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে দেবে।'

'তার প্রয়োজন নেই।'

'প্রয়োজন আছে,' টিনটেড লেন্সের পেছনে সরু হয়ে এল কনওয়ে ম্যানের চাউনি। 'বই লেখা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওরা আপনার ওপর নজর রাখবে।'

'যদি বই লেখা শেষ না হয়?'

'তা হলে ওরা আপনাকে শেষ করে দেবে।'

'আপনার হুমকিতে আমি ডরাই না,' বলল জেরি। 'আমি পুলিশে ফোন করব–'

'পারবেন না। আপনার ফোনের লাইন কেটে দেয়া হয়েছে। আমার প্রকাশকের কাছে যদি বইটা ঠিক সময়ে পৌঁছে দিতে না পারি তা হলে আপনাকেও কেটে ফেলব।' জেরির কাঁধে হাত রেখে হাসলেন কনওয়ে ম্যান। 'বেঘোরে প্রাণটা হারাবেন কেন, ভাই? যা বলছি তাই করুন।'

সদুপদেশটি মাথায় নিল না জেরি। বাড়ি ফিরে দেখে তার অ্যাপার্টমেন্টের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে অ্যান।

'রাত ন'টা বাজে,' বলল অ্যান। 'আমি দু'ঘণ্টা ধরে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি। কোন্ চুলোয় গিয়েছিলে শুনি?'

'আমি আসলে একটা চুলোর মধ্যেই ছিলাম এতক্ষণ,' বলল জেরি, তাকাল গাড়িটির দিকে যেটি থেকে এইমাত্র নেমে এসেছে ও। ওটার হেডলাইটজোড়া জ্বলজ্বল করে জ্বলছে, গর্জন ছাড়ছে মোটর, লাফিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত প্যান্থারের মত মসৃণ শরীর নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে রয়েছে ফুটপাতের ওপর।

ওর চোখ অনুসরণ করে তাকাল অ্যান। হুইলের পেছনে বিরাটদেহী এক লোককে দেখতে পেল। তার পাশে বসে আছে ক্ষুদ্রকায় একজন মানুষ।

'প্লিজ, ডার্লিং, ভেতরে এসো,' অ্যানের হাত ধরে ওকে দরজার মধ্যে টেনে নিল জেরি। 'আমি সব ব্যাখ্যা করছি।'

'তাই ভাল।'

কিন্তু ঘরে ঢুকে যা শুনল তা মোটেই ভাল মনে হলো না অ্যানের কাছে।

'একী বলছ তুমি!' জেরির সন্ধ্যার অভিজ্ঞতা শুনে মন্তব্য করল অ্যান।

'বাযার্ডের জন্য উপন্যাস লিখতে তোমার কয়েক মাস সময় লেগেছে। আর ম্যান আশা করছে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তুমি তাকে উপন্যাস লিখে দেবে!'

'এটা কিছুতেই সম্ভব নয়,' সায় দিল জেরি। 'কিন্তু ও থেকে বেরুবার রাস্তাও নেই।'

'সে তুমি বেরুতে পারবে না,' বলল অ্যান। 'কিন্তু আমি যখন খুশি যেতে-আসতে পারব।'

'মানে?'

'মানে সহজ,' হাসল অ্যান। 'আমি এখন চলে যাচ্ছি। আমি বাড়ি পৌঁছেই পুলিশে ফোন করব। ওরা এখানে চলে আসবে এবং যা ঘটেছে তুমি ওদেরকে বলবে। ব্যস, তুমিও তখন ফ্রি।'

'বাহ্, চমৎকার!'

অ্যান হাসতে হাসতে দরজায় পা বাড়াল এবং খুলল। সঙ্গে সঙ্গে তার হাসিটা নিভে গেল দপ করে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই ছোট মানুষটি, স্ফীত চক্ষু। সে তার কোটের পকেটে যেখানে হাত রেখেছে, সেই জায়গাটিও স্ফীত।

'আপনার কথা আমি শুনে ফেলেছি, লেডি। কেউ পুলিশে খবর দিচ্ছে না।'

বিস্ফারিত হলো অ্যানের চোখ। 'তার মানে আপনারা আমাকে এখানে জেরির সঙ্গে আটকে রাখবেন?'

মাথা নাড়ল লোকটি। 'আমি তা বলিনি। যে কেউ মুদি দোকানে যেতে পারে, সে আপনিও হতে পারেন। তবে যখনই বেরুবেন, আপনার সঙ্গে আমি থাকব। আর আমার সঙ্গী নীচতলায় বসে আপনার বয়ফ্রেণ্ডের ওপর নজর রাখবে। বসের অর্ডার।'

জেরি চলে এসেছে। দুই ভুরু কোঁচকানো। 'আপনাদের বস সবকিছুর ওপর খেয়াল রাখেন, না?'

'হুম,' বিশ্রী হাসল ছোট মানুষটা। 'আপনার এখন চিন্তা করার সময়, বন্ধু। ভুলে যাবেন না আপনাকে একটি বই লিখতে হবে।'

পরের কয়েকটি দিন যেন ঝড়ের গতিতে কেটে যেতে লাগল। অ্যান বেশিরভাগ সময় লিভিংরুমে কাটায়, জেরির টাইপ-রাইটার বেডরুমের দরজার ওপাশে খটাখট শব্দ তুলতে থাকে। মাঝে-মাঝে বই পড়ে অ্যান, কখনও টিভি দেখে, আবার কখনও জানালা দিয়ে কালো লিমুজিনটির দিকে ঠায় তাকিয়ে থাকে। মাঝে-মধ্যে সে রাস্তায় একটু আধটু হাঁটাহাঁটি করে, সুপারমার্কেটে যায় কেনাকাটা করতে, কিন্তু সর্বদা তার সঙ্গে একজন পাহারায় থাকে। অ্যান ছোট মানুষটির সঙ্গে কথা বলে না, খর্বাকৃতির লোকটিও অ্যানের সঙ্গে বাতচিত করার প্রয়োজন বোধ করে না। জেরি যখন শোবার ঘর থেকে খাওয়ার জন্য বেরিয়ে আসে তখন তার সঙ্গে কদাচিৎ কথা হয় অ্যানের।

জেরির বিধ্বস্ত চেহারা দেখলেই সব বোঝা যায়। সে ডেডলাইনের বিরুদ্ধে

ছুটছে, নিজের জান বাঁচানোর জন্য ছুটছে, এসময় তাকে প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করে বিরক্ত করতে চায় না অ্যান।

কিন্তু মাসের শেষের দিকে, যখন সময় প্রায় একদমই নেই, একটি মুহূর্ত এল যে অ্যান আর নীরব থাকতে পারল না।

কিচেন টেবিলে বসে কফি পান করছিল দু'জনে, জেরির কংকালসার দেহ আর চকচকে চোখের চাউনি সহ্য করতে পারছিল না অ্যান। তার ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বিস্ফোরিত হলো প্রশ্নটি, যে প্রশ্ন সকল লেখককেই ভীত করে তোলে।

'লেখা কেমন চলছে?' জিজ্ঞেস করল অ্যান।

মাথা নাড়ল জেরি। 'চলছে না,' বিড়বিড় করল সে।

'তার মানে নির্ধারিত সময়ে শেষ করতে পারবে না?'

'শুরুই করিনি এখনও।'

'শুরু করনি?' অ্যানের কপালে ভাঁজ। 'কিন্তু তুমি তো দিনরাত টাইপ করছ।'

'রাতে টাইপ করি, কারণ ঘুম আসে না। আর দিনের বেলা ছাইপাঁশ কী লিখছি সে চিন্তায় রাতে ঘুমাতে পারি না। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা নতুন নতুন শুরু হচ্ছে–কিন্তু একটারও কোন মাথামুণ্ডু নেই, সবগুলোর জায়গা হবে ময়লা ফেলার ঝুড়িতে। আমার ভয় লাগছে ভেবে, অবশেষে এটা ঘটেছে, যেভাবে ঘটেছে আল বাযার্ড এবং কনওয়ে ম্যানের জীবনে।'

'মানে?'

'তাঁরা যখন লেখা শুরু করেন, নিজেদের গল্প নিজেরাই লিখতেন। তারপর ধীরে-ধীরে ওটা তাঁদেরকে পেয়ে বসে। একই জিনিস নিয়ে সারাজীবন কেউ চলতে পারে না–প্রতিদিন দুর্নীতি, নিষ্ঠুরতা, মারামারি কাটাকাটি, অনাচার, ভোয়েয়ারিজম (যে লোক লুকিয়ে মানুষের যৌনমিলন দেখে মজা পায়–অনুবাদক), ধর্ষকাম। এসব লিখে লিখে তাঁরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাই তাঁরা গোস্ট রাইটার ভাড়া করেন, আমার মত লেখকদের দিয়ে লেখাতে শুরু করেন। সমস্যা হলো সেই একই জিনিস এখন আমার জীবনেও ঘটেছে।' জেরি তার যন্ত্রণাকাতর মুখখানা তুলল। 'ওই ধর্ষণ আর খুনের কথা লিখে লিখে আমিও বেজায় ক্লান্ত। আমার কলম আর চলতে চাইছে না। এমনকী জ্যাক দ্য রিপার হলেও শেষে সে খুনখারাবী ছেড়ে দিত।'

চেয়ার ছাড়ল অ্যান, চলে এল পরিচিত মানুষটির কাছে। 'আমার কথা শোনো,' নরম গলায় বলল সে। 'এত হতাশ হয়ো না। তোমাকে যা করতে হবে তা হলো বাযার্ডের শেষ চ্যাপ্টারটা শেষ করা। তুমি যদি আরেকটু এগোতে পারো–'

'তুমি আমার কথা বুঝতে পারছ না?' টেবিলের ওপর দুম করে ঘুষি মারল জেরি। 'এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমি চব্বিশ ঘণ্টা টাইপ-রাইটার নিয়ে পড়ে থাকলেও ডেডলাইন অনুযায়ী কিছুতেই শেষ করতে পারব না লেখা। হাতে একদমই সময় নেই।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে লিভিংরুমে হেঁটে গেল অ্যান। পেছন পেছন গেল জেরি। দু'জনে মিলে জানালা দিয়ে তাকাল বাইরে, ফুটপাতে হামাগুড়ি দিয়ে রয়েছে কালো গাড়িটি। অপেক্ষা করছে। ওরা দু'জন কেউ কোন কথা বলছে না। কথা বলে এখন কোন লাভও হবে না–যদি না আগামী তিনদিনের মধ্যে জেরি উনিশ হাজার শব্দ ফুটিয়ে তুলতে পারে কাগজের গায়ে।

নীরবতা ভঙ্গ করল অ্যান। চেহারা এবং কণ্ঠস্বর দুটোতেই চিন্তার ছাপ।

'মনে হয় এটাই সবচেয়ে ভাল হবে,' বলল সে।

'বুঝলাম না।'

'তুমি সময়মত কাজটা শেষ করতে পারলেও খুব একটা লাভ হত না। প্রথমে ভেবেছিলাম এটা বুঝি ঈশ্বরের একটা অনুগ্রহ। আর বাযার্ডের কাছ থেকে পাওয়া সাড়ে চার হাজার ডলার, আর কনওয়ে ম্যানের দেয়া অ্যাডভান্স ছয় হাজার–সব মিলিয়ে সাড়ে দশ হাজার ডলার। অনেক টাকা। এ টাকা দিয়ে তুমি অবশেষে নিজের নামে একটি বই লিখতে পারতে। কিন্তু এখন কিছু আসে যায় না, তাই না? তুমি তো বললেই আর লিখতে পারবে না–'

'আমি কক্ষনো তা বলিনি!' জেরি শক্ত করে চেপে ধরল অ্যানের হাত। 'আমি বলেছি আমি আর সেক্স এবং ভায়োলেন্স লিখতে পারব না। আমি যে উপন্যাসটি লিখতে চাই তা হবে অন্যরকম। কোন যৌন সুড়সুড়ি থাকবে না, সস্তা অ্যান্টি হিরো থাকবে না, সেলেব্রিটিরা ছদ্মনামে কাউকে প্রতারণা করবে না। আমার বইয়ের পাত্র-পাত্রীরা হবে সাধারণ মানুষজন, আমরা নিত্যদিন যেসব সমস্যার মুখোমুখি হই তাদেরকেও সেসব সমস্যা মোকাবেলা করে চলতে হবে।'

'কিন্তু এরকম বই কি বিক্রি হবে?'

অ্যানের গলায় সন্দেহের সুর থাকলেও জেরির কণ্ঠে তা নেই। 'কেন বিক্রি হবে না? অন্তত পাঠকদেরকে আমি বাস্তব কিছু দিতে পারব, তারা বিষয়টি নিয়ে ভাববে, চিন্তা করবে। বাযার্ড এবং ম্যান যেসব পর্নো রূপকথা তৈরি করেছেন ওতে শুধু গৎবাঁধা কাহিনিই আছে–একটা থেকে আরেকটাকে আলাদা করার উপায় নেই। আমি প্রকৃত সাহিত্যের কথা বলছি।'

অ্যানের চাউনি থেকে সন্দেহ যায় না। 'তুমি তোমার বইটা প্রমোট করবে কীভাবে?'

'একটি সৎবই চালানোর জন্য ঢাকঢোল পেটানোর দরকার নেই,' বলল জেরি। 'একজন ভাল লেখক কখনও অপযশ চান না। থ্যাকারের কথা চিন্তা করো–তাঁর কি ইয়ট ছিল? হেনরি জেমস কি মাথায় হাস্যকর টুপি চাপিয়ে লিয়ার জেটে ঘুরে বেড়াতেন? জেন অস্টেন কি ব্যভিচার করতেন? শেক্সপীয়রকে কি কোনদিন লেটনাইট টকশোতে দেখা গেছে?'

'ভাবছি বিষয়টি নিয়ে,' অ্যান বলল ওকে। তার গলার স্বর কেমন অদ্ভুত শোনাল। 'জেরি, আমার একটা কাজ করে দাও। আমার সঙ্গে এক মিনিটের জন্য বেডরুমে চলো। তোমার ফাইলপত্র কোথায় থাকে একটু দেখিয়ে দেবে।'

ওরা দু'জনে মিলে শয়নকক্ষে প্রবেশ করল। 'এই ক্যাবিনেটটাতে থাকে।'

'ও আচ্ছা,' তবে ফাইল ক্যাবিনেট নয়, অ্যানের চোখ ঘুরছে জেরির টেবিলে–দেখছে টাইপ-রাইটার, কাগজ, ভারী পেপারওয়েটের নীচে চাপা দিয়ে রাখা কার্বন পেপার। তার চাউনি সরু হয়ে এল। 'জেরি–তোমার নিজের বইটা। সত্যি তুমি ওটা লিখতে চাও?'

'পৃথিবীর যে কোন কিছুর চেয়ে বেশি চাই।'

'এবং তুমি নিশ্চিত বইটি বিক্রি হবে?'

মাথা ঝাঁকাল জেরি। ঘুরল। 'আমার অনুমান ভুল প্রমাণিত হলে আমি হয়তো হার্ট-অ্যাটাকেই মারা যাব।'

আর ঠিক তখন অ্যান ওর মাথার পেছনে পেপারওয়েট দিয়ে বাড়ি মারল...

'মারা গেছি,' গোঙাচ্ছে জেরি। 'আমি মরে গেছি–'

'উঠে পড়ো,' অ্যান ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকাচ্ছে। 'তুমি মারা যাওনি।'

চোখ মেলে চাইল জেরি। অন্ধকার ঘর। শুধু অ্যানের ছায়া-ছায়া মুখখানা দেখা যাচ্ছে। উদ্বিগ্ন চেহারা নিয়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

'তুমি আমাকে মারলে কেন?' উঠে বসল জেরি, মাথার পেছনে গজিয়ে ওঠা আলুটা ডলছে।

'পরে ব্যাখ্যা দেব। এখন কথা বলার সময় নেই। এখান থেকে বেরুতে হবে।'

'গুণ্ডাগুলো?'

'নিজেই দেখো।'

টলতে টলতে লিভিংরুমে ঢুকল জেরি। চলে এল জানালার সামনে। তাকাল নীচে।

কালো লিমুজিনটা নেই। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে অ্যানের গাড়ি।

'চলো,' বলল অ্যান। 'এয়ারপোর্টে যাব। গাড়িতে তোমার ব্যাগ গুছিয়ে রেখেছি।'

'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'কোস্টারিকা।'

ভুরু কোঁচকাল জেরি। 'বুঝলাম না।'

'পরে বুঝবে।'

প্লেন আকাশে ওড়ার পরে বুঝতে পারল জেরি।

'তুমি নিজের উপন্যাস লিখতে চাও শুনে আমি খুব অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম,' অ্যান বলল ওকে। 'তখন মাথায় আইডিয়াটা চলে আসে। তোমাকে পেপারওয়েট দিয়ে মারার জন্য দুঃখিত, কিন্তু আমি জানতাম নিজে থেকে কাজটি করতে কিছুতেই তুমি রাজি হতে না।'

'কীসে রাজি হতাম না?'

'কনওয়ে ম্যানের নতুন উপন্যাস তাঁর প্রকাশককে পৌঁছে দিতে।'

'কিন্তু কোন নতুন উপন্যাসই তো লেখা হয়নি।'

'এখন হয়েছে। আমি আল বাযার্ডের পাণ্ডুলিপির একটা কার্বন কপি নিয়েছিলাম। ওটা পড়ার পরে শুধু চরিত্রগুলোর নাম বদলে দিয়েছি।'

'তার মানে তুমি দুই প্রকাশককে একই বই দিয়েছ?'

'শেষ অধ্যায়টিসহ,' মাথা দোলাল অ্যান। 'তুমি নিজেই বলেছ ওঁদের দু'জনের কাহিনির ধরন একইরকম।'

'এজন্যেই কনওয়ে ম্যানের গুণ্ডারা আমাদেরকে ছেড়ে দিয়েছে।'

'হুঁ। স্ক্রিবলারস অ্যাণ্ড সন্সের অফিসে পাণ্ডুলিপি পৌঁছার পরে ওরা চলে গেছে। আমরাও চলে এসেছি।'

'কিন্তু কোস্টারিকা কেন?'

'এদেশে কোন এক্সট্রাডিশন ল নেই। ম্যান এবং বাযার্ড আমাদের সন্ধান পেলেও কেউ তোমার টিকিটিও স্পর্শ করতে পারবে না। তোমার কাছে নগদ টাকা আছে, এ দিয়ে বছরখানেক আমরা দিব্যি চলতে পারব। তুমি এই ফাঁকে তোমার বইটি লিখে ফেলতে পারবে।' হাসল অ্যান। 'তা ছাড়া, ডার্লিং, তুমি যা বলেছ তা যদি সত্যি হয়, কেউ কিছু বুঝতেই পারবে না। বাযার্ড, ম্যান, কিংবা প্রকাশক–কেউ নয়, পাঠকদের তো প্রশ্নই আসে না।'

গুঙিয়ে উঠল জেরি। 'হয়তো ঠিকই বলেছ তুমি।'

ওর হাত চাপড়ে দিল অ্যান। 'আমি জানি আমি ঠিক বলেছি।'

এবং অ্যানের কথাই শেষমেশ ফলল।

মাসখানেক বাদে দ্য অ্যারিস্টোক্রেটস এমন হিট করল যে আল বাযার্ড নতুন একটি ইয়ট কিনে ফেললেন, তাতে দুটি সুইমিং পুল, একটিতে পানির বদলে শুধু শ্যাম্পেন দিয়ে ভরে রাখলেন তিনি। আর দ্য টেস্টমেকারস আরও বেশি সাফল্য পেল। কনওয়ে ম্যান কিনলেন জ্যাকসন পোলক, ভ্যান গখ এবং রেমব্রান্টের তিনটি অরিজিনাল ছবি, সে সঙ্গে আরেকটি নতুন হ্যাট।

জেরি ক্রিবস অবশেষে তার নিজের উপন্যাসটি লিখে ফেলল। নিজের নামেই বের হলো সে বই। বইটি হয়তো আপনি পড়েছেন। আবার না-ও পড়তে পারেন।

বইটি মাত্র ১৪৮ কপি বিক্রি হয়েছে!

মূলঃ রবার্ট ব্লচ

কিড কারডুলা

জিমনাশিয়াম বন্ধ করতে যাচ্ছি এমন সময় এই লম্বা আগন্তুকটির আগমন ঘটল।

তার মাথায় কালো হ্যাট, পরনে কালো সুট, কালো টপকোট, হাতে একটি জিপার ব্যাগ। তার চোখও কালো। 'শুনেছি আপনি বক্সারদের নিয়ে কাজ করেন?'

কাঁধ ঝাঁকালাম আমি। 'আমার সময়ে কিছু ভাল ছেলে নিয়ে কাজ করেছি আমি।'

হ্যাঁ, ছেলেগুলো ভালই ছিল তবে দুর্দান্ত বক্সার বলা যাবে না কাউকেই। তবু ওদের মধ্যে সবার সেরা ছিল চ্যাপি স্ট্রাউস। রিং ম্যাগাজিন ওকে লাইটওয়েট বিভাগের তালিকায় দশ নাম্বারে জায়গা দিয়েছিল। সে ওই একবারই। ওকে ওই পর্যন্ত তুলতে খুব সাবধানে লড়াই নির্বাচন করতে হয়েছে আমাকে। তারপর ওর সঙ্গে গালানিও'র পরিচয় হয়। আর ওটাই ওর ধ্বংস ডেকে আনে। ওর অবসরের সময় হয়ে গেছে, এ কথা বলার আগেই দেখি সে তার পরবর্তী চারটি লড়াইতে হেরে বসে আছে।

'আমি আপনার সঙ্গে কাজ করতে চাই,' বলল আগন্তুক। 'আমি ফাইট রিং-এ প্রবেশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

আমি আগন্তুকের আপাদমস্তক চোখ বুলালাম। বেশ সুগঠিত চেহারা, ওজন অনুমান করলাম একশ নব্বুই পাউণ্ড হবে। উচ্চতা সম্ভবত ছয় ফুট এক। তবে তার মুখখানা কেমন ফ্যাকাসে, যেন অনেকদিন সূর্যের মুখ দেখেনি। তা ছাড়া তার বয়সেরও একটা ব্যাপার আছে। বয়স অনুমান করা শক্ত, তবে একেবারে বাচ্চা ছেলেও নয়।

'তোমার বয়স কত?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

নড়ে উঠল সে। 'বক্সারের জন্য আদর্শ বয়স কত হওয়া দরকার?'

'মিস্টার,' বললাম আমি, 'এ রাজ্যে চল্লিশোর্ধ্ব কেউ বক্সিং রিং-এ পা রাখতে পারে না।'

'আমার বয়স ত্রিশ,' দ্রুত বলল সে। 'বয়স প্রমাণ করার জন্য বার্থ সার্টিফিকেটও দেখাতে পারি।'

আমি মৃদু হাসলাম। 'শোনো, এ খেলার জন্য ত্রিশ বছর অনেক বেশি। এটা শুরু করার বয়স নয়।'

তার চোখ ঝিকিয়ে উঠল। 'কিন্তু আমার গায়ে অনেক বল। আমি অবিশ্বাস্য শক্তিমান।'

আমার মৃদু হাসিটি প্রসারিত হলো। 'কবি যেমন বলেছেন তোমার গায়ে দশজনের শক্তি, কারণ তোমার হৃদয়টি খাঁটি?'

মাথা ঝাঁকাল সে। 'সত্যি আমার গায়ে দশজন মানুষ সমান শক্তি আছে। তবে সেটা ওই খাঁটি হৃদয়ের জন্য নয়। আমার গায়ে এত শক্তি থাকার কারণে মনে হলো এটাকে পুঁজি করে তো আমি টাকা কামাই করতে পারব। বৈধভাবে।'

সে জিপার ব্যাগটি মেঝেতে নামিয়ে রেখে ম্যাটের দিকে হেঁটে গেল। ওখানে এক সেট বারবেল রাখা আছে। শিশুর খেলনার মত ঝট করে বারবেল সেটটি তুলে নিল সে।

বারবেলটির ওজন কত আমি জানি না, কারণ ওয়েট লিফটিং আমার জায়গা নয়। তবে উইসনিস্কিকে কিছুক্ষণ আগে ওই বারবেল নিয়ে ভারোত্তোলন করতে দেখেছি। সে একজন হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন হওয়া সত্ত্বেও বারবেল তুলতে ঘেমে যাচ্ছিল, নাক দিয়ে ফোঁস ফোঁস শ্বাস নিচ্ছিল।

যুবককে বারবেল সেটটি হেলায় তুলে নিতে দেখে আমি চমৎকৃত হলাম বটে, তবে তার প্রতি খুব বেশি আগ্রহ বোধ করলাম না। 'হুঁ, তোমার গায়ে শক্তি আছে। বুঝতে পারছি। এখানে কয়েকজন ভারোত্তোলনকারী আছে। তাদের সঙ্গে তুমি কাজ করতে পারো। ওদের একটা ক্লাবও আছে।'

কটমট করে তাকাল সে। 'ভারোত্তোলনে কোন পয়সা নাই। আর আমার অনেক টাকার দরকার।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। 'টাকা-পয়সা নিয়ে কখনও চিন্তা করতে হয়নি আমাকে। যখনই দরকার পড়েছে, নিজের কাছে জমানো টাকা খরচ করেছি। কিন্তু একদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ করেই আবিষ্কার করলাম আমার জমানো টাকা-পয়সা সব ফুরিয়ে গেছে। আর তখন খুব হতাশ লাগছিল।'

আমি আবার তার দিকে তাকালাম। যুবকের বেশভূষা বেশ দামি, তবে পুরানো মনে হচ্ছে, যেন অনেকদিন ধরে পরছে এবং সম্ভবত এ জামাকাপড় পরেই সে ঘুমায়।

'আমি খবরের কাগজ পড়ি,' বলল সে, 'ক্রীড়াপাতাসহ, দেখলাম কম পরিশ্রমেই বক্সিং খেলে ভাল টাকা-পয়সা আয় করা যায়।' জিপার ব্যাগে ইঙ্গিত করল। 'পুরোপুরি কপর্দকহীন হওয়ার আগে আমি বক্সিং ট্র্যাক এবং জুতো কিনে নিয়েছিলাম। শুধু বক্সিং গ্লাভস ধার করতে হবে।'

একটা ভুরু তুললাম আমি। 'তার মানে তুমি এখনই কারও সঙ্গে লড়াই করতে চাইছ?'

'ঠিক তাই।'

আমি জিমনাশিয়ামের ফ্লোরের দিকে তাকালাম। প্রায় সবাই চলে গেছে, শুধু আলফি বোগান বাদে।

সে একটা হেভি ব্যাগ নিয়ে ঠোকাঠুকি করছে।

আলফি বোগান ভাল বক্সার এবং খুব পরিশ্রমী। ওর ঘুষিতে অনেক জোর, রিং-এ উঠলে ওকে নিয়ে অনেকেই আশা করে। এ পর্যন্ত ছ'টা লড়াই ও জিতেছে, তিনটা নক আউট পেয়েছে, তিনটা রেফারি ও বিচারকদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী। তবে ওর ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব বেশি আশাবাদী নই। শীর্ষে ওঠার মত জিনিস ওর

ভেতরে তেমন নেই।

ঠিক আছে, মনে মনে বললাম আমি। কালো সুটধারী এ যুবককে একবার চেষ্টা করার সুযোগ দিই না কেন? ঝামেলাটা মিটিয়ে দ্রুত বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ব। অফিসেই আমার জন্য একটি খাটিয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

আমি আলফিকে ডেকে বললাম, 'এই যুবকটি তোমার সঙ্গে রিং-এ কয়েক রাউণ্ড খেলতে চায়।'

আলফি রাজি। যুবক লকার রুমে ঢুকল। কালো ট্র্যাক পরে একটু পরেই বেরিয়ে এল।

আমি তার হাতে গ্লাভস বেঁধে দিলাম। আলফি রিং-এ ঢুকল। চলে গেল বিপরীত কিনারে।

আমি একটি নতুন সিগারের র‍্যাপার খুলে ঘণ্টা বাজিয়ে সিগারে আগুন ধরাতে গেলাম।

নিজের কর্নার থেকে হামলা চালাল আলফি, যেভাবে বরাবর করে থাকে। রিং-এর খানিকটা রাস্তা পাড়ি দিয়ে ডান এবং বাম হাতে হুক চালাল। আগন্তুক সহজেই এড়িয়ে গেল ঘুষি দুটো। তারপর তার বাম হাতটা ঝলসে উঠল। আপনি দেখতেই পাবেন না ঘুষিটা, শুধু দেখবেন ঘটনাটা ঘটে গেল। আলফির থুতনিতে আঘাত হানল যুবকের হাত এবং আলফি ডিগবাজি খেয়ে পড়ে গেল ক্যানভাসের ওপর। আর নড়াচড়া করল না। তার মানে অজ্ঞান হয়ে গেছে।

দেশলাইটি আমার হাতে পুড়ছিল। সিগার ধরাতে ভুলেই গিয়েছিলাম। এক ফুঁয়ে নিভিয়ে দিলাম আগুন। তারপর সিঁড়ি বেয়ে রিং-এ উঠে এলাম। তাকালাম আলফির দিকে। শ্বাস নিচ্ছে, তবে শীঘ্রি জ্ঞান ফিরবে বলে মনে হয় না।

আমার মত দীর্ঘদিন বক্সিং লড়াইয়ের ম্যানেজার ও কোচ হিসেবে কাজ করলে একজন ফাইটারকে চিনে নিতে আপনার দীর্ঘ সময় পরখ করার প্রয়োজন হবে না। বাম হাতের ওই একটি মাত্র ঘুষি–আঘাতের শব্দ–আমার হৃৎস্পন্দন বাড়িয়ে দিয়েছিল কয়েকগুণ।

আলফির জায়গায় কাউকে দেয়া যায় কি না সে আশায় জিমনাশিয়ামের চারপাশে তাকালাম। কিন্তু আগেই বলেছি ওটা শূন্য। আমি জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটলাম। 'কিড, তোমার ডান হাতের কী অবস্থা? বাম হাতের মতই ওটা দিয়ে মারতে পার?'

'ডান হাত দিয়ে আমি আরও জোরে মারতে পারি।'

সম্ভাবনার কথা ভাবতেই আমার শরীর ঘেমে গেল। 'কিড, তোমার পাঞ্চ আমাকে বেশ মুগ্ধ করেছে। স্বীকার করছি। তবে বক্সিং-এর খেলায় পাঞ্চ মারতে পারলেই শুধু চলে না, ঘুষি নেয়ার ক্ষমতাও থাকতে হয়। আছে সে ক্ষমতা?'

সে বাচ্চা ছেলেদের মতই হাসল। 'অবশ্যই। প্লিজ, একবার হিট করুন না।'

কেন নয়? ভাবলাম আমি। এ যুবক পাঞ্চ কতটুকু সহ্য করতে পারে দেখা যাক। আমি আলফির ডান হাতের গ্লাভ খুলে নিজের হাতে পরলাম।

আমার সময়ে–সেটা আজ থেকে ত্রিশ বছর আগের কথা–আমিও অনেক বক্সিং করেছি। অনেককেই মেরে তুলোধুনো করেছি। আমার গায়ে এখনও শক্তি কম নেই। কাজেই গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে ছেলেটির ডান থুতনি বরাবর বিরাশি সিক্কার এক ঘুষি চালিয়ে দিলাম।

ঘুষি মারার সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখে জল এসে গেল, আমি রিং-এর ওপর লাফাতে লাগলাম প্রচণ্ড ব্যথায়। মনে হলো নিরেট পাথরে আঘাত হেনেছি। আমার হাতটাই বুঝি ভেঙে গেছে। অথচ ছোকরা দিব্যি দাঁড়িয়ে মুচকি হাসছে। তার চুল পর্যন্ত এলোমেলো হয়নি।

এদিকে আলফির জ্ঞান ফিরে এসেছে। আমি তখন পরীক্ষা করে দেখছি আমার হাতের কোন আঙুল ভেঙে-টেঙে গেছে কি না। ভাঙেনি দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

গোঙাতে গোঙাতে, টলতে টলতে সিধে হলো আলফি। আবার লড়াই করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। 'ওই পাঞ্চটা হঠাৎ করে লেগে গিয়েছিল,' বলল ও। 'লাকি পাঞ্চ।'

'আজ রাতে আর কোন ফাইট নয়, আলফি,' বললাম আমি। 'পরে আবার কখনও হবে।' আমি ওকে শাওয়ারে পাঠিয়ে দিলাম এবং আগন্তুককে নিয়ে চলে এলাম নিজের অফিসে।

'তোমার নাম কী?'

'কারডুলা নামে আমাকে সবাই চেনে।'

কারডুলা? বোধকরি পুয়ের্তোরিকান। ওর উচ্চারণটাও ভিনদেশী। 'ঠিক আছে,' বললাম আমি, 'আজ থেকে তুমি কিড কারডুলা। আর আমাকে ম্যানি বলে ডেকো।' একটা সিগার ধরালাম। 'কিড, আমি হয়তো তোমাকে কাজে লাগাতে পারব। তবে সবার আগে সবকিছুর বৈধতার প্রয়োজন। কাল সকালেই আমরা আমাদের ল-ইয়ারের সঙ্গে কথা বলব এবং সে আমাদেরকে কাজ করার জন্য বৈধ কাগজপত্র তৈরি করে দেবে।'

কেমন উৎকণ্ঠিত দেখাল কিড কারডুলাকে। 'দুঃখিত, আমি কাল সকালে আসতে পারব না। বিকেলেও আসা সম্ভব নয়। আসলে সকালে কিংবা বিকেলে কখনওই আসতে পারব না আমি।'

কপালে ভাঁজ পড়ল আমার। 'কেন?'

'আমার একটা অসুখ আছে। ফটোফোবিয়া।'

'ফটোফোবিয়া আবার কীরকম অসুখ?'

'আমি সূর্যের আলো একদম সহ্য করতে পারি না।'

'তোমার শরীরে কি র‍্যাশ জাতীয় কিছু ওঠে?'

'তারচেয়েও খারাপ অবস্থা হয়।'

আমি সিগার চিবুতে চিবুতে বললাম, 'এই ফটোফোবিয়া কি তোমার ফাইটে কোন সমস্যার সৃষ্টি করে?'

‘ঠিক তা নয়। আসলে এটি আমার শক্তির ওপর প্রভাব ফেলে। কাজেই আমাকে রাতের বেলা ফাইট করতে হবে।’

‘তাতে সমস্যা নেই। বক্সিং ম্যাচগুলো সব রাতের বেলাতেই হয়।’ আমি একটু ভেবে যোগ করলাম, ‘কিড়, তোমার এই ফটোফোবিয়ার কথা স্টেট মেডিকেল কমিশনের কাছে বলার কোন দরকার নেই। জানি না ব্যাপারটা আবার ওরা কীভাবে নেবে। তবু আমরা কোন ঝুঁকির মধ্যে যাব না। এই ফটোফোবিয়া কোন কৌশল নয় তো?’

‘না, না। সেরকম কিছু না।’ এবারে তার মুখের হাসি একটু চওড়া হলো। ও খানিক আগে কেন মুখ টিপে হাসছিল সে রহস্য এখন উদ্‌ঘাটিত হলো। তার মুখের দুই পাশের দুটি দাঁত অন্যগুলোর চেয়ে বড়। আমার নিজের যদি ওরকম দুটো কুকুরে শ্বদন্ত থাকত আমি অবশ্যই তা তুলে ফেলতাম, সে দাঁতে গর্ত থাকুক আর না-ই থাকুক।

সে কেশে পরিষ্কার করে নিল গলা। ‘ম্যানি, আমার ভবিষ্যতের উপার্জন থেকে কি কিছু অ্যাডভান্স দেয়া যাবে?’

প্রথম পরিচয়েই কেউ যদি এভাবে আমার কাছে আগাম অর্থ দাবি করত আমি স্রেফ তাকে জাহান্নামে যেতে বলতাম। কিন্তু কিড কারডুলা এবং তার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে এই প্রথম একটু ব্যতিক্রম করলাম।

‘নিশ্চয়, কিড,’ বললাম আমি। ‘খাবারের টাকার শর্ট পড়ে গেছে, না?’

‘খাবারের টাকা নিয়ে আমি চিন্তা করি না,’ বলল কিড। ‘কিন্তু বাড়িঅলা হুমকি দিয়েছে ভাড়ার টাকা শোধ না করলে বাড়ি থেকে বের করে দেবে।’

পরদিন সকাল এগারোটায় হানাহানের ফোন এল। শনিবার রাতে ম্যাককার্ডল এবং জ্যাবললকিকের ফাইট। ম্যাককার্ডল হলো হানাহানের গর্ব এবং আনন্দ। সে একজন হেভিওয়েট, রয়েছে নিজস্ব স্টাইল এবং গতি। বয়সেও তরুণ। খুব সাবধানে তাকে ব্যবহার করছে হানাহান। ম্যাককার্ডল হয়তো কোনদিনই চ্যাম্পিয়ন হতে পারবে না, তবে অবসরের আগে বড় অংকের কিছু লড়াইতে অংশ নিয়ে মোটা টাকা কামাতে পারবে।

‘ম্যানি,’ বলল হানাহান, ‘শনিবারের লড়াই নিয়ে একটা ঝামেলায় পড়েছি। জ্যাবললকিক ভাইরাস জ্বরে আক্রান্ত, কাজেই ফাইটে অংশ নিতে পারছে না। ওর খালি জায়গাটা পূরণ করার জন্য কাউকে দরকার। তোমার খোঁজে এরকম কোন ফাইটার আছে?’

জ্যাবললকিক ১৮টি ফাইটে জিতেছে, ১০টিতে হেরেছে, কাগজে ছাপা হওয়া এ রেকর্ড দেখলে মন্দ বলে মনে হয় না, তবে একথা উল্লেখ করা হয়নি যে ছ'টি লড়াইতেই সে নক আউট হয়েছে। কাজেই আমি জানি জ্যাবললকিকের বিকল্প হিসেবে কী ধরনের ফাইটার হানাহানের প্রয়োজন।

আমি একটু চিন্তা করলাম। এ মুহূর্তে জিমনাশিয়ামে তিন-চারজন অভিজ্ঞ বক্সার আছে এবং তারা টাকার বিনিময়ে মার খেতেও আপত্তি করবে না।

এমন সময় কিড কারডুলার কথা মনে পড়ে গেল।

সাধারণত নতুন কোন ছেলে বক্সিং-এ এলে তাকে দিয়ে তিন রাউণ্ডের প্রিলিমিনারিতে আমি খেলাই; তবে আমার মনে হচ্ছিল কিড কারডুলাকে দিয়ে অন্যদের চেয়ে ভাল কিছু দেখাতে পারব।

আমি ফোনে বললাম, 'ঠিক আছে, হানাহান। এমুহূর্তে নতুন একটি ছেলের কথাই মনে পড়ছে। গত রাতে এসেছিল আমার কাছে। কিড কারডুলা।'

'এরকম নামের কোন বক্সারের কথা তো শুনিনি। সে ক'টা খেলায় জিতেছে এবং হেরেছে?'

'ঠিক জানি না। বিদেশী এক ফাইটার। বোধহয় পুয়ের্তোরিকান। ওর রেকর্ড এখনও হাতে পাইনি।'

সতর্ক সুরে জানতে চাইল হানাহান, 'তুমি ওর ফাইট দেখেছ?'

'ওকে পরীক্ষা করতে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য রিং-এ তুলেছিলাম। ওর বাম হাতের মার বেশ ভাল, তবে ডান হাতেরটা এখনও দেখিনি। ডান হাতে সে কেমন পাঞ্চ কষতে পারে জানিও না।'

আগ্রহ বোধ করল হানাহান। 'আর কিছু?'

'দলামোচড়া একটা সুট পরে এসেছিল সে। কিছুক্ষণ তার দুঃখের পাঁচালী শোনাল। বয়সও পঁয়ত্রিশের কম নয় বলে মনে হচ্ছে।'

খুশি হলো হানাহান। 'বেশ। বেশ। তবে খুব দুর্বল কাউকে আমি চাইছি না। দু'এক রাউণ্ড টিকতে পারবে তো?'

'হানাহান, আমি কোনকিছুর গ্যারাণ্টি দিচ্ছি না, তবে মনে হয় পারবে।'

পরদিন সন্ধ্যায় শরীর চর্চা কেন্দ্রে এসে হাজির হলো কিড কারডুলা। আমি দ্রুত তাকে আমার আইনজীবীর কাছে নিয়ে গেলাম। তারপর অ্যারেনায় গিয়ে ওর ওজন মাপা হলো, শরীর পরীক্ষা করে দেখা হলো। ওখানে বসেই কাগজপত্রে সই হয়ে গেল। রাতের লড়াইয়ের শতকরা দশ ভাগ আমি ম্যানেজার হিসেবে পাব।

আমি কিড কারডুলাকে একটি রোব দিলাম। ওটার পেছনে কিছু লেখা নেই। তবে রোবটি কালো রঙের। ওর প্রিয় রঙ। আমরা অ্যারেনায় চলে এলাম।

ম্যাককার্ডল স্থানীয়। কাজেই তার ভক্ত সংখ্যা কম নয়। তার ফাইট দেখতে অর্ধেকের বেশি পড়শী আজ অ্যারেনায় এসে হাজির।

আমরা রিং-এর ভেতরে কিছুক্ষণ বসে রইলাম। তারপর বেল বাজতেই ম্যাককার্ডল শূন্যে ক্রসের একটা চিহ্ন এঁকে তার কর্নার থেকে নাচতে-নাচতে বেরিয়ে এল।

নিজের জায়গা থেকে এক ইঞ্চিও সরল না কিড কারডুলা। আমার দিকে ফিরল সে, ভীত চেহারা। 'ম্যাককার্ডলকেও কি ওটা করতে হবে?'

'কী করতে হবে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'দ্যাখো, কিড, এখন ভয়ে জবুথুবু হওয়ার সময় নয়। যাও, ফাইট করো গে।'

কিড মুখ ঘুরিয়ে রেফারি এবং ম্যাককার্ডলকে দেখল। ওরা দু'জন রিং-এর

মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। গভীর একটা দম নিল সে, ঘুরল এবং আমাদের কর্নার থেকে বেরিয়ে গেল।

তার বাম হাত ছোবল মারল, ম্যাককার্ডলের চোয়ালে সরাসরি লাগল আঘাত। এবং ওখানেই সব শেষ। ঠিক আগের মত। গত রাতে আলফি বোগান যেরকম চিৎপাত হয়ে পড়েছিল, ম্যাককার্ডলও জ্ঞান হারিয়ে শুয়ে থাকল।

রেফারি এমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল যে গুনতেই ভুলে গেল। অবশ্য তখন গুনলেই কী না গুনলেই কী। রেফারির কাউন্ট সহ মোট উনিশ সেকেণ্ড স্থায়ী ছিল এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

এরপর বেশ একটা হট্টগোল লেগে গেল। ম্যাককার্ডল হেরেছে বলে নয়, লোকের আফসোস সবকিছু এত দ্রুত ঘটে গেছে যে তারা ভাল মত কিছু বুঝেই উঠতে পারেনি যে ফাইট কখন শুরু হলো আর কখন শেষ হলো। তারা চেঁচামেচি করতে লাগল এই বলে যে তাদের টিকেটের দামও উসুল হয়নি।

আমরা ড্রেসিংরুমে যাওয়ার পরে যে লোকটি ঝড় তুলে ঘরে ঢুকল সে হানাহান। মুখখানা লাল টকটকে। কিড কারডুলার দিকে একবার জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আমাকে একপাশে টেনে নিয়ে গেল। 'তুমি আমার একী সর্বনাশ করলে, ম্যানি?'

আমি নিরীহ গলায় বললাম, 'হানাহান, বিশ্বাস করো ওই ঘুষিটা স্রেফ ভাগ্যের জোরে লেগে গিয়েছিল।'

'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ। ওটা একটা লাকি পাঞ্চই ছিল। খুব দ্রুত আমাদেরকে আবার রি-ম্যাচের ব্যবস্থা করতে হবে।'

'রি-ম্যাচ?' থুতনি ঘষতে ঘষতে বললাম আমি। 'হয়তো বা, হানাহান। তবে এবারে আমাকে কিডের স্বার্থটাও দেখতে হবে। রি-ম্যাচ যদি করোই তা হলে ওকে দশের বদলে ষাট শতাংশ লভ্যাংশ দিতে হবে, রাজি?'

হানাহান তখন কেবল বিস্ফোরিত হতে বাকি। তবে তার ফাইটারের রেকর্ডে আজ একটা কালো দাগ পড়ে গেছে। এ দাগ সে যত দ্রুত সম্ভব মুছে ফেলতে পারবে ততই ভাল। কাজেই দু'জনে চিৎকার চেঁচামেচি শেষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম আমরা পঞ্চাশ পঞ্চাশ বখরা পাব।

কয়েকদিন পরে, রাতে আমি জিম বন্ধ করে অফিসে ঢুকেছি, দেখি আমার পোর্টেবল টিভিতে লেট নাইট শো দেখছে কিড। ড্রাকুলার ছবি দেখাচ্ছে। আমাকে দেখে সে অন্য চ্যানেল ঘোরাল। আমি বললাম, 'ভ্যাম্পায়ারের ছবি আমিও পছন্দ করি না। ছবি হলেও আমি তাতে লজিক খুঁজি। আর ওসব ছবিতে কোন লজিকই নেই।'

'কোন লজিক নেই?'

'না। ধরো, একজন ভ্যাম্পায়ার কারও রক্ত চুষে খেয়ে তাকেও ভ্যাম্পায়ার বানিয়ে ফেলল। এখন দুটো ভ্যাম্পায়ার হলো। এক সপ্তাহ পরে দু'জনেরই খিদে পেল এবং তারা বাইরে গিয়ে আরও দু'জন মানুষকে শিকার করল। এখন হলো

চারজন ভ্যাম্পায়ার। এক সপ্তাহ বাদে ওই চার ভ্যাম্পায়ার খাবারের সন্ধানে বেরুল এবং ভ্যাম্পায়ারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল আটে।'

'ঠিকই বলেছ,' সায় দিল কিড কারডুলা। 'এবং একুশ সপ্তাহ পরে মোট ভ্যাম্পায়ারের সংখ্যা দাঁড়াবে ১০৪৮৫৭৬ জনে।'

'ঠিক তাই। আর ত্রিশ সপ্তাহ কিংবা তারও পরে পৃথিবীজুড়ে শুধু ভ্যাম্পায়ারই থাকবে এবং এক সপ্তাহ বাদে তারা সবাই না খেয়ে মারা যাবে কারণ আর কোন খাবারই থাকবে না।'

বড় বড় দাঁত দুটি দেখিয়ে হাসল কিড কারডুলা। 'তোমার মাথায় অনেক বুদ্ধি, ম্যানি। যা হোক, ধরো, এই কাল্পনিক ভ্যাম্পায়ারগুলো বুঝতে পারল শিকারের সমস্ত রক্ত চুষে খেলে তারাও ভ্যাম্পায়ার হবে এবং তাদের প্রতিযোগী হয়ে যাবে, তখন তারা একটু বিরতি দিল। ধরো, তারা একজনের কাছ থেকে একচুমুক রক্ত পান করল, আরেক লোকের শরীর থেকে আরেক চুমুক, এতে তাদের শিকাররা সামান্য রক্তশূন্যতায় ভুগল এবং কয়েকদিন অবসন্ন লাগল শরীর, এ ছাড়া যদি তাদের আর কোন ক্ষতি না হয়?'

আমি টিভির ভলিউম কমিয়ে দিয়ে কাজের কথায় চলে এলাম। 'শোনো, কিড, আমি জানি ম্যাককার্ডলকে তুমি আবার কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে শুইয়ে দিতে পারবে, কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে মারামারিটাও একটি শোবিজ। লোকে বাইশ সেকেণ্ডের মারপিট দেখার জন্য পকেটের রেস্ত খরচ করে না। খদ্দেরদেরকে এমন একটি পারফরমেন্স দিতে হবে যেটি কিছুক্ষণ ধরে চলে। কাজেই ম্যাককার্ডলের সঙ্গে যখন আবার মোলাকাত হবে, তুমি ফাইটটা কয়েক রাউণ্ড টেনে নিয়ে যাবে। খুব জোরে ওকে মারা চলবে না। অন্তত পাঁচ রাউণ্ড পর্যন্ত ম্যাচটা চালিয়ে নিয়ে গিয়ে তারপর ওকে অজ্ঞান করে দিয়ো।'

আমি একটি সিগার ধরালাম। 'আমরা যদি খুব বেশি ভাল পারফরমেন্স দেখাই তা হলে পরে প্রতিযোগী পেতে সমস্যা হয়ে যাবে। আর ভবিষ্যতের কথাও তো আমাদেরকে ভাবতে হবে। পরপর কয়েকটা নক আউট মন্দ নয়, কিড, তবে কাজটা যেন খুব সহজ মনে না হয়।'

ম্যাককার্ডলের সঙ্গে পুনরায় ম্যাচের জন্য যখন আমরা অপেক্ষা করছি, ওই সময় কিডকে একদিনের জন্যও ট্রেনিং-এ পেলাম না আমি। এমনকী আয়নার সামনে শ্যাডো বক্সিং করতেও সে রাজি হলো না। কাজেই আমি হাল ছেড়ে দিলাম। ও যখন ভালই ফাইট করে তখন আর ওকে ট্রেনিং-এর কথা বলে বিরক্ত করার দরকার কী? তা ছাড়া ও ওর ঠিকানা পর্যন্ত আমাকে দেয়নি। আমার ধারণা ছেলেটা খুব অহংকারী আর এ কারণেই কোন্ বস্তিতে সে বাস করে তা আমাকে দেখাতে চায়নি তার অহং-এ লাগবে বলে। ওর কোন ফোনও নেই। অবশ্য প্রায় প্রতিরাতেই সে জিম-এ আসে যদি কোন কারণে তাকে আমার দরকার হয়ে পড়ে।

ম্যাককার্ডলের সঙ্গে দ্বিতীয় ফাইটের দিনটি চলে এল এবং আমরা বিশেষ

পরিশ্রম ছাড়াই নিজেদের উদ্দেশ্য সাধন করলাম। কিড চার রাউণ্ড পর্যন্ত লড়তে দিল ম্যাককার্ডলকে, পঞ্চম রাউণ্ডে ডান হাতের এক বেমক্কা ও অবিশ্বাস্য দ্রুতগতির ঘুষিতে ওকে ভূপতিত করল।

এরপরের লড়াইগুলোতে অংশ নিতেও কোন ঝামেলা হলো না, কারণ যে-ই লড়াইয়ের আহ্বান করল, আমরা সাড়া দিলাম। কিড কারডুলাকে আমার এখন আর কিছু বলে দিতে হয় না। আমরা ঠিক করেই নিয়েছি দুই বা তিনটে লড়াইয়ের কোন একটিতে ও নিজেই নক আউট হয়ে যাবে। এতে কী হলো, আমরা এ ধারণা প্রতিষ্ঠিত করতে পারলাম, কিড খুব জোরে হিট করতে পারলেও নিজেও জোর ঘুষি সহ্য করতে পারে না। ফলে প্রতিটি ম্যানেজার, যার কব্জিতে জোরঅলা মুষ্টিযোদ্ধা আছে, সে ভাবল কিডকে ফেলে দেয়ার মত ক্ষমতা তার ফাইটার রাখে।

পরের বছর সাতটি প্রতিযোগিতায় আমরা অংশ নিলাম, প্রতিটিতে নক আউট করে জিতে গেল কিড এবং বলা বাহুল্য, দেশের অপরপ্রান্ত থেকেও আমরা লড়াইয়ের আমন্ত্রণ পেতে থাকলাম।

এখন বেশ ভালই পয়সা কামাচ্ছি আমরা, কিডেরও খুশি হওয়ার কথা, গত ছয়মাস ধরে তাকে বেশ হাসিখুশিও দেখছিলাম, তবে হঠাৎ লক্ষ করলাম কেন জানি সে মুখ ভার করে রেখেছে, আপন মনে গজগজ করছে। ঘটনা কী জানতে চাইলাম। বলল না। শুধু মাথা নেড়ে এড়িয়ে গেল। ইদানীং পাবলিসিটি পেতে শুরু করেছে কিড, মেয়েরা তার প্রতি আকর্ষিত হচ্ছে। অবশ্য মেয়েরা তাকে পছন্দ করবে না-ই বা কেন? মেয়েদের প্রতি তার আচরণ থাকে অত্যন্ত বিনয়ী, এদের কারও কারও বাড়ির ঠিকানা পর্যন্ত চেয়ে রেখেছে সে। যদিও জানি কখনও তাদের বাসায় যায়নি কিড।

একদিন সকালে, তার আগের রাতে আমরা আমাদের দশম ফাইটে জিতেছি—নয় রাউণ্ডের মাথায় নক আউট হয়ে গেছে আর্ভ ওয়াটসন—আমি আমার অফিসে বসে ভাবছিলাম শীঘ্রি জিমনাশিয়ামটা বিক্রি করে দেব কিংবা কারও কাছে ভাড়া দিয়ে দেব, এমন সময় নক হলো দরজায়।

ঘরে ঢুকল এক তরুণী। মাঝারি উচ্চতা এবং ওজন, মোটামুটি সুদর্শনাই বলা চলে, পরনে রুচিশীল পোশাক। মাথা ভর্তি কালো চুল, খাড়া নাক। চোখে ভীরু চাহনি। তবে সব মিলে আহামরি কিছু নয়।

মেয়েটি ঢোক গিলল। 'এখানে কি মি. কিড কারডুলার সঙ্গে দেখা করা যাবে?'

'সে মাঝে মাঝে এখানে আসে,' বললাম আমি। 'তবে তার আসা-যাওয়ার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। আমি নিজেও জানি না সে কখন হুট করে হাজির হবে।'

'আপনার কাছে ওর ঠিকানা আছে?'

'না। সে তার ঠিকানা কাউকে বলে না।'

মেয়েটিকে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য বিহ্বল দেখাল, কী এক ভাবনার মধ্যে

তলিয়ে গেল। তারপর বোধহয় মনস্থির করে ফেলল এখানে আসার কারণটি আমাকে বলবে। 'আমি সপ্তাহ দুই আগে গ্রামে যাচ্ছিলাম আমার হ্যারিয়েট খালার সঙ্গে দেখা করতে। ফিরে আসার সময় দেরি করে ফেলেছিলাম। রাত হয়ে গিয়েছিল। পথঘাট গুলিয়ে ফেলি। তা ছাড়া তখন বেশ বৃষ্টিও হচ্ছিল। আমি গাড়ি নিয়ে শুধু ঘুরেই মরছিলাম যদি চেনা কোন রাস্তা চোখে পড়ে। কীভাবে যেন একটা মেঠো রাস্তায় গাড়ি নিয়ে চলে গিয়েছিলাম। আমার গাড়ি পড়ে যায় একটা গর্তে। আমি গাড়িটাকে কিছুতেই গর্ত থেকে তুলতে পারছিলাম না। শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে ওখানেই বসে থাকি, অপেক্ষা করছিলাম যদি কোন গাড়ি দেখতে পাই তো হাত তুলে থামাবার চেষ্টা করব। কিন্তু কোন গাড়ি চোখে পড়ছিল না। এমনকী কোন খামার বাড়ির আলোও ছিল না কোথাও। শেষে বোধকরি ঘুমিয়েই পড়েছিলাম। একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখি, তবে স্বপ্নটা যে কী তা এখন ঠিক মনে পড়ছে না, তবে জেগে দেখি এক লম্বা, সুদর্শন যুবক আমার গাড়ির খোলা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তাকে দেখে প্রথমে ভয়ানক চমকে গিয়েছিলাম, পরে নিজেকে সামলে নিয়ে তার কাছে জানতে চাই সে তার গাড়িতে আমাকে কোথাও লিফট দিতে পারবে কি না যেখানে ফোন করে আমার বাবাকে বলতে পারি আমাকে নিয়ে যেতে উনি যেন কাউকে পাঠিয়ে দেন। লোকটির গাড়ি রাস্তার ধারেই দাঁড় করানো ছিল। সে আমাকে একটি ক্রসরোডে পৌঁছে দেয়। ওখানে একটি গ্যাস স্টেশন খোলা ছিল।'

আমি লক্ষ করলাম মেয়েটির গলায় পাশাপাশি দুটো ক্ষতচিহ্ন। যেন বড় মশা কামড়েছে।

সে বলে চলল, 'আমি যখন ফোন করছি ওই সময় সে গাড়ি নিয়ে চলে যায়। আমি তাকে ধন্যবাদ দিতে পারিনি কিংবা তার নামটিও জানতে পারিনি। তবে আমি তার কথা মন থেকে...' মেয়েটির ফর্সা মুখ রক্তিম হলো। 'গত রাতে লেট নিউজ দেখছি, স্পোর্টসের খবর হচ্ছিল, টিভিতে কিড কারডুলার ছবি দেখাল। আমি তক্ষুণি তাঁকে চিনে ফেললাম। আরে, ইনিই তো আমাকে তাঁর গাড়িতে গ্যাস স্টেশনে পৌঁছে দিয়েছিলেন! আমি লোকজনকে জিজ্ঞেস করার পরে একজন বলল আপনি তাঁর ম্যানেজার এবং আপনার জিমের ঠিকানা দিল। ভাবলাম নিজে এসে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে যাব।'

আমি মাথা ঝাঁকালাম। 'কিডের সঙ্গে আবার দেখা হলে আপনার ধন্যবাদ তাকে পৌঁছে দেব।'

মেয়েটি দাঁড়িয়ে থাকল। কী যেন ভাবছে। তার চেহারা আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'তা ছাড়া ওনাকে একটা জিনিস ফেরত দেয়ারও দরকার ছিল। একটা মানি ক্লিপ। ভেতরে এক হাজার ডলার আছে। টো-ট্রাক দিয়ে আমার গাড়ি গর্ত থেকে তোলার সময় এটা গাড়ির পাশে পাওয়া গিয়েছিল।'

বেশ তো, ভাবলাম আমি। কোন সৎ টো-ট্রাক ড্রাইভার মাটিতে এক হাজার ডলার পেয়েও নিজের পকেটে পুরে নেয়নি। আমি আবার মাথা ঝাঁকালাম। 'তা

হলে টাকাটা আমাকে দিন। কিড এলে ওকে দিয়ে দেব।'

হেসে উঠল মেয়েটি। 'দুর্ভাগ্যবশত আমি টাকা এবং ক্লিপ আনতে ভুলে গেছি।' সে পার্স খুলে একটি বল-পয়েন্ট পেন এবং একটুকরো কাগজ বের করল। 'আমার নাম ক্যারিংটন। ডফনে ক্যারিংটন। আমাদের বাড়িতে কীভাবে যেতে হবে লিখে দিচ্ছি। জায়গাটা চেনা একটু কঠিন। ওটার নাম ক্যারিংটন আইরি। শুনেছেন বোধহয়? স্টেটলি হোম অ্যাণ্ড ফর্মাল গার্ডেন ম্যাগাজিন-এ গত বছর আমাদের বাড়ির ছবি ছাপা হয়েছিল। মি. কারডুলাকে নিজেই আসতে হবে। তা হলে তিনি ক্লিপটি চিনতে পারবেন।'

পরদিন সন্ধ্যায় কিড কারডুলা এলে ওকে ডফনে ক্যারিংটনের কথা বললাম এবং তার লেখা ঠিকানাটা দিলাম।

কিডের কপালে ভাঁজ পড়ল। 'আমার এক হাজার ডলার হারায়নি। তা ছাড়া আমি কখনও মানি ক্লিপ ব্যবহার করি না।'

আমি হাসলাম। 'আমিও জানি। তবে মেয়েটি তোমার সঙ্গে একবার দেখা করার জন্য এক হাজার ডলার বাজি ধরতেও রাজি। আচ্ছা, ও যে গল্পটি বলল তার কোন কিছুই কি সত্যি নয়?'

'আ...ইয়ে...হ্যাঁ, আমি ওকে ফিলিং স্টেশনে পৌঁছে দিয়েছিলাম। ওকে আমি...গাড়িতে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখি।'

'তোমার গাড়ি আছে জানতাম না।'

'গত সপ্তাহে কিনেছি। কোন কোন জায়গা এত দূরে যে গাড়ি ছাড়া চলছিল না।'

'কী মডেল?'

'১৯৭৪ ফোক্স ওয়াগন। মোটরের অবস্থা বেশ ভাল। তবে বডিতে কিছু মেরামতি লাগবে।' সে আমার টেবিলের এক কিনারে বসল। চিন্তান্বিত চেহারা। 'মেয়েটি একটি লিংকন কন্টিনেন্টাল চালাচ্ছিল।'

'ও নিয়ে চিন্তা কোরো না, কিড। তুমিও শীঘ্রি লিংকন কন্টিনেন্টাল চালাবে।'

আমরা আবার আমাদের ফাইট নিয়ে পরিকল্পনা শুরু করলাম। এখন আর প্রতিমাসের সাধারণ মানের ফাইট করব না। কারণ, আমরা ভাল ভাল প্রতিদ্বন্দ্বী পাচ্ছিলাম এবং বড় বড় পার্টির আগ্রহ তৈরি করতে হলে সময় ও পাবলিসিটি দুটোরই প্রয়োজন আছে।

আমরা আরও কয়েকটি লড়াইয়ে জিতে গেলাম। ওগুলো টিভি কাভারেজ পেল। এতে কিডের খুশি হওয়ার কথা, উল্টো দেখি সে কেমন মনমরা আর বিষণ্ন হয়ে থাকে সারাক্ষণ।

একরাতে সে অফিসে ঢুকেই ঘোষণা করল, 'ম্যানি, আমি বিয়ে করছি।'

আমি কিঞ্চিৎ অবাক হলাম, তবে উৎকণ্ঠিত নয়। অনেক মুষ্টিযোদ্ধাই বিবাহিত। 'সৌভাগ্যবতীটি কে?'

'ডফনে ক্যারিংটন।'

নামটি চেনা চেনা লাগল। 'সেই ডফনে ক্যারিংটন?' মাথা ঝাঁকাল কিড।

আমি স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালাম। 'কিছু মনে কোরো না, কিড। তবে মেয়েটি তো র‍্যাকুয়েল ওয়েলচ নয়। চেহারা-সৌন্দর্যে আহামরি কিছুই নয়।'

কিডের চোয়াল শক্ত হলো। 'ও খুব ব্যক্তিত্বসম্পন্ন।'

এতেও আমার সন্দেহ আছে। 'কিড,' বললাম আমি, 'নিজেকে প্রশ্ন করো। ও কোনভাবেই তোমার যোগ্য নয়।'

'শীঘ্রি সে আমার যোগ্য হয়ে উঠবে।'

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে আমি চমকে গেলাম। 'কিড, তুমি নিশ্চয় এ মেয়েটাকে তার টাকার জন্য বিয়ে করছ না?'

কিড লজ্জা পেল কিংবা লজ্জিত হওয়ার ভান করল। 'তাতে সমস্যা কী? অনেকেই এর আগে টাকার জন্য বিয়ে করেছে।'

'কিন্তু, কিড, স্রেফ টাকার জন্য হেঁজিপেঁজি কাউকে তোমার বিয়ে করার দরকার তো নেই। তুমি নিজেই শীঘ্রি লাখ লাখ টাকা কামাতে যাচ্ছ।'

মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকাল ও। 'ম্যানি, আমাকে আমার আত্মীয়স্বজন এবং উদ্বিগ্ন বন্ধুবান্ধব চিঠি লিখছে। তবে বিশেষ করে আত্মীয়স্বজন। তারা বোধহয় আমার বক্সিং ম্যাচের কথা শুনেছে কিংবা তাদেরকে কেউ বলেছে। তারা ভীষণ রেগে গিয়ে বলেছে আমার মত পারিবারিক ব্যাকগ্রাউণ্ডের একজনের অর্থের বিনিময়ে বক্সিং রিং-এ ফাইট করা মোটেই মানায় না।'

কিড এখনও আমার দিকে তাকায়নি।

'বিষয়টি নিয়ে বহুদিন ধরে ভাবছি আমি, ম্যানি। এখন মনে হচ্ছে ওরা ঠিকই বলেছে। আমার বক্সার হওয়া উচিত নয়। বিশেষ করে পেশাদার তো নয়ই। আমার পরিবারের সব সদস্য এবং সমস্ত বন্ধুবান্ধব দারুণভাবে এর বিরুদ্ধে। এবং, ম্যানি, কেউ যদি এ পৃথিবীতে সুখ অর্জন করতে চায় তা হলে অভিজাত কোন ব্যক্তির সম্মতির প্রয়োজন তার রয়েছে এবং সে সঙ্গে তার নিজের আত্মমর্যাদাও থাকতে হবে।'

'অভিজাত ব্যক্তি?' বললাম আমি। 'তুমি কি রাজবংশীয় কারও কথা বলছ? তুমি কি কাউন্ট বা এধরনের কিছু? তোমার শিরায় কি উচ্চবংশের রক্ত বইছে?'

'কদাচিৎ,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। 'আমাকে দারিদ্র্যের কবল থেকে রক্ষা করতে আমার আত্মীয়স্বজন এমনকী চাঁদা তুলতেও শুরু করেছে। তবে আমি আমার স্বজনদের কাছ থেকে কোন দান গ্রহণ করতে পারব না।'

'তা হলে টাকার লোভে একটি মেয়েকে বিয়ে করতে তোমার বাধবে না?'

'মাই ডিয়ার, ম্যানি,' বলল ও। 'টাকার জন্য একটি মেয়েকে বিয়ে করার পেছনে যুক্তি আছে। তা ছাড়া, বিয়ে করলে আমাকে আর ফাইট করতে হবে না।'

আমরা বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘক্ষণ তর্ক করলাম এবং ওকে এটি পুনরায় বিবেচনা করে দেখার অনুরোধ জানালাম, বোঝালাম বক্সিং-এর টাকাটা তার এবং আমার

জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

অবশেষে ও একটু নরম হয়ে এল এবং যাওয়ার সময় বলে গেল বিষয়টি নিয়ে সে চিন্তা করবে।

সপ্তাহখানেক চলে গেল। এখনও কিডের কোন খবর পাচ্ছি না আমি। বেশ চিন্তায় পড়ে গেছি। অবশেষে একদিন রাত সাড়ে দশটায় আলফি বোগান আমার অফিসে এল একটি খাম নিয়ে।

খামটি খোলার সময় অশুভ সব চিন্তা খেলে গেল মাথায়। কম্পিত হস্তে খাম খুলে দেখি ভেতরে কিড কারডুলার চিঠি।

'প্রিয় ম্যানি,

পরিস্থিতি এভাবে পাল্টে যাওয়ার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। কিন্তু আমি রিং ছেড়ে দেয়ার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। জানি আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক প্রত্যাশা ছিল তোমার মনে এবং আমি নিশ্চিত ভিন্ন কোন পরিবেশ হলে আমরা দু'জনে ঠিকই লাখ লাখ টাকা কামাই করতে পারতাম।

কিন্তু গুডবাই এবং গুডলাক। তবে তোমাকে একেবারে খালি হাতে ফেরাচ্ছি না।

শুভেচ্ছাসহ

কিড কারডুলা।'

আমাকে খালি হাতে ফেরাচ্ছে না? ও কি খামের মধ্যে কোন চেক পাঠিয়েছে? খাম ধরে ঝাড়া দিলাম। কিন্তু কিছুই বেরিয়ে এল না। তা হলে ও বলল কেন সে আমাকে খালি হাতে ফেরাচ্ছে না?

আমি আলফি বোগানের দিকে কটমট করে তাকালাম। সে এখনও ওখানে দাঁড়িয়ে আছে।

হাসল সে। 'আমাকে মারো।'

আমার চোখ বড়-বড় হয়ে গেল। আলফিকে আজ একটু অন্যরকম লাগছে না? ওর গলার দু'পাশে সেই বড়-বড় মশার কামড়ের ক্ষতচিহ্ন আর ওপরের সারির দুটো দাঁতও কেমন কুকুরের শ্বদন্তের মত। কসম খেয়ে বলতে পারি ওর ওই লম্বা দাঁতদুটো আগে কখনও চোখে পড়েনি।

'আমাকে মারো,' আবার বলল সে।

আমার হয়তো ওকে মারা উচিত হবে না। কিন্তু গত একটা সপ্তাহ ধরে হতাশায় ভুগে ভুগে আমার ভেতরে কেমন একটা জেদ চেপে গিয়েছিল। তাই ওকে সর্বশক্তি দিয়ে ঘুষি মারলাম।

এবং আমার হাতটি ভেঙে গেল।

তবে ডাক্তার যখন আমার হাতে ব্যাণ্ডেজ করছিল তখন আমি হাসছিলাম।

কারণ, আমি কিড কারডুলার বিকল্প পেয়ে গেছি।

মূলঃ জ্যাক রিচি

মরা মানুষ চুরি করে না

ডেস্কের ফোন বেজে ওঠার শব্দে দারুণ চমকে গেল কুর্ট লেসনার। যতবার ফোন বেজেছে প্রতিবারই মনে হয়েছে বুঝি ফোন করেছে পুলিশ।

এবারের ফোনটা এসেছে ট্রাফিক ডিভিশন থেকে।

'সুপ্রভাত, মি. লেসনার,' একটি আন্তরিক বার্জেন কণ্ঠ ভেসে এল। 'ইন্সপেক্টর স্‌ভেন্দসেন বলছি। আপনার গাড়িটা খুঁজে পেয়েছি আমরা। সীমান্তের কাছে আমার বন্ধুরা পেয়েছে। আরভিকায়—একটা সুপার মার্কেটের বাইরে পার্ক করা ছিল। সিটে একটা লেডিস হ্যাণ্ডব্যাগও ছিল। ব্যাগভর্তি হাবিজাবি জিনিস। মহিলাদের ব্যবহার্য নানান জিনিস—পাউডার কমপ্যাক্ট, চিরুনি ইত্যাদি। একটা লাইসেন্সও ছিল। আর গোটা দুই ক্রেডিট কার্ড। ক্রেডিট কার্ডের মালিকের পরিচয় বের করতে বেশি সময় লাগবে না। আমার এক সহকর্মী ইতিমধ্যে এ নিয়ে কাজ শুরু করেও দিয়েছে।'

লেসনার শুধু আবছা গলায় 'ওহ!' বলার সুযোগ পেল, আবার বকবক শুরু করে দিয়েছে ইন্সপেক্টর। 'সুইডিশরা গাড়িটি চালিয়ে সীমান্তে নিয়ে যায়, আমরা ওখান থেকে গাড়িটা পিকআপ করি। ফরেনসিক বিভাগের ছেলেরা আপনার গাড়ি চেক করছে ফিঙ্গার প্রিন্টের জন্য। তবে চিন্তা করবেন না, আপনার গাড়ির কোনও ক্ষতি হয়নি। একদম ঠিক আছে।'

'ধন্যবাদ,' কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল লেসনার। 'তবে মহিলা তার হ্যাণ্ডব্যাগ কেন আমার গাড়িতে ফেলে রেখে গেল ভেবে অবাক লাগছে।'

'যে মহিলা আপনার গাড়ি নিয়েছিল সে শুধু তার হ্যাণ্ডব্যাগই ফেলে যায়নি, আরও অনেক কাণ্ড করেছে,' বলল ইন্সপেক্টর স্‌ভেন্দসেন। 'আরভিকা যাবার পথে সে অ্যাভার্স নামে একটি ক্যাফেতে থেমেছিল, ওটা বর্ডারের ঠিক অপর প্রান্তে। সেখানে সে স্ন্যাক খায়। আসলে ডিনারই বলা উচিত। মাংস, সবজি ইত্যাদি দিয়ে ডিনার করে। একটা সসবোট ভেঙে ফেলে সে। ম্যানেজার বলেছে সমস্ত সস ছড়িয়ে পড়েছিল মেঝেয়। বেশিরভাগ সস পড়েছিল সোফায়। মেয়েটির গায়ে পড়েনি। মেয়েটি খুব বিব্রত হয়ে পড়ে। সে ভাঙা সসবোটের দাম এবং সোফা পরিষ্কার করার খরচ দিতে চেয়েছিল। পরে সে ওদেরকে তার কার্ড দেয় যদি তার সঙ্গে ওদের যোগাযোগের প্রয়োজন হয়। কাজেই বুঝতেই পারছেন পুরো ব্যাপারটাই যেন আমাদের কাছে তস্তরিতে করে তুলে দেয়া হয়েছে।' যেন বেশ

একটা ঠাট্টার কথা বলেছে ইন্সপেক্টর, হো-হো করে হেসে উঠল।

'কিন্তু এত সব ঘটনা এত তাড়াতাড়ি জানলেন কী করে?' জিজ্ঞেস করল লেসনার। 'মানে ও যে ক্যাফেতে যাত্রা বিরতি দিয়েছিল সে বিষয়টি।'

'খুবই সহজ। মহিলার ব্যাগে অ্যাণ্ডার্স-এর খাবারের বিল ছিল। আপনার গাড়ি চুরির দিনই সে ওখানে খেতে যায়। সুইডিশ পুলিশ ক্যাফেতে খোঁজ নিতে গিয়ে এসব কথা জানতে পারে।'

'আপনারা যখন এত কিছু জানেন, মহিলার নামটাও নিশ্চয় জানেন। মানে ড্রাইভিং লাইসেন্সে ওর নাম...'

'অবশ্যই জানি,' বলল ইন্সপেক্টর। 'এতে গোপনীয়তার কিছু নেই। মহিলার নাম লিলেন অ্যাস। পুরো নাম লিলেন জোহান অ্যাস। নডস্টাণ্ডের স্কিপারগার্টেনে থাকে। বাড়ি নাম্বার বাইশ। তিন রুমের ফ্ল্যাট। শুনেছি খুব সুন্দর নাকি ফ্ল্যাটটা। যদিও বিষয়টা আমার এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না, তবু আমি পুলিশের একটা গাড়ি পাঠিয়েছিলাম একবার খোঁজ-খবর নিতে। বাড়িতে কাউকে পাওয়া যায়নি। তবে শীঘ্রি তার সন্ধান আমরা পেয়ে যাব। পেলেই আপনাকে জানাব।'

'লিলেন অ্যাস?' বিড়বিড় করল কূর্ট লেসনার। 'কিন্তু ও তো আমার সেক্রেটারির নাম! সে কয়েকদিন ধরে অফিসে আসছে না–গত সোমবার থেকে। কিন্তু আমার গাড়ি তো চুরি হয়েছে মাত্র দু'দিন আগে...'

'এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই,' বলল ইন্সপেক্টর। 'হয়তো আপনাকে না বলেই সে আপনার গাড়িটা নিয়েছে। হতে পারে না এরকম? আপনি কি কখনও তাকে গাড়ি ধার দিয়েছিলেন?'

'জী। মাঝে মাঝে দিতাম। অফিসের কাজে ওকে বাইরে পাঠাতে হলে আমার গাড়িটা নিয়ে যেত।'

'আপনি কি বিষয়টা নিয়ে আরও এগোতে চান, মি. লেসনার?' জানতে চাইল ইন্সপেক্টর। 'ধরুন মামলা-টামলা...'

'আ...এখনই ঠিক বুঝতে পারছি না,' নিজেকে জোর করে সংযত করল লেসনার। 'করা বোধহয় উচিত। তবে...আচ্ছা, শুনুন, সিদ্ধান্তটি কি এখনই জানাতে হবে?'

'না, মি. লেসনার,' ওকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বলল ইন্সপেক্টর। 'সে জন্য প্রচুর সময় পাবেন।'

কূর্ট লেসনার তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে নামিয়ে রাখল ফোন। ওর মস্তিষ্কে ঝড় বইছে, হাতের মধ্যে মুখ গুঁজল।

লিলেন–লিল–ও লেসনারের গাড়ি চুরি করতে পারে না। সুইডেনের ক্যাফেতে বসে সসবোট ভাঙার অবকাশও তার নেই।

মরা মানুষ কখনও গাড়ি চুরি করে না। তারা কিছুই চুরি করতে পারে না।

আর লিলেন অ্যাস মারা গেছে।

লেসনার নিজের হাতে খুন করেছে তাকে।

তার জীবনে লিলের আগমন ঘটার আগ পর্যন্ত সবকিছুই ঠিকঠাক ছিল।

স্বর্ণকেশী, ছিমছাম ফিগার, স্পীডওয়েল ফুলের মত উজ্জ্বল নীল চোখ, প্রাণবন্ত চেহারা নিয়ে একদিন গটগট করে লেসনারের অফিসে ঢুকেছিল তার ক্ষুদ্র চার্টার বিজনেস অ্যাণ্ড ট্রাভেল এজেন্সির সেক্রেটারির শূন্য পদে আবেদন করার জন্য। ব্যবসাটি মাত্র বছর তিনেক আগে শুরু করেছিল লেসনার।

'আমি তেমন কোনও রেফারেন্স জোগাড় করতে পারিনি,' আত্মসমর্পণের হাসি হেসে বলেছিল লিল। 'তবে যে কোনও কাজ খুব দ্রুত শিখে ফেলতে পারি আমি।'

ওর বয়স তখন ছাব্বিশ। মহিলাই বলা চলে, তবে চেহারায় ছিল অদ্ভুত শিশুসুলভ সারল্য।

'টাইপ জানেন?'

'জী। গতি খুব বেশি না, তবে নির্ভুল টাইপ করতে পারি। আমি আমার টাইপ করার শব্দ টেপ করে এনেছি।'

'টেপ করে এনেছেন?' শুনে অবাক লেসনার। অদ্ভুত লেগেছিল তার মেয়েটিকে।

পরে বুঝতে পেরেছে সত্যি অদ্ভুত প্রকৃতির মেয়ে লিলেন এবং তার মধ্যে নানান কণ্ট্রাডিকশন্স কাজ করে।

আর সত্যি কথাই বলেছিল লিল। সে দ্রুত শিখতে পারে।

সত্যি ও খুব দ্রুত শিখে নিচ্ছিল সবকিছু।

অ্যানি দু'চক্ষে দেখতে পারত না লিলকে—সঙ্গত কারণেই। কুর্টের সঙ্গে কুড়ি বছরের অম্ল-মধুর দাম্পত্য সম্পর্ক কাটানোর পরে হঠাৎ সে একদিন সন্দেহ করল তার স্বামী পরনারীতে আসক্ত। তার সন্দেহ অমূলক ছিল না। চাকরি দেয়ার তিনদিন পরেই লেসনার তার নতুন সেক্রেটারিকে বিছানায় নিয়ে গেল।

তারপরে আর ফিরবার উপায় ছিল না, অন্তত লেসনারের জন্য নয়।

লিলের সম্পর্কে ধারণাটি সম্পূর্ণই ভুল ছিল লেসনারের। ভেবেছিল অসদুপায়ে অর্থ উপার্জনের লোভনীয় প্রস্তাবটি পেলে সে লাফিয়ে উঠবে। বেশ কিছু টাকা জমিয়ে, দু'এক বছরের মধ্যেই ক্যারিবিয়ানে কেটে পড়বে দু'জনে। নরওয়ের চেয়ে ওখানে অনেক বেশি আরামে কাটানো যাবে জীবন। কারণ, ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জে জিনিসপত্র সস্তা, সারা বছরই থাকে চনমনে রোদ, নরওয়ের মত বছরের অর্ধেকটা সময় শীতে জমে থাকতে হবে না। পরিকল্পনাটি ছিল খুবই সরল। লিলকে শুধু কুরিয়ার হিসেবে কাজ করতে হবে। ট্যুরিস্টদেরকে নিয়ে ঘুরতে বেরিয়ে যাও, নানান দর্শনীয় জায়গা তাদেরকে দেখিয়ে ফিরে এসো। শুধু রিটার্ন ট্রিপে লিলের লাগেজের মধ্যে একটি-দুটি রঙ ঝলমলে ট্যুরিস্ট ব্রোশিয়ার থাকবে, ইলাস্টিক ব্যাণ্ড দিয়ে শক্ত করে বাঁধা থাকবে ওগুলো। এতে কারও মনে

কোনও প্রশ্নের উদ্রেক হবার সম্ভাবনা নেই। যদি কেউ জানতেই চায় লিল জবাব দেবে নরওয়েজিয়ান স্টাইলে এ ব্রোশিয়ারগুলোর ডিজাইন করার একটা ইচ্ছে আছে তার। তবে কেউ তাকে ব্রোশিয়ার নিয়ে কখনও প্রশ্ন করেনি। কৌতূহল প্রকাশ করলে দেখত ব্রোশিয়ারের প্রতিটি বাণ্ডিলের মাঝখানে বিশেষভাবে একটি গর্ত করা হয়েছে এবং ওই গর্তের মধ্যে চুপচাপ শুয়ে আছে কোকেনের প্যাকেট।

তিনটা ট্রিপের পরপরই বেঁকে বসল লিল। সে আর এ কাজ করবে না। তিনটে ট্রিপ থেকে সে যা আয় করেছে তা নিজের প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট বেশি, তবে সবচেয়ে বড় কথা হলো রিও ডি জেনিরোতে যাবার পথে সে এক পাইলটের প্রেমে পড়েছে। কাজেই কোকেন চোরাচালানিতে আর নেই লিল।

'তা হলে আমার কী হবে?' আপত্তি তুলেছিল লেসনার। তার জগৎটা অকস্মাৎ ভেঙে খানখান হয়ে গিয়েছিল।

'তুমি? তুমি ঠিকই থাকবে। তোমার তো টাকা-পয়সার অভাব নেই। আর তা ছাড়া তোমার অ্যানি তো আছেই। তুমি বিবাহিত পুরুষ, আমার চেয়ে বয়সে কুড়ি বছরের বড়। কুড়ি বছর! জানো, এ ব্যাপারটা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারি না।'

লিল যদি বয়সের ফারাকটার কথা না তুলত! অথবা ওভাবে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে না হাসত। ওর হাসি দেখে পিত্তি জ্বলে গিয়েছিল লেসনারের। ও বুড়ো হয়ে গেছে–এ কথাটা দারুণ অপমান হয়ে বিঁধেছে বুকে।

এ কারণেই লিলকে হত্যা করেছে লেসনার। অবশ্য ওকে খুন করার কোনও পরিকল্পনা ছিল না তার। ঘটনাটা ঘটে গেছে আকস্মিক।

লিলের অপমানসূচক কথার হুলে জর্জরিত লেসনারের মাথায় দপ করেই জ্বলে ওঠে আগুন। সে তার সেক্রেটারির কানের নীচে দুম করে এক ঘুসি বসিয়ে দেয়। ঘুসি খেয়ে ঘুরতে-ঘুরতে লেসনারের ডেস্কের উপর দড়াম করে পড়ে গিয়েছিল লিল, মাথাটা ভীষণভাবে ঠুকে যায় টেবিলের কোনায়। কেমন বিশ্রী একটা শব্দ হয়েছিল–থ্যাচ। টেবিলে বাড়ি খেয়ে নাকি ঘুসির আঘাতে মারা গেছে লিল জানে না লেসনার। শুধু জানত প্রাণবায়ু নিভে গেছে লিলের। মেঝেতে দুমড়ে মুচড়ে পড়েছিল সে, নীল চোখ জোড়া খোলা, অপলক দৃষ্টি লেসনারের দিকে। শেষে সহ্য করতে না পেরে হাত দিয়ে চোখ জোড়া বুজিয়ে দেয় সে।

কী কাণ্ড করেছে বুঝতে পারার পরে নিজের চেয়ারে কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে বসে ছিল ভীত-বিহ্বল লেসনার। ভাবছিল পরবর্তী করণীয়। আশ্চর্য, লিলের শরীর থেকে কোনও রক্তপাত হয়নি। লাশটা সরিয়ে ফেলার চিন্তা করছিল ও। কিন্তু কীভাবে?

অফিসের কেউ যেন না দেখে, অত্যন্ত সাবধানে সরিয়ে ফেলতে হবে লাশ। এবং এক্ষুণি। ইতোমধ্যে দেরি হয়ে গেছে–সন্ধ্যা হয়ে আসছে।

লাশটার ব্যবস্থা করেছিল সে। সরিয়ে ফেলেছিল।

কিন্তু সত্যি কি ব্যবস্থা করতে পেরেছে লেসনার? তা হলে এসব কী ঘটছে?

সবকিছু কেমন অবাস্তব ঠেকছে।

ইন্সপেক্টরের ফোন আসার পরে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল লেসনার। স্নায়ুগুলো শান্ত করার চেষ্টা করছে। তারপর অফিস বন্ধ করে ভাড়া করা গাড়িতে চলল বাড়ি অভিমুখে। বাড়ি পৌঁছেই ঢুকল লিভিংরুমে। ড্রিংক ক্যাবিনেট থেকে ঢেলে নিল হুইস্কি। এক ঢোকেই শেষ করে ফেলল মদ, বসল জানালার ধারে। তাকিয়ে থাকল বাইরে, অন্ধকার রাতে।

ওর সামনে বাগান, কিন্তু চোখের সামনে ভাসছে সেই জায়গাটা যেখানে, একটা ঝোপের নীচে পড়ে আছে লিলের লাশ। ওই জায়গাটা কেউ চিনতে পারবে না।

'কী হয়েছে, কূর্ট?' তীক্ষ্ণ গলায় জানতে চাইল তার স্ত্রী, কিচেন থেকে ঢুকেছে এ ঘরে। 'কেমন অস্থির লাগছে তোমাকে। হয়েছেটা কী?'

'পুলিশ ফোন করেছিল,' জবাব দিল কূর্ট। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। 'আমি অফিস থেকে বেরোবার ঠিক আগে আগে। আমার গাড়িটা খুঁজে পেয়েছে ওরা। আরভিকার বর্ডারের কাছে। সিটের ওপর লিলেনের হ্যাণ্ডব্যাগ ছিল। এ ছাড়াও আরও কিছু জিনিস পাওয়া গেছে...'

'ওই বেহায়া মেয়েটা!' হিসিয়ে উঠল তার স্ত্রী। 'ওটা একটা বেহায়া মাগী এবং চোর। ও তোমার গাড়ি চুরি করেছে বলে একটুও অবাক হইনি আমি. জানতাম এরকম কিছু একটা ঘটবে। তবে একদিক থেকে ভালই হয়েছে, ওই মাগীর সঙ্গে আর ঢলাঢলি করতে পারবে না।'

'ওভাবে কথা বোলো না, অ্যানি,' গম্ভীর গলায় বলল লেসনার। 'লিলেনের সঙ্গে আমার কোনও ঢলাঢলির সম্পর্ক ছিল না। কথাটা আগেও বলেছি তোমাকে। তুমি ওকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে বলে আমি ওর হয়ে দু একটা কথা বলতাম। তবে আমার মনে হয় না ও-ই গাড়িটা চুরি করেছে। ওকে কেউ হয়তো ফাঁসানোর চেষ্টা করছে।'

'আবার ওর পক্ষ নিয়ে কথা বলতে শুরু করেছ! ও যদি চুরি না-ই করে থাকে, তা হলে নিজের চেহারা দেখাতে ভয় পাচ্ছে কেন? ওর হ্যাণ্ডব্যাগ মিসিং বলে রিপোর্ট করবে? ওর ব্যাগের মধ্যে কমপ্যাক্ট এবং লিপস্টিক ছাড়াও আরও অনেক কিছু থাকার কথা। মহিলাদের ব্যাগে সবসময়ই থাকে। ক্রেডিট কার্ড... এরকম নানান জিনিস। নাহ্, ওর বাড় বড্ড বেড়েছে! দাঁড়াও, ওকে আবার হাতের নাগালে পেয়ে নি'! এমন ঝাড়ি দেব না! ও তোমার ওপর ছড়ি ঘোরাতে পারে, কিন্তু আমার সাথে পারবে না।'

কোনও জবাব না দিয়ে স্ত্রীর দিকে তাকাল লেসনার। হঠাৎ সিধে হলো সে, টলতে টলতে এগোল বাথরুমে। তারপর ওয়াশ বেসিনে হড়হড় করে বমি করে দিল।

ও জানে লিল মারা গেছে। মরা মানুষ চুরি করে না।

কিংবা সসবোটও ভাঙে না।

সে রাতে সত্যি খুব অসুস্থ হয়ে পড়ল লেসনার। খুব জ্বর-জ্বর লাগছিল আর বেশ কয়েকবারই যেতে হলো বাথরুমে।

'এভাবে চলতে পারে না, কূর্ট,' বলল তার স্ত্রী। 'ডাক্তার ডাকা দরকার।' বহুদিন পরে এরকম নরম গলায় কথা বলল অ্যানি। জবাবে করুণ মুখে ডানে-বামে মাথা নাড়ল লেসনার।

'ঠিক হয়ে যাব আমি,' স্ত্রীকে আশ্বস্ত করতে চাইল সে। 'কাল সকালেই সুস্থ হয়ে যাব, দেখো। আজেবাজে কিছু বোধহয় খেয়ে ফেলেছি। ফলে বদহজম হয়েছে।'

ওর দিকে সরু দৃষ্টিতে তাকাল অ্যানি, কিন্তু মুখে বলল না কিছু।

বিছানায় শুয়ে খালি এপাশ-ওপাশ করল লেসনার। ঘুম আসছে না। অ্যানি ঘুমায়নি, বুঝতে পারল ও। লেসনারের মাথাটা বনবন করে ঘুরছে। সে এখন কী করবে? সে নিশ্চিত মারা গেছে লিল। কিন্তু মরা মানুষ তো চুরি করে না, আবার ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করল লেসনার। কিংবা সস ছিটিয়ে নোংরা করে না সোফা...

পরদিন সকাল ন'টা বাজার আগেই ইন্সপেক্টরকে ফোন করল ও। বলল ওর সন্দেহ গাড়ি চুরির পুরো ঘটনাটাই সাজানো। 'লিল যদি গাড়ি চুরি করবেই তা হলে কেন সিটের ওপর ওর হ্যাণ্ডব্যাগ ফেলে গেল?' জিজ্ঞেস করল লেসনার। 'আর ক্যাফেতে ঢুকেই বা সসবোট ভাঙতে যাবে কেন? পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে। মেয়েটা দেখতে কেমন? ক্যাফের লোকেরা নিশ্চয় তার চেহারার বর্ণনা দিতে পারবে।'

'শুনেছি মেয়েটি ছিল স্বর্ণকেশী, দেখতে তরুণীদের মত, চেহারায় অদ্ভুত শিশুসুলভ সারল্য রয়েছে, বলেছে ক্যাফের ম্যানেজার। তবে আপনি বললে আমি আরভিকার পুলিশকে ফোন করতে পারি ওরা আর কিছু জানে কি না।' বলল পুলিশ কর্মকর্তা।

'না, তার আর দরকার হবে না,' দ্রুত বলে উঠল কূর্ট লেসনার। 'আমার কাছে পুরো ব্যাপারটাই একটু খাপছাড়া মনে হচ্ছিল এই যা। ও তো আমাকে বলতেই পারত যে গাড়িটা ওর দরকার। ও নিশ্চয় জানত...'

'এক মিনিট,' বাধা দিল ইন্সপেক্টর। 'একটু ধরুন, প্লিজ।' কূর্ট লেসনার শুনতে পেল পুলিশ ইন্সপেক্টর রিসিভার নামিয়ে রেখে কোথায় যেন গেল। এক মিনিট পরে আবার ফোনে ফিরে এল সে। 'গাড়িতে লিলেন জোহান অ্যাস-এর হাতের ছাপের ছড়াছড়ি। কাজেই, বোঝা যাচ্ছে সে-ই গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে আরভিকা গিয়েছিল।'

'ও, আচ্ছা-আচ্ছা। তা হলে তো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়েই গেল, তাই না?' দুর্বল গলায় বলল লেসনার। হাত থেকে খসে পড়ে যাচ্ছিল রিসিভার, দ্রুত রেখে দিল যথাস্থানে।

শেভ করতে-করতে আয়নায় তাকাল লেসনার। 'ঈশ্বর,' মনে-মনে বলল ও, 'আমাকে মরা মানুষের মত দেখাচ্ছে।' হঠাৎ শিউরে উঠল সে। নাশতার টেবিলে বসে টোস্টে একটা কামড় দিয়েই প্লেটটি ঠেলে সরিয়ে রাখল।

'আজ আর বেরিয়ে কাজ নেই, কুর্ট,' অনুনয়ের সুরে বলল তার স্ত্রী। 'শরীরের এ অবস্থা নিয়ে অফিস যেতে হবে না। তা ছাড়া আজ তো শনিবার। আমি ডাক্তারকে খবর দিই। উনি একবার এসে তোমাকে দেখে যান।'

'নির্বোধের মত কথা বোলো না,' বিরক্ত লেসনার। 'অফিসে যাওয়া খুব জরুরি। আমি না গেলে অফিস চলবে কী করে?'

তবে অ্যানি শহরে যাচ্ছে বুঝতে পেরে মত বদলাল লেসনার। ও যদি সত্যি হ্যালুসিনেশনের শিকার হয়ে থাকে, বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখা দরকার। যেখানে ও লিলের লাশ লুকিয়ে রেখেছে সেখানে গেলেই একমাত্র সকল সন্দেহ ভঞ্জন হবে।

ইস, যদি এসব কিছুই না ঘটত! 'ওহ, গড!' ভাবছে লেসনার। 'সবকিছুই যেন আমার মনের কল্পনা হয়।' কিন্তু ও জানে সবকিছু তা নয়।

লিলকে আবার দেখতে পাবার জন্য নিজের সবকিছু বিসর্জন দিতে রাজি লেসনার। শুধু একবার ওকে দেখতে চায়—জীবিত! লিল যাকে খুশি বিয়ে করুক কিচ্ছু মনে করবে না লেসনার। লিলকে আর কখনও কোনও ঝামেলায় ফেলবে না সে। নিজের জীবনে আর কোনও নারীকেও আসতে দেবে না। যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে ওর। লিল, প্রিয় লিল...

অ্যানি বাড়ি থেকে বেরোতেই ভাড়া করা গাড়িটি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল লেসনারও। চলল সে রাস্তায় যে রাস্তা ধরে পিছনের আসনে কম্বল মোড়ানো লিলের লাশটা নিয়ে যাচ্ছিল ও। ওটা ছিল লিলের শেষ যাত্রা।

গতবারের মত একই জায়গায় গাড়ি থামাল লেসনার। নিজেকে শক্ত করে, গাড়ির দরজা খুলল। তারপর অর্ধ সচেতন অবস্থায় প্রায় ছুটে গেল ঘন জঙ্গলের দিকে যেখানে লিলের লাশ ফেলে গিয়েছিল ও।

জঙ্গল পেরিয়ে মাঝামাঝি জায়গায় চলে এল সে, ঝোপ ঠেলে উঁকি দিল জমাট বাঁধা অন্ধকারে। আছে! যেখানে রেখে গিয়েছিল লাশটি আছে সেখানেই!

ঠিক ওই সময় পিছন থেকে ঝোপঝাড় মাড়িয়ে ছুটন্ত বুটজুতোর শব্দ শুনতে পেল লেসনার।

পুলিশ।

দৃশ্যপটে প্রথমে হাজির হলো ইন্সপেক্টর স্ভেন্দসেন, এর সঙ্গেই ফোনে কথা বলেছিল লেসনার। তার ঠিক পিছনে হালকা-পাতলা গড়নের একটি নারী মূর্তি দেখতে পেল ও। ইন্সপেক্টর ওর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল মহিলার: ডিটেকটিভ সিলভিয়া লারসগার্ড।

'লিলের অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝতে পারি সাংঘাতিক

সিরিয়াস কিছু একটা ঘটেছে ওর। ও নিজের ফ্ল্যাটটাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত। ওটা যেন তার শরীরের একটা অংশ হয়ে উঠেছিল। ও কখনওই কাউকে না বলে ফ্ল্যাট ছেড়ে কোনওদিন কোথাও যায়নি। ও একবার আমাকে বলেছিল আপনার সম্পর্কে ও এমন কিছু তথ্য জানে যা প্রকাশ হলে আপনি ধ্বংস হয়ে যাবেন। তবে তথ্যটা আমাকে কখনও জানায়নি লিল। ওর কোনও খোঁজ-খবর পাচ্ছিলাম না বলে আমি আপনাকে নিয়ে ওর বলা কথাগুলো ভাবতে থাকি। তারপরই আমি আপনার গাড়িটা চুরি করি। আমি ভেবেছিলাম আপনি যদি ওকে খুন করে থাকেন এবং আমি যদি ব্যাপারটা এরকমভাবে দাঁড় করাই যে ও বেঁচে আছে–ওয়েল, সেক্ষেত্রে আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে আপনি নিশ্চয় ওর লাশটা যথাস্থানে আছে কি না দেখতে যাবেন। ওর কাছে আপনার গাড়ির আরেকটা চাবি ছিল ভুলে যাননি নিশ্চয়। আমি ওই চাবিটাই লিলের ড্রেসিং-টেবিলে পেয়ে যাই। আর–দেখতেই পাচ্ছেন আমার পরিকল্পনাটা কাজে লেগেছে।'

ডিটেকটিভ সার্জেন্ট সিলভিয়া লারসগার্ড। স্বর্ণকেশী, ছিমছাম ফিগার, চোখজোড়া স্পীডওয়েল ফুলের মত উজ্জ্বল নীল। লিলের চেয়ে বয়সে চার-পাঁচ বছরের বেশি হবে, কিন্তু দেখলেই বোঝা যায় ওরা দুই বোন।

মূলঃ ইলা গ্রিফিথস

মৃত্যু-প্রহর

এলিসন লিডেল একজন আত্মপ্রতিষ্ঠিত মানুষ। ইংরেজিতে যাকে বলে 'সেলফ-মেড ম্যান'। এবং নিজের কাজ নিয়ে তার অহংকারও কম নয়।

অনেক ছানা-পোনার বৃহৎ এবং দরিদ্র একটি শ্রমিক পরিবারে তার জন্ম। তবে শীঘ্রি সে পরিবারের মায়া থেকে বেরিয়ে এসে ইলেকট্রনিক্সের লাইনে নিজের প্রতিভার স্ফূরণ ঘটাতে সক্ষম হলো এবং কঠোর পরিশ্রম করার ক্ষমতা ও যে কোনও বাধা গুঁড়িয়ে দেয়ার অদম্য মনোবলের সাহায্যে প্রকল্পে পা দেয়ার আগেই সে অত্যন্ত লাভজনক একটি ব্যবসার মালিক হয়ে উঠল, কিনে ফেলল দামী আসবাবসহ সুন্দর একটি বাড়ি, লেটেস্ট মডেলের গাড়ি, দেশের বাইরেও তার সম্পত্তির পরিমাণ কম নয় এবং তার সাফল্যের আকাশে অর্থনৈতিক মন্দার কালো মেঘ কখনও ছায়া ফেলবার সুযোগ পেল না। এ বয়সে অনেক পুরুষই তাদের অর্জন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু এলিসন তাদের মত নয়।

সম্পদ অর্জন এবং বৃদ্ধির সুখ সে উপভোগ করেছে; এখন জীবনের কাছ থেকে দুটি ঝলমলে পুরস্কারের প্রত্যাশা করছে এলিসন, যে কোনও ধরনের সামাজিক স্বীকৃতি বা সম্মাননা এবং একজন উত্তরাধিকার। তবে দুটোর সামনেই বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার স্ত্রী ডুলসি।

এলিসনের সামাজিক উচ্চাকাঙ্ক্ষায় কখনও অনুপ্রেরণা জোগায়নি ডুলসি, তার সঙ্গে ব্যবসায়িক কোনও বিষয় নিয়ে আলোচনা করাই বৃথা। নিজের সংসার ছাড়া আর কিছু বোঝে না ডুলসি, বুঝতেও চায় না বোধহয়। তাকে এলিসনের রক্ত মাংসের রোবটের বেশি কিছু মনে হয় না। যদিও ডুলসি তাকে যথেষ্ট ভালবাসে, কিন্তু এলিসন তাকে আর ভালবাসে না। সামাজিক মান মর্যাদা বাড়াতে ডুলসি তার কোনও কাজেই আসবে না বুঝতে পেরে এলিসন তার স্ত্রীকে শীঘ্রি নিজের জীবন থেকে চিরতরে সরিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যেহেতু ডুলসি বুড়িয়ে গেছে, তার কাছ থেকে সন্তান উপহার পাবার কোনও সম্ভাবনাই নেই, কাজেই অকাজের কাজী একটা বুড়ি মাগীকে নিয়ে ঘর-সংসার করার কথা ভাবতেই পারে না এলিসন। আর আসল কথা হলো তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে ভায়োলেটের। ত্রিশ বছরের এই অপূর্ব সুন্দরী ফরাসী নারীটি তারই এক মৃত ব্যবসায়ী প্রতিদ্বন্দ্বীর বিধবা স্ত্রী। ভায়োলেটকে দেখা মাত্র এলিসনের মনে হয়েছিল এতদিনে সে খুঁজে পেয়েছে তার প্রকৃত পার্টনারকে। ভায়োলেট ধনী তো বটেই, তার চেহারা, আভিজাত্য, ব্যবসায়িক ধীশক্তি সবকিছুই তার প্রতি দারুণ আকৃষ্ট করে তোলে এলিসনকে। স্ত্রী হিসেবে যা দারুণ মানাবে ভায়োলেটকে! তার সন্তানের মা হিসেবেও চমৎকার ভূমিকা পালন করতে পারবে এ নারী! এলিসন জানে, টের

পেয়েছে, ভায়োলেটও তার প্রতি সমানভাবে আকৃষ্ট। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হলেও এলিসনকে চল্লিশের বেশি মনেই হয় না। আর তার যে কোনও বিষয় সহজভাবে, লঘু হাস্যরসে মেনে নেয়ার ক্ষমতাটিও ভায়োলেটের খুব পছন্দ। দু'জনের মিলনে, বিবাহে, একমাত্র অন্তরায় হয়ে আছে ম্লান, নিষ্প্রভ এবং ভোঁতা ডুলসি। ডুলসি একটা বাধা। এ বাধা দূর করতেই হবে।

তবে ডুলসিকে একসময় প্রয়োজন হত এলিসনের। পঁচিশ বছর আগে, বিয়ের সময় সে নিতান্তই লেসলি সিডনি নরম্যান ওরফে লিডল ছিল। কেউ চিনত না, সহায়-সম্পত্তি, টাকা-পয়সা কিছুই ছিল না তার, শুধু বুকের মধ্যে ছিল আগুন, বড় হয়ে ওঠার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। হতাশ হয়ে শীঘ্রি সে আবিষ্কার করে টাকা-পয়সা ছাড়া দ্রুত উন্নতি প্রায় অসম্ভব একটি ব্যাপার। ডুলসি ছিল তার সমবয়েসী, সাদামাটা চেহারার, ঘরোয়া একটি মেয়ে। ডুলসি এলিসনের প্রেমে পড়ে গিয়েছিল প্রবলভাবে। প্রথমে তার ভালবাসা ছিল প্রতিদানহীন, কিন্তু যখন তার বিধবা মা আকস্মিক মারা যান, একমাত্র সন্তানের জন্য রেখে গিয়েছিলেন একটি বাড়ি, কিছু টাকা আর ইনশিওরেন্স পলিসি। তরুণ লিডল মনে করত বেচারী মাতৃহীন মেয়েটিকে সম্পদলোভীদের হাত থেকে রক্ষা করা তার নৈতিক দায়িত্ব। সে ডুলসিকে ঝট করে বিয়ে করে ফেলে, ছলচাতুরি করে মেয়েটির সমস্ত টাকা-পয়সা এবং পার্থিব সম্পত্তি যৌথ নামের অ্যাকাউন্ট করে নিজের ব্যবসা ফেঁদে বসে এবং নিজের নাম বদলে এলিসন লিডেল রাখে। এ নামটি তার কাছে অনেক বেশি অভিজাত মনে হচ্ছিল। ব্যবসায় তরতর করে উন্নতি করছিল সে।

শুরুর দিকে খুব সুখীই ছিল ডুলসি, কিন্তু যখন তাদের জীবন যাত্রার মান বদলে যাচ্ছিল, উপরের দিকে উঠছিল, এ পরিবর্তনের সঙ্গে ঠিক তাল মেলাতে এবং খাপ খাওয়াতে পারছিল না সে। তার সর্বোচ্চ চাওয়া ছিল 'শীতের সময় থ্রি পিস সুট আর কিছু ভেলভেটের পর্দা'। কিন্তু এলিসন যখন সিদ্ধান্ত নেয় তাদের ছোট্ট, সুন্দর বাড়িটি ছেড়ে শহরে নামী, অভিজাত এলাকার একটি বাড়িতে উঠবে, হৃদয় ভেঙে গিয়েছিল ডুলসির।

বছর যায়, ডুলসি দেখে সে সমাজ থেকে ক্রমে বিচ্যুত হয়ে পড়ছে, কারণ স্বামীর প্রাচুর্যময় লাইফস্টাইলের সঙ্গে নিজেকে কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারছিল না। স্বামীর সোহাগ এবং ভালবাসা থেকে ক্রমে বঞ্চিত ডুলসি মানসিক শান্তি খুঁজে নেয় খাদ্য এবং পানীয়র মাঝে। সে মিষ্টি খেতে ভালবাসত এবং মিষ্টিজাত খাদ্যগুলো বেশি-বেশি গ্রহণ করার কারণে খুব দ্রুত ওজন বৃদ্ধি পেতে থাকে তার, অচিরেই তাকে বয়সে এলিসনের চেয়ে বড় দেখাচ্ছিল। কারণ, ব্যায়াম আর ডায়েট কন্ট্রোলের মাধ্যমে নিজের বয়স অনেকটাই লুকিয়ে রাখা সম্ভব হচ্ছিল এলিসনের জন্য। আর এলিসনের চেয়ে তাকে বুড়ি দেখানোর হতাশায় আরও বেশি খেতে থাকে ডুলসি।

বিয়ের পরে ডুলসি মা হতে চাইলেও এলিসন সবসময়ই বিরোধিতা করেছে। এলিসন ভাবত এত তরুণ বয়সে বাপ হলে তা তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছুবার ক্ষেত্রে

বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু এখন সে মনে করছে লিডেল সাম্রাজ্য এগিয়ে নিয়ে যেতে এর হাল সে ধরিয়ে দিয়ে যাবে তার পুত্রকে। এ কারণেই তার পিতৃত্বের সাধ জেগেছে। এবং শখ পূরণ করার জন্য মোটেই দেরি করার পাত্র নয় এলিসন।

কাজগুলো সহজ হত যদি ডুলসিকে ডিভোর্স দেয়া যেত। ডিভোর্স নিয়ে ডুলসি ডুবে থাকত তার পছন্দের ক্রিম কেক, ড্রিংক আর রোমাণ্টিক উপন্যাসগুলোর মাঝে। ডুলসি জানে না তার টাকা-পয়সা দিয়ে এলিসন বড়লোক হলেও ডুলসিকে সে কাগজপত্রে নামে মাত্র পার্টনার রেখেছে, সমস্ত ক্ষমতা একাই ভোগ করছে এলিসন। তবে মনে হয় না ডুলসি তাকে ডিভোর্স দিতে রাজি হবে। আর ভায়োলেট সম্ভ্রান্ত ফরাসী ক্যাথলিক পরিবারের মেয়ে হয়ে এলিসনের স্ত্রী বর্তমান থাকা অবস্থায় কিছুতেই তাকে বিয়ে করতে রাজি হবে না। কাজেই আর কোনও উপায় রইল কি? ডুলসিকে হারাতেই হবে এলিসনের, বিপত্নীক তাকে হতেই হবে।

সর্বদা সতর্ক, প্রতিটি কাজ হিসেব করে চলা এলিসন কোনওদিন কোনও ভুল পদক্ষেপ ফেলেনি। নিজের অত্যন্ত দক্ষ ইলেকট্রনিক জ্ঞান খাটিয়ে, অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে পরিকল্পনা করতে লাগল সে কীভাবে ডুলসির কবল থেকে চিরতরে মুক্তি পাওয়া যায়।

প্রথমে ডুলসির মনে এ ধারণা ঢুকিয়ে দিতে হবে যে তাদের বাড়িতে গ্যাস লিক করেছে। সে নিশ্চয়ই গ্যাস বোর্ডকে খবর দেবে চেক করে দেখার জন্য। তারা কিছুই পাবে না। তবে গ্যাস লিকের বিষয়ে ডুলসির মনে একটা সন্দেহের বীজ রোপণ করা যাবে।

তারপর সতর্কতার সঙ্গে বাছাই করা একটি দিনে, যেদিন এলিসন নিশ্চিত থাকবে বাড়িতে থাকবে না ডুলসি, সে ছোট অথচ অত্যন্ত শক্তিশালী এক্সপ্লোসিভ চার্জ ইনস্টল করবে গ্যাস মিটারে, সেণ্ট্রাল হিটিং সিস্টেমের ঘড়ির সঙ্গে জুড়ে দেবে একটি টাইমিং ডিভাইস। ওই দিন রাত এগারোটার সময় যাতে বিস্ফোরিত হয় বোমা সেভাবে ফিউজ সেট করবে ডিটোনেটরের সঙ্গে। ঘরের কাজকাম সেরে বিছানায় যেতে যেতে রাত সোয়া দশটা বেজে যায় ডুলসির। সে মুহূর্তে বাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটবে, উড়িয়ে নিয়ে যাবে সবকিছু, ওই সময় নিষ্কণ্টক অ্যালিবাই তৈরি করার জন্য এলিসন থাকবে অনেক–অনেক দূরে।

স্বাভাবিকভাবেই ইনশিওরেন্সের লোকজনের কাছে ধ্বংস হওয়া বাড়ি থেকে বিস্ফোরণের কারণ খুঁজে পাবার মত কোনও প্রমাণ থাকবে না। এলিসন অ্যামেচার নয় বলেই ভয়াবহ এ ধ্বংসযজ্ঞ থেকে যাতে কেউ বা কোনও কিছু রক্ষা না পায় সেদিকটা সে নিশ্চিত করবে, তার দিকে সন্দেহের আঙুল তুলবার মত কোনও প্রমাণ রাখবে না।

ভাগ্য সবসময় আশ্চর্য সহায়তা করে এসেছে এলিসনকে। এবারেও তার ব্যত্যয় ঘটল না। দুটি ঘটনা ঘটল। প্রথমটি হলো সাইনাসের সমস্যাটি হঠাৎ

চাগিয়ে উঠল ডুলসির। সে সর্দির কারণে কোনও কিছুর গন্ধ পাচ্ছিল না বলে এলিসনের গ্যাস লিক হবার গল্পটি সহজেই বিশ্বাস করল। দ্রুত ফোন করল গ্যাস বোর্ডে। গ্যাস বোর্ডের একজন পরিদর্শক এসে পুরো সিস্টেমটি চেক করে দেখল এবং কোথাও কোনও সমস্যা নেই বলে জানাল। কিন্তু এলিসন ক'দিন পরপর ডুলসিকে বলল সে গ্যাসের কড়া গন্ধ পাচ্ছে, নিশ্চয়ই কোথাও গ্যাসট্যাস লিক করেছে। ডুলসি আরও বারতিনেক গ্যাস ইন্সপেক্টরকে খবর দিল। প্রতিবারই লোকটি বলল কোনও গ্যাস লিক হয়নি। ডুলসির কাছে এলিসনের কথাই আইন, সে যখন গ্যাসের গন্ধ পাচ্ছে, নিশ্চয় কোথাও গ্যাস লিক করেছে। ইন্সপেক্টরই আসলে ভুল বলছে। আজকাল ডুলসিরও মনে হতে লাগল সে যেন কেমন গ্যাসের গন্ধ পাচ্ছে। গ্যাস লিকের আশংকার কথা সে তাদের ঠিকা কাজের বুয়া মিসেস হ্যালিডেকেও বলল।

দ্বিতীয়বার এলিসনকে ভাগ্য সহায়তা করল ডুলসির কিছু অভ্যাসকে আশ্রয় করে। প্রতি বৃহস্পতিবার সে তার কাজিন ডোরিসের বাড়ি বেড়াতে যায়। ডোরিসের বাড়ি মাইল দশেক দূরে। ছোট্ট গাড়িটিতে চড়ে ডুলসি কাঁটায়-কাঁটায় সকাল দশটায় রওনা হয়ে যায় কাজিনের বাড়ির উদ্দেশে এবং ঠিক রাত দশটার সময় নিজের বাসায় ফেরে। ফিরে এসে সে হটচকোলেট এবং কাস্টার্ড ক্রিম খেয়ে ঘুমের বড়ি গিলে রোমান্টিক কোনও উপন্যাস নিয়ে শুয়ে পড়ে বিছানায়।

পরিকল্পনা মাফিক কাজ করার সুযোগটা মিলে গেল বৃহস্পতিবারের এক সন্ধ্যায়। পার্শ্ববর্তী একটি শহরে একটি গুরুত্বপূর্ণ ডিনারে দাওয়াত পেল এলিসন। সব কেমন খাপে-খাপে মিলে যাচ্ছিল; এর চেয়ে দারুণ বন্দোবস্ত আর কী হতে পারে?

মিসেস হ্যালিডেকে শুনিয়ে-শুনিয়ে বেশ কয়েকবার ডুলসিকে তার সঙ্গে ডিনারে যেতে অনুরোধ করেছে এলিসন, প্রলোভন দেখিয়েছে শুধুমাত্র ওই অনুষ্ঠানের জন্য নতুন ইভনিং গাউন কিনে দেবে। যেমনটি অনুমান করেছিল তা-ই ঘটেছে। সামাজিক অনুষ্ঠানে হাজিরা দিতে বরাবরই বিমুখ ডুলসি এবারেও স্বামীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। কারণ, ডোরিসকে সে হতাশ করতে পারবে না। ডোরিসের বাড়ি না গেলে খুবই কষ্ট পাবে তার কাজিন। ডুলসির কাণ্ড দেখে যারপরনাই বিরক্ত মিসেস হ্যালিডে। ভেবেছে কী অদ্ভুত মানুষ এই মিসেস লিডেল! মিসেস হ্যালিডে জীবনেও এরকম সুযোগ হারাত না।

নভেম্বরের শেষ সপ্তাহের ওই বৃহস্পতিবারে, সেদিন বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। ওই দিনই ডিনারের দাওয়াতে যাবে এলিসন, সে শেষ বিকেলে অফিস থেকে শূন্য বাড়িতে ফিরে এসে কাজ শুরু করে দিল। সবকিছুই ঠিকঠাক মত করল এলিসন, তবে একজন পারফেকশনিস্ট বলে প্রতিটি জিনিস ডাবল চেক করে দেখল। কথা বলা ঘড়িটিতে বারবার চোখ বুলিয়ে নিল। এগারোটা বাজলেই—বুম!

জামা-কাপড় পরে শেষবারের মত ঘরের চারপাশে চোখ বুলাল এলিসন। সে

ফিরে আসার পরে এ বাড়িটির আর কোনও অস্তিত্ব থাকবে না। বাড়ি নিয়ে তার মধ্যে কোনও আবেগ কাজ করছে না এবং আফসোসও নেই। এখন সবকিছু আবার নতুন করে শুরু করার সময়।

খুবই জমকালো ডিনার পার্টি। অন্যসময় হলে দারুণ উপভোগ করত এলিসন। কিন্তু আজ রাতে তার মন পড়ে রয়েছে ঘটনাস্থলে, রাত এগারোটার সময় সে কল্পনায় বিস্ফোরণের আওয়াজ পর্যন্ত শুনতে পেল, তবে স্নায়ুর উপর দুর্দান্ত নিয়ন্ত্রণ রয়েছে বলে তার বাইরের মার্জিত আচরণ দেখে কারও বোঝার জো নেই ভেতরের মানুষটা কীরকম উৎকণ্ঠায় অস্থির আর উত্তেজনায় অধীর।

রাত বারোটা পঞ্চাশ মিনিটে গাড়ি নিয়ে নিজের মহল্লার রাস্তায় প্রবেশ করল এলিসন, নরক গুলজার হয়ে থাকা দৃশ্যটি দেখার জন্য মনে-মনে প্রস্তুত। সে দেখবে দমকল বাহিনীর গাড়ি, অ্যাম্বুলেন্স, পুলিশ তার অপেক্ষায় ভয়ংকর সংবাদটি দেয়ার জন্য, উৎসুক দর্শক–ডিজাস্টার পরবর্তী যেমনটি ঘটে থাকে আর কী।

কিন্তু সুপ্রশস্ত রাস্তাটি সম্পূর্ণ নির্জন, শীতল, তারাজ্বলা আকাশের নীচে, এভিন্যুর বৃহদায়তনের ছাড়া-ছাড়া বাড়িগুলো চুপচাপ নিদ্রা যাচ্ছে। ওর নিজের বাড়িটি অন্ধকার এবং অক্ষত।

বাড়ির ভিতরে এলিসন যেমনটি দেখে গিয়েছিল সবকিছু তেমনটিই রয়েছে। হতভম্ব হয়ে সে একছুটে দোতলায় ডুলসির রুমে চলে এল। খালি ঘর, বিছানায় কেউ শোয়নি। জীবনে এই প্রথম একেবারে বোকা বনে গেল এলিসন। ঘটনা কী? ভজকটটা লাগল কোথায়?

হলঘরে ফিরে এসেছে এলিসন, বেজে উঠল ফোন। ডুলসি। বাড়ি ফিরতে পারেনি বলে ক্ষমা চেয়ে ব্যাখ্যা দিল সে বাড়ি ফেরার সময় হঠাৎ করে বিদ্যুৎ চলে যায়। অন্ধকারে ডোরিস আর তাকে বেরোতে দেয়নি, তার সঙ্গে রাতটা কাটাতে বলে। কেন, ইলেকট্রিসিটি ফেইল হবার কথা এলিসন জানে না? কুড়ি মাইল এলাকা জুড়ে দুই ঘণ্টার জন্য বিদ্যুৎ চলে গিয়েছিল। আবার মাফ চাইল ডুলসি, বলল সকাল হলেই সে বাসায় ফিরে এলিসনের জন্য নাশতা বানিয়ে দেবে। শুভরাত্রি জানিয়ে লাইন কেটে দিল সে।

মন্থর গতিতে রিসিভার নামিয়ে রাখল এলিসন। ইলেকট্রিসিটি ফেইল! হঠাৎ ব্যাপারটার মাজেজা বুঝতে পেরে ভয়ে গোটা শরীর কেঁপে উঠল ওর। দেয়ালে ঝোলানো বৈদ্যুতিক ঘড়িটির দিকে তাকাল। দ্বিতীয় কাঁটাটি ১১-র ঘরের দিকে টিক-টিক শব্দে এগিয়ে যাচ্ছে। এক্ষুণি ছুঁয়ে ফেলবে। প্রচণ্ড আতংক নিয়ে সদর দরজার দিকে ছুটল এলিসন। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। এত সাবধানে করা পরিকল্পনা মাফিকই কাজ করল ইলেকট্রিক ঘড়ির বোমা। এগারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ভয়াবহ বিস্ফোরণে টুকরো টুকরো হয়ে গেল এলিসনের বাড়ি, এলিসনকে সহ। জীবনের প্রথম এবং শেষ ভুলটার খেসারত এভাবেই দিতে হলো তাকে!

মূল: এইলিন হুইলার

কলোনি

মেজর লরেন্স হ্যাল বিনকিউলার মাইক্রোস্কোপের ওপর ঝুঁকে পড়ল, অ্যাডজাস্টমেণ্ট কারেকশন করছে।

'ইণ্টারেস্টিং,' বিড়বিড় করল সে। 'ব্যাপারটা বেশ মজার, না? তিন হপ্তা ধরে এ গ্রহে আমরা ক্ষতিকর কোন লাইফ-ফর্ম খুঁজে বেড়াচ্ছি, অথচ এখনও তার দেখা মেলেনি।'

লেফটেন্যাণ্ট ফ্রেগুলি কালচারাল বোলগুলোর পাশে, ল্যাব টেবিলের কোনায় বসল সাবধানে। 'কেমন জায়গাটা? কোন রোগজীবাণু নেই, নেই মশা-মাছি, ইঁদুর, নেই–'

'নেই হুইস্কি বা পতিতালয়।' সিধে হলো হ্যাল। 'অদ্ভুত একটা জায়গাই বটে। গোটা গ্রহের কোথাও কোন ক্ষতিকর উপাদান খুঁজে পাইনি আমরা। ভাবছি এটাই আমাদের পূর্বপুরুষের সেই কল্পনার স্বর্গের বাগান কি না।'

হ্যাল জানালার কাছে গিয়ে তাকাল বাইরে। দারুণ একটি দৃশ্য। ঢেউ খেলানো জঙ্গল এবং পাহাড়, সবুজ ঢাল উদ্ভাসিত হয়ে আছে নানা রঙের ফুল আর সীমাহীন দ্রাক্ষাকুঞ্জে, জলপ্রপাত, ঝুলন্ত শেওলা, ফলের গাছ, লেক। যেন প্ল্যানেট বু'র সব কিছুই নিপুণ হাতে সাজিয়ে রেখেছে কেউ–যেন ছ'মাস আগে স্কাউটশিপ এটা তৈরি করে রেখে গেছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল হ্যাল। 'এমন জায়গায় বারবার আসতে কার না মন চায়!'

ফ্রেগুলি একটা সিগারেট বের করেও সরিয়ে রাখল। বলল, 'জানো, গ্রহটা একটা অদ্ভুত প্রভাব ফেলেছে আমার ওপর। আমার এখন আর ধূমপান করতে ইচ্ছে করে না। যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলতেও বাধে।'

নিজের মাইক্রোস্কোপের কাছে ফিরে গেল হ্যাল। 'আমার একটু কাজ আছে, ফ্রেগুলি। কয়েকটা কালচার এখনও বাকি রয়ে গেছে। দেখি কোন ভয়ঙ্কর জীবাণুর সন্ধান পাই কি না।'

'চেষ্টা করতে থাকো,' টেবিল থেকে লাফিয়ে নামল ফ্রেগুলি। 'ভাল কথা, এক নম্বর রুমে কনফারেন্স ডাকা হয়েছে। চলে এসো,' বলে চলে গেল সে। ওর পায়ের শব্দ ক্রমে মিলিয়ে গেল করিডরে। ল্যাবে একা হয়ে গেল হ্যাল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কী যেন ভাবল ও। তারপর মাইক্রোস্কোপের স্লাইড সরিয়ে নতুন আরেকটা ঢোকাল। আলোতে মার্কিংগুলো পড়তে লাগল।

ল্যাবটা উষ্ণ এবং নীরব। সূর্যের আলো জানালা গলে ঢুকে পড়ে মেঝেতে গলে পড়ছে। বাতাসে গাছের পাতা হঠাৎ হঠাৎ শিউরে উঠছে। ঘুম এসে গেল হ্যালের। হঠাৎ লাফিয়ে উঠল ও। মাইক্রোস্কোপের আইপিস দুটোকে গলা থেকে ছোটানোর প্রাণপণ চেষ্টা করল। পারল না। ইস্পাতের দাঁড়া জোড়া ফাঁদের মত

চেপে বসেছে গলায়।

মাইক্রোস্কোপটাকে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিল হ্যাল, লাফ মেরে পিছিয়ে এল। কিন্তু মাইক্রোস্কোপও হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল তার দিকে, জড়িয়ে ধরল পা। মুক্ত পা-টা দিয়ে লাথি বসাল হ্যাল, পকেট থেকে বের করল ব্লাস্ট পিস্তল।

মাইক্রোস্কোপ পিছু হঠতে শুরু করল। হাতের ব্লাস্ট পিস্তল গর্জে উঠল হ্যালের। টুকরো টুকরো হয়ে গেল মাইক্রোস্কোপ।

'গুড গড!' ধপ করে বসে পড়ল হ্যাল, হাতের চেটো দিয়ে মুছল ঘর্মাক্ত মুখ। 'এসব কী!' গলা ডলছে ও। 'কী এসব!'

কাউন্সিল রুম ভরে আছে। প্ল্যানেট ব্লু'র প্রতিটি অফিসার উপস্থিত ওখানে। কমাণ্ডার স্টেলা মরিসন একটি সরু প্লাস্টিক পয়েন্টার দিয়ে বড় কন্ট্রোল ম্যাপের গায়ে টোকা দিল।

'এই লম্বা সমতল ভূমি নগরী স্থাপনের জন্যে যথার্থ জায়গা। এর আশপাশেই রয়েছে পর্যাপ্ত পানি, আবহাওয়া এখানে উপনিবেশ গড়ে তোলার অনুকূলে। রয়েছে নানা খনিজের বিপুল সম্ভার। কলোনিস্ট বা উপনিবেশকারীরা সহজেই তাদের কারখানা স্থাপন করতে পারবে। কোন কিছু আমদানি করার প্রয়োজন নেই। গ্রহের সবচে' বড় অরণ্যও রয়েছে এখানে। মাথায় বুদ্ধি থাকলে জঙ্গল রাজ্য ধ্বংস করতে চাইবে না ওরা। তবে খবরের কাগজ তৈরি করতে চাইলে বনভূমির ওপর হাত দেবেই।'

সে ঘরভর্তি নিশ্চুপ লোকজনের ওপর একবার চোখ বোলাল। 'লেট'স বি রিয়ালিস্টিক। আপনাদের কেউ কেউ হয়তো ভাবছেন ই. এ. বা ইমিগ্রেশন অথরিটিকে "ওকে" সঙ্কেত না পাঠাতে। ভাবছেন এ গ্রহে আপনারাই থাকবেন। এমন সুন্দর একটা গ্রহে আমারও যে থাকতে ইচ্ছে করে না তা নয়। তবে এটা আমাদের গ্রহ নয়। আমাদের এখানে পাঠানো হয়েছে নির্দিষ্ট একটা কাজ করতে। কাজ শেষ হলে ফিরে যেতে হবে আমাদেরকে। আর কাজ প্রায় শেষের দিকে। কাজেই এখানে থাকার কথা ভুলে যান। এখন একটাই করণীয় আমাদের–গো অ্যাহেড সিগন্যাল দিয়ে জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করা।'

'ব্যাকটেরিয়ার ওপর ল্যাব রিপোর্ট এসেছে?' জানতে চাইল ভাইস-কমাণ্ডার উড।

'ও ব্যাপারে বিশেষ নির্দেশ দেয়া আছে। তবে যদ্দূর জানি এখনও ব্যাকটেরিয়ার সন্ধান পাওয়া যায়নি। আমার মনে হয় ব্যাপারটা ই. এ.-কে জানানো দরকার। তাদেরকে জাহাজ পাঠাতে বলব, উপনিবেশকারীদের প্রথম ব্যাচটা যেন পাঠিয়ে দেয়। কোন কারণ নেই জেড–' হঠাৎ থেমে গেল সে।

কে যেন বিড়বিড় করে কী বলল। সবার মাথা ঘুরে গেল দরজার দিকে।

কমাণ্ডার মরিসনের কপালে ভাঁজ পড়ল। 'মেজর হ্যাল, তোমাকে কি মনে করিয়ে দিতে হবে যে কাউন্সিল মিটিং-এ কোন রকম বিরক্ত করা চলবে না?'

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে টলছে মেজর হ্যাল। ফাঁকা চোখে তাকাল কাউন্সিল রুমে। অবশেষে চকচকে চোখ জোড়া স্থির হলো লেফটেন্যান্ট ফ্রেগুলির ওপর, ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় বসে আছে।

'এদিকে এসো,' কর্কশ গলায় ডাকল সে।

'আমি?' নিজের আসনে আরও সেঁধিয়ে গেল ফ্রেগুলি।

'মেজর, এসবের মানে কী?' গর্জে উঠল ভাইস-কমাণ্ডার উড। 'তুমি কি মাতাল নাকি–' হ্যালের হাতের ব্লাস্ট গান নজর এড়াল না তার। 'কোন ঝামেলা, মেজর?'

মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠল ফ্রেগুলি, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। হ্যালের কাঁধ চেপে ধরে বলল, 'কী হয়েছে?'

'ল্যাবে চলো।'

'কোন কিছুর সন্ধান পেয়েছ?' বন্ধুর পাথর মুখের দিকে তাকাল লেফটেন্যান্ট। 'কীসের সন্ধান মিলল?'

'এসো।' হ্যাল হাঁটা দিল করিডর ধরে। সাথে ফ্রেগুলি। ধাক্কা মেরে ল্যাবের দরজা খুলল হ্যাল। আস্তে আস্তে ঢুকল ভেতরে।

'কী হয়েছে?' আবার প্রশ্ন করল ফ্রেগুলি।

'আমার মাইক্রোস্কোপ।'

'তোমার মাইক্রোস্কোপ? কী হয়েছে?' ওকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল ফ্রেগুলি। 'কই, ওটাকে দেখছি না তো?'

'ওটা নেই।'

'নেই? কোথায় গেল?'

'আমি উড়িয়ে দিয়েছি।'

'উড়িয়ে দিয়েছ?' ফ্রেগুলি তাকাল বন্ধুর দিকে। 'বুঝলাম না। কেন?'

হ্যাল মুখ খুলে আবার বুজে ফেলল, কোন শব্দ বেরোল না।

'তুমি ঠিক আছ তো?' উদ্বেগ নিয়ে জানতে চাইল ফ্রেগুলি। তারপর ঝুঁকে টেবিলের নীচের সেলফ থেকে কালো একটি প্লাস্টিক বক্স তুলে নিল। 'কী এটা?'

বক্স থেকে হ্যালের মাইক্রোস্কোপ বের করল ফ্রেগুলি। 'তুমি নাকি মাইক্রোস্কোপ উড়িয়ে দিয়েছ। তা হলে এটা এল কোত্থেকে? কী হয়েছে বলো তো? স্লাইডে কিছু দেখেছ? কোন ব্যাকটেরিয়া? লেথাল? টক্সিক?'

হ্যাল মাইক্রোস্কোপটাকে দেখল। ঠিকই আছে, এটা তার মাইক্রোস্কোপ। অবিকল আরেকটার মত। সে মাইক্রোস্কোপের গায়ে আঙুল ছোঁয়াল।

মাত্র পাঁচ মিনিট আগে এই মাইক্রোস্কোপ ওকে হত্যা করতে চেয়েছে। আর হ্যাল ওটাকে গুলি করে উড়িয়ে দিয়েছে। তা হলে এটা এল কোত্থেকে?

'তোমার আসলে সাইকি টেস্ট করা দরকার,' চিন্তিত গলায় বলল ফ্রেগুলি। 'তোমাকে ভয়ানক অসুস্থ লাগছে।'

'ঠিকই বলেছ তুমি,' বিড়বিড় করল হ্যাল।

সাইকি টেস্টে কিছুই ধরা পড়ল না। মাথাটা এখনও বনবন করে ঘুরছে হ্যালের। তার কি সত্যি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল? কিন্তু এ কী করে সম্ভব, মাইক্রোস্কোপ জ্যান্ত হয়ে ওঠে? মানুষ খুন করতে চায়! ওটাকে সে গুলি করে উড়িয়ে দিয়েছিল। তারপর আবার ফ্রেগুলি ওটাকে খুঁজে পেয়েছে বক্সের মধ্যে অক্ষত অবস্থায়। ওটা বক্সে গেল কী করে?

ইউনিফর্ম ছেড়ে শাওয়ারের নীচে দাঁড়াল হ্যাল। গরম জলে গা ধুতে ধুতে ধ্যান করল। রোবট সাইকি বলেছে তার মন বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। ধ্যান করলে মনে শান্তি ফিরে আসবে।

গোসল সেরে গা মোছার জন্যে তোয়ালের দিকে হাত বাড়াল হ্যাল। তোয়ালেটা হাতে নিতেই ওটা কোমর পেঁচিয়ে ধরল হ্যালের, ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গেল দেয়ালে। মুখ আর নাক চাপা দেয়ার চেষ্টা করছে। তোয়ালে খুলে ফেলার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল হ্যাল। রীতিমত যুদ্ধ করল। অনেক কষ্টে গা থেকে টেনে ফেলে দিল তোয়ালে। পা পিছলে হ্যালও পড়ে গেল বাথরুমের মেঝেতে। দেয়ালে দারুণভাবে ঠুকে গেল মাথা। চোখে রীতিমত সর্ষে ফুল দেখতে শুরু করল সে। গরম জলের মধ্যে বসে টাওয়েল র‍্যাকের দিকে তাকাল হ্যাল। একটু আগে হিংস্র হয়ে ওঠা তোয়ালেটা র‍্যাকের বাকি তোয়ালেগুলোর সাথে চুপচাপ সহাবস্থান করছে। তিনটে তোয়ালে একসঙ্গে, স্থির। তা হলে কি স্বপ্ন দেখেছে হ্যাল?

কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল মেজর, মাথা ডলছে হাত দিয়ে। সাবধানে টাওয়েল র‍্যাকটাকে পাশ কাটাল সে, শাওয়ার থেকে বেরিয়ে ঢুকল নিজের ঘরে। ডিসপেন্সার থেকে নতুন একটা তোয়ালে নিয়ে গা মুছল। এটাকে স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। গা মুছে কাপড় পরতে লাগল হ্যাল। ঠিক এই সময় বেল্টটা কোমর পেঁচিয়ে ধরল ওর, চাপ দিয়ে গুঁড়িয়ে দিতে চাইল হাড়গোড়। চিৎ হয়ে পড়ে গেল হ্যাল, বেল্টের নাগপাশ থেকে মুক্ত হবার জন্যে যুঝছে। বেল্ট না, যেন ধাতব সাপ, শিস কাটছে বাতাসে, ছোবল মারছে ওকে। অবশেষে ব্লাস্টারটা হাতে নিতে পারল হ্যাল।

সাথে সাথে অদৃশ্য হয়ে গেল বেল্ট বিস্ফোরণের ধাক্কায় একটা চেয়ারে ধপ করে এলিয়ে পড়ল ও, হাঁপাচ্ছে বেদম।

চেয়ারের হাতল জোড়া ওকে জাপটে ধরল। ব্লাস্টার রেডি ছিল এবার। পরপর ছ'বার গুলি করল হ্যাল। নেতিয়ে পড়ল চেয়ার। বন্ধনমুক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল সে।

অর্ধনগ্ন হয়ে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে হ্যাল, হাপরের মত ওঠানামা করছে বুক।

'এ হতে পারে না,' ফিসফিস করে বলল ও। 'আমি নির্ঘাত পাগল হয়ে গেছি।'

অবশেষে পোশাক পরল হ্যাল, পায়ে গলাল জুতো। বেরিয়ে এল শূন্য করিডরে। লিফটে চড়ে টপ ফ্লোরে চলে এল।

কমাণ্ডার মরিসন তার ডেস্কের ওপর দিয়ে তাকাল হ্যালের দিকে। হ্যাল ঘরে ঢুকতেই রোবট ক্লিয়ারিং স্ক্রিন হিস্‌স্‌ শব্দ করে উঠেছে।

'তুমি অস্ত্র নিয়ে এসেছ,' অভিযোগের সুরে বলল কমাণ্ডার।

হ্যাল হাতের ব্লাস্টারের দিকে তাকাল। ডেস্কে জিনিসটা রেখে বলল, 'সরি।'

'কী চাও তুমি? হয়েছেটা কী তোমার? টেস্টিং মেশিন থেকে রিপোর্ট পেয়েছি। বলেছে গত চব্বিশ ঘণ্টায় তোমার রেশিও দশে উঠে গেছে।' তীক্ষ্ণ চোখে ওকে দেখল কমাণ্ডার। 'আমরা পরস্পরকে অনেক দিন ধরে চিনি, লরেন্স। তোমার আসলে হয়েছেটা কী বলো তো?'

গভীর শ্বাস টানল হ্যাল। 'স্টেলা, আজ সকালে আমার মাইক্রোস্কোপ আমাকে গলা টিপে হত্যা করতে চেয়েছিল।'

স্টেলার নীল চোখ জোড়া বিস্ফারিত হয়ে উঠল। 'কী!'

'তারপর, শাওয়ার থেকে বেরোচ্ছি, বাথ টাওয়েলটা পেঁচিয়ে ধরল আমাকে। অনেক কষ্টে ওটার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি। তারপর পোশাক পরতে গেছি। বেল্টটা–' থেমে গেল হ্যাল। কমাণ্ডার দাঁড়িয়ে পড়েছে।

'গার্ড!' হাঁক ছাড়ল সে।

'দাঁড়াও, স্টেলা।' হ্যাল পা বাড়াল তার দিকে। 'আমার কথা শোনো। ব্যাপারটা সিরিয়াস। কোথাও একটা ঝামেলা হয়ে গেছে। চারবার চারটা জিনিস আমাকে হত্যা করতে চেয়েছে। সাধারণ জিনিসগুলো হঠাৎ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। হতে পারে হয়তো এ জিনিসটারই অনুসন্ধান করছিলাম আমরা। হতে পারে এটি–'

'তোমার মাইক্রোস্কোপ তোমাকে খুন করতে চেয়েছে?'

'ওটা জ্যান্ত হয়ে উঠেছিল। আমার কণ্ঠনালী পেঁচিয়ে ধরেছিল।'

অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। শেষে নীরবতা ভাঙল স্টেলাই। 'কেউ এই ঘটনা ঘটতে দেখেছে?'

'না।'

'তুমি কী করলে?'

'গুলি করে উড়িয়ে দিয়েছি।'

'কোন ধ্বংসাবশেষ নেই?'

'না,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বীকার করল হ্যাল। 'তবে সত্যি বলতে কী, মাইক্রোস্কোপটাকে আবার ঠিকঠাক অবস্থায় বক্সে দেখেছি।'

'আচ্ছা,' দুই গার্ডের দিকে তাকিয়ে মৃদু মাথা ঝাঁকাল স্টেলা।

'মেজর হ্যালকে ক্যাপ্টেন টেলরের কাছে নিয়ে যাও। টেরায় পরীক্ষার জন্যে না ফেরা পর্যন্ত ওকে বন্দি করে রাখো।'

দুই গার্ড সাথে সাথে চুম্বকের সাঁড়াশি দিয়ে আটকে ধরল মেজর হ্যালকে।

'দুঃখিত, মেজর,' বলল কমাণ্ডার, 'তোমার গল্পের সত্যতা প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে বন্দি হয়ে থাকতে হবে। তোমার মত সাইকোটিককে মুক্ত অবস্থায় ঘোরাফেরা করতে দেয়া যায় না। কারণ, তুমি অনেক ক্ষতি করতে পারো।'

গার্ডরা হ্যালকে ধরে দরজার দিকে পা বাড়াল। প্রতিবাদ না করে ওদের সাথে চলল হ্যাল। তার মাথা ঝিমঝিম করছে। স্টেলা হয়তো ঠিকই বলেছে। তার মাথার ঠিক নেই।

ক্যাপ্টেন টেলরের অফিসে চলে এল ওরা। এক গার্ড বাজার বাজাল।

'কে?' তীক্ষ্ণ গলায় জানতে চাইল রোবট ডোর।

'কমাণ্ডার মরিসন নির্দেশ দিয়েছেন ক্যাপ্টেনের জিম্মায় এই লোকটিকে রাখতে হবে।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করার পরে জবাব এল, 'ক্যাপ্টেন এখন ব্যস্ত।'

'ব্যাপারটা খুব জরুরি।'

রোবট কী যেন ভাবছে, ক্লিক ক্লিক শব্দ হলো। শেষে বলল, 'কমাণ্ডার তোমাদেরকে পাঠিয়েছেন?'

'হ্যাঁ। খোলো।'

'ঢোকো।' দরজা খুলে দিল রোবট।

গার্ড ভেতরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ফ্লোরে চিৎ হয়ে পড়ে আছে ক্যাপ্টেন টেলর, মুখ নীল, চোখ বেরিয়ে আসতে চাইছে কোটর ছেড়ে। তার মাথা আর পা শুধু দেখা যাচ্ছে। লাল সাদা রঙের একটা কম্বল জড়িয়ে রেখেছে ক্যাপ্টেনকে, শক্ত করে চেপে বসছে গায়ে।

মেঝেতে বসে পড়ল হ্যাল, কম্বল ধরে টানাটানি শুরু করে দিল। 'জলদি!' হুঙ্কার ছাড়ল ও। 'ধরো এটা।'

তিনজনে মিলে এবার শুরু করল টানাটানি। কিন্তু কম্বল যে ছাড়ে না!

'বাঁচাও!' ককিয়ে উঠল টেলর।

'আমরা তো বাঁচাতেই চাইছি!' গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে কম্বল টানছে ওরা। শেষে ওটা ছুটে এল ওদের হাতে। তারপর ছুটল খোলা দরজা লক্ষ্য করে। এক গার্ড গুলি করল কম্বলটাকে। টুকরো টুকরো হয়ে গেল ওটা।

হ্যাল দৌড়ে গেল ভিডস্ক্রিনে, কাঁপা হাতে ডায়াল করল কমাণ্ডারের ইমারজেন্সি নাম্বারে।

পর্দায় ভেসে উঠল স্টেলার মুখ।

'দেখো!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল হ্যাল।

ফ্লোরে শুয়ে থাকা টেলরের দিকে তাকাল স্টেলা। ক্যাপ্টেনের পাশে হাঁটু মুড়ে বসে আছে গার্ড দু'জন, তাদের হাতের ব্লাস্টার থেকে এখনও ধোঁয়া উঠছে।

'কী-কী হয়েছে?'

'একটা কম্বল ওকে আক্রমণ করেছে।' হাসল হ্যাল। তবে হাসিতে প্রা

নেই। 'এখন বলো মাথা খারাপ কার?'

'ওদের ব্লাস্টার রেডি রাখতে বলো। সবাইকে জেনারেল অ্যালার্মের কথা জানাও।'

হ্যাল চারটে জিনিস রাখল কমাণ্ডার মরিসনের ডেস্কে: একটা মাইক্রোস্কোপ, একটা তোয়ালে, একটা ধাতব বেল্ট এবং একটা ছোট লাল-কালো কম্বল।

নার্ভাস ভঙ্গিতে বলল কমাণ্ডার, 'মেজর, তুমি কি শিওর–'

'এ ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই। এই তোয়ালেটা কয়েক ঘণ্টা আগে আমাকে খুন করতে চেয়েছে। আমি ওটাকে গুলি করে উড়িয়ে দিই। তারপর আবার যথাস্থানে ফিরে এসেছে জিনিসটা। এখন দেখে মনে হচ্ছে ভাজা মাছটিও উল্টে খেতে জানে না।'

ক্যাপ্টেন টেলর সাবধানে লাল-কালো কম্বলটাকে স্পর্শ করল। 'এটা আমার কম্বল। টেরা থেকে কিনেছিলাম। আমার স্ত্রী এটা আমাকে আসার সময় দিয়ে দেয়। অথচ–অথচ–'

পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল ওরা।

'কম্বলটাকেও গুলি করে উড়িয়ে দেয়া হয়,' জানাল হ্যাল।

নেমে এল নীরবতা।

'তা হলে আমার ওপর হামলা চালাল কীসে?' জিজ্ঞেস করল টেলর। 'যদি এটা সেই কম্বল না হয়ে থাকে?

'এটাকে কম্বলের মতই লাগছে,' ধীরে ধীরে বলল হ্যাল। 'আর আমাকে যেটা আক্রমণ করেছিল ওটাও তোয়ালের মত দেখতে ছিল।'

কমাণ্ডার মরিসন আলোতে তুলে ধরল তোয়ালেটা। 'দেখে তো সাধারণ তোয়ালেই মনে হচ্ছে। এটা তোমাকে আক্রমণ করে কীভাবে?'

'এটাকে দেখে সাধারণ তোয়ালে মনে হচ্ছে,' বলল হ্যাল। 'হয়তো সাধারণ তোয়ালেই এটা। কিন্তু আমাকে বা ক্যাপ্টেনকে যে তোয়ালে বা কম্বল আক্রমণ করেছিল সেগুলোর ওপর কি ভূত ভর করেছিল?'

লেফটেন্যান্ট ডডস তার ড্রেসার খুঁজছে হাতমোজার জন্য। তাড়া আছে ওর। গোটা ইউনিটকে ডাকা হয়েছে ইমারজেন্সি অ্যাসেম্বলির জন্যে।

'কোথায় যে রাখলাম–?' বিড়বিড় করছে ডডস। 'আরে এ কী!'

বিছানার ওপর দু'জোড়া মোজা দেখা যাচ্ছে। একই রকম।

ভুরু কোঁচকাল ডডস, মাথা চুলকাল। এটা কী করে সম্ভব? ওর তো একজোড়া মোজা ছিল। তা হলে অপর জোড়া নিশ্চয়ই অন্য কারও। বব ওয়েসলি গত রাতে এসেছিল কার্ড খেলতে। সে হয়তো রেখে গেছে মোজা জোড়া।

ভিডস্ক্রিন আলোকিত হয়ে উঠল। 'অল পার্সোনেল, রিপোর্ট অ্যাট ওয়াঙ্গ। অল পার্সোনেল, রিপোর্ট অ্যাট ওয়াঙ্গ। ইমারজেন্সি অ্যাসেম্বলি অভ অল

পার্সোনেল।'

'যাচ্ছি, বাবা, যাচ্ছি!' বিরক্ত গলায় বলল ডডস। একজোড়া মোজা তুলে নিল সে, হাতে ঢোকাল।

মোজা পরা হয়ে যেতে হাত দুটো অদৃশ্য কোন আকর্ষণে চলে এল কোমরে, বন্দুকের বাঁট ধরে টান দিল।

'গেছি রে!' আঁতকে উঠল ডডস। মোজা পরা হাত বন্দুক ধরেছে তার বুক লক্ষ্য করে।

মোজা পরা আঙুল চেপে বসল ট্রিগারে। প্রচণ্ড শব্দ হলো। ডডসের বুকের অর্ধেকটা উড়ে গেল। ধপাস করে মেঝেতে পড়ে গেল ডডস, মুখটা হাঁ হয়ে আছে বিস্ময়ে।

কর্পোরাল টেগার মেইন বিল্ডিং-এর দিকে দ্রুত পায়ে এগোচ্ছে, ইমারজেন্সি অ্যালার্মের আর্তনাদ শুনে।

বিল্ডিং-এর প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে পড়ল সে ধাতব বুট খোলার জন্যে। কপালে ভাঁজ পড়ল। দোরগোড়ায় একটার বদলে দুটি সেফটি ম্যাট দেখা যাচ্ছে।

যাক গে, তাতে কিছু আসে যায় না। সে একটি ম্যাটের ওপর গিয়ে দাঁড়াল। অপেক্ষা করছে। ম্যাটের সারফেসে হাই ফ্রিকোয়েন্সির বিদ্যুৎ প্রবাহ শুরু হয়ে গেল। তার শরীরে কোন রোগ জীবাণু থাকলে মেরে ফেলবে।

কর্পোরাল টেগার ঢুকে পড়ল বিল্ডিং-এ।

এক মুহূর্ত পরে লেফটেন্যান্ট ফুলটন ছুটতে ছুটতে চলে এল দরজায়। হাইকিং বুট খুলে প্রথম যে ম্যাটটা চোখে পড়ল ওটার ওপরেই দাঁড়াল।

ম্যাট সাপের মত পেঁচিয়ে ধরল তাকে।

'হেই,' চেঁচাল ফুলটন। 'ছাড়! ছাড়!'

ম্যাট থেকে পা ছাড়িয়ে নেয়ার বৃথা চেষ্টা করল ফুলটন। ভয় পেয়ে গেল। বন্দুক বাগিয়ে ধরলেও নিজের পায়ে গুলি করতে সাহস পেল না। 'বাঁচাও!' আর্তনাদ করে উঠল সে।

দুই সৈন্য দৌড়ে এল: 'কী হয়েছে, লেফটেন্যান্ট?'

'এই হারামজাদাটাকে সরাও।'

হাসতে শুরু করল ওরা।

'হাসির কিছু নেই,' বলল ফুলটন, তার মুখ সাদা হয়ে গেছে। 'হারামজাদাটা আমার পা ভেঙে ফেলছে-'

যন্ত্রণায় চিৎকার দিতে শুরু করল সে। সৈন্যরা ম্যাট ধরে রীতিমত টানাটানি শুরু করে দিল। ফুলটন পড়ে গেছে মাটিতে, মোচড় খাচ্ছে, গড়ান দিচ্ছে। সেই সাথে ভয়ার্ত আর্তনাদ বেরিয়ে আসছে গলা চিরে। অবশেষে সৈন্যদের একজন ম্যাটের একটা কোনা ছুটিয়ে আনতে পারল ফুলটনের পা থেকে।

কোমরের নীচ থেকে ফুলটনের পা জোড়া নেই। শুধু ধবধবে সাদা হাড় দেখা

গেল।

'আমরা এখন জানি,' অন্ধকার মুখ করে বলল হ্যাল, 'এটা জৈব জীবনের একটা ফর্ম।'

কমাণ্ডার মরিসন ঘুরল কর্পোরাল টেগারের দিকে। 'বিল্ডিং-এ আসার সময় তুমি দুটো ম্যাট দেখেছ?'

'জী, কমাণ্ডার। দুটো। আমি একটার ওপর পা দিয়ে আসি।'

'তুমি ভাগ্যবান। সঠিক ম্যাটটির ওপর পা দিয়েছ।'

'আমাদের সাবধান হতে হবে,' বলল হ্যাল। 'নকল বা ডুপ্লিকেটের দিকে নজর রাখতে হবে। এটা যে জিনিসই হোক না কেন, অনুকরণ করতে ওস্তাদ। গিরগিটির মত রং বদলায়।'

'ক্যামোফ্লেজ।'

ভিডস্ক্রিন আলোকিত হয়ে উঠল। ভাইস-কমাণ্ডার উডের চেহারা দেখা গেল 'স্টেলা, আরেকটা ঘটনা ঘটেছে।'

'এবার কে?'

'এক অফিসার অদৃশ্য হয়ে গেছে। লেফটেন্যান্ট ডডস তার নাম। শুধু জামার কয়েকটা বোতাম আর ব্লাস্ট পিস্তল ছাড়া কিছু পাওয়া যায়নি।'

'এ নিয়ে তিনজন হলো,' মন্তব্য করল কমাণ্ডার মরিসন।

'এটা যদি জৈবিক কিছু হয়ে থাকে তা হলে এটাকে আমরা ধ্বংস করতে পারব,' বিড়বিড় করল হ্যাল। 'আমরা ইতোমধ্যে কয়েকটাকে ব্লাস্ট পিস্তলের আঘাতে উড়িয়ে দিয়েছি। সম্ভবত এটা এক ধরনের প্রোটোপ্লাজম। ভয়ঙ্কর এ জিনিসটার সঙ্গে কোন কিছুর তুলনা হতে পারে না।'

'কিন্তু তুমি তো বললে এদেরকে ধ্বংস করা যায়। তার মানে আমাদের চান্স আছে ওদের হাত থেকে বেঁচে যাবার।'

'যদি ওদের দেখা পাওয়া যায় তবেই,' হ্যাল ঘরের চারপাশে চোখ বোলাল। দোরগোড়ায় দুটো ওয়ার্কিং-কেস দেখা যাচ্ছে। একটু আগে কি ওখানে দুটো ছিল?

চিন্তিত ভঙ্গিতে কপাল টিপে ধরল হ্যাল। 'আমাদের এমন কোন পয়জন খুঁজে বের করতে হবে যা দিয়ে ওদেরকে ধ্বংস করা যায়। বসে থেকে ওদের হামলার জন্যে অপেক্ষা করলে চলবে না। এমন কিছু দরকার যা আমরা স্প্রে করতে পারি।'

হঠাৎ উঠে দাঁড়াল কমাণ্ডার। আড়ষ্ট।

ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল হ্যাল। 'কী হয়েছে?'

'দেয়ালের ওই কোনায় দুটি ব্রিফকেস দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু ছিল তো একটি,' অবিশ্বাসে এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল সে।

'এ তো আমাকে পাগল করে ছাড়বে দেখছি।'

ওই দিন দুটি ঘটনা ঘটল।

ক্যাপ্টেন উঙ্গার হেড ফোনে ইমারজেন্সি কল পেয়ে অফিসে রওনা হচ্ছিল, গাড়িতে উঠতে গাড়ির সিট তাকে চেপে ধরল। তার হাতে একটা বাকেট ছিল, ওটা হঠাৎ গলে যেতে শুরু করল। বাকেটের সাথে গলতে শুরু করল ক্যাপ্টেন উঙ্গারও। তার মাংস খসে খসে পড়ল গা থেকে। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে বুঝতে পারল ক্যাপ্টেন ডাইজেসটিভ অ্যাসিড ওকে খেয়েছে।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটল লেকে, সাঁতার কাটার সময়। কর্পোরাল হেনড্রিক্স তার প্রেমিকা গেইল থামাসকে নিয়ে সাঁতার কাটতে নেমেছিল। সাঁতার কেটে আগে তীরে উঠল গেইল। গাছের আড়ালে রেখে দিয়েছিল ইউনিফর্ম। কিন্তু ওই গাছের ধারে আসার পরে হঠাৎ বাতাসে যেন মিশে গেল গেইল। আর খোঁজ মিলল না তার।

কমাণ্ডার মরিসনকে খুবই উদ্বিগ্ন লাগছে। 'আর বসে থাকা যায় না,' বলল সে। 'আমাদের ত্রিশজন কর্মীর মধ্যে দশজনকেই ইতোমধ্যে হারিয়েছি।'

কাজ করছিল হ্যাল। ডেক্স থেকে মাথা তুলে বলল, 'আমি নিশ্চিত হয়ে গেছি এক ধরনের প্রোটোপ্লাজমের বিরুদ্ধেই আমরা লড়াইটা করছি।' স্প্রে ট্যাঙ্কটা হাতে তুলে নিল সে।

'তবে ওরা সংখ্যায় কত এটা থেকে হয়তো বোঝা যাবে।'

'কী ওটা?'

'আর্সেনিক এবং হাইড্রোজেনের গ্যাস ফর্ম–আরসিন।'

'এ দিয়ে কী করবে তুমি?'

মাথায় হেলমেট পরল হ্যাল। কমাণ্ডার তার কণ্ঠ শুনত পেল ইয়ারফোনে। 'ল্যাবে এটা ছড়িয়ে দেব। আমার ধারণা ল্যাবে ওটা সবচে' বেশি আছে।'

'ওখানে বেশি থাকবে কেন?'

'কারণ, ল্যাবেই সব ধরনের স্যাম্পল এবং স্পেসিমেন নিয়ে আসা হয়। ওখানেই ওদেরকে সবার আগে দেখেছি আমি। আমার ধারণা স্যাম্পলের মধ্যে চলে এসেছে ওরা। তারপর গোটা বিল্ডিং-এ ছড়িয়ে পড়েছে।'

কমাণ্ডারও হেলমেট পরে নিল। তার চার গার্ডও একই কাজ করল। 'আরসিন মানুষের জন্যে ক্ষতিকর, তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল হ্যাল। 'আমাদের সাবধানে থাকতে হবে। এটার একটা লিমিটেড টেস্ট করব।'

ল্যাবের দিকে স্প্রে মেশিনের নাক ঘুরিয়ে ট্রিগার টিপে ধরল হ্যাল। ওর পেছনে কমাণ্ডার সহ চারজন গার্ড দাঁড়িয়ে আছে নীরবে।

এক মুহূর্ত কিছুই ঘটল না। তারপর–

'গুড গড!' আঁতকে উঠল কমাণ্ডার মরিসন।

ল্যাবের দূর প্রান্তের স্লাইড ক্যাবিনেট হঠাৎ কেঁপে উঠল। তারপর ফুলে উঠল, শেষে গলতে শুরু করল। ওটার আকৃতি বদলে গেল আমূল–জেলির মত

একটা পদার্থ গলে গলে পড়তে লাগল টেবিলে। টেবিল থেকে গড়িয়ে মেঝেতে। পদার্থটার গা থেকে বুদ্বুদ উঠছে।

'ওই যে ওখানে।'

একটা বুনসেন বার্নার গলে গেল। ঘরের প্রতিটি জিনিসের রূপান্তর ঘটতে শুরু করল। সবগুলোই গলে বুদ্বুদ হয়ে যাচ্ছে। টেস্ট টিউবের শিশি, কেমিকেল, বিশাল জার–সব কিছু। বোঝাই যাচ্ছে প্রোটোপ্লাজমরা প্রায় সব কিছুর অনুকরণ করেছে।

যা দেখার দেখা হয়ে গেছে। হ্যাল ল্যাবের দরজা খুলল দ্রুত হাতে, দল নিয়ে বেরিয়ে এল করিডরে। দড়াম করে দরজা বন্ধ করল পেছনে।

'অবস্থা তা হলে খুবই খারাপ?' জিজ্ঞেস করল কমাণ্ডার।

'আমাদের এখানে থাকা চলবে না। আরসিন ওদের কতটা ক্ষতি করতে পেরেছে জানি না। তবে আমাদের হাতে বেশি আরসিন নেই।'

'তা হলে চলো চলে যাই।'

'পৃথিবীতে ফিরলে ওদের জার্মও হয়তো আমাদের সাথে থেকে যাবে।'

'কিন্তু এখানে থাকলে তো আমরা সবাই একে একে মারা পড়ব। ওরা কি আমাদের অনুকরণ করতে পারবে? জীবন্ত প্রাণীদের ইমিটেট করা সম্ভব? উচ্চতর লাইফ-ফর্ম?'

'দৃশ্যত তা মনে হয় না। ওরা শুধু অজৈব পদার্থের ওপর ভর করতে পারে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল কমাণ্ডার। 'তা হলে আমাদেরকে পৃথিবীতে ফিরতে হবে অজৈব সমস্ত পদার্থ ত্যাগ করে।'

'কিন্তু আমাদের জামা-কাপড়! ওরা তো বেল্ট, গ্লাভস, জুতো–সবই নকল করতে ওস্তাদ–'

'আমরা কেউ জামা-কাপড় নিচ্ছি না। আমরা পৃথিবীতে ফিরে যাব একেবারে শূন্য হাতে। মানে কোন কিছুই থাকবে না আমাদের সঙ্গে।'

ঠোঁট কামড়াল হ্যাল। 'আই সি, এতে অবশ্য কাজ হতে পারে। তা হলে সমস্ত অফিসারদের জানাও কেউ কোন কিছু সাথে নিতে পারবে না। শুধু তা হলেই এখান থেকে চলে যাওয়া সম্ভব হবে।'

কমাণ্ডার নিকটতম ক্রুজারে খবর পাঠাল ওদেরকে নিতে আসার জন্য। ক্রুজারটা ওদের কাছ থেকে দু'ঘণ্টার রাস্তা দূরে।

মেজর হ্যাল ক্রুজারের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বলল। জানাল রিসার্চ ডিভিশন থেকে কথা বলছে।

'আমি ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েল ডেভিস,' বলল ক্রুজারের ক্যাপ্টেন। 'আপনারা কোন সমস্যায় পড়েছেন, মেজর?'

হ্যাল জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল। 'ব্যাপারটা জাহাজে ওঠার পরে ব্যাখ্যা করব।' তারপর একটু ইতস্তত করে বলল, 'আমরা আপনার জাহাজে নগ্ন অবস্থায় উঠতে চাই।'

ক্যাপ্টেনের একটা ভুরু উঠে গেল কপালে। 'নগ্ন অবস্থায়?'

'জী।'

'আচ্ছা।' আর কিছু জানতে চাইল না ক্যাপ্টেন।

'আপনারা এখানে পৌঁছুবেন কখন?'

'ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যে।'

'আমাদের শিডিউলে এখন একটা বাজে। আপনারা তিনটার মধ্যে আসবেন?'

'ওই সময়ের মধ্যেই চলে আসব,' বলল ক্যাপ্টেন।

'আমরা আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করব। তবে আপনাদের কোন লোককে বেরোতে দেবেন না। একটা লক খোলা রাখবেন আমাদের জন্যে। শুধুই আমাদের জন্যে। আমরা জাহাজে ওঠা মাত্র জাহাজ ছেড়ে দেবেন।'

কমাণ্ডারের নির্দেশে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল অফিসারদের মাঝে। তবে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে আরেক জাহাজে উঠতে হবে শুনে দোটানায় ভুগল কেউ কেউ। তাদেরকে এক ধমকে সিধে করে দিল মেজর হ্যাল। যখন জানল নগ্ন অবস্থায় না গেলে প্রোটোপ্লাজমের জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে, আর জোরাজুরি করল না কেউ। প্রোটোপ্লাজমের ভয়ঙ্কর হামলার স্বরূপ দেখে ভয়ে আধমরা হয়ে আছে সবাই।

তবে নির্ধারিত সময়ের আগেই চলে এল ক্রুজা। ভিডস্ক্রিনে একটি রোবট তীক্ষ্ন গলায় বলতে শুরু করল, 'সবাই এক্ষুণি বিল্ডিং ত্যাগ করুন। জাহাজ এসে গেছে। সবাই এক্ষুণি ফিল্ডে চলে যান। সবাই–'

'এত তাড়াতাড়ি চলে এল?' হ্যাল দৌড়ে গেল জানালার ধারে, ধাতব ব্লাইণ্ড তুলে বলল, 'ল্যাণ্ড করার শব্দও তো পেলাম না।'

ল্যাণ্ডিং ফিল্ডে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা ক্রুজারটা। স্থির। জীবনের চিহ্নও নেই কোথাও।

দলে দলে নগ্ন মানুষ দৌড়াতে শুরু করেছে ক্রুজারের দিকে। সব শেষে বিল্ডিং থেকে বেরোল হ্যাল এবং কমাণ্ডার স্টেলা।

স্টেলার পাশে হাঁটতে হাঁটতে হ্যাল জিজ্ঞেস করল, 'কেমন লাগছে, স্টেলা?'

'অদ্ভুত।'

'আমাদের কথা কেউ বিশ্বাস করবে মনে হয়?'

'না করুক। প্রাণে যে বেঁচে ফিরতে পারছি এই ঢের।'

জাহাজের র‍্যাম্প নামল। লোকজন ইতোমধ্যে উঠে গেছে জাহাজে। অদৃশ্য হয়ে গেছে গোলাকার লকের আড়ালে।

'লরেন্স–'

স্টেলার গলায় অদ্ভুত আতঙ্কের সুর। 'লরেন্স, আমি–'

'তুমি কী?'

'আমার ভয় লাগছে।'

'ভয়!' দাঁড়িয়ে পড়ল হ্যাল। 'কেন?'

'জানি না।' শিউরে উঠল কমাণ্ডার।

র‍্যাম্পের ওপর পা রাখল হ্যাল। 'ভুলে যাও সব। ওঠো।'

'আমি যেতে চাই না!' পরিষ্কার ভয় স্টেলার কণ্ঠে। 'আমি-'

হাসল হ্যাল। 'এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে, স্টেলা।'

স্টেলাকে নিয়ে সে উঠে পড়ল র‍্যাম্পে। এগোল লকের দিকে। 'এই যে এসে গেছি আমরা।'

খুলে গেল লক। নীরব অন্ধকারের মধ্যে ঢুকে পড়ল হ্যাল। তার পিছু পিছু স্টেলা।

কাঁটায় কাঁটায় তিনটার সময় ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েল ডেভিস তার শিপ নিয়ে ল্যাণ্ড করল মাঠের মাঝখানে। সশব্দে এনট্রান্স লক খুলে গেল। কণ্ট্রোল কেবিনে ক্যাপ্টেন তার ক্রুদের নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে ক্যাপ্টেন বলল, 'কী ব্যাপার? ওরা কোথায়?'

অস্বস্তি নিয়ে এক অফিসার বলল, 'মনে হয় কোন সমস্যা হয়েছে।'

'হয়তো পুরো ব্যাপারটাই একটা ঠাট্টা ছিল।'

ওরা অপেক্ষা করতে লাগল।

কিন্তু এল না কেউ।

মূল: ফিলিপ কে. ডিক

ঘাতক সময়

মি. ডার্বি তাঁর .২২ বোরের পিস্তলটা নামিয়ে ড্রেসার ক্লকের দিকে তাকালেন। সকাল ৭:১৭। বিছানা ছাড়ার নিত্য রুটিনের তেরো মিনিট আগে আজ তিনি ঘুম থেকে উঠেছেন। এই তেরোটা মিনিট তাঁকে খুব সাবধানে ব্যবহার করতে হবে। কারণ, এই সময়টুকু তাঁর রুটিন বহির্ভূত। রুটিনের বাইরে হলেও সময়টা মি. ডার্বির ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা রক্ষার জন্য খুবই জরুরি। মুচকি হাসি ফুটল তাঁর ঠোঁটে, হাতের কাজটা নিখুঁতভাবে সারার জন্য গর্বিত তিনি। দশ সেকেণ্ড এজন্য নিজেকে বাহবা দিলেন মি. ডার্বি।

.২২ পিস্তলে এমনিতেই শব্দ হয় কম, তারপর মোটা বালিশের মধ্য দিয়ে বুলেট ঢোকার সময় সামান্য 'পপ' আওয়াজ করে। আর বুলেটের ছিদ্রটাও বেশ ছোট। কোন বিশৃঙ্খলা নেই। তাই মি. ডার্বি মনে মনে বেশ খুশি। কারণ, সব কিছু নিখুঁতভাবে এবং সময় মেনে সম্পাদন করা তাঁর নেশা।

পিস্তলটা একপাশে রেখে স্ত্রীর বিছানার কাছে চলে এলেন মি. ডার্বি। মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে এলোমেলো কম্বলটা ভাঁজ করে পায়ের কাছে রেখে দিলেন। তারপর তোষকের একদিকের কভার খুলে ফেললেন। তাঁর স্ত্রী কভারের মধ্যে টাকা রাখেন, এ ব্যাপারটা আবিষ্কার করতেই মি. ডার্বির অনেকদিন লেগেছে। বিয়ে করেছেন তিনি বছর দুই আগে। সংসার জীবনে খুবই অসুখী একজন মানুষ তিনি। তাঁর স্ত্রী নিজেকে পঙ্গু বলে দাবি করতেন—আর সারাক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকতেন (অবশ্য স্ত্রীর পঙ্গুত্বের ব্যাপারটা মি. ডার্বির কখনওই বিশ্বাস হয়নি। কিন্তু সকাল সাড়ে আটটা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত প্রতিদিন অফিসে ব্যস্ত থাকতে হয় তাঁকে। তাই সন্দেহটা প্রমাণ করার সুযোগ হয়নি তাঁর। যদিও মি. ডার্বির ঘোর সন্দেহ তিনি বাড়ি থেকে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্ত্রী বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠতেন আর পাড়া ঘুরে বেড়াতেন। আর যে-ই তাঁর অফিসে ফেরার সময় হত সঙ্গে সঙ্গে আবার তিনি বিছানায় শুয়ে পড়তেন। যেন শরীর লেগে গেছে বিছানার সাথে।)। এই দুটো বছর মি. ডার্বির হাড়-মাংস জ্বালিয়ে খেয়েছেন ভদ্রমহিলা। কুকুরের মত জীবনযাপন করতে হয়েছে। সারাক্ষণ খালি প্যানপ্যানানি আর অভিযোগ লেগেই থাকত; যতক্ষণ বাড়িতে থাকতেন মি. ডার্বি, স্ত্রীর ফাইফরমাশ খেটে তাঁর জান বেরিয়ে যেত। এটা আনো, ওটা আনো, এই ছিল ভদ্রমহিলার মুখের একমাত্র বুলি। ইয়া মোটকা শরীর নিয়ে তিনি টাকা ভর্তি তোষকটার ওপর গড়াতেন আর মি. ডার্বি শুধু অপেক্ষায় থাকতেন কবে মুটকির নড়াচড়া চিরতরে বন্ধ করে দেবেন, এই আশায়।

ভদ্রমহিলাকে মি. ডার্বি বিয়ে করেছিলেন টাকার লোভেই। নইলে কে

পঞ্চাশোর্ধ্ব মাংসের একটা তালকে খামোকা জীবনসঙ্গিনী করতে যায়? বেশ ধনবতী ছিলেন তাঁর স্ত্রী। কিন্তু ব্যাঙ্কে একটা টাকাও রাখতেন না। তোষকের কভারই মহিলার ব্যাঙ্ক। যেদিন জানতে পারলেন মি. ডার্বি, খুশিতে বাগবাগ হয়ে উঠেছিলেন। তারপর থেকে শুধু সুযোগ খুঁজছিলেন কীভাবে টাকাটা হাতানো যায়। অনেক কষ্টে খুন করার সাহস জুগিয়েছেন তিনি বুকে। তারপর আজ সকালে...। তাঁর স্ত্রী একটা শব্দ উচ্চারণ করারও সুযোগ পাননি। দুই বছরের অনবরত ভ্যানভ্যানানির পর এই একটা সকালে মহিলার নীরবতা সুমধুর সঙ্গীতের মত লাগছে মি. ডার্বির কাছে।

কভারের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলেন মি. ডার্বি। ছোট-বড় অনেকগুলো প্যাকেটের স্পর্শ পেল আঙুল। খসখসে। একটার পর একটা বের করতে লাগলেন তিনি। পাঁচটা, দশটা, বিশটা, পঞ্চাশটা...

আলমিরা খুলে একটা ব্রিফকেস বের করলেন মি. ডার্বি। টাকার প্যাকেটগুলো সব সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখলেন। তারপর, কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে সাতটায় ঢুকলেন বাথরুমে। টুথব্রাশ আর রেজর নিয়ে ফিরে এলেন বেডরুমে, ঢোকালেন ব্রিফকেসে। কয়েকটা শর্টস এবং মোজাও রাখলেন। ব্যস, আর কিছু নেয়ার দরকার নেই। প্যারিসে পৌঁছেই তিনি নতুন পোশাক কিনে ফেলবেন।

পোশাক পরে ব্রিফকেসটা হাতে নিয়ে দরজার দিকে এগোচ্ছেন মি. ডার্বি, হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন। 'শান্তিতে বিশ্রাম নাও, প্রিয়তমা,' নরম গলায় বললেন তিনি। মুখে হাসি।

নীচে নেমে এলেন মি. ডার্বি। হলঘরের ঘড়িতে সাতটা চল্লিশ বাজে। মাথা ঝাঁকালেন তিনি সন্তুষ্টির ভঙ্গিতে। অন্যান্য দিনগুলোর মত আজকেও তিনি সময়ানুবর্তিতা রক্ষা করে চলেছেন। আটটা পঞ্চাশে তাঁর বাস স্টেশনে পৌঁছার কথা। সেভাবে হিসেব করে প্রতিটি কাজ করতে হবে। গত দু'বছরে হিসেবের বাইরে তিনি পা ফেলেছেন এমন অপবাদ তাঁর শত্রুও দিতে পারবে না। 'ডার্বিকে দেখলেই আর ঘড়ির সময় জানার প্রয়োজন হয় না,' প্রতিবেশীরা প্রায়ই তাঁর সম্পর্কে এই কথাটি বলে। আর আজকের সকালে, বিশেষ এই সকালে কোনভাবেই কোন ভুল পদক্ষেপ নেয়া যাবে না, চলবে না সময়ের হিসেবে কোন গরমিল, প্রতিটি সেকেণ্ড আজ তাঁকে গুণে গুণে চলতে হবে। আগে গরম করা কড়াইতে তিনটে বেকন ছেড়ে দিয়ে রান্নাঘরের ঘড়ির দিকে তাকালেন মি. ডার্বি। সাতটা তেতাল্লিশ। দ্রুত মাংসটা ভেজে দুই পিস তিনি খেয়ে নিলেন। বাকি টুকরো অভ্যাস মত স্ত্রীর জন্য থাকল। খেয়াল হতেই জিভে কামড় দিলেন তিনি। 'উঁহুঁ।' এদিক-ওদিক মাথা নাড়লেন মি. ডার্বি। 'এরকম ভুল হলে তো চলবে না।' বাকি বেকনও খেয়ে ফেললেন তিনি। তারপর ফ্রিজ খুলে তাঁর জন্য নির্ধারিত দুটো ডিম বের করলেন। ডিম ভাজা, আধ-গ্লাস খেজুরের রস দিয়ে ব্রেকফাস্ট সাজিয়ে যথারীতি ঘড়ি দেখলেন মি. ডার্বি। সাতটা আটচল্লিশ। খবরের কাগজ পড়া এবং ট্যাবিকে ডেকে আনার সময় হয়েছে। হলঘর থেকে বেরিয়ে এলেন

তিনি। মুখে হাসিটা ধরাই আছে।

ট্যাবিকে প্রতিদিন সকালে ঘরে এনে এক ধরনের বিকৃত আনন্দ পান মি. ডার্বি। মিসেস ডার্বি ক্রেগের বউয়ের মতই–নিজের ঘর আর আসবাবপত্রের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষার ব্যাপারে ভীষণ খুঁতখুঁতে। ট্যাবিকে সহ্যই করতে পারেন না তিনি। বেড়ালটাকে দেখলেই নাকমুখ কুঁচকে যায় তাঁর প্রবল বিতৃষ্ণায়, 'শয়তানের বাচ্চা' নাম দিয়েছেন তিনি ট্যাবির। আর স্ত্রীকে মানসিক যন্ত্রণা দিতেই মি. ডার্বির প্রধান কাজ হলো প্রতিদিন সকালে ট্যাবিকে খাবারের লোভ দেখিয়ে ভেতরে ডেকে আনা।

মি. ডার্বি ওই দিনের ভাঁজ করা খবরের কাগজ হাতে নিয়ে সামনের বারান্দায় এলেন। নরম গলায় ডাকতে লাগলেন, 'ট্যাবি-ট্যাবি-ট্যাবি।'

তাঁর পাশের ফ্ল্যাটের দোতলার জানালা দিয়ে উঁকি দিলেন বিধবা প্রতিবেশী মিসেস রিজ। মি. ডার্বিকে দেখে হাসলেন তিনি। কথা বলার আগে ঘড়ির দিকে একবার তাকাতে ভুললেন না। 'কী ব্যাপার, মি. ডার্বি,' বললেন তিনি। 'আজ আপনি দু'মিনিট আগে এসেছেন নাকি আমার দু'মিনিট দেরি হয়েছে?'

মিসেস রিজের সঙ্গে প্রতিদিন সকালে এই সময় মি. ডার্বির দেখা হবেই। আর ভদ্রমহিলা মি. ডার্বির পাংচুয়ালিটি নিয়ে কোন না কোন ঠাট্টা করবেনই। দু'মিনিট আগেই আজ বারান্দায় চলে এসেছেন ভেবে অস্বস্তি বোধ করলেন মি. ডার্বি। কিন্তু তাঁর তো এরকম ভুল হবার কথা নয়। আসলে মিসেস রিজের ঘড়িই দু'মিনিট স্লো।

'আপনি বোধহয় ভুল বলছেন, মিসেস রিজ,' বললেন মি. ডার্বি। 'আমি কাল রাতে টেলিফোন অপারেটরের ঘড়ির সঙ্গে সময় মিলিয়ে দেখেছি। আমার ঘড়ি ঠিকই আছে।'

মাথা দোলালেন মিসেস রিজ। 'সেটা হওয়াই স্বাভাবিক, মি. ডার্বি। আপনার ঘড়ি কখনও ভুল সময় দেয় না। নিখুঁত সময়জ্ঞানের ব্যাপারে আমরা আপনার ওপর এজন্যই তো ভরসা রাখতে পারি।'

পাতাবাহারের একটা ঝাড়ের আড়াল থেকে মিউমিউ করে এই সময় বেরিয়ে এল ট্যাবি। দ্রুত এগোল মি. ডার্বির দিকে। বেড়ালটার তাড়া দেখে আবার হাসলেন মিসেস রিজ। 'ট্যাবি আপনার খুব পোষা হয়ে গেছে, মি. ডার্বি।'

চট করে একবার রিস্টওয়াচে চোখ বোলালেন মি. ডার্বি। সাতটা একান্ন। ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বললেন, 'মাফ করবেন, মিসেস রিজ...আমার ডিম বোধহয় সেদ্ধ হয়ে এল।'

তড়িঘড়ি রান্নাঘরে ঢুকলেন তিনি। একটা প্লেটে সেদ্ধ ডিম ঢেলে খেতে দিলেন ট্যাবিকে। নিজের নাস্তা নিয়ে এগোলেন ডাইনিং রূমের দিকে। গলায় যখন ন্যাপকিন বাঁধছেন মি. ডার্বি, ডাইনিং রূমের ঘড়ি ঢং ঢং করে জানান দিল সকাল সাতটা পঞ্চান্ন বেজে গেছে।

আটটা দশে নাস্তা খাওয়া হয়ে গেল মি. ডার্বির। মাত্র খবরের কাগজের ভাঁজ

খুলতে শুরু করেছেন, এই সময় হলঘরে ফোন বেজে উঠল। কপাল কুঁচকে গেল মি. ডার্বির। পা বাড়ালেন ওদিকে।

'হ্যাল্লো, ডার্ব,' কানের পর্দায় দুম করে আছড়ে পড়ল যেন কণ্ঠটা। 'তোমাকে আবার বিরক্ত করলাম না তো?' হেসে ওঠে লোকটা। সম্ভবত তার পাশের জনকে কী যেন বলল, ধরতে পারলেন না মি. ডার্বি।

ফোনটা আসার কারণ এখন বুঝতে পারছেন তিনি। তাঁদের অফিস ক্লার্ক স্মিটি প্রায়ই সকাল বেলা তাঁকে এভাবে ফোন করে জ্বালাতন করে। তাঁর সময়জ্ঞান নিয়ে দু'একটা মশকরা না করলে পেটের ভাত যেন হজম হয় না ব্যাটার।

'ঠিক আছে, স্মিটি,' বললেন মি. ডার্বি। 'আমি মাত্র নাস্তা সারলাম।'

আবারও হাসল লোকটা। 'আমি একটু আগে ওদেরকে তাই বলছিলাম, ডার্ব। বলছিলাম: এমনকী বেড়াতে গেলেও আমাদের বুড়ো ডার্ব তার হিসেব করা সময়ের সঙ্গে আঠার মত লেগে থাকবে। ঠিক বলিনি?'

কষ্টার্জিত হাসি হাসলেন মি. ডার্বি। 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। আমি সব সময় সেকেণ্ড গুণে কাজ করি।'

'ঠিক আছে, ডার্ব। তো দুই সপ্তাহের ছুটি নিয়েছ তুমি, তাই না? বাড়ির কাজ সারার প্রচুর সময় পাবে। ধোয়া, মোছা, সাফ-সুতরো সবই বোধহয় করে ফেলবে, তাই তো? হো! হো! যাক গে, ডার্ব। দু'সপ্তাহ পর আবার দেখা হবে।'

ফোন রেখে দিলেন মি. ডার্বি। নির্জন বাড়িটার চারদিকে একবার চোখ বোলালেন।

'ঠিকই বলেছ তুমি,' বিড়বিড় করলেন তিনি। 'শেষ বারের মত এই বাড়ি সাফ-সুতরো করে যাচ্ছি আমি।'

খবরের কাগজটা টেনে নিলেন মি. ডার্বি, নিশ্চিন্ত মনে পড়া শুরু করলেন। প্রতিবেশীদের কোন ধারণাই নেই তাঁর আজ সকালের যাত্রা সম্পর্কে। সকাল সাড়ে আটটায় তিনি যখন বাড়ি ছেড়ে বেরোবেন, তারা ভাববে মি. ডার্বি নিত্যদিনের মত অফিসে যাচ্ছেন। সাড়ে ছ'টার মধ্যে তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত তারা ব্যাপারটা লক্ষই করবে না। সাড়ে সাতটাতেও যখন দেখবে তিনি বাড়ি ফেরেননি ওরা হয়তো একটু অবাক হবে। কিন্তু সাড়ে আটটা নাগাদ ওরা বেশ চিন্তিত হয়ে পড়বে বলে মনে হয়। কারণ, গত দুই বছরের কোনদিন দুই ঘণ্টা দেরি করে অফিস থেকে ফেরেননি মি. ডার্বি। আর সাড়ে ন'টার সময়ও যখন ওরা দেখবে তাঁর কোন খবর নেই, সম্ভবত বাড়িতে আসবে খোঁজ নিতে—পুলিশে ফোন করতেও পারে।

কিন্তু তাতে মি. ডার্বির কিছুই আসবে যাবে না। কারণ, ন'টা বিশে তিনি নিউ ইয়র্কের ফ্লাইট ধরবেন। আর রাত সাড়ে দশটায় ইণ্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে প্যারিসগামী প্লেনে চড়ে বসবেন। পুলিশ যত তাড়াতাড়িই তাঁর মৃতা স্ত্রীকে আবিষ্কার করুক না কেন, ততক্ষণে তিনি ইউরোপের মাটিতে পা রেখেছেন। তারপর নতুন নাম, ভুয়া পাসপোর্ট নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যেতে কতক্ষণ?'

মি. ডার্বিকে ভয়ানক চমকে দিয়ে ডোরবেল বেজে উঠল। কাগজটা ফেলে দিয়ে ভীত চোখে চাইলেন ঘড়ির দিকে। আটটা একুশ। এত সকালে কোন্ গর্দভ বাড়িতে এল? কেন?

চেয়ারটা ঠেলে সরিয়ে দ্রুত তিনি দরজার দিকে পা বাড়ালেন।

এক লোক হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে বারান্দায়, এক হাতে একটা খোলা বাক্স, ভেতরে কয়েকটা ব্রাশ সুন্দরভাবে সাজানো, সঙ্গে কয়েকটা যন্ত্রপাতি; অন্য হাতে একটা ভারী ব্যাগ, সোনার জলে তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম লেখা।

'মি. ডার্বি? আমি আপনার জিনিস নিয়ে এসেছি, স্যর।'

চোখ পিটপিট করলেন মি. ডার্বি। 'আমার জিনিস?'

'জী, আপনার ব্রাশ...কিংবা বলতে পারেন আপনার স্ত্রীর, হে-হে।'

কপালে ভাঁজ পড়ল মি. ডার্বির। 'আমার স্ত্রীর?'

হাসিটা আড়ষ্ট হয়ে গেল ফেরিওয়ালার মুখে। 'জী, স্যর। আপনার স্ত্রী গত সপ্তাহে এই ব্রাশগুলো আমাকে নিয়ে আসতে বলেছিলেন।'

ঘড়ির ডায়ালে ঘুরে এল মি. ডার্বির চোখ। আটটা বাইশ। 'তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।' অন্যমনস্ক সুর তাঁর কণ্ঠে। 'ব্রাশ দিয়ে উনি কী করবেন? তিনি তো ইনভ্যালিড। বিছানা ছেড়েই উঠতে পারেন না।'

ব্রাশওয়ালার চোখে এবার সন্দেহ ফুটল। চিঠির বাক্সে ছাপ মারা বাড়ির নাম্বার দেখল সে এক পলক, তারপর কোটের পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করল।

'কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই মি. ডার্বি, তাই না? আমি অর্ডারগুলো তাঁর কাছে এই বাড়ি থেকেই পেয়েছি–একটা সিল্ক ব্রাশ–নাইলন; একটা হেয়ার ব্রাশ–নাইলন; একটা হ্যাণ্ড লোশন–ব্লু মেমোরি; একটা কীটনাশক–পাইন সেণ্ট...সবই অর্ডার দিয়েছেন একজন মিসেস এলমো ডার্বি। গত সপ্তাহে এখানে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে আমার কথা হয়...আহ্, দিনটা ছিল সোমবার। জী, সোমবারই ছিল। মনে পড়েছে।'

তা হলে ব্যাপার এই। মি. ডার্বি যা সন্দেহ করেছিলেন সব সত্যি! আদপেই তাঁর স্ত্রী পঙ্গু নয়। ক্রোধের ঢেউ উঠল শরীরে। দুটো বছর এই মহিলা কী নির্যাতনটাই না চালিয়েছে তাঁর ওপর; তাঁকে স্রেফ ক্রীতদাস বানিয়ে রেখেছিল, প্রতি রোববার মি. ডার্বিকে তাঁর স্ত্রীর সমস্ত নোংরা জামাকাপড় ধুয়ে দিতে হয়েছে, খাবার রান্না করেছেন তিনি, খাইয়ে দিয়েছেন, বারবার ওপর-নীচ করে-করে তাঁর শরীর ব্যথা হয়ে যেত...। এখন মি. ডার্বির রীতিমত আফসোস হতে লাগল কেন তিনি কাজটা করার আগে তাঁর মিসেসকে ঘুম থেকে জাগাননি...

আটটা তেইশ।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। উনিই আমার স্ত্রী,' ঘেউ ঘেউ করে উঠলেন মি. ডার্বি। দরজা বন্ধ করার তাড়া দেখালেন। 'কিন্তু এসব জিনিস আমাদের এখন কোন দরকার নেই।'

মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল ব্রাশওয়ালার। 'দরকার নেই, স্যর? কিন্তু

আপনার স্ত্রী তো সেদিন বললেন এগুলো তাঁর খুব দরকার। মি. ডার্বি, স্যর, দয়া করে একবার যদি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আমাকে একটু কথা বলতে দিতেন...'

ধমক দিলেন মি. ডার্বি, 'না, না। ওঁর সঙ্গে এখন কথা বলা যাবে না। উনি এখন ঘুমাচ্ছেন...মানে নাস্তা খাচ্ছেন...বিছানা ছেড়ে ওঠেননি এখনও।' আবার ঘড়ির দিকে দৃষ্টি চলে গেল তাঁর। উদ্ভট আচরণ করছেন তিনি, বুঝতে পারছেন মি. ডার্বি। ব্রাশওয়ালা তাঁর সম্পর্কে উল্টোপাল্টা কিছু ভেবে বসতে পারে। কিন্তু সে রকম কিছু ভাবার সুযোগ ওকে দেয়া যাবে না। সব কিছু স্বাভাবিকভাবে না চললে কোথাও মস্ত ভজকট হয়ে যেতে পারে। এই লোকটাকে এখন ভালয় ভালয় বিদায় করতে পারলে তিনি বাঁচেন। তা হলে তাঁর হিসেব করা সময় এবং কাজে কোন গরমিল হবে না।

'তোমার জিনিসের দাম কত হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলেন মি. ডার্বি।

আবার তেলতেলে হাসিটা মুখে ফিরে এল ব্রাশওয়ালার। বিলের দিকে তাকাল সে, 'এই তো, এখানে লেখা আছে...মোট চারশো একুশ ডলার। ট্যাক্স সহ, জানেনই তো।'

'হ্যাঁ। হ্যাঁ, জানি।'

আটটা চব্বিশ।

মি. ডার্বি ওয়ালেটের জন্য পকেটে হাত ঢোকালেন...পরক্ষণে মনে পড়ল পকেটে টাকা নেই। 'এক মিনিট,' বলে তাড়াতাড়ি চলে এলেন ডাইনিং রূমে। ব্রিফকেস খুলে ত্রস্ত হাতে টাকার একটা প্যাকেট তুলে নিলেন।

নোটটার দিকে চেয়ে ব্রাশওয়ালার চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল। 'মাত্র পঞ্চাশ ডলার? কিন্তু বিল হয়েছে...'

লজ্জা পেলেন মি. ডার্বি। ওকে আর কথা শেষ করতে দিলেন না, আবার ফিরে এলেন ডাইনিং রূমে। পাঁচশো ডলারের বদলে ভুলে তিনি পঞ্চাশ ডলার নিয়েছেন।

প্যাকেট খুলে কাঁপা হাতে পাঁচশো ডলারের নোট খুঁজছেন মি. ডার্বি, ডাইনিং রূমের ঘড়ি জানান দিল আটটা ছাব্বিশ বাজে। ঠোঁট কামড়ালেন তিনি। নিজেকে তিরস্কার করছেন। 'শান্ত হও, ব্যাটা। নইলে ব্রাশওয়ালা কিছু সন্দেহ করে বসবে।' প্রায় দৌড়ে তিনি সামনের দরজায় চলে এলেন।

লোকটা ভাংতি ফেরত দিচ্ছে, কিন্তু এমনভাবে টাকা গুণতে শুরু করল যে মি. ডার্বির মনে হলো সে অনন্তকাল ধরে গুণেই চলেছে।

'পাঁচশো থেকে চারশো একুশ বাদ দিলে থাকে উনআশি। এই নিন, স্যর, সত্তর ডলার। আর এই নিন আরও পাঁচ ডলার। এই যে নিন আরও তিন...মোট দিলাম আটাত্তর ডলার। কিন্তু খুচরা আরেক টাকা যে কই গেল...' আঁতিপাঁতি করে ফেরিওয়ালা নিজের পকেট হাতড়াতে শুরু করল।

অধৈর্য হয়ে উঠলেন মি. ডার্বি। আটটা আটাশ বেজে গেছে। 'ঠিক আছে, তোমাকে আর এক ডলার দিতে হবে না। ওটা তোমার কাছেই রেখে দাও।'

'না, না। তা কেন? ছিল তো আমার কাছে! এই তো পেয়েছি! নিন, স্যর—এই যা। আরেকটু হলেই হাত ফস্কে পড়ে যাচ্ছিল,' বলল ব্রাশওয়ালা। ভাংতি টাকা বুঝিয়ে দিতে পেরে সন্তুষ্ট।

'ঠিক আছে। এবার তা হলে তুমি এসো, কেমন?' মি. ডার্বি দড়াম করে দরজা বন্ধ করলেন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কড়া নাড়ল ফেরিওয়ালা।

কপালে হতাশায় চাপড় মারলেন মি. ডার্বি। নিজেকে একটা গাল দিয়ে আবার দরজা খুললেন। হাতে মোটা একটা প্যাকেট নিয়ে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে হাসছে ব্রাশওয়ালা। 'আপনার জিনিস, স্যর। না নিয়েই দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।'

প্যাকেটটা প্রায় ছিনিয়ে নিলেন মি. ডার্বি। দরজা বন্ধ করে রেখে দিলেন ভেতরে। যদিও এসব জিনিস তাঁর কখনও কাজে লাগবে না, ভাল করেই জানেন তিনি।

সকাল সাড়ে আটটা।

মি. ডার্বি ঝট করে ব্রিফকেসটা নিয়ে চট করে মাথায় হ্যাটটা চাপালেন। গলা খাঁকারি দিয়ে ঠিক করলেন টাই-এর নট, তারপর সামনের দরজাটা খুললেন। বারান্দায় নেমে শেষবারের মত দরজা বন্ধ করলেন তিনি।

সব কিছুই এখন পর্যন্ত ঘড়ির কাঁটা ধরে চলছে। একটু উত্তেজনা বোধ হচ্ছে। কিন্তু ব্যাপারটাকে পাত্তা দিলেন না মি. ডার্বি। তাঁর চিরাচরিত 'সময়-চলে-যাচ্ছে-নষ্ট-কোরো-না' ভাব নিয়ে হুড়মুড়িয়ে তিনি ড্রাইভওয়ের দিকে এগোলেন।

মিসেস রিজের সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেল। 'আমার ঘড়িটা এখন নিশ্চয়ই ঠিক সময় দিচ্ছে, মি. ডার্বি। কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে আটটা। আপনাকে দেখে আমি সব সময় এই সময় ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে নিই।'

মৃদু হাসলেন শুধু মি. ডার্বি। কোন মন্তব্য করলেন না।

'আপনার স্ত্রী কি নাস্তা খাচ্ছেন, মি. ডার্বি?' পেছন থেকে ডাকলেন মিসেস রিজ। 'তাঁর গায়ে আবার ব্যথা ওঠেনি তো?'

রসিকতা করার সুযোগটা হারালেন না মি. ডার্বি। যদিও এজন্য তাঁকে চারটে মূল্যবান সেকেণ্ড নষ্ট করতে হলো। থেমে দাঁড়ালেন তিনি, ঘুরলেন, 'আমি ওর জন্য আজ সকালে বিশেষ নাস্তার ব্যবস্থা করেছি,' বললেন তিনি। 'আর ব্যথা-ট্যথা তার এখন একদম নেই।'

'সকাল সোয়া দশটায় প্যারিস ফ্লাইটের যাত্রীরা এয়ারপোর্টের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিং-এর গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকতে শুরু করল। এদের মধ্যে মি. ডার্বিও আছেন। বেশ প্রফুল্ল চিত্তে রয়েছেন তিনি। মনে হচ্ছে সারা পৃথিবীর সময় এখন তাঁর হাতের মুঠোয়। তাঁর সমস্ত সমস্যা, ভয় এখন তাঁর কাছে নিতান্তই তুচ্ছ। নিজের ভাবনায় তিনি এত মশগুল যে লক্ষই করলেন না ওভারকোট আর টুপি পরা এক দীর্ঘদেহী লোক যাত্রীদের কাগজপত্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করছে।

মি. ডার্বি তাঁর টিকেট আর পাসপোর্ট মাত্র দেখিয়েছেন, ওভারকোট তার প্যান্টের পকেট থেকে ওয়ালেট বের করে উল্টো একটা ঝকঝকে ধাতব ব্যাজ দেখাল তাঁকে।

'আপনাকে আমার সঙ্গে আসতে হবে, মি. ডার্বি। আমি আপনাকে হত্যা করার সন্দেহে গ্রেফতার করছি।' আরও কিছু কথা হয়তো বলত সে, কিন্তু মি. ডার্বির রক্তশূন্য চেহারা দেখে থেমে গেল।

'কী-কীভাবে?' মাথা বনবন করে ঘুরছে মি. ডার্বির। গোয়েন্দা অফিসার তাঁকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, মন্ত্রমুগ্ধের মত তিনি তার সঙ্গে চলেছেন। আবার প্রশ্নটা করলেন তিনি। 'কী-কীভাবে এত তাড়াতাড়ি আপনারা খোঁজ পেলেন?'

গোয়েন্দা অফিসার তার হাসি গোপন করতে পারল না। 'আপনার স্ত্রী আপনার মতই ঘড়ির কাঁটা ধরে চলতেন, মি. ডার্বি। আপনাদের দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্মের রুটিনে কোন হেরফের হত না।'

'আমাদের রুটিন? আমার স্ত্রীর আবার কী রুটিন ছিল?'

'কেন, আপনি জানতেন না?' গোয়েন্দাকে খুবই বিস্মিত দেখাল। 'ঠিক আছে। তা হলে খুলেই বলছি। প্রতিদিন সকাল সাতটা ঊনত্রিশ মিনিটে আপনি বেড়াল ট্যাবি আর খবরের কাগজ নিয়ে বসতেন, আপনার প্রতিবেশী মিসেস রিজ আমাকে জানিয়েছেন। তারপর সকাল সাড়ে আটটায় আপনি বেরিয়ে যেতেন কাজে। আর তার ঠিক দশ মিনিট পরে, অর্থাৎ আটটা চল্লিশে আপনার স্ত্রী সামনের দরজা খুলে বেড়ালটাকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলতেন।

'কিন্তু আজ সকালে মিসেস ডার্বি ওই সময় ট্যাবিকে রুটিন মত বাইরে তাড়িয়ে না দেয়ায় মিসেস রিজ চিন্তায় পড়ে যান—কারণ, তিনি জানতেন আপনার স্ত্রী অসুস্থ—তাঁর অসুখটা আরও বাড়ল কি না দেখার জন্য তিনি আপনাদের বাড়িতে আসেন, আর তারপর...'

মূল: রবার্ট এডমণ্ড অলটার

ম্যানড্রাগোরা

দোকানের ধুলো পড়া কাঁচের দরজা দিয়ে তাকে দেখতে পেল মাইকেল। ভেতরে নানা রঙ আর চেহারার ফ্লাওয়ার ভাস, মূর্তি, নস্যির কৌটা সহ টুকিটাকি আরও হরেক জিনিস। সে বসে রয়েছে একটা চেয়ারে। মাথাটা সামান্য ঝুঁকে আছে সামনের দিকে, কোলের ওপর ভাঁজ করা হাত জোড়া, তার গোটা অবয়ব থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে সৌন্দর্য আর আভিজাত্য। এত সুন্দর মেয়ে জীবনেও দেখেনি মাইকেল। খুব ইচ্ছে করছে ভেতরে ঢুকে ভাল করে দেখে মেয়েটিকে। তবে লজ্জাও লাগছে। মাইকেল অবশ্য এমনিতেই খুব লাজুক স্বভাবের, মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে ঘেমে আড়ষ্ট হয়ে যায়। তোতলাতে থাকে। এ জন্যেই বেচারা জীবনে প্রেম করতে পারল না।

তবে দোকানের মেয়েটি সাংঘাতিক টানছে মাইকেলকে। যেভাবে চুম্বক আকর্ষণ করে লোহাকে। সম্মোহিতের মত এগিয়ে গেল মাইকেল। খুলল দরজা। ঢুকল ভেতরে। সাথে সাথে দোকানের মধ্যে মিষ্টি শব্দে বেজে উঠল ঘণ্টা। মেয়েটির মধ্যে কোন ভাবান্তর হলো না। সে যেমন ছিল বসে রইল একই ভঙ্গিতে। এ দোকানের সেলস গার্ল নয়, ভাবল মাইকেল। বোধ হয় অপেক্ষা করছে কারও জন্যে।

রোগা-পাতলা এক লোককে দেখতে পেল মাইকেল, কাউন্টারের পেছনের একটা দরজা খুলে ঢুকলেন ভেতরে। ভদ্রলোক বয়সে প্রৌঢ়, মাথায় কাঁচাপাকা চুল। মুখখানা শুকনো, ফেকাসে। যেন রক্তশূন্যতায় ভুগছেন। মাইকেলের দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি, 'বলুন, আপনার জন্য কী করতে পারি?'

ভদ্রলোক ঘরে ঢোকার পরেও মেয়েটি স্থির বসে আছে, আড়চোখে লক্ষ করল মাইকেল।

'না, কিছু করতে হবে না,' জবাব দিল ও। 'আমি এমনি এসেছি। দোকানটা একটু ঘুরে দেখব।'

'অবশ্যই দেখুন।'

মাইকেল তাকগুলো দেখার ভান করে আস্তে আস্তে এগোতে লাগল মেয়েটির দিকে। মেয়েটির ঝলমলে চুল কোমর ছুঁয়েছে, নিয়ন বাতির আলোতে ঝলকাচ্ছে। তার গায়ের চামড়া যেন মোম দিয়ে তৈরি। পরনে গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা কালো একটা ড্রেস। ধবধবে শরীরের সঙ্গে দারুণ মানিয়ে গেছে। ওহ, কী সুন্দর!

মেয়েটির খুঁব কাছে চলে এসেছে মাইকেল। একটা স্টাফ করা পাখির মূর্তি দেখার জন্য ঝুঁকল, হাতটা ঘষা খেল মেয়েটির বাহুর সঙ্গে। 'সরি,' বলে ঘুরল মাইকেল। এবং এই প্রথম সরাসরি তাকাল মেয়েটির মুখের দিকে। প্রচণ্ড ধাক্কা

খেল একটা। সুন্দরী এই নারী কোন জ্যান্ত মানবী নয়, লাইফ-সাইজ একটা মূর্তি!

'ঈশ্বর!' হাঁপিয়ে ওঠার শব্দ বেরোল মাইকেলের গলা দিয়ে। 'আমি ভেবেছিলাম এ মানুষ।'

হাসলেন দোকানের মালিক। 'দোকানে ঢুকে এ ভুলটা অনেকেই করে। অবশ্য তাদের দোষ নেই। খুব কাছ থেকে না দেখলে বোঝার উপায় নেই এ মানুষ না মূর্তি।'

মাইকেল এখনও হতবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে নারী-মূর্তিটির দিকে। ফিসফিস করে জানতে চাইল, 'একে কি বিক্রি করবেন?'

'না,' মাথা নাড়লেন প্রৌঢ়। 'কিন্তু মূর্তিটা কিনতে চাইছেন কেন?'

মন্ত্রমুগ্ধ স্বরে জবাব দিল মাইকেল, 'কারণ, একে আমার চাই। এ আমার স্বপ্নের নারী। সুন্দরী, ভদ্র, শান্ত। ওকে দেখেই প্রেমে পড়ে গেছি আমি।'

'বেশ,' বললেন দোকানের মালিক। 'তা হলে আপনি ওকে নিয়ে যেতে পারেন। আপনার চোখের দৃষ্টি দেখেই বুঝতে পেরেছি আপনার কাছে ভালই থাকবে ম্যানড্রাগোরা।'

'ম্যানড্রাগোরা?' প্রতিধ্বনি তুলল মাইকেল।

'হ্যাঁ।' মাথা ঝাঁকালেন অপরজন। 'এটাই ওর নাম।'

মাইকেল পাঁজাকোলা করে বুকের মধ্যে তুলে নিল ম্যানড্রাগোরাকে। মুগ্ধ চোখে দেখছে অনিন্দ্য সুন্দর মুখখানাকে। ওকে নিয়ে বেরিয়ে এল দোকান থেকে। একটা ট্যাক্সি ক্যাব ডেকে উঠে বসল তাতে। পেছন ফিরলে দেখতে পেত প্রৌঢ় দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন, তাকিয়ে আছেন ওদের দিকেই। চিকচিক করছে তাঁর চোখের কোণ।

মাইকেল শহরতলীতে, একতলা একটা বাড়িতে থাকে একা। বাবা-মা-ভাই-বোন কেউ নেই। প্রচণ্ড নিঃসঙ্গ জীবনে এই প্রথম কারও আবির্ভাব ঘটল। ম্যানড্রাগোরাকে সে পরম যত্নে একটা আর্মচেয়ারে বসাল, ভেলভেটের একটা কুশনে এলিয়ে দিল মাথা। হাতজোড়া আড়াআড়িভাবে রাখল চেয়ারের হাতলের ওপর, অবিন্যস্ত স্কার্টের ভাঁজগুলো সমান করে দিল আঙুলের চাপে।

'আমার বাড়িতে সুস্বাগতম, প্রিয়তমা,' মৃদু গলায় বলল মাইকেল।

পরদিন রোববার। সারাদিন কোথাও বেরোল না মাইকেল। উপভোগ করল ম্যানড্রাগোরার সঙ্গ। মেয়েটির সঙ্গে কথা বলল ও। মনে হলো ম্যানড্রাগোরা মনোযোগ দিয়ে শুনছে ওর কথা। সন্ধ্যার পরে ক্যাসেট প্লেয়ারে চোপিন নকট্রনের বাজনা ছেড়ে দিল। ম্যানড্রাগোরা যেন চুপচাপ শুনতে লাগল মিষ্টি যন্ত্রসঙ্গীত। মেয়েটি মাইকেলের যথার্থ সঙ্গিনী। এতদিন যেরকম সঙ্গিনীর স্বপ্ন দেখে এসেছে মাইকেল, ঠিক তেমনটি। অফিসের মেয়েগুলোকে পছন্দ নয় মাইকেলের। ওরা সারাক্ষণ বকবক আর খাই-খাই করতে থাকে। সুন্দরী কলিগদের কারও প্রতি কোন রকম দুর্বলতা নেই মাইকেলের। নিজে সারাক্ষণ চুপচাপ থাকতে পছন্দ করে। এজন্যে আড়ালে ওকে 'রাম গরুড়ের ছানা' ডাকা হয়, জানে মাইকেল।

মনে কষ্ট পেলেও মুখ ফুটে কাউকে কিছু বলে না সে। মাইকেল শুধু স্বপ্ন দেখে আসছিল, এমন কেউ একজন তার জীবনে আসবে, সব দিক থেকেই যে হবে মনের মত। অবশেষে স্বপ্ন পূরণ হয়েছে মাইকেলের। ম্যানড্রাগোরাকে পেয়েছে সে।

সোমবার সকালে অফিসে যাবার সময় সে বলল, 'গুডবাই, ম্যানড্রাগোরা। সন্ধে বেলায় দেখা হবে।' মূর্তির গালে চুমু খেল ও। ভারী মসৃণ আর নরম চামড়া। অবিকল মানুষের মত।

সেদিন অফিসে বসে সারাক্ষণ ম্যানড্রাগোরার কথাই ভাবল মাইকেল। কী দিয়ে বানানো হয়েছে ম্যানড্রাগোরাকে? মোম, ধাতু, প্লাস্টিক কিংবা সিল্ক নয়। তবে কি ও কোন পদার্থ দিয়ে তৈরি নয়? ও কি—সত্যি কি তা সম্ভব?

সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে ম্যানড্রাগোরার গা থেকে আস্তে আস্তে কাপড়টা খুলে ফেলল মাইকেল। ওর শরীরে কোন খুঁত নেই, শুধু দুটো দাগ আছে, বাম কাঁধে ছোট্ট একটা আঁচিল আর অ্যাপেনডিক্স অপারেশনের অস্পষ্ট শুকনো একটা ক্ষতচিহ্ন।

মাইকেলের মনে পড়ল প্রৌঢ়ের দোকানে স্টাফ করা নানা রকম মূর্তি দেখেছে সে। বইতে পড়েছে মৃত পশু বা পাখির চামড়ার মধ্যে খড়-কুটো ভরে স্টাফ করে রাখা হয়। অবিকল জীবন্ত লাগে। একে বলে ট্যাক্সিডার্মি। আর যাঁরা এ কাজ করেন তাঁরা হলেন ট্যাক্সিডার্মিস্ট। ভদ্রলোক তা হলে এঁদেরই একজন!

কিন্তু এমন সুন্দর একটি মেয়েকে স্টাফ করলেন কেন তিনি? একে পেলেনই বা কোথায়? ম্যানড্রাগোরার ব্যাকগ্রাউণ্ড কী? এসব প্রশ্নের জবাব না পেলে অস্থির হয়ে থাকবে মন। পরদিন, লাঞ্চ ব্রেকে মাইকেল গেল ভদ্রলোকের দোকানে। তিনি মাইকেলকে দেখেই চিনে ফেললেন। সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন, 'কেমন আছে ম্যানড্রাগোরা?'

'আমি জানতে এসেছি ম্যানড্রাগোরা কে?' প্রশ্ন করল মাইকেল।

'স্বর্গের সবচে' সুন্দরী নারী,' হাসিমুখে জবাব দিলেন প্রৌঢ়। 'যার জন্যে দেবতা-দানব-মানুষ সবাই পাগল ছিল।'

'আমি আপনার ম্যানড্রাগোরার কথা বলছি। সে এমন ভরা বয়সে মারা গেল কীভাবে?' কাটা কাটা গলা মাইকেলের।

হাসিটা মুছে গেল প্রৌঢ়ের মুখ থেকে। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন তিনি। তারপর বললেন, 'মস্তিষ্কের অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণে মারা গেছে ম্যানড্রাগোরা,' চোখ তুলে তাকালেন মাইকেলের দিকে। 'আপনি তা হলে বুঝে গেছেন ও কোন পুতুল নয়। ব্যাকরুমে চলুন। ম্যানড্রাগোরার গল্প শোনাব আপনাকে।'

পেছনের ঘরে মাইকেলকে নিয়ে ঢুকলেন তিনি। সুসজ্জিত ঘর। জানালেন এ দোকান আসলে তাঁর বাড়ির একটা অংশ। তারপর শুরু করলেন, 'ম্যানড্রাগোরা আমার স্ত্রী। একে অন্যকে খুব ভালবাসতাম আমরা। একদিন শপিং করে ফেরার পথে একটা ট্যাক্সি পেছন থেকে ধাক্কা দেয় ম্যানড্রাগোরাকে। ম্যানড্রাগোরা ছিটকে

পড়ে যায় ফুটপাতে। মাথাটা প্রচণ্ড জোরে বাড়ি খায় একটা লাইট পোস্টে। অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ম্যানড্রাগোরাকে। ব্রেন হেমারেজে কোমার মধ্যে চলে গিয়েছিল। তার লাশ আমি চুরি করি। কফিনে একটা ডামি ভরে রেখে দিই। তারপর কাজ শুরু করে দিই।'

'কী কাজ?' জানতে চাইল মাইকেল।

'আমি ট্যাক্সিডার্মি নিয়ে পড়াশোনা করেছি। আমি একজন পেশাদার ট্যাক্সিডার্মিস্ট। দেশের বিভিন্ন জাদুঘরে আমার কাজের প্রচুর নমুনা রক্ষিত আছে। বেশিরভাগই পশু-পাখির স্টাফ করা মূর্তি। অনেকের ব্যক্তিগত কাজও আমি করে দিয়েছি। কারও পোষা বেড়াল বা কুকুর মারা গেলে আমার কাছে আসত। আমি তাদের পোষা প্রাণীগুলোকে স্টাফ করে দিতাম। ট্যাক্সিডার্মি কারও কারও কাছে গা ঘিনঘিনে একটা ব্যাপার, কিন্তু আমার কাছে নয়। আমি আমার জীবনের সমস্ত দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েছি ম্যানড্রাগোরাকে স্টাফ করার সময়। ও আমার মাস্টারপীস। ম্যানড্রাগোরার পরে ট্যাক্সিডার্মির কাজটা আমি ছেড়ে দিই। তারপর এ দোকানটা খুলে বসি। এখানে যেসব স্টাফ করা মূর্তি আপনি দেখেছেন, সব আগে বানানো।'

একটু বিরতি দিলেন ভদ্রলোক, তারপর আবার বলতে লাগলেন, 'ম্যানড্রাগোরাকে নিয়ে ভালই ছিলাম আমি। আমার বয়স বাড়ছিল। যদিও ম্যানড্রাগোরার বয়স এক জায়গায় থেমে আছে। কিছুদিন আগে জানতে পেরেছি আমার ব্লাড ক্যান্সার হয়েছে। লাস্ট স্টেজ। ডাক্তাররা বলে দিয়েছেন আর বেশিদিন আয়ু নেই আমার।'

'সরি,' বিড়বিড় করল মাইকেল।

'সরি হবার কিছু নেই। মৃত্যুকে আমি ভয় পাই না। ভয় পাচ্ছিলাম মৃত্যুর পরে আমার ম্যানড্রাগোরার কী হবে ভেবে। কারণ, আমি মরে গেলে ওকে কে দেখবে? তখন ওকে দোকানে এনে বসাই আমি। এমন এক তরুণকে খুঁজছিলাম যার চোখে ম্যানড্রাগোরা স্রেফ কোন মূর্তি বলে বিবেচিত হবে না। দয়াবান, হৃদয়বান যে যুবক ভালবাসবে আমার ম্যানড্রাগোরাকে, রক্ষকের ভূমিকা পালন করবে। তারপর একদিন মিরাকলের মত এলেন আপনি। ম্যানড্রাগোরার দিকে যেভাবে গভীর দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেন, দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম ম্যানড্রাগোরা আপনার কাছে নিরাপদে থাকবে। ওকে ভালবাসবেন আপনি।'

'হ্যাঁ। বাসব,' বলল মাইকেল।

'ধন্যবাদ। আমার বিশ্বাস আমার চেয়েও বেশি ভালবাসতে পারবেন ম্যানড্রাগোরাকে।'

এমন সময় বেজে উঠল দোকানের ঘণ্টা। খদ্দের এসেছে। উঠে দাঁড়াল দু'জনেই। মাইকেল চলে গেল। অপরজন ব্যস্ত হয়ে পড়ল খদ্দের নিয়ে।

কয়েক দিন পরে ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে মাইকেল, দেখল প্রৌঢ়ের দোকান বন্ধ। পাশের দোকানদার জানাল মারা গেছেন ভদ্রলোক। মাইকেলের মধ্যে অদ্ভুত

একটা অনুভূতি হলো। মনে হলো অবশেষে ম্যানড্রাগোরা সত্যি তার হয়ে গেছে। মেয়েটির জন্যে সে জীবনও দিতে পারবে।

তারপর থেকে পাগলামিতে পেয়ে বসল মাইকেলকে। ম্যানড্রাগোরা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছে না সে। অফিস কামাই শুরু করল। ফলে চাকরিটা হারাতে হলো ওকে। ম্যানড্রাগোরা খেতে পারে না বলে সে-ও একটা পর্যায়ে বন্ধ করে দিল খাওয়া-দাওয়া। আমার ভালবাসার মানুষ না খেলে আমি খাই কী করে? নিজেকে যুক্তি দিয়ে বোঝাল সে।

সারাদিন ঘরে বসে দিন কাটে মাইকেলের ম্যানড্রাগোরার মুখের দিকে তাকিয়ে। সন্ধ্যাবেলায় মাঝে মাঝে বেরোয়। ফুল কিনে আনে ম্যানড্রাগোরার জন্যে। এভাবে তার জমানো টাকাও শেষ হয়ে গেল।

ম্যানড্রাগোরার প্রতি মাইকেলের ভালবাসা স্বর্গীয়। এর মধ্যে কামনা-বাসনার কোন স্থান নেই। ম্যানড্রাগোরাকে সে স্পর্শও করে না। শুধু সাবধানে গোসল করিয়ে দেয়, ফ্যান চালিয়ে শুকোয় গা এবং চুল। তারপর স্কার্ট পরিয়ে বেঁধে দেয় চুল। মাইকেল উত্তেজিত হয়ে লক্ষ করে ওর যত্নে আর ভালবাসায় যেন ধীরে ধীরে প্রাণ ফিরে পাচ্ছে ম্যানড্রাগোরা। চুলের রঙ চকচক করছে, চামড়ার ফেকাসে ভাবটা চলে গিয়ে ক্রমে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে, পাতলা ঠোঁটে ধরেছে রঙ।

ম্যানড্রাগোরার জন্য উন্মাদ মাইকেলের নিজের প্রতি বিন্দুমাত্র খেয়াল ছিল না। সে বুঝতে পারছিল না এই উন্মাদনা নিজের ধ্বংস ডেকে আনছে। ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ছে শরীর। কিন্তু ব্যাপারটাকে পাত্তাই দিল না সে। বাইরে যাওয়া বাদ দিল মাইকেল, আর খাওয়া-দাওয়া একেবারেই বন্ধ। ভূতের মত সে নিজের ঘরে পায়চারি করে, কথা বলে ম্যানড্রাগোরার সঙ্গে, প্রেমের কবিতা লেখে ম্যানড্রাগোরাকে নিয়ে। পড়ে শোনায়।

না খেতে খেতে দুর্বলতার চরম সীমায় পৌঁছে গেল মাইকেল। একদিন অজ্ঞান হয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরল, হামাগুড়ি দিয়ে এগোল আর্মচেয়ারের দিকে। বহু কষ্টে উঠে বসল। এই প্রথমবার চুমু খেল ম্যানড্রাগোরার ঠোঁটে।

পরের মুহূর্তে মারা গেল মাইকেল।

ঘরটা এখন অদ্ভুত নীরব। তারপর দ্রুত এবং হালকা শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ভেসে এল, গভীর এবং ঘন হয়ে উঠল আওয়াজ। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ম্যানড্রাগোরা, কোমরে গোঁজা সাদা সিল্কের রুমালটা দিয়ে ঢেকে দিল লাশের মুখ।

ম্যানড্রাগোরার গালে রঙ ধরল, ফাঁক হয়ে গেল কমলাকোয়া অধর, মৃদু একটা ঝাঁকি দিতেই খোঁপা খুলে পিঠময় ছড়িয়ে পড়ল কালো কুচকুচে চুলের বন্যা। নাচের ভঙ্গিতে বার কয়েক পা ফেলল সে ঘরের মেঝেতে, তারপর এগোল দরজার দিকে। দোর খুলতেই সূর্যের সোনালি আলোয় উদ্ভাসিত হলো ম্যানড্রাগোরার ফর্সা শরীর। বুক ভরে শ্বাস নিল সে।

আহ্, আবার বেঁচে ওঠা কী আনন্দের!

মূল: রোজমেরি টিম্পারলি

ছিনতাই

বুদ্ধিটা টনির। আমরা মাত্র বেরিয়ে এসেছি সিনেমা হল থেকে। আমি, টনি আর জেনি। পকেট ঝেড়েঝুড়ে টিকেট কাটতে হয়েছে, কিন্তু ছবিটি ছিল যাচ্ছেতাই। এখন বাড়ি ফেরারও পয়সা নেই। ওদিকে রাত দ্বিপ্রহর ছুঁইছুঁই। দ্রুত কিছু টাকা-পয়সা জোগাড় করতেই হবে। খিদেও লেগেছে বেদম। এমন সময় লোকটাকে চোখে পড়ল আমাদের।

প্রেক্ষাগৃহের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে আসা তরুণী মেয়েদের দিকে কুৎসিত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে, বিশ্রী অঙ্গভঙ্গি করছে। লোকটা মোটু, থলথলে ভুঁড়ি, তবে পোশাক পরেছে দামী। দেখলেই বোঝা যায় মালদার পার্টি।

তবে পোশাক বা শারীরিক কাঠামো নয়, আমি লক্ষ করছিলাম লোকটার চেহারা। গোল মুখ, অসংখ্য ফুটকি তাতে। কুতকুতে ছোট ছোট চোখ, শুয়োরের মত। এমনভাবে তাকায়, যাকে দেখছে তাকে যেন দৃষ্টি দিয়ে ন্যাংটো করে ফেলছে। তার ওপরের ঠোঁটে জমেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম, কপালটা একটু পরপর রুমাল দিয়ে মুছছে। একটি যুবতী মেয়ে পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল, তার দিকে তাকিয়ে বিশ্রী হাসল লোকটা, মুখটা বাড়িয়ে দিল যেন কুকুরের মত গায়ের গন্ধ শুঁকবে।

এ ধরনের মানুষজন আগেও দেখেছি আমি। কামুক। মেয়েদেরকে উত্ত্যক্ত করে মজা পায়।

এমন সময় জেনির দিকে চোখ পড়ল তার। এমনভাবে কপাল মুছতে লাগল যেন ওখানে আগুন লেগেছে। এজন্য ওকে দোষ দেয়া যায় না। জেনি দেখার মতই মেয়ে বটে। ওকে দেখলে যে কারও বুকে ধকধক শুরু হয়ে যাবে। আর আজ জেনি সেজেছেও দারুণ। পাতলা সাদা স্কার্টটি ওলটানো তানপুরার মত নিতম্বের খাঁজভাঁজগুলো প্রস্ফুটিত করে রেখেছে, গায়ের লাল ব্লাউজটি গলার কাছে ইংরেজি 'ভি'-র আকার পেয়েছে, তাতে ওর ফর্সা, ধবধবে গিরিখাদের অনেকটাই উন্মুক্ত। দেখলে বোঝাই যায় না জেনির বয়স মাত্র ষোলো। ও কিউট এবং সেক্সি।

রাস্তার শেষ মাথাতক হেঁটে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম তিনজন। টনি পকেট থেকে গাঁজা ভরা একটি সিগারেট বের করে আগুন ধরাল। মোটুর দিকে উদ্দেশ্য করে মাথা ঝাঁকাল। 'চলো, ওকে ধরি,' প্রস্তাব দিল টনি।

পরামর্শটা পছন্দ হলো না আমার।

'তোমার হয়েছেটা কী, দোস্তো?' জানতে চাইল টনি। 'ভোটকুটাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে মালকড়ি আছে পকেটে। কীরকম দামী পোশাক পরেছে লক্ষ

করেছ?'

'লোকটার আচার-আচরণ পছন্দ হয়নি আমার। কেমন কামুক টাইপের।'

'তোমার ধারণা ও একটা সেক্স ম্যানিয়াক? আরে ধুর, ও বোধহয় মেয়েমানুষ খুঁজছে। রাতের বেলায় এরকম লোক তুমি যেন আর কোনওদিন দেখনি!'

'তবু ওকে আমার ভাল্লাগেনি।'

'লোকটা পয়সাঅলা। অনেক পয়সাঅলা।' জানি টনি এর মধ্যে আমাকে জড়াবেই। সবসময়ই করে। আমি জেনির দিকে তাকালাম।

'তুমি কী বল?'

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না-' ধীর গলায় জবাব দিল সে। 'আমার দিকে যেভাবে তাকাচ্ছিল, কেমন ছমছম করছিল গা।'

টনি ধীরে ধীরে সিগারেট টানতে লাগল, তারপর গোড়াটা টুসকি মেরে ফেলে দিল ম্যানহোলের গর্তে।

'শোনো, দোস্তো,' বলল সে, 'রাস্তাঘাট খালি হয়ে আসছে দ্রুত। আর-আর এই লোকটাকে খুব সহজেই আমরা কাবু করতে পারব।'

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, টনি। আমি-'

'শোনো, বন্ধু। লোকটাকে সহজেই কব্জা করা যাবে ভেবেই ঝুঁকিটা নিচ্ছি আমি, নইলে নিতাম না। এখন এগোনো যাক, নাকি?'

'না-এখনই নয়।' আমি জেনির দিকে তাকালাম। ও জানে টনি আমাদেরকে দিয়ে কাজটা করাবেই। এজন্যেই ভয় পাচ্ছে জেনি। সত্যি খুব ভয় পেয়েছে। আতংকে সাদা হয়ে গেছে মুখ। বারবার শরীরের ওজন চাপাচ্ছে এক পা থেকে আরেক পায়ের ওপরে। আমাদের দলে নতুন ও, তবে আমি কিছু করতে বললে মানা করতে পারে না। ওর অসহায় চেহারাটা দেখে মায়া লাগল আমার। ইচ্ছে করল টনিকে চেঁচিয়ে বলি, জাহান্নামে যাক ও। কিন্তু সে সাহস আমার নেই। কারণ টনি টিম লিডার। ওর কথা মেনে চলতেই হয়। তা ছাড়া রাজি না হলে আমাকে ডরপুক বলে গালাগাল দেবে।

'তুমি ঠিক জানো, টনি, ওকে আমরা সামাল দিতে পারব?'

'একশোবার।'

জেনির দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পারছি ঘন ঘন ঢোক গিলছে সে। আমার একটা হাত ধরল। ওর হাত কাঁপছে।

'কাজটা করতে পারবে, জেনি?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

এক মুহূর্ত দ্বিধা করল ও, তারপর ধীর গতিতে মাথা দোলাল। তবে কথা বলার সময় কেঁপে গেল কণ্ঠ। 'তুমি যদি বলো, জ্যাক। তোমার জন্য আমি সব করতে পারি।'

হাতে হাত ঘষল টনি। 'গুড, ম্যান। তা হলে সবাই রাজি, কেমন?'

'হুঁ,' বললাম আমি।

'এখন কী করতে হবে বলছি আমি। জেনি, তুমি সিনেমা হলের সামনে চলে

যাবে। ভোটকুর মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করবে। ওর চোখে চোখ রাখবে। চোখ মারবে। তারপর কোনও অন্ধকার গলিতে ওকে নিয়ে যাবে। আমি আর জ্যাক দূর থেকে পিছু নেব তোমাদের। ওকে নিয়ে তুমি গলিতে ঢুকলেই ছুটে যাব আমরা। মোটু বিনা বাক্যব্যয়ে মালপানি ছাড়লে ভাল, নইলে দু'এক ঘা লাগাতে হবে হয়তো। খুবই সহজ কাজ।'

একটা সিগারেট নিয়ে ধরালাম। পাতার মত কাঁপছি। তবে হেসে ব্যাপারটা উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করলাম। টনির সঙ্গে এরকম ছিনতাইয়ের ঘটনা এর আগেও বহুবার ঘটিয়েছি আমি। কোনও সমস্যা হয়নি। কিন্তু জেনি আমাদের দলে ভিড়বার পর থেকে কেন জানি মেয়েটার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছি আমি। এসব কাজ করতে এখন একটু ভয়-ভয় লাগে, দ্বিধাও জাগে মনে। কী জানি, হয়তো এ লাইনটা শীঘ্রি ছেড়ে দেব আমি। ভাল হয়ে যাব। জেনি যদি রাজি হয় ওকে নিয়ে চলে যাব দূরে কোথাও। টনির ছায়াও আর মাড়াব না। হয়তো আজকের রাতটাই শেষ রাত। আনমনে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে এসব কথা ভাবছিলাম, চমক ভাঙল জেনির ভীরু কণ্ঠের আওয়াজে।

'ঠিক আছে,' বলল ও আমার দিকে তাকিয়ে, 'কাজটা করব আমি। তবে কথা দাও তোমরা আমার ওপর খেয়াল রাখবে। লোকটা যেন কেমন। আমার ভয় লাগছে।'

'ভয় পেয়ো না,' ওকে আশ্বস্ত করলাম আমি। 'আমরা এক মুহূর্তের জন্যেও তোমাকে চোখের আড়াল হতে দেব না।' গোড়ালি উঁচু করল জেনি, টনির সামনেই চুমু খেল আমাকে। মেয়েটা কি সত্যি আমার প্রেমে পড়েছে?

একটা ল্যাম্পপোস্টের গায়ে হেলান দিলাম। দেখছি রাস্তা ধরে হেঁটে যাচ্ছে জেনি। আবার সেই অস্বস্তিটা ফিরে এল আমার মাঝে। মোটা লোকটার মধ্যে সত্যি অশুভ কী যেন আছে, দেখলেই শিরশির করে গা।

রাস্তাঘাট এখন জনশূন্য। শুধু জেনি আর মোটকা লোকটা ছাড়া আর কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। মোটু দেখছে জেনি এগিয়ে যাচ্ছে তার দিকে। সে পাগলের মত কপাল মুছতে লাগল রুমাল দিয়ে। ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। আমাকে কিংবা টনিকে দেখতে পায়নি সে। আমরা দেখছি জেনি লোকটার প্রায় সামনে চলে এসেছে। বয়স যদিও ষোলো, কিন্তু পুরুষ পটানোর সমস্ত মন্ত্রই জেনির জানা। মোটুর সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল ও। কথা বলছে দু'জনে। লোকটা হাত তুলে জেনির ব্লাউজের নেকলাইন স্পর্শ করল। খ্যাক খ্যাক করে হাসছে। ইচ্ছে করল এক লাথিতে ব্যাটার পোঁদ ফাটিয়ে দিই।

'ইজি, ম্যান, ইজি,' বিড়বিড় করল টনি, বুঝতে পারলাম লোকটাকে একটু জোরেই গালাগাল দিয়ে ফেলেছি আমি। যদিও মোটুর কানে যায়নি আমার খিস্তি-খেউর।

হারামীটা এক হাতে কোমর জড়িয়ে ধরল জেনির, হাঁটা দিল ওকে নিয়ে।

জেনির আড়ষ্ট ভঙ্গি দেখে বুঝতে পারছিলাম ভয়ে আত্মা উড়ে গেছে ওর।

'চলো, টনি,' বলে কদম বাড়াতে গেলাম আমি।

খপ করে আমার হাত চেপে ধরল টনি। 'এখনই নয়, গদর্ভ! তোমার হয়েছেটা কী, হাহ্? সব ভণ্ডুল করতে চাও?'

জোর করে শান্ত রাখলাম নিজেকে। ঠিকই বলেছে টনি। একটু অপেক্ষা করতে হবে আমাদের। আমাদেরকে দেখে ফেললেই দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে নেবে মোটু। আমি পাগলের মত গাঁজা দেয়া সিগারেটটি টানতে লাগলাম। কিন্তু কোনও লাভ হলো না। উত্তেজনা এবং ভয় কোনওটারই প্রশমন ঘটল না।

ব্লকের শেষ মাথায় একটি গলির ধারে চলে এসেছে ভোটকু এবং জেনি। সেঁধিয়ে গেল ভেতরে।

'এখন ধরো ওকে!' বলল টনি। দ্বিতীয়বার কথাটা বলার দরকার ছিল না ওর। জোর কদমে হাঁটা দিলাম। আমার ইচ্ছে করছিল ছুটে যেতে। ভিতরে ভিতরে বেদম শীত লাগছে আমার। গলিপথটাকে মনে হচ্ছে সহস্র মাইল দূরে। যেন জীবনেও পৌঁছতে পারব না ওখানে।

'স্বাভাবিকভাবে হাঁটো!' খেঁকিয়ে উঠল টনি। 'এমন তাড়াহুড়ো করছ কেন?'

এ কথা তো ও বলবেই। কারণ, ওর বান্ধবী তো আর গলিতে ঢোকেনি। সময় যেন উড়ে যাচ্ছিল। আমি মোটেই দেরি করতে চাইছিলাম না।

এমন সময় পুলিশের একটা গাড়ি এসে ফুটপাত ঘেঁষে দাঁড়াল। পুলিশের দুই লোক নামল গাড়ি থেকে।

'অ্যাই, তোমরা দু'জন যেখানে আছ সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকো!' ভারি ও কর্কশ কণ্ঠের হুকুম এল।

'কী হয়েছে, ভাইজান?' মোলায়েম গলায় জানতে চাইল টনি।

'কী হয়েছে এখনই তা জানতে পারবে, খোকা। দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়াও।'

'শুনুন, ভাইসাব–' বলতে গেলাম আমি।

'বলেছি না দেয়ালে মুখ করে দাঁড়াতে? মুভ!'

লোকটার কণ্ঠের কাঠিন্য বুঝিয়ে দিল তার সঙ্গে কোনও তর্ক করা চলবে না। ভবনের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম দু'জনে। দু'হাত দু'পাশে ছড়ানো। পুলিশের লোকটা আমার আগাপাছতলা সার্চ করল। পেল না কিছুই।

'কোত্থেকে আসছ?' জানতে চাইল ভারি কণ্ঠ।

'সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। এই মাত্র বেরিয়েছি হল থেকে।'

'তাই নাকি?'

'জী। সিনেমা দেখা নিশ্চয় অপরাধ নয়?'

'ওর কী অবস্থা?' সহকর্মীকে জিজ্ঞেস করল ভারি গলা।

'একদম ক্লীন,' জবাব দিল অপরজন। 'ওদেরকে থানায় নিয়ে যাই, কী বলো?'

হঠাৎ মনে হলো অজ্ঞান হয়ে যাব আমি। হাঁটু এমন কাঁপাকাঁপি শুরু হলো ভারসাম্য রক্ষায় হেলান দিতে হলো দেয়ালে। আমি যথেষ্ট কঠিন প্রকৃতির মানুষ। ঠোলাদেরকে একদমই দেখতে পারি না। কোনওদিনই পছন্দ করতাম না। অন্যসময় হলে ওরা যে আমার দু'চক্ষের বিষ তা ওদেরকে বুঝিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু আজ রাতে এটা সম্ভব নয়। অন্তত এ মুহূর্তে তো নয়ই। গলির ভিতরে কী ঘটছে ভেবে দুশ্চিন্তায় মরে যাচ্ছি আমি, তাই পুলিশগুলোকে কাকুতি মিনতি করতে লাগলাম যেন আমাদেরকে থানায় নিয়ে না যায়। থানা এখান থেকে মাইলখানেক দূরে। আর এখন যদি ওরা আমাদেরকে ওখানে ধরে নিয়ে যায়–

'শোনেন, ভাই, বিশ্বাস করেন, আমরা মাত্র সিনেমা দেখে বেরিয়েছি।'

কী যেন ভাবল গম্ভীর কণ্ঠস্বরের মালিক। 'ওকে নিয়ে সিনেমা হল-এ যাও। ওরা সত্যি বলছে না মিথ্যা চেক করে এসো।' বলল সে একটু পর।

অপর পুলিশ অফিসার টনিকে নিয়ে প্রেক্ষাগৃহ অভিমুখে রওনা দিল। আমার চিৎকার করে কেঁদে উঠতে ইচ্ছা করল।

মন্দ্র কণ্ঠস্বর একটা সিগারেট বের করে ধরাল। তার কোনও তাড়া নেই। সরু চোখে পরখ করছে আমাকে।

'তোমাকে খুব অস্থির লাগছে, খোকা। সমস্যা কী?'

জোর করে মুখে হাসি ফোটালাম আমি। 'না–কোনও সমস্যা নাই। কেন, ভাইসাব?'

'না, এমনি।'

আড়ষ্ট হাসলাম। না, কোনও সমস্যা নেই, ভাবছি আমি। যদি না ওই মোটকুটা সেক্স ম্যানিয়াক হয়। কোনও সমস্যা নেই যদি আমরা ঠিক সময়ে ওই গলিতে ঢুকতে পারি। আড়চোখে একবার তাকালাম ওদিকে। কিছুই পড়ল না চোখে। সুনসান রাস্তা। কোনও শব্দ নেই। কিস্যু নেই। মনোযোগ ফেরালাম ষণ্ডামার্কা পুলিশটার দিকে।

'আপনারা কী খুঁজছেন?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'কতগুলো পাংক ছোঁড়া মহল্লার এক দোকানে ডাকাতি করেছে।'

'কিন্তু আমরা ওসবের মধ্যে জড়িত নই,' দ্রুত বললাম আমি।

ষাঁড় তার হাতের সিগারেটের দিকে তাকাল। ওটাকে দেখতে দেখতে মন্তব্য করল, 'সে একটু পরেই জানা যাবে, খোকা।'

আবার গলিপথে ফিরে গেল আমার দৃষ্টি। টের পেলাম দ্রুত ঘেমে যাচ্ছি আমি, ইঁটের দেয়াল খামচে ধরলাম।

গলি থেকে বেরিয়ে আসছে মোটকা। ঘাড় ঘুরিয়ে একবার পেছনটা দেখে নিল যেন ওখানে কিছু একটা ফেলে এসেছে। ওর পকেট থেকে কী একটা খসে পড়ল ফুটপাতে। খেয়াল করল না লোকটা। তারপর আমাকে এবং পুলিশের লোকটাকে দেখতে পেল সে, বিপরীত দিকে পা চালাল। দ্রুত।

জিভটা কেমন আঁশ-আঁশ লাগল আমার, কথা বলার জন্য মুখ খুলতে চাইলাম। পারলাম না। দেখছি চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটা। টনির সঙ্গে যে পুলিশ কর্মকর্তা সিনেমা হল-এ গিয়েছিল, তারা যে ফিরে এসেছে তা-ও লক্ষ করিনি আমি।

'ওরা মিথ্যা বলেনি,' বলল পুলিশ কর্মকর্তা। 'সিনেমা হলের টিকেট বিক্রেতা মেয়েটা একে দেখেই চিনতে পারল।'

'ঠিক আছে। তোমরা এখন যেতে পারো,' বলা হলো আমাদেরকে।

তবে আমার কানে কিছু ঢুকছিল না। আমি কিছু শুনছিলামও না। আমি ততক্ষণে হাঁটা ধরেছি। টনি আমার পাশেই থাকল। দুই পুলিশ তাদের গাড়িতে উঠল। আমার চলার গতি দ্রুততর হলো, তারপর দৌড়তে শুরু করলাম। জাহান্নামে যাক ঠোলার বাচ্চারা।

গলিমুখে এসে পড়লাম আমরা। টনি নুয়ে কী যেন তুলে নিল ফুটপাত থেকে। মোটা লোকটার পকেট থেকে এখানেই কী একটা পড়ে যেতে দেখেছি আমি। ওটা বাতির আলোয় ধরল টনি। একটা ধারাল ক্ষুর। ক্ষুরের গায়ে লেগে আছে তাজা রক্ত। আমার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল টনি। তারপর একসঙ্গে ডাইভ দিয়ে পড়লাম গলিতে। ভয়ানক অসুস্থ বোধ করছিলাম আমি, বমি বমি লাগছিল। আমি জানি আমরা কী দেখতে পাব।

মূলঃ হ্যাল এলসন

পদশব্দ

একটা চাইনিজ মেয়ের সঙ্গে সিঙ্গাপুরে আমার পরিচয় হয়। তখন তার বয়স তিরিশের কাছাকাছি। তবে দেখতে ছোটখাট আর তার গায়ের চামড়া এমন মসৃণ আর চকচকে ছিল যে তাকে খুব কমবয়সীদের মত লাগত।

তার সঙ্গে আমার কীভাবে পরিচয় হয়েছিল, তা আর এখন মনে নেই। তবে তার নামটা পরিষ্কার মনে আছে, কোয়ান আন। অবস্থা ওদের বেশ সচ্ছলই ছিল। তার মা ছিলেন তখনকার সময়ের ডাকসাইটে সুন্দরী ও প্রথিতযশা কবি। কোয়ান আন এবং দুই বুড়ো চাকরকে নিয়ে তিনি শহরের তাংলিন অঞ্চলের ছায়াঘেরা শান্ত রাজপথের উপরে একটি সেকেলে মস্ত বাড়িতে বাস করতেন। বাড়ির কাঠের কারুকার্যমণ্ডিত হলঘরটি দেখার মত। সামনের ফটক দিয়ে ঢুকেই হলঘরের একদিকে পারিবারিক উপাসনা-বেদী। আর ছিল কাঠের প্যানেলের ওপর চীনা ভাষায় সোনালি রঙে লেখা নানান বাণী।

উপাসনা-বেদীর দু'পাশ দিয়ে দুই ধাপ সিঁড়ি উঠে গেছে। কোয়ান আনের বসার ঘরটি ছিল দোতলায় খোলা বারান্দায়, ঠিক বাগানের উপরে।

আমরা বেশির ভাগ সময় ওর ঘরে যেতে বাঁ দিকের সিঁড়িটা ব্যবহার করতাম। মনে আছে একদিন আমি ডান দিকের সিঁড়িটা দিয়ে ওপরে উঠছি, সে আমাকে শান্তভাবে বলল, ওই সিঁড়িটা এখন আর তারা ব্যবহার করে না। কথাটার মানে তখন বুঝতে পারিনি। পরে এর সাংঘাতিক ইতিহাসটা জেনেছি।

কোয়ান আনের মা মিসেস লীর সঙ্গে আমার কদাচিৎ দেখা হত। তিনি কথা বলতেন কম। রান্নাঘরে রান্না করা ছাড়া বেশির ভাগ সময়েই নিজের ঘরে থাকতেন।

একদিন সন্ধ্যায় কোয়ান আনের ঘরে বসে আমরা সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করছিলাম। সাহিত্যে ছিল তার সবচেয়ে প্রিয় বিষয়। চারদিক নিস্তব্ধ। ঝিঁঝি পোকার ডাক আর ফ্রাঙ্গি পানি ফুলের গন্ধ মিলেমিশে এক অদ্ভুত পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল।

হঠাৎ সিঁড়িতে একটা ক্যাঁচ-কোঁচ আওয়াজ শোনা গেল। বোধহয় কেউ সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসছে।

চেয়ার থেকে না উঠে ঘাড় ফিরিয়ে ভাবলাম, কোয়ান আনের মা হয়তো আসছেন। শব্দটা সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছে গেল। অপেক্ষা করছিলাম দরজাটা খুলে যাবে। কিন্তু সেরকম কিছু হলো না। তখন বুঝতে পারলাম, যে সিঁড়িটা আমরা ব্যবহার করি সেখান থেকে শব্দটা আসছে না। শব্দটা আসছে ডান দিকের সিঁড়ি থেকে, অথচ ওদিক থেকে এই বসার ঘরে আসবার কোন দরজাই নেই।

আমাকে অবাক হতে দেখে কোয়ান আন বলল, 'ও আমার বড় ভাই।'

'কিন্তু বড় ভাই এখানে এল না যে!'

'ও নিয়ে ভাবতে হবে না। ভাইয়া এখানে আসবে না।'

'কিন্তু তোমার ভাইয়ার সঙ্গে দেখা হলে আমি খুশি হতাম...'

কোয়ান আন ঘাড় নেড়ে গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'ভাইয়া খুবই চালাক চতুর ছিল। তবে তার জীবনটা ছিল বড়ই দুঃখের। বিয়ে...একমাত্র বিয়েটাই তার জীবনে কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল।'

তার কথায় আমার শরীরটা শির শির করে উঠল।

কোয়ান আন বলে চলল: 'ভাইয়ার মৃত্যুর পরে, আমার বয়স তখন বারো বছর, প্রায়ই ওই সিঁড়িতে তার পায়ের শব্দ শুনতে পেতাম, ভাবতাম সে বুঝি ঘরে ঢুকবে। কিন্তু ঢুকত না। তাকে খুশি করবার জন্য সাধ্যমত সব কিছুই আমরা করেছি, কিন্তু কিছু লোক মৃত্যুর পরেও তাদের দুর্ভাগ্য বয়ে বেড়ায়।'

ম্লান হাসল কোয়ান আন।

'চমকে উঠো না। ঘটনাটা খুবই সাধারণ এবং দুঃখজনক।' কোয়ান আন নড়েচড়ে বসে আবার বলা শুরু করল।

ভাইয়া আমার চাইতে বছর আষ্টেকের বড় ছিল। আমি তাকে ভালবাসতাম, তাকে নিয়ে আমাদের অহঙ্কার ছিল। পড়াশোনায় খুব ভাল ছিল। আইনের ছাত্র ছিল সে। বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই একজন সফল এবং বিখ্যাত লোক হত আমার ভাই।

সন্ধেবেলা আমরা এখানে বসে পড়াশোনা করতাম। কত গল্প হত দু'জনে। বেশ মনে পড়ে, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে সে এ বাড়ির ওই উঠোনে ব্যাডমিন্টন খেলত। আমিও ওদের সঙ্গে থাকতাম। আমাকে নিয়ে বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াতে যেত। তারপর যখন সে গাড়ি কিনল তখন প্রতি রবিবার আমাকে পিকনিকে নিয়ে যেত। সাগরতীরে পিকনিক হত।

তারপর হঠাৎ একদিন সে একটি মেয়ের প্রেমে পড়ল। তবে মাকে এ ব্যাপারে কিছুই জানায়নি। শুধু আমাকেই সে সব কথা বলত। মেয়েটির নাম ছিল মিংলী। মিংলী কোনদিনই আমার ভাইয়ের যোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি। মেয়েটি একটা বার-এ কাজ করত, মদ পরিবেশন করত। শহরের এক পাশে একটা নোংরা বস্তিতে একটা ছোট ঘরে আরও দুটি মেয়ের সঙ্গে থাকত। ভাইয়া বলেছিল, মায়ের নিষ্ঠুর ব্যবহারে মিংলী অতিষ্ঠ হয়ে মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। মিংলী খুব সুন্দরীও ছিল।

প্রায়ই সন্ধের দিকে ভাইয়া আমাকে সমুদ্রতীরে নিয়ে যেত। সেখানে বেড়ানোর সময় মিংলী ও তার বান্ধবীদের সঙ্গে কখনও কখনও আমাদের দেখা হয়ে যেত। তখন একসঙ্গে সবাই বেড়াতাম। ভাইয়া মেয়েটির হাত ধরে হাঁটত। ভাইয়া তখন বেশি কথা বলত না। আমি তার অন্য হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে

রাখতাম।

একদিন মায়ের মনে সন্দেহ জাগল। ভাইয়ার হাবভাবে মা যেন কিছুটা আন্দাজ করতে পারছিল। দু'একবার সে মেয়েটির সঙ্গে দেখা করার জন্য গাড়ি নিয়ে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে মা-ও তাকে অনুসরণ করবার জন্য গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ত।

তারপর এল সেই ভয়ঙ্কর দিন। আমার প্রতিদিনই ভোরে ওঠার অভ্যেস। ওই দিনও ভোরে উঠে নীচে নেমেছি। চারদিক নিস্তব্ধ, অন্ধকার আর সেদিন বেশ গরমও লাগছিল। কাগজওয়ালা খবরের কাগজটা কাঠের বড় দরজাটার নীচ দিয়ে ঢুকিয়ে রেখে গিয়েছিল। কাগজটা তুলে নিতেই আলো-অন্ধকারে দেখলাম, তার মুখখানা আমার দিকে তাকিয়ে আছে, জানলার কাছে গিয়ে পাল্লাটা খুলে দিতেই শিরোনামটা চোখে পড়ল: **বার গার্লের আত্মহত্যা! ব্যর্থ প্রেম**! মেয়েটি মারা গেছে। নিজের একাকী ঘরে হাতের কবজি কেটে ফেলে রক্তক্ষরণে তার মৃত্যু হয়েছে। বান্ধবীরা তার একটা চিরকুট পেয়েছিল: 'আমি ভালবেসেছি, আর সে-ও আমাকে ভালবাসে; কিন্তু এ ভালবাসায় কোন আশা নেই, আছে শুধু বিষাদ। কারণ, আমাদের কোনদিনই বিয়ে হবে না। এভাবে বেঁচে থেকে কী লাভ? আমাকে দোষ দিয়ো না। বিদায়।'

কাগজ পড়তে পড়তে আমার সারা শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল। ভাইয়া যাতে দেখতে না পায় সেজন্যে খবরের কাগজটা লুকিয়ে রাখব ভাবছিলাম। পরক্ষণে মনে হলো লুকিয়ে রেখে ফায়দা কী? সে তো জানতে পারবেই। তাই কাগজটা মেঝেয় ফেলে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। ওদের জন্যে খুব কষ্ট হচ্ছিল।

এদিকে বেলা গড়াচ্ছিল। বাড়িটা চুপচাপ। হঠাৎ ভাইয়া ও মায়ের গলা কানে এল। তারা চিৎকার-চেঁচামেচি করছে। কান্নার শব্দ পেতে আমি ছুটে বাগানে যাব, এমন সময় দরজার বেল বেজে উঠল। পরিচিত গলা শুনতে পেলাম। আমার চাচা। দৌড়ে তাঁর কাছে গেলাম। তিনি হাসিমুখে আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললেন, 'তোমার সঙ্গে পরে কথা বলব, সোনা, এখন তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা করে আসি।' বলে উপরে উঠে গেলেন।

পরদিন বাড়িতে এল একজন পুলিশ অফিসার। অফিসারটির সঙ্গে চাচাও ছিলেন। হলঘরে তারা মা ও ভাইয়ার সঙ্গে কথা বলল। সিঁড়ির রেলিং-এ ঝুঁকে আমি তাদের কথাবার্তা শোনার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু কিছুই শুনতে বা বুঝতে পারলাম না। ভাইয়া একটু পরে আমার পাশ ঘেঁষে উপরে উঠে গেল। আমাকে যেন দেখতেই পেল না। তার মুখটা ফ্যাকাসে ও রক্তশূন্য। তবে চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছিল।

এরপরই আমার ভাই হংকং চলে যায়। সে সেখানে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে এক আত্মীয়ের কাছে থেকে ব্যবসা শিখতে লাগল। যাবার সময় ভাইয়া আমাকে বলেছিল, 'দিদাকে দেখিস, লক্ষ্মী বোন।'

আমি বললাম, 'দেখব। আর মাকে?'

'ওঃ, মা নিজেই নিজেকে সামলাতে পারবে।'

এ কথা শুনে মা উদাস চোখে তার দিকে তাকাল।

দিদা আমাকে বলল, 'তুমি সব কিছুতেই বড় বেশি নাক গলাও। গাছ-গাছড়াকে নিজের মত বাড়তে দিতে হয়।'

মা বলল, 'আপনার আদরের গাছটাকে আগাছায় ছেয়ে ফেলুক তাই কি আপনি চান?'

তখন এসব কথার মানে বুঝিনি। পরে বুঝতে পেরেছি।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ভাইয়া ফিরে এল। হংকং-এ সে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, ফিরল খুবই অসুস্থ শরীরে। ছোকরা চাকরটা তাকে ধরে ধরে সিঁড়ি দিয়ে তুলছে দেখে আমি কেঁদে ফেললাম।

তার পাশে বসে গল্প করতাম। অনেক সময়েই সে বিকারের ঘোরে থাকত। কখনও কখনও তাকে এক দৃষ্টিতে সিলিং ফ্যানের দিকে তাকিয়ে চুপ করে শুয়ে থাকতে দেখতাম।

আগুন গনগনে চোখে সে একদিন আমাকে বলল, 'ও আমার জীবনটা নষ্ট করেছে। ও আমাকে খুন করেছে।'

কথাটা বুঝতে না পেরে মাকে জিজ্ঞেস করলাম।

'বার-এর যে মেয়েটা ওকে ফাঁদে ফেলেছিল তার কথাই ও বলছে—' এই বলেই মা মুখে কুলুপ এঁটে দিল।

কিন্তু ও ভাইয়াকে কী করে খুন করবে? এ প্রশ্নের কোন জবাব দিল না মা।

মা ডাক্তার ডাকল। অনেক বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এলেন ইউরোপ, হংকং ও লণ্ডন থেকে। তারপর এল এক চীনা ডাক্তার সে ভাইয়ার শরীরে ছোট ছোট সুচ ফোটাল, বিশেষ পদ্ধতিতে ওষুধ দিল।

শেষ পর্যন্ত একজন মালয়ী 'বোমো'-কেও ডাকা হলো। লোকটা জাদু জানত। সে নারকেল মালায় তেলে ভাসমান সলতে জ্বালিয়ে ভাইয়ার বিছানার চারধারে রেখে দিল। ঘরময় ঘুরে ঘুরে অদ্ভুত সব শব্দ করতে লাগল। দেয়াল ও সিলিং-এ তার ছায়া নড়তে লাগল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। শেষ পর্যন্ত সেই বোমো বলল, 'মেয়েটির আত্মা কবর থেকে একে ডাকছে। এ রোগী সে ডাক ফেরাতে পারছে না। একে তার কাছে যেতেই হবে।'

এরপর থেকে মা ভাইয়ার ঘরে যাওয়া বন্ধ করে দিল। নীচের ঘরে বসে বিষণ্ন মুখে ছেলের মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। এর কয়েকদিন পরে মারা গেল ভাইয়া। মৃত্যুর আগে মাকে একবার দেখতেও চায়নি সে। ভাইয়ার জন্যে দিদা ও আমি অনেক চোখের জল ফেললাম। আমার শরীরের অবস্থা ভাল ছিল না, তবু দিদার পীড়াপীড়িতে তাকে নিয়ে যোগ দিলাম অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায়।

যত দিন যেতে লাগল ততই ধীরে ধীরে শোক ফিকে হতে লাগল। এখন আর

আগের মত বেশি ফাঁকা লাগে না বাড়িটা। তবে প্রায় সন্ধ্যাতেই এখানে এসে বসলে ভাইয়ার কথা মনে পড়ে। বাড়ি ফিরেই সে উপরে উঠে আসত, আমার সঙ্গে কত কথা বলত, হৈ-চৈ করত।

তারপর একদিন সন্ধ্যায় সিঁড়িতে তার পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম; হালকা পায়ে দ্রুত সে যেন দরজার দিকে এগিয়ে আসছিল। দাঁড়িয়ে থেকে তার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কেউ কোথাও নেই। মা ও দিদাকে কথাটা বলতে ছুটে নীচে নেমে গেলাম। তারা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

দিদা বলল, 'লক্ষণ ভাল মনে হচ্ছে না।'

মা জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের অনুষ্ঠানে কি কিছু ত্রুটি হয়েছে?'

প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই পায়ের শব্দ শোনা যেতে লাগল। টান টান ভয় আর প্রত্যাশা নিয়ে প্রতি সন্ধ্যাতেই আমি অপেক্ষা করে থাকতাম। বাড়ির বাইরে যেতে বা এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যেতে পারি না। ঘরেই থাকতাম, আবার ভয়-ভয়ও করত; আমি জানতাম, একদিন না একদিন ঠিক সে ঘরে আসবেই। আমি চাইতাম যে, সে আসুক; আবার ভাবতেও বেশ গা ছমছম করত!

ক্রমে আমার খাওয়া-দাওয়া বন্ধ হয়ে গেল, শুকিয়ে যেতে লাগলাম, ফ্যাকাসে ও চঞ্চল হয়ে উঠলাম। অবশেষে একদিন স্বপ্ন দেখলাম। ভাইয়া যেন আমার বিছানার শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে বলছে, 'মিংলী আমার কাছেই আছে। আমরা এখনও দু'জনে দু'জনকে ভালবাসি। বিয়ে করতে চাই। মাকে এ বিয়ের ব্যবস্থা অবশ্যই করে দিতে হবে। মাকে বুঝিয়ে বল, বোন।'

সেদিন ঘুম ভাঙতেই সোজা চলে গেলাম মায়ের ঘরে। কাঁপতে কাঁপতে তাকে সব কথা বললাম। মায়ের মুখটা শক্ত হয়ে গেল। বলল, 'বটে! সে-ই জিতল—সব কিছু জিতে নিল!'

মা উঠে দাঁড়াল। সেদিন সারারাত সে ঘুমাল না, ঘরময় হেঁটে বেড়াল!

পরদিন ডাকা হলো চাচাকে। তিনজনে অনেক পরামর্শ হলো। চাচা বলল, 'ভাবী, তার আত্মার যদি শান্তি চাও তো এটা করতেই হবে। এখন আমাদের সব অহঙ্কার আর ঘৃণা ভুলে যেতে হবে।'

পরদিন প্রাতরাশের পর গাড়ি করে আমাকে সঙ্গে নিয়ে মা শহরের একটা নোংরা বস্তি অঞ্চলে গেল। আমি মায়ের পেছন পেছন দোকানের উপরকার একটা অন্ধকার ছোট ঘরে ঢুকলাম। সেখানে একজন পুরুষ ও একজন নারী আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। পুরুষটি শীর্ণকায়, মাথায় পাকা চুল; নারীটি স্থূলকায়, মুখ বলিরেখায় ভর্তি। তাদের পরনে জীর্ণ পোশাক। ঘরে আসবাব কিছু নেই বললেই চলে, প্রার্থনা-বেদীর উপর মিংলীর একখানা ফটো ঝোলানো রয়েছে। মা তাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলল। মাকে খুব ক্রুদ্ধ মনে হলো। সব কথা বুঝতে পারলাম না। তবে এটা বুঝলাম যে এরাই ভাইয়ার প্রেমিকার বাবা আর মা। তারা চেষ্টা করছে তাদের মৃত কন্যার সঙ্গে আমার মৃত ভাইয়ের বিয়ের ব্যবস্থা পাকা করতে।

পুরুষটি বলল, 'ওরা যখন বেঁচে ছিল তখন তো বিয়েটা আপনি চাননি। তা হলে আজ ওদের বিয়ে দিতে চাইছেন কেন?'

মা বলল, 'কারণ, আমার ছেলের জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেছে। তোমার মেয়ে তাকে কবরেও শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না। তোমাদের মেয়েই আমার ছেলেটাকে মেরেছে।'

'না,' পুরুষটি বলল। 'তাকে মেরেছেন আপনি। ঠিক যেমন আমার মেয়েকেও মেরেছেন।'

এসব তর্কাতর্কি শুনে আমি কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। ভেবেছিলাম মা খুব রেগে যাবে। চেঁচামেচি করবে, বাড়ি থেকে রেগেমেগে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু দাঁতে দাঁত চেপে মাথা নিচু করে মা চুপটি করে বসে রইল। তারপর ঘৃণাভরা চোখ তুলে বুড়োটার দিকে তাকাল।

'তারা এ বিয়ে চায়। আমিও এতে রাজি আছি।'

'নিশ্চয়ই, যথারীতি অনুষ্ঠান করা হবে। সে-ই তো হবে প্রথম স্ত্রী?'

মা মাথা ঝাঁকাল।

'কন্যা-পণ দেবেন তো?'

মা আবার মাথা দোলাল। বলল, 'একজন পুরোহিত ও ঘটক পাঠিয়ে দেব। তাদেরকে তোমার মেয়ের কবরে নিয়ে যেয়ো।'

বাড়ি ফেরার পথে মা আমার সঙ্গে একটা কথাও বলল না।

ক'দিন পরেই মিংলীর সঙ্গে ভাইয়ার বিয়ে হয়ে গেল। পুরোহিত এবং ঘটক ফুলে ফুলে সাজানো বড় গাড়িতে করে মিংলীর আত্মাকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে এল। গাড়ির বনেটের সামনে একটা কনে পুতুল বাঁধা ছিল। পুরো ব্যাপারটা মায়ের একেবারেই পছন্দ ছিল না। তবু যথাবিহিত অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার জন্যে মা চাচা সহ আরও অনেক বন্ধু-বান্ধবদের দাওয়াত দিল।

আমি হল ঘরে বসে আছি, তখন পুরোহিত আর ঘটক বাড়িতে এল। মা, দিদা ও চাচা বসল এক দিকে, আর অতিথিরা অন্য দিকে। দুই আত্মার মধ্যে পরিণয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলো ঘরের মাঝখানে পারিবারিক প্রার্থনা-বেদীর সামনে। পরে যখন অদৃশ্য দম্পতি পূর্বপুরুষের স্মৃতি-ফলক ও পারিবারিক দেবতাদের সামনে শ্রদ্ধা নিবেদন করল, তখন আমরা নীরবে তা দেখলাম। আত্মীয়রা মুখ তুলে দেখল, অদৃশ্য কনেটি মা ও দিদাকে চায়ের কাপ এগিয়ে দিল। তারপর কাগজ ও ভৌতিক টাকায় তৈরি দামী দামী সব উপহার পোড়ানো হলো যাতে অন্য জগতে গিয়ে দম্পতিরা সেটা ব্যবহার করতে পারে। অতিথিদের চমৎকার বিয়ের ভোজ খাওয়ানো হলো।

আমার মা সারাক্ষণ পাথরের মত কঠিন মুখে বসে ছিল। একটা কথাও বলল না।

মদ পরিবেশনের পর অতিথিরা ক্রমে ভুলেই গেল যে তারা অশরীরী আত্মার

বিয়েতে এসেছে। চাচা আগেই চুপচাপ চলে গিয়েছিল।

তারপর থেকে আমি আর কোনও স্বপ্ন দেখিনি। সিঁড়িতে কোনও পায়ের শব্দও শুনিনি। স্কুলে যেতে লাগলাম। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আগের মতই মিশতে লাগলাম। একবার মা আমাকে নিয়ে হং কং-এ আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে দেখা করতে নিয়ে গেল। মাঝে মাঝে মা কোনও পাহাড়েও ছুটি কাটাতে যেত। একদিন দিদা মারা গেল। শেষের দিকে সে প্রার্থনা-বেদীর পাশে নিজের চেয়ারে চুপচাপ বসে থাকত। একদিন মাকে বলল, 'খুব শীঘ্রিই আমি নাতি আর নাতবৌকে দেখতে পাব। তাদের কোনও খবর পাঠাবে কি?'

মা কখনও ভাইয়ার কথা বলত না। ঠোঁট শক্ত করে বলল, 'এ বিয়ে করে আমাদের অমর্যাদা করা তার উচিত হয়নি। তাকে বলার আমার কিছুই নেই।'

দিদার শেষ কাজটিও খুব ঘটা করে হয়েছিল। সিঙ্গাপুর ও মালয়ের প্রবীণ চীনাদের মধ্যে তার অনেক বন্ধু ছিল। অনেকদিন পর্যন্ত বাড়িটা লোকজনে ভর্তি ছিল।

মা কয়েকদিন পর আমাকে বলল, 'আমার মনে হয়, আমাদের একবার ইউরোপ ভ্রমণে যাওয়া উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার আগে সে দেশটা তোমার দেখা উচিত।'

অতএব সতেরো বছর বয়সেই আমি মায়ের সঙ্গে ইতালি, ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া, এমনকী স্পেন ঘুরে এলাম। লণ্ডনে আমার এক চাচা ছিল। কেন্ট-এর একটা ছোট গ্রামে ছিল আর এক চাচা-চাচি। হ্রদ অঞ্চল, এডিনবরা ও স্ট্র্যাটফোর্ডেও গেলাম। দিনগুলি আমাদের বেশ ভালই কাটছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি সাহিত্য নিয়ে পড়লাম। কারণ, মায়ের মত আমারও সাহিত্যের প্রতি বেশি আগ্রহ ছিল।

প্রথম বার্ষিক পরীক্ষার আর কয়েকদিন মাত্র বাকি। টেনশনের কারণেই বেশি পড়াশোনা করছিলাম। স্নায়ুবিকারের ফলে আমার একটু জ্বর-জ্বর ভাবও হয়েছিল। মা খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। আমার মনটা সব সময়েই ভার হয়ে থাকত। কেন যে এমন হলো তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

একদিন সন্ধেবেলায় ঠিক এইখানে মন খারাপ করে বসে ছিলাম। আর হঠাৎ সেই শব্দটা শুনতে পেলাম। সিঁড়িতে সেই পায়ের শব্দ; এবার আরও ভারী। আরও ধীর গতি। বুঝতে পারলাম, ভাইয়া এসেছে। জানতাম, এ-ঘরে সে ঢুকবে না। দরজার কাছে এসে পায়ের শব্দটা থেমে গেল।

এ ঘটনা আমি মাকে কিছুই বললাম না। অকারণে তার দুশ্চিন্তা বাড়াতে চাইনি। একবার মনে হলো, ভুল শুনেছি আমি। যা শুনেছি তা আমার অসুস্থ মনের কল্পনা হতে পারে। কিন্তু প্রতি সন্ধ্যাতেই সেই পায়ের শব্দ শুনতে লাগলাম। বুঝতে পারলাম, ভাইয়া ছাড়া এ অন্য কেউ নয়।

একদিন রাতে সে স্বপ্নে দেখা দিল। আমার বিছানা ঘেঁষে এসে দাঁড়াল। বলল, 'অন্য জগতে আমি বড় কষ্টে আছি। বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। আমরা

আলাদা হয়ে গেছি। তাকে আমার বিয়ে করা উচিত হয়নি। তার আর আমার চিন্তাধারা সম্পূর্ণ বিপরীত। আমি বাড়ি ফিরে যেতে চাই। মাকে একটু বোলো।'

আমি এবার সব কথা মাকে খুলে বললাম। মায়ের চোখে খুশির ঝিলিক ফুটে উঠল। মৃদু হেসে মা বলল, 'আমি জানতাম সে ভুল করেছে। একটা বার-গার্লের জন্যে শুধু শুধু এতগুলো টাকা খরচ হয়ে গেল। আমার কথাই শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো।' তারপরে একটু থেমে মা আবার বলল, 'ওকে তো এ-বাড়ি থেকে ফিরিয়ে দিতে পারি না। সে তার পুরনো ঘরটাতেই থাকুক।'

ছুতোর মিস্ত্রী দিয়ে ওদিককার দরজাটা তক্তা মেরে বন্ধ করে দেয়া হলো। ফলে যে সিঁড়িটা দিয়ে এখানে আসা এবং ভাইয়ার ঘরে যাওয়া যেত সেটা দিয়ে এখন শুধু তার ঘরেই যাওয়া যায়। মা ও আমার আসা-যাওয়ার জন্যে অন্য দিকে আর একটা সিঁড়ি বানানো হলো। বাড়িতে ছেলের পুনরাগমন উপলক্ষে আত্মীয়-বন্ধুদের জন্যে একটা মজলিসের ব্যবস্থা করা হলো। তার ঘরটা পরিষ্কার করাও হলো। এইভাবে আবার আমরা একসঙ্গে বাস করছি। প্রতি রাতে আমি শুনি, ভাইয়া তার ঘরে ফিরে আসছে।

কোয়ান আন এবার চুপ হয়ে গেল। ঘন অন্ধকার পৃথিবীটাকে গ্রাস করছে ধীরে ধীরে। হঠাৎ ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক ছাপিয়ে একটা টিকটিকি ডেকে উঠল: টিক্‌টিক্-টিক!

কোয়ান আন উঠে গিয়ে আলোটা জ্বালিয়ে দিল। হলুদ আলোয় ঘরটা ভরে গেল; আর সেই সঙ্গে মিলিয়ে গেল তার গল্পের রহস্যময়তা। অন্য সিঁড়িটার দিকে তাকিয়ে তখনও সে তার ভাইয়ার পদশব্দ শুনতে উৎকর্ণ হয়ে রইল।

মূল: সিলভিয়া শেরি

একই সমতলে

খবরটা যখন শুনল ওরা সবাই, রেস্টুরেন্ট, ক্যাফে এবং হোটেল থেকে দলে দলে বেরিয়ে এসে তাকাল আকাশের দিকে। কালো কালো হাত দিয়ে ঢাকল কপাল। বিস্ময়ে সবার মুখ হাঁ হয়ে গেছে। উত্তপ্ত দুপুর। সহস্র মাইলের ভেতরে ছোট ছোট অজস্র যেসব শহর আছে, সেখানকার কালো মানুষেরা সকলে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আকাশের দিকে।

রান্নাঘরে ফুটতে থাকা সুপের পাত্রটা ঢাকনি দিয়ে ঢেকে দিল হ্যাটি জনসন, সরু আঙুলগুলো একটা ত্যানায় মুছে নিল, তারপর লঘু পদক্ষেপে চলে এল বাড়ির পেছনের উঠোনে।

'এসো, মা! অ্যাই, মা, চলে এসো–নইলে মিস করবে!'

'অ্যাই, মা!'

ধুলোভরা উঠোনে লাফালাফি আর চিৎকার করছে তিনটি নিগ্রো বালক। একটু পরপর তাকাচ্ছে তাদের বাড়ির দিকে।

'আসছি,' বলল হ্যাটি, খুলল স্ক্রিন ডোর। 'এই গুজব কোত্থেকে শুনলি?'

'জোনসদের কাছ থেকে, মা। ওরা বলল একটি রকেট আসছে, কুড়ি বছরের মধ্যে এই প্রথম, ভেতরে নাকি একটা সাদা মানুষ!'

'সাদা মানুষ কী জিনিস? আমি কোনওদিন দেখিনি।'

'দেখতে পাবি,' বলল হ্যাটি। 'নিশ্চয় দেখবি।'

'আমাদেরকে সাদা মানুষের গল্প বলো না, মা! আগে যেমন বলতে।'

ভুরু কোঁচকাল হ্যাটি। 'সে অনেক দিন আগের কথা। তখন আমি খুব ছোট। ১৯৬৫ সালের দিকে।' (এ গল্প লেখা হয়েছিল ১৯৫০ সালে–অনুবাদক)

'একটা সাদা মানুষের কথা বলো, মা!'

হ্যাটি উঠোনে এসে দাঁড়াল। মঙ্গলের সাদা, পাতলা মেঘের ঝকঝকে নীল আকাশে তাকাল। দূরে মঙ্গলের পাহাড়গুলো প্রচণ্ড উত্তাপে যেন ঝলসাচ্ছে। হ্যাটি বলল, 'ওদের হাতের রঙ ছিল সাদা।'

'সাদা হাত!' ছেলেগুলো ঠাট্টার সুরে কথাটা বলে একে অন্যের হাতে চাপড় মারল।

'ওদের বাহু ছিল সাদা।'

'সাদা বাহু!' সুর তুলল ছেলেরা।

'আর ফর্সা মুখ।'

'ফর্সা মুখ! সত্যি?'

'এরকম সাদা, মা?' সবচেয়ে ছোট ছেলেটা ধুলো মাখল মুখে। সঙ্গে সঙ্গে

কাশতে শুরু করল।

'ওর চেয়েও সাদা,' গম্ভীর মুখে বলল হ্যাটি, আবার মুখ তুলে চাইল আকাশে। সে যেন আকাশে বজ্র-বিদ্যুৎ দেখার আশা করছিল। না দেখতে পেয়ে উদ্বেগ বোধ করল।

'ছেলেরা, তোমরা সবাই ঘরে যাও,' বলল সে।

'ওহ্, মা!' অবিশ্বাস নিয়ে ছেলেরা তাকাল তাদের মায়ের দিকে। 'আমরা সাদা মানুষ দেখব বলে দাঁড়িয়ে আছি। কিন্তু সাদা মানুষ আসবে না, তাই না?'

'জানি না। না-ও আসতে পারে।'

'আমরা রকেট শিপটা একটু দেখব। তারপর পোর্টে গিয়ে সাদা মানুষটাকে দেখব। সে দেখতে কেমন, মা?'

'আমি জানি না। সত্যি জানি না,' ডানে-বামে মাথা নাড়ল হ্যাটি।

'ওদের গল্প আরেকটু বলো, শুনি!'

'সাদা মানুষরা থাকে পৃথিবীতে, আমরা সবাই ওখান থেকে এসেছি কুড়ি বছর আগে। মঙ্গলে এসে আমরা শহর গড়ে তুলেছি, তারপর এখানে বসবাস শুরু করেছি। আমরা এখন আর পৃথিবীবাসী নই, মঙ্গলবাসী। গত কুড়ি বছরে কোনও সাদা মানুষ আমাদের এখানে আসেনি। ব্যস, এই-ই হলো গল্প।'

'ওরা কেন আসেনি, মা?'

'আমরা এখানে চলে আসার পরে পৃথিবীতে পারমাণবিক যুদ্ধ হয়। ওরা একে অন্যকে নিষ্ঠুরের মত উড়িয়ে দেয়। ওরা আমাদের কথা ভুলে গেছে। বছরের পর বছর তাদের যুদ্ধ চলেছে। যুদ্ধ শেষে তাদের কাছে কোনও রকেট ছিল না। সম্প্রতি তারা রকেট তৈরি করতে পেরেছে। তাই তারা এখন আসছে, কুড়ি বছর পরে।' সন্তানদের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে হাঁটা ধরল হ্যাটি। 'তোমরা এখানে দাঁড়াও। আমি এলিজাবেথ ব্রাউনের বাড়ি যাচ্ছি। এখান থেকে একদম নড়াচড়া করবে না। মনে থাকবে?'

'আমাদের যেতে ইচ্ছে করছে, তবে তুমি মানা করেছ বলে কোথাও যাব না।'

'ঠিক আছে।' বলে হ্যাটি রাস্তা ধরে দ্রুত পা বাড়াল।

ব্রাউনদের বাড়ি পৌঁছে দেখল ওরা সবাই ওদের গাড়িতে উঠে বসেছে। 'অ্যাই, হ্যাটি! চলে এসো!'

'যাচ্ছ কোথায় তোমরা?' হাঁপাতে হাঁপাতে জানতে চাইল হ্যাটি।

'সাদা মানুষটাকে দেখতে!'

'হ্যাঁ,' গম্ভীর গলায় বললেন মি. ব্রাউন। গাড়ি ভর্তি বাচ্চাদের দিকে ইঙ্গিত করে যোগ করলেন, 'এরা কোনওদিন সাদা মানুষ দেখেনি। আর শ্বেতাঙ্গ দেখতে কেমন, আমি প্রায় ভুলেই গেছি।'

'সাদা মানুষটাকে নিয়ে আপনারা কী করবেন?' জিজ্ঞেস করল হ্যাটি।

'করব?' সমস্বরে বলল সবাই। 'কেন—আমরা শুধু ওকে দেখব, ব্যস।'

'ঠিক বলছেন?'

'তা হলে আর কী করব?'

'জানি না,' বলল হ্যাটি। 'আমার মনে হচ্ছিল সাদা মানুষটাকে নিয়ে ঝামেলা হবে।'

'কী ঝামেলা?'

'আপনারা তো জানেনই,' আবছা গলায় বলল হ্যাটি, অপ্রস্তুত বোধ করছে। 'আপনারা ওকে ফাঁসিতে ঝোলাবেন না?'

'ফাঁসিতে ঝোলাব?' সবাই হেসে উঠল হো হো করে। মি. ব্রাউন নিজের হাঁটুতে চাপড় মারলেন। 'আরে, পাগল নাকি? আমরা শুধু ওর সঙ্গে হাত মেলাব। তোমরা কী বলো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। নিশ্চয়।'

বিপরীত দিক থেকে একটা গাড়ি আসতে দেখে চেঁচাল হ্যাটি। 'উইলি!'

'তুমি এখানে কী করছ? বাচ্চারা কোথায়?' খেঁকিয়ে উঠল তার স্বামী। অন্যদের দিকে কটমট করে চাইল। 'তোমরা গাধার পালের মত ওই লোকটাকে দেখতে যাচ্ছ?'

'ঠিক ধরেছ,' হাসিমুখে বললেন মি. ব্রাউন।

'তা হলে সঙ্গে বন্দুক নিয়ে নাও,' বলল উইলি। 'আমি আমার বন্দুক আনতে বাড়ি যাচ্ছি।'

'উইলি!'

'তুমি গাড়িতে এসো, হ্যাটি,' গাড়ির দরজা মেলে ধরল উইলি, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল স্ত্রীর দিকে। কোনও কথা না বলে স্বামীর পাশে এসে বসল হ্যাটি। অপর গাড়ির আরোহীদের দিকে আর দৃকপাত না করে ধুলোয় আচ্ছন্ন রাস্তা ধরে নিজের বাহন ছোটাল উইলি।

'উইলি, এত জোরে চালিয়ো না!'

'জোরে চালাব না, না? সে দেখা যাবে,' রাস্তায় চোখ রেখে বলল উইলি। 'ওরা কেন আমাদের এখানে আসছে? ওরা আমাদেরকে শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না কেন? পুরানো পৃথিবীতে ওরা একে অন্যের গলা কাটাকাটি করে মরলেই পারত, এখানে আমাদেরকে নিজেদের মত থাকতে দিত।'

'উইলি, ক্রিশ্চিয়ানরা এমনভাবে কথা বলে না।'

'নিজেকে আমার আর ক্রিশ্চিয়ান বলে মনে হচ্ছে না,' ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল উইলি, শক্ত মুঠোয় চেপে ধরল হুইল। 'প্রচণ্ড রাগ লাগছে আমার। ওরা আমাদের ওপর কী অত্যাচারটাই না করেছে—আমার বাবা-মা, তোমার বাবা-মা সবাইকে ওরা হত্যা করেছে। এত তাড়াতাড়ি সব ভুলে গেলে? মনে নেই, নকউড হিলে ওরা কীভাবে আমার বাবাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করেছিল আর মাকে মেরে ফেলেছিল গুলি করে? মনে আছে? নাকি অন্যদের মত তোমারও স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়ে যাচ্ছে?'

'তোমার সব মনে আছে,' বলল হ্যাটি।

'তোমার নিশ্চয় মনে আছে ডা. ফিলিপস, মি. বার্টন এবং তাদের বড় বড় বাড়ির কথা, আমার মা যে বস্তা ধুতেন, বুড়ো বয়সেও কাজ করতেন আমার বাবা, নিশ্চয় ভুলে যাওনি ডা. ফিলিপস এবং মি. বার্টন বাবাকে ফাঁসিতে লটকানোর আগে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন,' বলল উইলি, 'এক মাঘে শীত যায় না। বল এখন আমাদের কোর্টে। আমরা দেখব কে আইন ফাঁকি দিয়েছে, কে ফাঁসিতে ঝুলবে, কাকে ট্রামের পেছন দিকে বসতে হবে, কাকে সিনেমা-থিয়েটারে সবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বসতে হবে–এসবই আমরা ঠিক করব। জাস্ট ওয়েট অ্যাণ্ড সি।'

'উইলি, তোমার কথায় কেমন ঝামেলার গন্ধ টের পাচ্ছি।'

'সবাই কথা বলছে। সবার ভাবনা-চিন্তা আজকের দিনটিকে ঘিরে, সবাই ভাবছে এরকম দিন আর কখনও আসবে না।'

'সাদা মানুষগুলোকে কি তোমরা এখানে থাকতে দেবে?'

'নিশ্চয় দেব,' হাসল সে, তবে বড়ই শীতল এবং নিষ্ঠুর সে হাসি। উইলির চোখ উন্মাদের মত চকচক করছে। 'তারা এখানে আসতে পারে, আমাদের সঙ্গে বসবাস করতে পারে, তাতে কিছু অসুবিধা নাই। তবে তাদেরকে থাকতে হবে শহরের ক্ষুদ্র অংশে, বস্তি এলাকায়। তারা আমাদের জুতো পালিশ করে দেবে, আমাদের ঘর-দোর পরিষ্কার করবে, প্রেক্ষাগৃহে ব্যালকনির শেষ সারিতে গিয়ে বসবে। ওদের এসবই করতে হবে। আর প্রতি হপ্তায় ওদের একজন-দু'জনকে আমরা ফাঁসিতে ঝোলাব–ব্যস।'

'তুমি মানুষের মত কথা বলছ না। তোমার কথার ধরন আমার পছন্দ হচ্ছে না।'

'আমার কথার ধরনে তোমাকে অভ্যস্ত হতে হবে,' বলল সে। বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থামাল উইলি, লাফিয়ে নামল। 'আমার বন্দুকগুলো আর কিছু রশি নিয়ে এসো। কাজটা এখুনি সেরে ফেলতে চাই।'

'ওহ্, উইলি,' বিলাপ করল হ্যাটি, বসে থাকল গাড়িতে। উইলি লম্বা পা ফেলে সিঁড়ি বেয়ে উঠল, দড়াম শব্দে বন্ধ করল সদর দরজা।

হ্যাটিও গেল। যেতে চায়নি সে, কিন্তু তার স্বামীর উন্মাদের মত আচরণ তাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে। চিলেকোঠায় চলে এল উইলি। মুখ দিয়ে মেশিনগানের মত গুলি ছুটছে, শেষে অস্ত্র চারটে খুঁজে পেতে একটু শান্ত হলো। অন্ধকার চিলেকোঠার মধ্যে বন্দুকগুলোর নিষ্ঠুর ধাতব গা যেন চকচক করছিল। উইলিকে দেখতে পাচ্ছিল না হ্যাটি। এত কালো উইলি যে আঁধারের সঙ্গে মিশে গেছে। শুধু তার গালিগালাজ শোনা যাচ্ছিল। অবশেষে লম্বা লম্বা পা ফেলে, প্রচুর ধুলো উড়িয়ে চিলেকোঠার সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল উইলি। বন্দুকগুলোর গান চেম্বার খুলে পেতলের অনেকগুলো গুলি একে একে ভেতরে ঢোকাল সে। তার থমথমে চেহারায় ক্রোধ এবং ঘৃণা ফুটে আছে। 'আমাদেরকে একা থাকতে দাও,' বিড়বিড়

করল সে, হঠাৎ দু'হাত দুদিকে ছড়িয়ে দিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'ওরা আমাদেরকে একা থাকতে দিল না কেন?'

'উইলি, উইলি।'

'তুমিও–তুমিও!' স্ত্রীর দিকেও ক্রূর চোখে তাকাল উইলি।

জানালার বাইরে উইলির ছেলেরা হড়বড় করে কথা বলছিল।

'মা বলেছে দুধের মত সাদা। দুধের মত সাদা।'

'পাথরের মত সাদা। যে চক দিয়ে তুমি লেখ, সেরকম।'

বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল উইলি। 'বাচ্চারা, ভেতরে যাও। আমরা তোমাদেরকে তালা মেরে যাব। তোমরা কোনও সাদা মানুষ দেখতে পাবে না, তাদেরকে নিয়ে কথা বলবে না, তোমরা কিছুই করবে না। এখন চলো।'

'কিন্তু, বাবা–'

ওদেরকে ঠেলাধাক্কা দিয়ে ঘরে ঢোকাল উইলি, তারপর এক বালতি রং এবং স্টেনসিল (লেখা বা আঁকার জন্য ধাতব কার্ডবোর্ড) নিল। গ্যারেজ থেকে জোগাড় করল লম্বা, মোটা আঁশ বিশিষ্ট রশি। রশিতে গিট্‌ঠু দিয়ে ফাঁসির গেরো তৈরি করল খুব যত্নে। কাজ করতে করতে একবার তাকাল আকাশে।

ওরা গাড়িতে উঠে বসল, পেছনে ধুলোর মেঘ ছড়িয়ে ছুটে চলল রাস্তা ধরে। 'আস্তে চালাও, উইলি।'

'এখন আস্তে চালানোর সময় নাই,' বলল উইলি। 'এখন জলদি কাজ করার সময়, তাই আমি দ্রুত ছুটছি।'

রাস্তার ধারের লোকজনকে দেখা গেল, অনেকে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে, কেউ গাড়িতে চড়ছে, কেউ-বা ছুটছে গাড়ি নিয়ে, কয়েকটি গাড়ির পেছন দিকে টেলিস্কোপ সাইটের মত মাথা উঁচিয়ে আছে বন্দুকের নল।

বন্দুকগুলোর দিকে তাকাল হ্যাটি। 'তুমি সবার সঙ্গে কথা বলেছ,' অনুযোগের সুরে বলল সে স্বামীকে।

'আমি তা-ই করেছি।' মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল উইলি। রাস্তায় চোখ বুলিয়ে ভয়ঙ্কর গলায় বলল, 'প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে আমি বলে এসেছি তাদেরকে কী করতে হবে। বলেছি তাদের অস্ত্র, রঙের বালতি এবং রশি নিয়ে আসতে। বলেছি রেডি থাকতে। আমরা এখন সবাই রেডি–অভ্যর্থনা কমিটি। ওদের হাতে তুলে দেব নগরীর চাবি। ইয়েস, স্যর!'

হ্যাটি কালো পাতলা হাতজোড়া পরস্পরের সঙ্গে চেপে ধরল, ভেতরে বেড়ে ওঠা আতঙ্ক জোর করে সরিয়ে দিতে চাইছে। অন্য গাড়িগুলোতে রঙের বালতি ঝাঁকি খাওয়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছে সে। কানে ভেসে আসছে মানুষজনের চিৎকার-চেঁচামেচি। 'অ্যাই, উইলি, দ্যাখো!' উইলির গাড়ির পাশ দিয়ে দ্রুত ছুটে যাওয়ার সময় তারা হাত উঁচিয়ে দেখাল রশি এবং বন্দুক।

'এসে পড়েছি,' বলে ধুলো উড়িয়ে গাড়ির ব্রেক কষল উইলি। লাথি মেরে খুলল দরজা। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নেমে এল গাড়ি থেকে। পা বাড়াল

এয়ারপোর্ট অভিমুখে।

'তুমি ভেবেচিন্তে কাজটা করছ তো, উইলি?'

'কুড়ি বছর আগেই আমার ভাবনা-চিন্তা সারা। ষোলো বছর বয়সে আমি পৃথিবী ত্যাগ করি এবং ওখান থেকে চলে আসতে পেরেছিলাম বলে খুশিই হয়েছিলাম,' বলল সে। 'ওখানে তোমার-আমার বা আমাদের মত কারও জন্যই কিছু ছিল না। পৃথিবী ত্যাগের জন্য আমি কোনওদিন আফসোস করিনি। এখানে আমরা শান্তিতে ছিলাম, জীবনে প্রথম স্বস্তিতে নিঃশ্বাস নিতে পেরেছি। এখন, এসো।'

ওর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসা জনমানুষের ভিড় ঠেলে এগোল সে।

'উইলি, উইলি, আমাদের করণীয় কী?' জানতে চাইল তারা।

'এই বন্দুকটা তুমি নাও,' বলল উইলি। 'তুমি এটা ধরো। তুমি ওটা নাও।' ওদেরকে জোরে জোরে ধাক্কা মেরে এগিয়ে চলেছে সে। 'তুমি এই পিস্তলটা রাখো। তুমি নাও শটগানটা।'

লোকগুলো এমন গাদাগাদি করে দাঁড়িয়েছে, দেখে মনে হচ্ছে একটি মাত্র কৃষ্ণাঙ্গ দেহ সহস্র হাত বাড়িয়ে দিয়েছে অস্ত্র নিতে। 'উইলি, উইলি।'

উইলির স্ত্রী তার পাশে শিরদাঁড়া টানটান করে দাঁড়িয়ে আছে নিঃশব্দে, খাঁজকাটা ওষ্ঠজোড়া চেপে রয়েছে পরস্পরের সঙ্গে, বড় বড় চোখ দুটো ভেজা এবং বিষণ্ন। 'রঙের বালতিটা নিয়ে এসো।' হ্যাটিকে হুকুম দিল উইলি। হলুদ রঙের একটি বালতি নিয়ে এয়ারফিল্ডে চলে এল হ্যাটি। ওখানে ইতিমধ্যে একটি ট্রলি কার এসে দাঁড়িয়েছে। গাড়িটির সামনে সদ্য তাজা রঙে লেখা হয়েছে: TO THE WHITE MAN'S LANDING। গাড়ি থেকে নেমে আসা মানুষজন ছুটল এয়ারফিল্ডের মাঠ পেরিয়ে। আকাশের দিকে মুখ তুলে ছুটেছিল বলে অনেকেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল। মহিলারা এসেছে হাতে পিকনিক বক্স নিয়ে, পুরুষদের মাথায় খড়ের টুপি, গায়ে শর্ট স্লিভ। ট্রামটি একাকী দাঁড়িয়ে গুঞ্জন তুলছে। গাড়িতে উঠে বসল উইলি, রঙের বালতি মেঝেয় নামাল, খুলল ঢাকনি, বালতি ধরে মৃদু একটা ঝাঁকি দিল, তারপর ওতে ব্রাশ চুবিয়ে একটা স্টেনসিলে রঙ মাখাল। শেষে হাঁটু গেড়ে বসল একটি আসনে।

'এই যে!' ট্রামের কনডাক্টর এসে দাঁড়াল উইলির পেছনে। পকেটে রাখা কয়েন বাজল ঝনঝন শব্দে। 'করছ কী তুমি? নামো বলছি!'

'কী করছি, দেখতেই পাচ্ছ। নিজের চরকায় তেল দাও গে।'

হলুদ রঙে কার্ডবোর্ড রাঙাতে লাগল উইলি। সে খুশি মনে বড় বড় অক্ষরে লিখল F এবং R। তার কাজ শেষ হলে উঁকি মেরে দেখল কনডাক্টর, কী লিখেছে উইলি। জ্বলজ্বল করছে হলদে শব্দগুলো। FOR WHITES: REAR SECTION। লেখাটি আবার পড়ল কনডাক্টর। FOR WHITES। চোখ পিটপিট করল সে। REAR SECTION। উইলির দিকে তাকিয়ে হাসল সে।

'কী, পছন্দ হয়?' ট্রাম থেকে নামতে নামতে জিজ্ঞেস করল উইলি।

জবাব দিল কনডাক্টর। 'খুব পছন্দ হয়, স্যর।'

বুকে হাত বেঁধে বাইরে দাঁড়িয়ে গাড়ির লেখাটা লক্ষ করছিল হ্যাটি।

ক্রমবর্ধমান জনতার ভিড়ে ফিরে এল উইলি। একের পর এক গাড়ি আসছে। তা থেকে নামছে মানুষজন।

উইলি একটি প্যাকিং বাক্সে উঠে দাঁড়াল। 'প্রতিটি ট্রামে রঙ করার জন্য আমাদের একটি ডেলিগেশন টিম দরকার। কে কে ভলাণ্টিয়ার হতে চাও?'

অনেকগুলো হাত উঠে গেল।

'তা হলে সবাই কাজে নেমে যাও।'

ওরা কাজে নেমে পড়ল।

'আরেকটা দল দরকার আমার। এরা প্রেক্ষাগৃহের আসন রঙ করবে। প্রতিটি প্রেক্ষাগৃহের শেষ দুটো সারি বরাদ্দ থাকবে শ্বেতাঙ্গদের জন্য। আর তাদের জন্য নির্ধারিত স্থান রশি দিয়ে ঘিরে সীমানা চিহ্নিত করে রাখবে।'

আরও হাত উঠল।

'নেমে পড়ো কাজে।'

তারা কাজে নামল।

উইলি চারপাশে মুখ ঘুরিয়ে দেখল। তার সারা গা ঘেমে গেছে, পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছে, তবে নিজের শক্তি নিয়ে গর্বিত, একটা হাত রেখেছে নীচে দাঁড়ানো স্ত্রীর কাঁধে। অবসাদগ্রস্ত, দুঃখী দুঃখী চোখে তাকিয়ে রয়েছে হ্যাটি। 'আরেকটা কথা,' ঘোষণার সুরে বলল উইলি। 'আজ বিকেলে একটা আইন পাশ করব আমরা। কোনও ইণ্টারম্যারেজ বা আন্তর্বিবাহ চলবে না।'

'তা তো বটেই,' সমস্বরে বলে উঠল অনেকে।

'জুতো পালিশ করা ছেলেগুলো আজ থেকে জুতো পালিশ করা ছেড়ে দেবে।'

'এক্ষুণি ছেড়ে দিলাম,' চেঁচিয়ে উঠল কয়েকটি মুচি বালক। তারা জুতো পালিশ করার কাপড় ছুঁড়ে ফেলল।

'পারিশ্রমিক দেয়ার একটা আইন তো থাকা উচিত, নাকি?'

'নিশ্চয়।'

'জুতো পালিশ করার জন্য শ্বেতাঙ্গদের আমরা দশ সেণ্ট ধার্য করলাম।'

'চমৎকার!'

শহরের মেয়র ছুটে এলেন দ্রুত পদক্ষেপে। 'উইলি জনসন, এখন ওই বাক্স থেকে নামো!'

'মেয়র, আমি এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কোনও অপরাধ করিনি।'

'তুমি জনরোষ তৈরি করছ।'

'তা হয়তো করছি।'

'অথচ তুমি কৈশোরে এ কাজটাকেই বেশি ঘৃণা করতে। যে সাদা মানুষদের বিরুদ্ধে এত চেঁচামেচি করছ, তাদের থেকে তো তুমি ভাল নও, উইলি!'

'এক মাঘে শীত যায় না, মেয়র। আর সেই মাঘ মাস এখন আমাদের,' বলল

উইলি, মেয়রের দিকে তাকাচ্ছে না পর্যন্ত, তার চোখ নীচে দাঁড়ানো জনতার দিকে, এদের কেউ কেউ হাসছে, কারও চোখে-মুখে অনিশ্চয়তা, কাউকে বিভ্রান্ত লাগছে, কেউ-বা বিরক্ত এবং ভীত বোধ করে সরে যাচ্ছে।

'এজন্য তোমাকে ভুগতে হবে,' বললেন মেয়র।

'আমরা ইলেকশন করে একজন নতুন মেয়র নির্বাচিত করব,' বলল উইলি। সে শহরের দিকে তাকাল। ওখানে রাস্তায় সদ্য লেখা বড় বড় সাইনবোর্ড ঝুলছে: LIMITED CLIENTELE: Right to serve customer revocable at any time। হেসে উঠে হাততালি দিল উইলি। চমৎকার! ট্রাম থামিয়ে পেছনের আসনগুলো সাদা রঙ করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে এসব আসন নির্ধারিত থাকবে শ্বেতাঙ্গদের জন্য। প্রেক্ষাগৃহগুলোতে হামলা চালানো হলো। কালো মানুষরা হাসতে হাসতে রশি দিয়ে সীমানা চিহ্নিত করল সাদা মানুষদের জন্য আর ওই সময় তাদের স্ত্রীরা ফুটপাতে পায়চারি করে বেড়াল এবং সন্তানরা ভয়ে ভয়ে লুকিয়ে থাকল ঘরের ভেতর।

'আমরা কি সবাই প্রস্তুত?' হাঁক ছাড়ল উইলি জনসন, গেরো লাগানো ফাঁসির রশি হাতে।

'প্রস্তুত!' গর্জন ছাড়ল অর্ধেক জনতা। বাকিরা বিড়বিড় করল, তারা জোম্বির মত হাঁটছে, যেন জোর করে তাদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

'ওই যে, ওটা এসে পড়েছে!' চেঁচাল ছোট একটি ছেলে।

একটি মাত্র সুতোয় বাঁধা ভিড়ের সবগুলো মাথা পুতুলের মত চোখ তুলে চাইল আকাশে।

পেছনে কমলা রঙের আগুনের ঝর্না ছড়িয়ে আকাশ দিয়ে উড়ে আসছে একটি রকেট। একটা বৃত্ত নিয়ে নেমে এল ওটা সবাইকে চমকে দিয়ে। অবতরণ করল তৃণভূমিতে এখানে-ওখানে আগুনের পিণ্ড ছড়িয়ে। তারপর নিভে গেল আগুন, এক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল রকেট, নীরব জনতা দেখছে ওটাকে, উড়ুক্কু যানের এক পাশের বিরাট দরজাটা অক্সিজেনের হুশশ্ শব্দ তুলে পিছিয়ে গেল, দোরগোড়ায় উদয় হলো একজন শ্বেতাঙ্গ বৃদ্ধ।

'সাদা মানুষ, সাদা মানুষ, সাদা মানুষ...' গুঞ্জন উঠল জনতার মাঝে, শিশুরা একে অপরের সঙ্গে কানাকানি করল, ফিসফিস করে কথা বলছে, ঠেলাধাক্কা মারছে, শব্দগুলো ঢেউয়ের মত তিরতির করে ছড়িয়ে পড়ল উপস্থিত মানুষগুলোর মাঝে, রোদে পুড়তে থাকা ট্রাম এবং এগুলোর খোলা জানালী দিয়ে ভেসে আসা কাঁচা রঙের মধ্যেও যেন ঢুকে গেল সাদা মানুষের আগমন সংবাদ। ফিসফিসানির ঢেউটা উঠে একটু পরেই মিলিয়ে গেল।

কেউ নড়াচড়া করছে না।

সাদা মানুষটি লম্বা এবং সোজা, তবে তাঁর চেহারায় উদ্বেগের ছাপ সুস্পষ্ট। তিনি দাড়ি কামাননি, চোখজোড়া নিষ্প্রাণ, তাতে জীবনের কোন রঙ নেই, প্রায় সাদা এবং অন্যমনস্ক শীতকালের গাছের ডালের মতই কৃশ তিনি। তাঁর হাত

কাঁপছে, জনতার ভিড়ে তাকানোর সময় রকেটের পোর্টওয়েতে হেলান দিতে হলো তাঁকে।

তিনি একটা হাত তুলে মৃদু হাসলেন। পরক্ষণে নামিয়ে নিলেন হাত।

কেউ নড়ল না।

লোকগুলোর মুখের দিকে তাকালেন বৃদ্ধ। ওদের হাতে বন্দুক এবং রশি লক্ষ করলেন না। তবে সম্ভবত রঙের গন্ধ তিনি পেয়েছেন। কেউ তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করল না। তিনি নিজেই কথা বলতে শুরু করলেন। শান্ত গলায়, ধীরে ধীরে তিনি কথা বললেন, আশা করলেন কেউ তাঁকে বাধা দেবে না, বাধা পেলেনও না। তাঁর গলা শোনাল অত্যন্ত ক্লান্ত এবং বিষণ্ন।

'আমি কে বা কী আমার পরিচয়, তা মুখ্য বিষয় নয়,' বললেন তিনি। 'আপনাদের কাছে একটি নাম বৈ তো কিছু না। অবশ্য আপনাদের কারও নামও আমি জানি না। সে হয়তো পরে জানা যাবে।' বিরতি দিলেন তিনি, চোখ বুজলেন এক মুহূর্তের জন্য, তারপর আবার বলে চললেন:

'কুড়ি বছর আগে আপনারা পৃথিবী ছেড়ে চলে এসেছেন। দীর্ঘ, দীর্ঘ সময়। এ যেন কুড়িটি শতকেরও বেশি, এর মধ্যে কত কিছু ঘটে গেছে। আপনারা চলে আসার পরে শুরু হয় যুদ্ধ।' মৃদু মাথা ঝাঁকালেন বৃদ্ধ। 'হ্যাঁ, সে এক বিরাট যুদ্ধ। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ। অনেক দিন চলেছে সে যুদ্ধ। গত বছর পর্যন্ত। আমরা পৃথিবীর সবগুলো শহরে বোমা ফেলেছি। ধ্বংস করেছি নিউ ইয়র্ক, লণ্ডন, মস্কো, প্যারিস, সাংহাই, বোম্বে এবং আলেকজান্দ্রিয়া। আমরা সব ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছি। বড় শহরগুলো ধ্বংস করার পরে আমরা হামলা করি ছোট শহরগুলোতে। ওগুলো অ্যাটম বোমা মেরে পুড়িয়ে দিই।'

এরপর তিনি শহর, জায়গা এবং রাস্তার নাম বলতে শুরু করলেন। তিনি একেকটা নাম উচ্চারণ করছেন, সে সঙ্গে দর্শকদের মধ্যে গুঞ্জন সৃষ্টি হচ্ছে।

'আমরা ধ্বংস করেছি নাচেজ...'

গুঞ্জন।

'এবং কলাম্বাস, জর্জিয়া...'

আবার গুঞ্জন।

'আমরা পুড়িয়ে দিয়েছি নিউ অর্লিন্স...

দীর্ঘশ্বাস ফেলার শব্দ।

'এবং আটলান্টা...'

আবারও দীর্ঘশ্বাস।

'আলাবামা'র গ্রিন ওয়াটারের কোনও চিহ্নই নেই।'

মাথায় একটা ঝাঁকি খেল উইলি জনসন, খুলে গেল মুখ। ওর প্রতিক্রিয়া লক্ষ করল হ্যাটি।

'কোনও কিছুই আর অক্ষত নেই,' আস্তে আস্তে বললেন পোর্টে দাঁড়ানো মানুষটি। 'তুলার মাঠগুলো পুড়ে গেছে।'

'ওহ্!' সমস্বরে আর্তনাদ করে উঠল সবাই।

'সুতার কলগুলোয় বোমা মারা হয়েছিল–'

'ওহ্।'

'কারখানাগুলোয় ছড়িয়ে পড়েছে তেজস্ক্রিয়তা। সবকিছুতেই তেজস্ক্রিয়তা। রাস্তাঘাট, খামার, খাবার–সবকিছু তেজস্ক্রিয় দূষণে দূষিত।' তিনি একের পর এক শহর এবং গ্রামের নাম বলে গেলেন।

'টাম্পা।'

'ওটা আমার শহর,' বলল একজন ফিসফিসিয়ে।

'ফুলটন।'

'ওই শহরে আমি থাকতাম,' বলল আরেকজন।

'মেমফিস।'

'মেমফিস। ওরা কি মেমফিসও পুড়িয়ে দিয়েছে?' অবিশ্বাস নিয়ে জানতে চাইল কে যেন।

'মেমফিস বোমার আঘাতে উড়ে গেছে।'

'মেমফিসের ফোর্থ স্ট্রিটও?'

'পুরো শহরটাই,' বললেন বৃদ্ধ।

ওরা এখন উত্তেজিত হয়ে উঠছে। কুড়ি বছর পরে মনে পড়ে যাচ্ছে সব স্মৃতি। শহর, বাসস্থান, গাছ-পালা, ইটের ভবন, সাইনবোর্ড, গির্জা, চেনা দোকান-পাট, সবকিছুর স্মৃতিই উদ্বেলিত করে তুলছে জনতাকে। প্রতিটি নাম জাগিয়ে তুলছে সেই দিনগুলোর কথা। আর এখানে এমন একজন নেই যে বিস্মৃত হয়েছে অতীত দিন। শিশু আর বালক ছাড়া বয়স্কদের সকলেই পুরানো স্মৃতির ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ছে।

'লারেডো।'

'লারেডোর কথা আমার মনে আছে।'

'নিউ ইয়র্ক নগর।'

'হার্লেম-এ আমার একটা দোকান ছিল।'

'হার্লেম বোমার আঘাতে উড়ে গেছে।'

কী ভয়ঙ্কর শব্দগুলো। চেনা-পরিচিত সবগুলো জায়গা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, কল্পনা করতেও কষ্ট হয়।

বিড়বিড় করল উইলি জনসন, 'আলাবামা'র গ্রিন ওয়াটার। ওই শহরে আমার জন্ম।'

'গেছে। সব ধ্বংস হয়ে গেছে,' জানালেন বৃদ্ধ।

তিনি বলে চললেন, 'আমরা বোকার মত সবকিছু নষ্ট করে ফেলেছি, সবকিছু ধ্বংস করে দিয়েছি। লক্ষ কোটি মানুষ হত্যা করেছি। পৃথিবীতে এখন সব ধর্ম আর জাতি মিলিয়ে পাঁচ লাখের বেশি মানুষ নেই। ধ্বংসস্তূপ থেকে ধাতব সংগ্রহ করে এ রকেটটি বানিয়ে মঙ্গলগ্রহে এসেছি আপনাদের সাহায্য পেতে।'

তিনি ইতস্তত করলেন, তাকালেন মানুষগুলোর দিকে। হ্যাটি জনসন টের পেল তার স্বামীর হাত শক্ত হয়ে গেছে, রশিতে মুঠো পাকাল সে।

'আমরা বোকা ছিলাম,' শান্ত গলায় বললেন বৃদ্ধ। 'পৃথিবী এবং সভ্যতাকে আমরা তাচ্ছিল্য করেছি। পৃথিবীর আর কোনও শহরই এখন বাসযোগ্য অবস্থায় নেই–আগামী একশো বছর ওগুলো তেজস্ক্রিয় দূষণের শিকার হয়ে থাকবে। পৃথিবীর আয়ু শেষ। আপনাদের কাছে রকেট আছে, কিন্তু আপনারা এগুলো গত কুড়ি বছরে পৃথিবীতে ফিরে যাবার জন্য একবারও ব্যবহার করেননি। আমি আপনাদের কাছে আবেদন নিয়ে এসেছি, এগুলো ব্যবহার করার জন্য। পৃথিবীতে চলুন, যারা এখনও বেঁচে আছে তাদেরকে নিয়ে আসুন মঙ্গলগ্রহে। এবারের মত আমাদেরকে একটু সাহায্য করুন। আমরা নির্বোধের মত কাজ করেছি। ঈশ্বরের কাছে আমাদের নির্বুদ্ধিতা এবং দুষ্কর্মের কথা স্বীকার করছি। পৃথিবীতে চীনা, ভারতীয়, রাশান, ব্রিটিশ এবং আমেরিকানরা আছে। ওদেরকে নিয়ে আসার জন্য আপনাদেরকে অনুরোধ করছি। আপনাদের মঙ্গলের মাটি শত-শত বছর ধরে অনাবাদি পড়ে রয়েছে। এখানে সবার স্থান সংকুলান হয়ে যাবে; এ মাটি উর্বর–আমি আকাশ থেকে আপনাদের মাঠ-ঘাট-জমি দেখেছি। আমরা এসে আপনাদের জমিতে চাষ করব। হ্যাঁ, আমাদের কৃষকের কাজ করতে কোনও আপত্তি নেই। আপনারা আমাদেরকে যা যা করতে বলবেন সব আমরা করতে রাজি। তবে আমাদেরকে আসতে মানা করবেন না। আমরা তো আর এখন আপনাদের ওপর জোর করতে পারব না। যদি বলেন চলে যেতে, আমি চলে যাব। আর আপনাদেরকে বিরক্ত করতে আসব না। তবে আমাদেরকে যদি আপনাদের এখানে একটু জায়গা দেন, আমরা আপনাদের সমস্ত কাজ করে দেব। আপনাদের ঘর-দোর পরিষ্কার করব, আপনাদের জন্য খাবার রান্না করব, আপনাদের জুতো পালিশ করে দেব। অতীত দিনে আপনাদের প্রতি যে অবিচার আমরা করেছি, সেজন্য আপনারা যে শাস্তি দেবেন, আমরা মাথা পেতে নেব।'

তাঁর কথা শেষ হলো।

আশ্চর্য এক নীরবতা নেমে এল। এ এমন এক নিস্তব্ধতা যা হাত দিয়ে যেন স্পর্শ করা যায়, এ নৈঃশব্দ দূরাগত ঝড়ের চাপের মত চেপে বসল জনতার ওপর। সূর্যালোকে তাদের লম্বা লম্বা হাতগুলো কালো কালো পেণ্ডুলামের মত ঝুলে আছে, চোখ মেলে তাকিয়ে আছে বৃদ্ধ মানুষটির দিকে। তিনি কোনও কথা বলছেন না, শুধু অপেক্ষা করছেন।

হাতের মুঠোয় রশি চেপে ধরে আছে উইলি জনসন। তার আশপাশের লোকজন তার দিকে তাকিয়ে আছে, সে কী করে দেখার জন্য। হ্যাটি স্বামীর বাহু চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রইল। সে জানে সবকিছুই এখন নির্ভর করছে উইলির ওপর। এখন উইলি যদি একটুখানি উস্কানি দেয়, জনতা উন্মত্তের মত ঝাঁপিয়ে পড়বে বুড়ো লোকটির গায়ে। নিমেষে টুকরো করে ফেলবে তাঁর রকেট শিপ, সে সঙ্গে বৃদ্ধও ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবেন। কারণ, এখানে অনেকের মনেই কুড়ি বছর আগের

প্রতিহিংসার আগুন ছাইচাপা হয়ে আছে। কেবল ছাইটাকে উস্কে দিলেই হলো...

'মিস্টার–' কদম বাড়াল হ্যাটি। কিছু না ভেবেই সে এগিয়েছে। জনতার শ্যেন দৃষ্টি যেন পিঠে অনুভব করল হ্যাটি। 'মিস্টার–'

বৃদ্ধ ওর দিকে ফিরে তাকালেন, ঠোঁটে ক্লান্ত হাসির রেখা টেনে।

'মিস্টার,' বলল হ্যাটি, 'আলাবামা'র গ্রিন ওয়াটারের নকউড হিল আপনি চেনেন?'

বৃদ্ধ ঘাড় ঘুরিয়ে শিপের মধ্যে কার সঙ্গে যেন কথা বললেন। একটু পরে তাঁর হাতে একটি ফটোগ্রাফিক ম্যাপ তুলে দেয়া হলো। লোকটি ম্যাপ হাতে দাঁড়িয়ে রইলেন।

'ওই পাহাড়ের ওপর একটা বড় ওক গাছ ছিল জানেন, মিস্টার?'

বড় ওক গাছ। ওখানে উইলির বাবাকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছিল। সকাল বেলা দেখা যায় বাতাসে তাঁর লাশ দুলছে।

'হ্যাঁ।'

'ওটা কি এখনও আছে ওখানে?' জানতে চাইল হ্যাটি।

'না, নেই,' জবাব দিলেন বৃদ্ধ। 'উড়ে গেছে। বোমা পড়ে ধুলোয় মিশে গেছে পাহাড়টি, সে সঙ্গে ওক গাছটিও। এই যে দেখুন।' ফটোগ্রাফ দেখালেন তিনি।

'দেখি তো,' লাফ মেরে সামনে বাড়ল উইলি। তাকাল ম্যাপে।

হ্যাটি শ্বেতাঙ্গটির দিকে তাকিয়ে চোখ মিটমিট করল, তার বুক ধড়াস ধড়াস করছে।

'গ্রিন ওয়াটারের কথা বলুন,' দ্রুত বলল সে।

'কী জানতে চান?'

'ড. ফিলিপ-এর কথা। উনি কি এখনও বেঁচে আছেন?'

রকেটের ভেতরে একটা যন্ত্র ক্লিক ক্লিক শব্দ করল। পাওয়া গেল তথ্য।

'উনি যুদ্ধে মারা গেছেন।'

'আর তাঁর ছেলে?'

'সে-ও মৃত।'

'ওঁদের বাড়ির কী অবস্থা?'

'পুড়ে ছাই। অন্যসব বাড়ির মত।'

'নকউড হিলে আরেকটি খুব বড় গাছ ছিল। ওটা?'

'ওখানকার সব গাছই পুড়ে গেছে।'

'ওই গাছটা পুড়ে গেছে, আপনি ঠিক জানেন?' জিজ্ঞেস করল উইলি।

'হ্যাঁ।'

উইলির শরীরের পেশীতে ঢিল পড়ল।

'মি. বার্টন এবং তাঁর বাড়ির কী খবর?'

'কোনও বাড়িই আর আস্ত নেই, সেখানকার কোনও বাসিন্দাও।'

'মিসেস জনসনের বাড়ি চেনেন? ওটা আমার মায়ের বাড়ি।'

ওখানে উইলির মাকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

'ওই বাড়িরও কোনও চিহ্ন নেই। সবকিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এই যে ছবি আছে। নিজেই দেখুন।'

রকেটে ছবির অভাব নেই, আর এসব ছবিই ওদের সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিল। শহর, ভবন, মহল্লা—সবকিছুই ধ্বংস হয়ে গেছে।

হাতে রশি নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল উইলি।

পৃথিবীর কথা মনে পড়ছে তার, সবুজ-শ্যামল ধরিত্রী মাতা, সবুজে ভরা শহর, যেখানে তার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা, ভাবছে সে শহরটি এখন টুকরো হয়ে গেছে, ধুলোয় মিশে গেছে তার সবকিছু, সমস্ত চিহ্ন, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে শহরের পরিশ্রমী মানুষগুলো, আস্তাবল, কামারশালা, কিউরিও শপ, সোডা ফাউণ্টেন, মদ তৈরির কারখানা, নদীর সেতু, বৃক্ষরাজি, পাহাড়, রাস্তা, গরু, মিমোসা (থোকা থোকা ছোট মিষ্টি গন্ধযুক্ত হলুদ ফুল), নিজের বাড়ি, নদীসংলগ্ন বড়-বড় থামঅলা ঘরগুলো, সাদা মর্চুয়ারি, যেখানে শরতের আলোয় নারীদেরকে লাগত প্রজাপতির মত বর্ণিল। গেছে, সব হারিয়ে গেছে; আর ফিরে আসবে না কোনওদিন। সভ্যতার সবকিছু কনফেত্তির (রঙিন কাগজের টুকরো) মত ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। নেই, ঘৃণা করার মত কোনও কিছুই আর অবশিষ্ট নেই—বন্দুকের গুলির খালি খোসা, ভাঙা এক টুকরো শন, একটি গাছ, এসবের কোনওকিছুই আর নেই, যাকে ঘৃণা করা যায়। শুধু রয়েছে একটি রকেট, অচেনা কিছু মানুষ, যারা তার জুতো পালিশ করে দেবে, ট্রলির পেছনে বসবে, মধ্যরাতের প্রদর্শনীতে যাদের জায়গা হবে প্রেক্ষাগৃহের একেবারে দূর প্রান্তে...

'তোমাদেরকে ওসব কিছুই করতে হবে না,' বলল উইলি জনসন।

তার স্ত্রী তার বিরাট হাতদুটোর দিকে তাকাল।

উইলির হাতের মুঠো খুলে যাচ্ছে।

খোলা মুঠো থেকে খসে পড়ল রশি, কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে রইল মাটিতে।

ওরা রাস্তা ধরে ছুটে গেল নিজেদের শহরে, দ্রুত টেনে-হিঁচড়ে নামিয়ে ফেলল সমস্ত সাইনবোর্ড, ট্রামের গায়ের হলুদ রঙের চিহ্নগুলো মুছে ফেলল, প্রেক্ষাগৃহের ব্যালকনির রশির ঘেরাটোপ খুলে নিল, বন্দুক থেকে বের করে নিল গুলি এবং ফাঁসির রশি, সব সরিয়ে ফেলল।

'সবার জন্য একটি নতুন শুরু,' নিজেদের গাড়িতে বাড়ি ফেরার পথে মন্তব্য করল হ্যাটি।

'ঠিক তাই,' অবশেষে বলল উইলি। 'ঈশ্বর আমাদেরকে বিপদ কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেছেন। কিছু এখানে কিছু ওখানে। এরপরে যা-ই ঘটুক না কেন, সমস্ত কিছুর দায়-দায়িত্ব আমাদের ওপরেই বর্তাবে। বোকা থাকার দিন শেষ। আমরা আর বোকা থাকব না। আমি বুঝতে পারছিলাম ওই সাদা মানুষটা আমাদের মতই নিঃসঙ্গ এবং একাকী। আমাদের যেমন দীর্ঘদিন কোনও বাড়ি-ঘর ছিল না, এখন তারও কোনও আশ্রয় নেই। এখন একই সমতলে চলে এসেছি

আমরা। আর একই সমতলে থেকে আবার সবকিছু নতুন করে শুরু করতে পারি আমরা।'

গাড়ি থামাল উইলি। বসে রইল জায়গায়। হ্যাটি ঘরে ঢুকল বাচ্চাদের নিয়ে আসতে। তারা ছুটে এল তাদের বাবাকে দেখতে। 'তুমি সাদা মানুষকে দেখেছ?' সমস্বরে চিৎকার দিল তারা। 'দেখেছ তাকে?'

'ইয়েস, স্যর,' হুইলের পেছনে বসে আঙুল দিয়ে ধীর গতিতে মুখ ঘষতে ঘষতে বলল উইলি। 'মনে হলো জীবনে এই প্রথম সত্যি সাদা মানুষটাকে দেখতে পেয়েছি আমি-পরিষ্কার দেখেছি তাকে।'

মূলঃ রে ব্রাডবারি

আর্তনাদ

আজ খুব গরম পড়েছে। ক্লাউসনার রুমাল দিয়ে কপাল আর ঘাড়ের ঘাম মুছে হনহন করে এগোল গেটের দিকে। গেট খুলে বাঁ দিকে বাগানের উদ্দেশে মোড় নিল ও। 'ম্যানর হাউস'-এর পেছনে পরিত্যক্ত বাগানটা। গাছগাছালির চেয়ে এখানে আগাছার সংখ্যাই বেশি। বাগানের শেষ প্রান্তে, একটা ভাঙা টিনশেড ঘরের কাছে চলে এল ক্লাউসনার। এটা একসময় মালীর ঘর ছিল। কিন্তু পড়ন্ত ম্যানর পরিবার শেষদিকে তাদের ঠাটবাট আর বজায় রাখতে পারেনি। ব্যবসায় লালবাতি জ্বেলে, বাড়িটা ব্যাঙ্কের কাছে মর্টগেজ রেখে তাঁরা ভাগ্যান্বেষণে অস্ট্রেলিয়া পাড়ি জমিয়েছেন। এমনিতেই মালী বেচারা অনেক দিন বেতন পাচ্ছিল না, তারপর মালিক চিরতরে দেশের বাইরে চলে যেতে এখানে থাকার আর কোন প্রয়োজন অনুভব করেনি সে। চাট্টিবাট্টি গুটিয়ে সে গ্রামের বাড়িতে চলে গেছে, তাও অনেক দিন হয়। ভাগ্যিস মালীর ঘরটা খালি পেয়েছিল ক্লাউসনার, নইলে খুব অসুবিধে হত।

ঘরে ঢুকল ক্লাউসনার, বন্ধ করে দিল দরজা। ঘরটার ছিরিছাঁদ কিছুই নেই। বাঁ দিকের দেয়াল ঘেঁষে লম্বা একটা কাঠের র‍্যাক, ওটার ওপর অসংখ্য তার আর ব্যাটারি, কয়েকটা ছোট যন্ত্রও রয়েছে। কালো রঙের একটা কাঠের বাক্স, লম্বায় ফুট তিনেক হবে, বাচ্চাদের কফিনের মত, দাঁড় করানো আছে র‍্যাকের ওপর।

ক্লাউসনার দ্রুত পায়ে এগোল বাক্সটার দিকে। বাক্সটার মুখ খোলা, ঝুঁকল সে। উঁকি দিয়ে দেখতে লাগল ভেতরের বিভিন্ন রঙের তার আর সিলভার টিউবগুলোকে। বাক্সের মধ্য থেকে এক টুকরো কাগজ বের করল ক্লাউসনার, বেশ সতর্কভাবে ওটাতে চোখ বোলাল, রেখে দিল নীচে, আবার গলা বাড়িয়ে কী যেন দেখল। এবার কাজ শুরু করে দিল ক্লাউসনার। তারগুলোর কানেকশন ঠিক আছে কি না পরীক্ষা করল, কাগজটা আবার পড়ল, তারপর বাক্সের দিকে নজর দিল। খানিক পর আবারও কাগজটা হাতে নিল, প্রতিটা তার খুঁটিয়ে কী যেন দেখল। প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে সে এই কাজগুলোই করে গেল।

বাক্সের মুখে তিনটে ডায়াল। ক্লাউসনার এবার ডায়ালগুলোতে মোচড় দিতে দিতে আগ্রহ নিয়ে তাকাতে লাগল বাক্সের ভেতরে। কাজ করতে করতে মৃদু গলায় নিজের সঙ্গে কথা বলছে ও, কখনও মাথা দোলাচ্ছে, আবার হাসছে। হাত দুটো সবসময় ব্যস্ত থাকল কাজে, আঙুলগুলো প্রজাপতির ওড়ার ছন্দে দ্রুত, নিখুঁতভাবে ছুঁয়ে যাচ্ছে বাক্সের ভেতরের কলকজা। প্রায় প্রতিবার ওর চেহারার অভিব্যক্তি পাল্টে যেতে লাগল। দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে উঠল কণ্ঠের ওঠানামা। হ্যাঁ...হ্যাঁ...এবার এইটা...ঠিক...ঠিক। কিন্তু এটা কি সত্যি ঠিক হচ্ছে?

আ...ডায়াগ্রামটা আবার কোথায় গেল? ও, হ্যাঁ...অবশ্যই...ঠিক...ওটাই ঠিক...এবং এখন...গুড...গুড...এই তো হচ্ছে...হচ্ছে...

প্রচণ্ড একাগ্রতা নিয়ে কাজ করে চলেছে ক্লাউসনার। গা ঘামে ভিজে সপসপে। বাতাসও যেন ওর উত্তেজনার রেশ ধরতে পেরেছে, থম মেরে গেছে।

হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। ঝট করে সিধে হলো ক্লাউসনার। ভাঙা বেড়ার ফাঁকে চোখ রাখল। ডা. স্কট। বিরক্ত মুখে দরজা খুলে দিল সে।

'এই যে, তুমি তা হলে এখানে,' বললেন ডাক্তার সাহেব। 'সন্ধ্যার পরে বুঝি আজকাল এখানেই সময় কাটাও?'

'কেমন আছেন, ডাক্তার আঙ্কেল?' প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল ক্লাউসনার।

'ভাল। এদিক দিয়েই যাচ্ছিলাম। ভাবলাম তোমার সঙ্গে একবার দেখা করে যাই। তোমার ঘরের দরজা দেখলাম বন্ধ। ভেবেছিলাম লাইব্রেরিতে গেছ বুঝি। কিন্তু দূর থেকে মালীর ঘরে আলো দেখে কৌতূহলী হয়ে চলে এসেছি। যাক গে, তোমার গলার অবস্থা এখন কেমন?'

'জী, ভালই।'

'যখন এসেই পড়েছি, না হয় আরেকবার গলাটা পরীক্ষা করে যাই।'

'না, না, ঠিক আছে। গলা দেখতে হবে না।'

ডাক্তার স্কট ঘরের মধ্যে চাপা উত্তেজনা ঠিকই টের পেলেন। বাক্সটার দিকে তাকিয়ে তাঁর ভ্রূ কুঁচকে উঠল। বললেন, 'কী ব্যাপার, রেডিও বানাচ্ছ নাকি?'

'না, তেমন কিছু না।'

'সেরকমই তো মনে হলো।'

'জী,' বিরক্তি চেপে বলল ক্লাউসনার।

'আসলে কী জিনিসটা?' জানতে চাইলেন ডাক্তার। 'দেখে তো ভয়ঙ্করদর্শন কিছু একটা মনে হচ্ছে। তাই না?'

'এটা স্রেফ একটা আইডিয়া।

'মানে?'

'শব্দ নিয়ে কাজ করার একটা আইডিয়া।'

'সে কী! তুমি আজ সারাদিন তা হলে এই আইডিয়ার পেছনেই ব্যয় করেছ!'

'জী। কারণ, শব্দ আমার খুব পছন্দের বিষয়।'

'দেখে-শুনে তাই তো মনে হচ্ছে,' দরজার দিকে এগোলেন ডা. স্কট, ঘুরলেন, বললেন, 'ঠিক আছে, আমি আর তোমাকে ডিস্টার্ব করব না। তোমার গলা এখন ঠিক আছে জেনে ভাল লাগল।' কিন্তু তিনি এক দৃষ্টিতে অদ্ভুত যন্ত্রটার দিকে তাকিয়েই থাকলেন, তাঁর জানার খুব আগ্রহ হচ্ছে এই জিনিস দিয়ে ক্লাউসনার আসলে কী করছে। 'আমাকে সত্যি করে বলো তো, আসলে এটা দিয়ে তুমি কী করছ?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'আমাকে তুমি খুবই কৌতূহলী করে তুলেছ, হে।'

বাক্সটার দিকে চাইল ক্লাউসনার, চোখ ঘুরে এল ডাক্তারের দিকে। ডান

কানের লতি কিছুক্ষণ চুলকাল। কী বলবে ভাবছে। দরজার সামনে থেকে ডাক্তার সাহেব ওর দিকে তাকিয়ে আছেন, হাসছেন।

'ঠিক আছে, আপনি যখন জানতে চাইছেন, আমি বলব।' আবার খানিকক্ষণ নীরবতা। ডাক্তার বুঝলেন ক্লাউসনার ঠিক মনস্থির করতে পারছে না কীভাবে শুরু করবে।

বার কয়েক ডান পা থেকে বাঁ পায়ে শরীরের ওজন চাপাল ক্লাউসনার, আবার বাঁ থেকে ডানে, কিছুক্ষণ কানের লতি অন্যমনস্কভাবে চুলকাল, চেয়ে থাকল মেঝের দিকে, অবশেষে মুখ খুলল সে। আস্তে, ইতস্তত ভঙ্গিতে কথা শুরু করল।

'আ...ইয়ে মানে...থিওরিটা খুব সহজ-সরল, মানুষের কান...আপনি জানেন...সব শব্দ ধারণ করা সম্ভব নয়। বেশ কিছু শব্দ আছে নিচু লয়ের, আর কিছু উঁচু লয়ের। এগুলো মানুষ শুনতে পায় না।'

'হ্যাঁ,' বললেন ডাক্তার। 'বলে যাও।'

'তো, খুব জোরে কথা বললে, প্রতি সেকেণ্ডে শব্দের ভাইব্রেশন হয় পনেরো হাজার বার–আর এটা আমাদের পক্ষে শোনা সম্ভব নয়। কুকুরের কান আমাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট মানের। কোন হুইসলের সুর যদি হয় প্রচণ্ড উচ্চ-ধ্বনির, তা হলে সেটা আমরা শুনতে না পেলেও একটা কুকুর ঠিকই তা শুনতে পাবে।'

'হ্যাঁ, জানি আমি ব্যাপারটা,' বললেন ডাক্তার।

'অবশ্যই জানবেন। কিন্তু বিশেষ কোন সুরের স্কেল ওই হুইসলের চেয়েও যদি জোরাল হয়, তা হলে সেই সুরটাকেও আপনি শুনতে পাবেন না। এভাবে স্কেল যত উঁচু মাত্রার হবে, ভাইব্রেশনও তত বেশি বাড়বে। এভাবে বাড়তে বাড়তে কম্পনের সংখ্যা লক্ষ-কোটি ছাড়িয়ে যাবে।' বলতে বলতে ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠল ক্লাউসনার। 'আমি বিশ্বাস করি, আমাদের চারপাশে শব্দের এক মহাসমুদ্র ছড়িয়ে রয়েছে যা আমরা, মানুষরা কানে শুনতে পাই না। যে অদৃশ্য শব্দের মহাতরঙ্গ আমাদের চারদিকে ঘিরে আছে অপূর্ব সুর এবং ছন্দ নিয়ে, সেই সংগীত এতই শক্তিশালী যে আমরা যদি তা শুনতে পেতাম তা হলে নির্ঘাত পাগল হয়ে যেতাম।'

'হয়তো থাকতেও পারে,' বললেন ডাক্তার। 'তবে আমার মনে হয় নেই।'

'নেই? নেই কেন?' প্রতিবাদ করল ক্লাউসনার। আঙুল দিয়ে র‍্যাকের ওপরে তামার তারের রোলে বসা একটা মাছি দেখাল। বলল, 'ওই মাছিটা দেখছেন? ওটা এখন কী ধরনের শব্দ উৎপাদন করে চলেছে? আপাত দৃষ্টিতে কিছুই না–মানে আমরা শুনতে পাচ্ছি না। কিন্তু কে জানে, ওটা হয়তো উচ্চনিনাদে শব্দ করে চলেছে, কিংবা ঘড়ঘড় আওয়াজ করছে অথবা গান গাইছে। ওর তো একটা মুখ আছে, তাই না? তা হলে ওর নিশ্চয়ই একটা কণ্ঠও আছে।'

ডাক্তার স্কট মাছিটার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। এখনও দরজার খিলে তাঁর হাত। 'বুঝলাম,' বললেন তিনি। 'তা হলে তুমি ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখতে চাও?'

'কিছুক্ষণ আগে,' বলল ক্লাউসনার, 'আমি একটা ছোট্ট যন্ত্র আবিষ্কার করেছি যা দিয়ে প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছে আমাদের চারপাশে অনেক অদ্ভুত শব্দের উপস্থিতি বিদ্যমান। প্রায়ই আমি এখানে বসে আমার যন্ত্রে, বাতাসে শব্দের যেসব কম্পন রয়েছে তা রেকর্ড করেছি, যদিও আমি নিজে কিছুই শুনিনি। আর এই শব্দগুলো আমি এখন শুনতে চাই। জানতে চাই এগুলো কোত্থেকে আসছে, কারাই বা এই শব্দ করছে।'

'আর তোমার টেবিলের ওপর যে যন্ত্রটা,' বললেন ডাক্তার, 'ওটা দিয়েই কি তুমি অদৃশ্য শব্দগুলো শোনার আশা করছ?'

'হতে পারে। কে জানে? তবে এক্ষেত্রে ভাগ্য এখনও আমাকে তেমন সহায়তা করেনি। কিন্তু আমি যন্ত্রটায় কিছু পরিবর্তন ইতিমধ্যে করেছি এবং আজ রাতেই আরেকবার পরীক্ষা করে দেখব এই যন্ত্রটা,' হাত দিয়ে বাক্সটা ছুঁল সে, 'উচ্চস্বরের সমস্ত শব্দ কম্পন ধরে মানুষের কানে শোনার মত উপযুক্ত করে তা যাতে পরিবেশন করতে পারে সেভাবেই ডিজাইন করা হয়েছে। আমি এটাকে প্রায় রেডিওর মতই টিউন করতে পারি।'

'মানে?'

'মানে খুব সোজা। ধরুন, আমি একটা বাদুড়ের কিচিরমিচির ডাক শুনতে চাই। এটা খুব উঁচু লয়ের শব্দ—সেকেণ্ডে কম্পনের গতি ত্রিশ হাজার। সাধারণভাবে মানুষ এই শব্দ শুনতে পাবে না। এখন, এই ঘরে যদি একটা বাদুড় উড়তে থাকে এবং আমি আমার যন্ত্র টিউন করি ত্রিশ হাজারে, তা হলে আমি খুব পরিষ্কারভাবে ওটার ডাক শুনতে পাব। আমি আসল সুর, এমনকী শুনতে পাব এফ শার্প, বি ফ্ল্যাট কিংবা অন্য যা কিছু আমি ইচ্ছা করব—এমনকী খুব নিচু লয়ের শব্দও শোনা যাবে। এবার বুঝতে পেরেছেন?'

লম্বা কফিন আকৃতির বাক্সটার দিকে তাকালেন ডা. স্কট। 'তুমি ব্যাপারটা আজ রাতেই পরীক্ষা করে দেখতে চাইছ নাকি?'

'জী।'

'ঠিক আছে। তা হলে তোমার জন্যে শুভকামনা রইল।' ঘড়ির দিকে চট করে একবার চাইলেন তিনি। 'আরে সর্বনাশ! সাড়ে ছ'টা বেজে গেছে খেয়ালই করিনি, এক্ষুণি আমাকে ডাউন-টাউনে দৌড়াতে হবে। যাক গে, তোমার যন্ত্রের জাদু দেখার আগ্রহ থাকল। গুডবাই।' ডাক্তার দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে গেলেন।

ক্লাউসনার আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ল তার কালো বাক্সের তারটা নিয়ে। কিছুক্ষণ পর সিধে হলো সে। উত্তেজিত কিন্তু নিচু গলায়, যেন নিজেকেই শুনিয়ে বলল, 'আবার একবার চেষ্টা করে দেখব আমি...মনে হয় এবারের ধারণক্ষমতা আগের চেয়ে উন্নত হবে। এখন এটাকে নিয়ে বাইরে যেতে...তোলো এবার সাবধানে...মাই গড, এ দেখি হাতির মত ওজন!'

বাক্সটা নিয়ে দরজার দিকে এগোল ক্লাউসনার। দেখল যন্ত্রটাকে না নামিয়ে খিল খোলা সম্ভব নয়। আবার বাক্সটাকে র‍্যাকের ওপর রাখল সে, খুলল দরজা,

তারপর হাঁসফাঁস করতে করতে ওটাকে বয়ে নিয়ে চলল বাগানে। বাগানের এক কোণে, ভাঙা ও লম্বা একটা পাথরের টেবিলের ওপর সাবধানে রাখল। টিনশেডে এসে এক জোড়া ইয়ারফোন নিয়ে গেল। ইয়ারফোনের তার ঢোকাল সাউণ্ড মেশিনের মধ্যে, দুই কানে সেট করল দুই ফোন। দ্রুত, দক্ষ হাতে কাজগুলো সারল সে। ভয়ানক উত্তেজিত ক্লাউসনার, ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে। কী যেন বিড়বিড় করে বলে চলেছে সে, আসলে সাহস জোগাচ্ছে নিজেকে। সাহস জোগাচ্ছে, কারণ ভয় পেয়েছে ক্লাউসনার–যদি যন্ত্র কাজ না করে, তা হলে তার এতদিনের শ্রম পণ্ড তো হবেই, সেই সঙ্গে ধার-কর্জ করা টাকাগুলোও যাবে জলে। তা ছাড়া আরও একটা ভয় কাজ করছে ওর মধ্যে। ক্লাউসনার জানে না, তার স্ব-আবিষ্কৃত সাউণ্ড মেশিন শেষ পর্যন্ত কী ফলাফল বয়ে আনবে।

লম্বা পাথুরে টেবিলটার পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল ক্লাউসনার। এমনিতেই ছোটখাট মানুষ সে; তারপর টেনশন, উত্তেজনা আর ভয় যেন তাকে আরও চুপসে দিয়েছে। সূর্য ডুবেছে অনেকক্ষণ। এপ্রিলের এই সন্ধ্যায় বাগানের একটা গাছের পাতাও নড়ছে না, এক ফোঁটা বাতাস নেই কোথাও। চারদিক এমন নিঝুম আর শব্দহীন, গা ছমছম করে উঠল ক্লাউসনারের। যেখানে ও দাঁড়িয়ে আছে, জায়গাটা থেকে কয়েক গজ দূরে ছোট একটা বেড়া, তার পাশেই ছোট্ট সাজানো একটি ফুলের বাগান। বাগানের পর কাঠের একটি বাড়ি। ওখানে মি. এবং মিসেস সণ্ডার্স নামের এক নিঃসন্তান দম্পতি থাকেন। ফ্লাওয়ার বাস্কেট হাতে মিসেস সণ্ডার্সকে তাঁর বাগানে টুকটুক করে হাঁটতে দেখল ক্লাউসনার। কিছুক্ষণ বুড়ির দিকে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে থাকল সে, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে তার সাউণ্ড মেশিনের সামনের দিকের একটা সুইচ টিপল। বাঁ হাত ব্যস্ত থাকল ভলিউম কন্ট্রোলে, ডান হাতে একটা নব ঘোরাতে শুরু করল। নব ঘোরানোর সঙ্গে সঙ্গে ছোট একটা কাঁটা বড় সেণ্ট্রাল ডায়ালের মধ্যে নড়তে লাগল, যেন রেডিওর ওয়েভলেংথ ডায়াল। ডায়ালে এক সিরিজ ব্যাণ্ডে অসংখ্য সংখ্যা লেখা, শুরু হয়েছে পনেরো হাজার দিয়ে, শেষ হয়েছে দশ লাখে।

সাউণ্ড মেশিনের ওপর ঝুঁকে পড়ল ক্লাউসনার। ঘাড় একদিকে কাত হয়ে আছে, যেন কিছু শুনছে বা শুনবে। ডান হাতে নব ঘোরাচ্ছে ও, কাঁটাটা ধীরে ধীরে ডায়ালের সংখ্যাগুলো পেরিয়ে যেতে লাগল। এতই ধীরে যে মনেই হচ্ছিল না কাঁটাটা নড়ছে। ইয়ারফোনে অস্পষ্ট, বিক্ষুব্ধ একটা শব্দ শুনতে পেল সে। যেন কিছু একটা মচমচ শব্দে ভেঙে যাচ্ছে।

মচমচ শব্দটা ছাড়িয়ে ক্লাউসনারের কানে সাউণ্ড মেশিনের মৃদু গুঞ্জন ধ্বনি ভেসে এল। ব্যস, এটুকুই। কিন্তু শুনতে শুনতে ওর ভেতরে একটা অদ্ভুত অনুভূতি কাজ শুরু করে দিল। মনে হলো কান দুটো যেন মাথা ছাড়িয়ে অনেক লম্বা হয়ে গেছে, কানের সঙ্গে মাথাটার যোগসূত্র স্থাপন করে আছে শুধু একটা শক্ত তার, যেন একটা শুঁড়, আর তারগুলো ক্রমে প্রসারিত হয়ে চলেছে এবং কান দুটো ছুটে চলেছে গোপন এক নিষিদ্ধ অঞ্চলের দিকে, বিপজ্জনক আলট্রাসনিক এক

এলাকায়, যেখানে সাধারণ মানুষের শ্রবণেন্দ্রিয় কখনও প্রবেশ করেনি, আর প্রবেশাধিকার পাবেও না কোনদিন।

ছোট কাঁটাটা ধীর গতিতে ছুঁয়ে যাচ্ছে ডায়াল, হঠাৎই সে তীক্ষ্ণ এবং তীব্র একটা চিৎকার শুনল, চিৎকার নয়, যেন মরণ আর্তনাদ। লাফিয়ে উঠল ক্লাউসনার, পড়ে যাচ্ছিল, তাল সামলাতে টেবিলের কোনা আঁকড়ে ধরল। এদিক-ওদিক চাইল সে, চিৎকারকারীকে খুঁজছে। কিন্তু সামনের বাগানে মিসেস সণ্ডার্স ছাড়া দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিকে চোখে পড়ল না। উনি যে চিৎকার দেননি সে ব্যাপারে ক্লাউসনার একশো ভাগ নিশ্চিত। ঈষৎ সামনের দিকে ঝুঁকে হলদে কয়েকটা গোলাপ কেটে ফুলের ঝুড়িতে রাখছেন তিনি।

ভয়ঙ্কর চিৎকারটা আবার শোনা গেল–বেসুরো, অমানুষিক চিৎকার, তীক্ষ্ণ এবং সংক্ষিপ্ত, কিন্তু অত্যন্ত স্পষ্ট। এরকম চিৎকার জীবনে শোনেনি ক্লাউসনার। আবার চারপাশে তাকাল সে, চিৎকারের উৎস সন্ধানে ব্যস্ত। মানুষজন বলতে শুধু মিসেস সণ্ডার্সকে অনতিদূরে দেখা যাচ্ছে। ক্লাউসনার দেখল ভদ্রমহিলা একটা লাল গোলাপের ঝাড়ের দিকে ঝুঁকলেন, আঙুলে একটা ফুলের বোঁটা ধরে অন্য হাতে কাঁচি দিয়ে ওটাকে বৃন্তচ্যুত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই ভয়াবহ চিৎকারটা শোনা গেল।

চিৎকারটা শোনা গেছে ঠিক তখন, যখন মিসেস সণ্ডার্স গোলাপ ফুলটিকে বোঁটা থেকে কেটে নিয়েছেন। এই সময় খাড়া হয়ে দাঁড়ালেন তিনি, ঝুড়িতে ফুলগুলোর সঙ্গে কাঁচিটাও রেখে দিলেন, হাঁটা শুরু করলেন বাড়ির দিকে।

'আন্টি!' জোরে ডাক দিল ক্লাউসনার, উত্তেজনায় কণ্ঠ চিলের মত তীক্ষ্ণ শোনাল। 'শুনুন, আন্টি!'

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন মিসেস সণ্ডার্স। দেখলেন তাঁর প্রতিবেশী ছেলেটা ম্যানরদের পরিত্যক্ত বাগানে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে তাঁকে ডাকছে। চেহারায় উত্তেজনা স্পষ্ট। অবাক হলেন মিসেস সণ্ডার্স। ছেলেটাকে মাঝে মধ্যে টিনশেডের ঘরটাতে ঢুকতে দেখেছেন তিনি। চোখাচোখি হলে হাত নেড়ে সৌজন্য বিনিময় করেছে মাত্র। কিন্তু কী ব্যাপার? আজ ওকে এরকম লাগছে কেন? ভেতরে ভেতরে বেশ কৌতূহল বোধ করলেন মিসেস সণ্ডার্স।

'আরেকটা কাটুন! প্লিজ, আরেকটা ফুল ছিঁড়ুন গাছ থেকে।'

এখনও অবাক চোখে তাকিয়ে আছেন মিসেস সণ্ডার্স। 'কেন, বাবা ক্লাউসনার?' জানতে চাইলেন তিনি। 'কী হয়েছে তোমার?'

'কিছু হয়নি, আন্টি!' বলল ক্লাউসনার। 'যা বলছি দয়া করে করুন না। একটা ফুল ছিঁড়ুন গাছ থেকে।'

ক্লাউসনারকে পরিচয়ের প্রথম থেকেই বেশ অদ্ভুত মনে হয়েছে মিসেস সণ্ডার্সের। জানেন, ছেলেটা বছর দুই কুইন্স কলেজে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পড়ার পর কী কারণে যেন পড়াশোনা বাদ দিয়েছে। ম্যানর হাউস, যেটা একটা ব্যাঙ্ক আপাতত ভাড়া দিয়েছে কয়েকজন ব্যাচেলরের কাছে এবং শিগ্‌গিরই এটা

ভেঙে একটা মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং তৈরির পরিকল্পনা নিয়েছে, এই বাড়ির নীচতলায় থাকে ক্লাউসনার। কথা খুব কম বলে, প্রায়ই আপন মনে কী যেন বিড়বিড় করে। ছেলেটার আচার-আচরণ কখনও-কখনও অস্বাভাবিক ঠেকলেও এখন ওর অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে যেন উন্মাদ হয়ে গেছে সে। এক দৌড়ে বাড়িতে ঢুকে স্বামীকে ডেকে আনবেন কি না, ভাবলেন মিসেস সণ্ডার্স। কিন্তু পরক্ষণে নাকচ করে দিলেন চিন্তাটা। নাহ্, ছেলেটা একটু পাগলাটে স্বভাবের হলেও তেমন মন্দ নয়। তার চেয়ে ওর সঙ্গে একটু মজা করা যাক। দেখা যাক, ও আসলে কী বলতে চাইছে। 'ঠিক আছে, ক্লাউসনার, তুমি যখন বলছ, আরও কিছু ফুল না হয় আবার সংগ্রহ করছি,' বললেন তিনি। ঝুড়ি থেকে কাঁচিটা বের করে বোঁটা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন একটা হলদে গোলাপ।

মরণ আর্তনাদটা প্রচণ্ড জোরে আঘাত করল ক্লাউসনারের কানে, ফুলটা যে মুহূর্তে কাটা হলো, ঠিক সেই সময়। ইয়ারফোন একটানে খুলে সে দৌড়ে গেল বেড়ার দিকে। 'ধন্যবাদ, আন্টি,' বলল সে। 'আর লাগবে না।'

মিসেস সণ্ডার্স হলদে গোলাপ হাতে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকালেন ক্লাউসনারের দিকে।

'আপনাকে তা হলে ব্যাপারটা খুলেই বলি, আন্টি,' বলল সে। 'কিন্তু আপনি হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করবেন না।' বেড়ার ওপর হাত রেখে ভারী চশমার আড়াল থেকে সে উৎসুক ভঙ্গিতে তাকাল ভদ্রমহিলার দিকে। 'আপনি একটু আগে কাঁচি দিয়ে যে ফুলগুলো কেটেছেন, ওগুলো আসলে ফুল নয়, জীবন্ত সত্তা। আর যতগুলো ফুল আপনি কেটেছেন, সবগুলো মৃত্যুযন্ত্রণায় আর্তনাদ করেছে। একথা কি আপনি জানেন, আন্টি?'

'না,' জবাব দিলেন মিসেস সণ্ডার্স। 'আমি সত্যি জানি না।'

'কিন্তু এটা সত্যি,' বলল ক্লাউসনার। আগের চেয়ে দ্রুত শ্বাস পড়ছে, উত্তেজনা চাপা দেয়ার চেষ্টা করল সে। 'আমি ওদের মরণ আর্তনাদ শুনেছি। যতবার আপনি ওদের গায়ে কাঁচি চালিয়েছেন, ততবার ওরা যন্ত্রণায় চিৎকার দিয়েছে। খুবই উঁচু লয়ের শব্দ, সেকেণ্ডে একশ বত্রিশ হাজার কম্পন মাত্রার কাছাকাছি। আপনি সে শব্দ না শুনলেও আমি শুনেছি।'

'তাই, ক্লাউসনার?' মিসেস সণ্ডার্সের কৌতূহল সম্পূর্ণ উবে গেছে। ছেলেটা যে আসলেই পাগল হয়ে গেছে সে ব্যাপারে এখন তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিত। সিদ্ধান্ত নিলেন আর পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে বাড়ির দিকে হাঁটা দেবেন।

'আপনি বলতে পারেন,' বলে চলল ক্লাউসনার, গোলাপ গাছের অনুভব করার কোন নার্ভাস সিস্টেমই নেই, কান্নাকাটি দূরে থাক। হয়তো আপনি এটাকে ধ্রুব সত্য জেনে বসে আছেন। ভাবছেন মানুষের মত তো আর ওদের গলা নেই যে চিৎকার দেবে। কিন্তু আপনি কী করে নিশ্চিত হবেন, আন্টি–' বেড়ার দিকে ঝুঁকে এল ক্লাউসনার, ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, 'আপনি কী করে নিশ্চিত হবেন যে আপনার হাতে ধারাল ছুরির পোঁচ বসালে যেমন ব্যথা পাবেন, কাঁচি দিয়ে গোলাপ কাটলে

সেরকম ব্যথা ওরা পাবে না? আপনি কী করে বুঝবেন, বলেন? ওদেরও তো প্রাণ আছে, তাই না?'

'হ্যাঁ, ক্লাউসনার, ঠিক বলেছ। আচ্ছা, আজকের মত তা হলে আসি, কেমন? গুডনাইট।' দ্রুত ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি, প্রায় দৌড় দিলেন বাড়ির দিকে। ক্লাউসনার টেবিলের কাছে ফিরে এল। ইয়ারফোন দুটো কানে লাগিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে শুনল। মেশিনের মৃদু গুঞ্জন আর অস্পষ্ট মচমচ ছাড়া অন্য কোন শব্দ তার কানে এল না। সামনে নুয়ে একটা ছোট্ট সাদা ডেইজি বুড়ো আঙুল আর তর্জনীতে ধরে আলতো করে মোচড় দিয়ে ছিঁড়ে আনল বোঁটা থেকে।

প্রায় অস্পষ্ট একটা কান্নার আওয়াজ ভেসে এল ইয়ারফোনে। আরেকটা ডেইজি ছিঁড়ল সে একইভাবে। আবার চিৎকার, তবে যন্ত্রণাকাতর কোন আর্তনাদ নয়। না, ব্যথার চিৎকার নয়, এ বিস্ময়ের বহিঃপ্রকাশ। সত্যি কি তাই? কিন্তু মানুষের মত আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ কি আদৌ ছিল? না, ওটা আসলে স্রেফ একটা চিৎকার ছিল, অনুভূতিহীন চিৎকার, গোলাপের ব্যাপারটাও ছিল একই রকম। যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ বলা তার ভুল হয়েছে। ফুল সম্ভবত এমন কিছু অনুভব করে যা আমরা এখনও জানতে পারিনি—অন্য কোন অনুভূতি, যার নতুন নামকরণ প্রয়োজন।

কান থেকে ইয়ারফোন খুলে ফেলল ক্লাউসনার। রাত হয়ে আসছে। কাছেপিঠের বাড়িঘরের জানালা দিয়ে বিচ্ছুরিত হচ্ছে আলো। সাবধানে কালো বাক্সটা তুলল সে, নিয়ে চলল টিনশেডে, কাঠের র‍্যাকের ওপর রাখল। তারপর বেরিয়ে এল সে, অবশ্যই দরজা বন্ধ করতে ভুলল না। হাঁটা দিল বাসস্ট্যাণ্ডের দিকে। পার্টটাইম একটা চাকরি করে ও। সেখানে যাচ্ছে।

পরদিন খুব ভোরে ঘুম থেকে জাগল ক্লাউসনার, তাড়াতাড়ি প্যাণ্টটা দু'পায়ে গলিয়ে সটান চলে এল টিনশেডে। সাউণ্ড মেশিনটা নিয়ে বাইরে এল সে। বুকের সঙ্গে চেপে ধরে আছে ভারী যন্ত্রটা, ওজনের ভারে নুয়ে গেছে সামনের দিকে। সামনের গেট খুলে রাস্তা পেরুল ক্লাউসনার। রাস্তার ওপারে একটা পরিত্যক্ত পার্ক। নামেই পার্ক, আসলে দিনের বেলা এখানে গরু-ছাগল চরে। কিছু বীচ, পাম আর আম গাছ দাঁড়িয়ে আছে খোলা ঘাস জমির এক কিনারে লাইন বেঁধে। পার্কে ঢুকে দাঁড়িয়ে পড়ল ক্লাউসনার, এদিক-ওদিক চাইল। সবচেয়ে বড় বীচ গাছটার দিকে এগোল সে। গুঁড়ির কাছে, মাটিতে সাউণ্ড মেশিনটাকে বসাল। তারপর দ্রুত বাসায় ফিরে খাটের তলা থেকে আগেই সংগ্রহ করা ছোট কুড়োলটা নিয়ে এল। কুড়োলটা মাটিতে, গাছটার পাশে রাখল।

ভারী কাচের আড়াল দিয়ে নার্ভাস ভঙ্গিতে এদিক-ওদিক চাইতে লাগল ক্লাউসনার। কেউ কোথাও নেই। হাতঘড়ির দিকে তাকাল সে। ভোর পাঁচটা।

ইয়ারফোন কানে জড়িয়ে মেশিনের সুইচ অন করল ক্লাউসনার। সেই মৃদু গুঞ্জন ধ্বনি শুনল কয়েক সেকেণ্ড; তারপর কুড়োলটা নিয়ে দু'পা ফাঁক করে দাঁড়াল গুঁড়ির সামনে। শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে কোপ বসাল ক্লাউসনার। কুড়োলের ধারাল

ফলা গুঁড়ির অনেকখানি ভেতরে ঢুকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত শব্দ ভেসে এল ইয়ারফোনে। এরকম শব্দ আগে কখনও শোনেনি সে–কর্কশ, বেসুরো, বিকট একটা চিৎকার, যেন তীব্র যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে। গোলাপ ফুলের মত দ্রুত এবং সংক্ষিপ্ত নয়, পুরো এক মিনিট ফোঁপানির আওয়াজটা দীর্ঘস্থায়ী হলো, তারপর ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে এল।

আতঙ্কিত ক্লাউসনার অনেকক্ষণ পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল গাছটার পাশে। তারপর খুব সাবধানে কুড়োলটা টেনে খুলল গুঁড়ি থেকে, ছুঁড়ে ফেলে দিল মাটিতে। কাটা জায়গা থেকে রস বেরিয়ে এসেছে, আলতো করে ওখানে আঙুল বোলাল ক্লাউসনার, দু'পাশে মুখ হাঁ হয়ে যাওয়া ক্ষতস্থানের ছাল যেন আবার জোড়া লাগাতে চাইল। করুণ গলায় বলল, 'আমি দুঃখিত...ভাই বৃক্ষ...আমি সত্যি, প্রচণ্ড দুঃখিত...তবে ভেবো না, সব ঠিক হয়ে যাবে...আমি বলছি তোমার কষ্ট দূর হয়ে যাবে।'

গুঁড়ির কাটা জায়গাটা কিছুক্ষণ হাত দিয়ে চেপে ধরে থাকল ক্লাউসনার; তারপর কী মনে পড়তে দৌড়ে বেরিয়ে পড়ল পার্ক থেকে। ছুটতে ছুটতে ম্যানর হাউস-এর তিনতলায় উঠে এল। পাগলের মত দরজার কড়া নাড়তে লাগল। অত্যন্ত বেজার মুখে দরজা খুলে দিলেন ডা. স্কট। ক্লাউসনারকে দেখে তাঁর কপালে আরও একটা ভাঁজ পড়ল। বিরক্তি চেপে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার, এত সকালে তুমি?'

'ডাক্তার আঙ্কেল, আপনি আমার সঙ্গে একটু পার্কে যেতে পারবেন?'

'এখন? কেন? তুমি বুঝি ইদানীং প্রাতঃভ্রমণ শুরু করেছ?'

ডাক্তারের ঠাট্টা গায়ে মাখল না ক্লাউসনার। ব্যাকুল গলায় বলল, 'চলুন না, ডাক্তার আঙ্কেল। আপনি তো এমনিতেও প্রতিদিন সকালে মর্নিং ওয়াকে বের হন।'

'তা বের হই। কিন্তু ভাবছি আজ বেরোব না। শরীরটা কেমন ম্যাজম্যাজ করছে।'

'প্লিজ, চাচা, প্লিজ! তবুও আপনাকে আমার সঙ্গে একবার যেতেই হবে।'

'কিন্তু...কী ব্যাপার, বলো তো?' ডাক্তার স্কট সতর্ক গলায় জিজ্ঞেস করলেন।

'ব্যাপারটা আপনি নিজ চোখে দেখবেন। চলুন না, প্লিজ! সঙ্গে আপনার ব্যাগটাও আনবেন।'

ছেলেটাকে হতাশ করতে মন চাইল না ডাক্তার সাহেবের। ক্লাউসনারকে বিশেষ স্নেহ করেন তিনি। এক ছাদের নীচে দু'জনের অবস্থান খুব বেশি দিনের না হলেও চাচা-ভাতিজার সম্পর্কটি বেশ নিটোল। যদিও ক্লাউসনার পাগলাটে এবং রগচটা স্বভাবের, তবু বাপ-মা মরা, এতিমখানায় বড় হয়ে ওঠা এই ছেলেটির প্রতি কেন জানি তাঁর আলাদা একটা টান রয়েছে। তিনি বললেন, 'ঠিক আছে। তুমি ভেতরে এসে বসো। আমি ড্রেস-আপ করে আসছি।'

'না, না, বসব না। আপনি তাড়াতাড়ি আসেন।'

বাইরে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল ক্লাউসনার। বীচ গাছটা কীরকম চিৎকার দিয়েছিল মনে করার চেষ্টা করল। ভয়ঙ্কর চিৎকারটা শুনে ভয়ে প্রায় জমে গিয়েছিল সে। আচ্ছা, কোন মানুষকে যদি মাটিতে চিৎ করে ফেলে ধারাল অস্ত্র তার পায়ে ঢুকিয়ে দেয়া হয় তা হলে তার অবস্থা কেমন হবে? কীরকম চিৎকার দেবে সে? না, সে চিৎকার আলাদা ধরনের হবে। তবে গাছদের মরণ আর্তনাদ মানুষের চিৎকারের চেয়ে অনেক ভয়াবহ এবং মর্মন্তুদ। গম গাছের কথা ভাবল ক্লাউসনার। যেন চোখের সামনে ভেসে উঠল সোনালি শস্য খেত। আচ্ছা, একটা খেতের সমস্ত গম যদি একযোগে কাটা হতে থাকে, তা হলে ওদের চিৎকারের ধরন কী হবে? ধরা যাক, ছোট একটি খেতে এক হাজার গম গাছ রয়েছে, একসঙ্গে সবগুলো কাটা হচ্ছে, প্রত্যেকেই মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে—ওহ, গড! শিউরে উঠল ক্লাউসনার। আমার সাউণ্ড মেশিন নিয়ে জীবনেও কোন গম খেতে যাব না। আমি এখন থেকে আর রুটিও খাব না, সিদ্ধান্ত নিল সে। কিন্তু আলু, বাঁধাকপি, গাজর আর পেঁয়াজদের কী অবস্থা? কিংবা আপেল? না, আপেল ঠিক আছে। ওগুলো তো আপনা-আপনি গাছ থেকে ছিঁড়ে পড়ে। সুতরাং এখানে ব্যথা পাবার প্রশ্ন নেই। তবে আলু কিংবা পেঁয়াজের ব্যাপারটা সাংঘাতিক। আলু তো মাটির নীচ থেকে উপড়ে বের করে আনা হয়। ইস, কী যে ব্যথা পায় তখন...

'চলো হে, বেরোনো যাক,' ট্র্যাকস্যুট পরা ডাক্তারের ডাকে বাস্তবে ফিরে এল ক্লাউসনার।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলেন,' দ্রুত বলল সে।

যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলেন ডাক্তার স্কট, 'তোমার ব্যাপারটা কী বলো তো? কী দেখাতে নিয়ে যাচ্ছ আমাকে?'

'দেখাব না। শোনাব। আপনাকে নিয়ে এসেছি, কারণ আমার ব্যাপারটা একমাত্র আপনিই জানেন। পার্কে চলুন, নিজের চোখেই সব দেখবেন এবং শুনবেন।'

ডাক্তার স্কট ক্লাউসনারের দিকে তাকালেন। অপেক্ষাকৃত শান্ত দেখাচ্ছে ওকে। পাগলামির ছাপ নেই চেহারায়।

দু'জনে পার্কে ঢুকল। ক্লাউসনার ডাক্তারকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল বড় বীচ গাছটির কাছে।

কালো কফিনের মত সাউণ্ড মেশিনের বাক্সটা দেখে ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন, 'এটাকে এখানে এনেছ কেন?'

'এখানে এই বীচ গাছটার মত অন্য কোন বড় গাছ নেই বলে।'

'আর কুড়াল দিয়ে কী হবে?'

'ওটার কাজও আপনি একটু পরই দেখতে পাবেন। এখন দয়া করে ইয়ারফোনটা মাথায় লাগান। খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন এবং আমাকে সব বলবেন। আমি নিশ্চিত হতে চাই...'

হেসে ইয়ারফোন দুই কানে ঢোকালেন ডা. স্কট।

ক্লাউসনার মেশিনের প্যানেলের সুইচবোর্ড নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর কুড়োলটা হাতে নিয়ে পা ফাঁক করে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করল, 'কিছু শুনতে পাচ্ছেন?'

'কী শুনব?'

'কিছুই শুনতে পাচ্ছেন না?'

'শুধু একটা গুঞ্জন ধ্বনি শুনছি।'

ক্লাউসনার গাছে কোপ দিতে গিয়েও দিল না। গাছটা কী ভয়ানক আর্তনাদ করে উঠবে—এই চিন্তা ওকে দমিয়ে ফেলল।

'কী হলো?' জিজ্ঞেস করলেন ডাক্তার।

'কিছু না,' বলল ক্লাউসনার। কুড়োলটা মাথার ওপর তুলল সে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো পায়ের নীচের মাটি, যার গভীরে লুকিয়ে আছে গাছটির শিকড়, কেমন যেন কেঁপে উঠল। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে অনেক। কোপ পড়েছে বীচের গুঁড়িতে, সেঁধিয়ে গেছে ঝকঝকে ফলা। ঠিক এই সময় বিপুল আলোড়ন উঠল মাথার ওপর, যেন মড়মড় করে ভেঙে পড়ছে বিশাল এক ডাল, পাতায় পাতায় ঘর্ষণের শব্দে দু'জনেই ঝট করে ওপরে তাকাল। ডাক্তার চিৎকার করে বললেন, 'সাবধান! দৌড়াও, ক্লাউসনার! দৌড়াও!'

ইয়ারফোন এক ঝটকায় খুলে ফেলে পড়িমরি করে দৌড় দিলেন ডাক্তার স্কট, কিন্তু ক্লাউসনার আগের জায়গাতেই হতবুদ্ধির মত দাঁড়িয়ে থাকল, হাঁ করে তাকিয়ে আছে ষাট ফুট উঁচু গাছটার মগডালের দিকে। যেন দানবের হাত একটা, বিকট শব্দে ভেঙে পড়ল ওটা, সাঁ সাঁ করে নেমে আসতে লাগল নীচের দিকে, গেঁথে ফেলবে ক্লাউসনারকে। একটুর জন্য বেঁচে গেল সে, এক লাফে সরে দাঁড়িয়েছে শেষ মুহূর্তে। সোজা যন্ত্রটার ওপর আছড়ে পড়ল বিরাট ডালটা, টুকরো টুকরো করে ফেলল ওটাকে।

'ঈশ্বর বাঁচিয়েছেন তোমায়,' আবার আগের জায়গায় ফিরে এসেছেন ডাক্তার স্কট। 'ভাগ্যিস চাপা পড়োনি। পড়লে স্রেফ ভর্তা হয়ে যেতে।'

এখনও বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে ক্লাউসনার গাছটার দিকে। হাঁ হয়ে আছে মুখ, দৃষ্টিতে স্পষ্ট ভীতি। আস্তে এগোল সে সামনে, সাবধানে ফলাটা খুলে আনল গুঁড়ি থেকে।

'আপনি শুনেছেন তো?' ঘুরল সে ডাক্তারের দিকে।

এখনও হাঁপাচ্ছেন ডাক্তার স্কট, 'কী শুনব?'

'ইয়ারফোনে। কোপ দেয়ার সময় কিছু শোনেননি?'

ঘাড় ডলতে ডলতে ডাক্তার সাহেব জবাব দিলেন, 'আ...সত্যি বলতে কি...'একটু বিরতি দিলেন তিনি, দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরলেন নীচের ঠোঁট, 'না, মানে আমি ঠিক নিশ্চিত নই যে, কিছু শুনেছি কি না। তুমি গুঁড়িতে কোপ দেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তো ইয়ারফোন খুলে দৌড় দিলাম।'

'তা তো আমিও দেখেছি। কিন্তু আপনি কোন শব্দ শুনেছেন কি না বলেন।'

'ডাল ভাঙার শব্দ ছাড়া অন্য কোন শব্দ শুনেছি বলে তো মনে পড়ছে না,' বললেন তিনি।

'কিন্তু ওই শব্দটাই বা কী ধরনের ছিল?' এক পা বাড়ল ক্লাউসনার। স্থির তাকিয়ে আছে ডাক্তারের দিকে! 'ঠিক কী ধরনের শব্দ ছিল ওটা?'

'যাচ্চলে!' বললেন ডাক্তার। 'তা কী করে বলব! আমি তো তখন পালাতে ব্যস্ত।'

'ডাক্তার আঙ্কেল, ঠিক করে মনে করার চেষ্টা করুন ঠিক কী ধরনের শব্দ ছিল ওটা,' থেমে থেমে প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করল ক্লাউসনার।

'কসম, আমার মনে নেই। আমার মাথার ওপর গোটা গাছ ভেঙে পড়ছে আর আমি বোকার মত দাঁড়িয়ে থেকে ওটা কী শব্দ করছে তা শুনব! গাধার মত কথা বোলো না তো!'

কঠিন এবং ক্রূর দৃষ্টি ফুটল ক্লাউসনারের চোখের তারায়। ঝাড়া দশ সেকেণ্ড এক দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে থাকল ডাক্তারের দিকে। এ ক্লাউসনারকে অচেনা মনে হলো ডাক্তার স্কটের। অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন তিনি। কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঘুরে দাঁড়াবার ভঙ্গি করে বললেন, 'বেলা হয়ে গেছে। চলো এখন যাই।'

'দাঁড়ান,' হিম গলায় বলল খুদে মানুষটা। তার ফর্সা মুখে হঠাৎ যেন রক্তের বন্যা বয়ে গেল। লালচে হয়ে উঠেছে চেহারা। 'দাঁড়ান,' আবার বলল সে। 'আপনাকে এই জায়গাটা সেলাই করতে হবে,' গুঁড়ির গায়ের ক্ষতস্থানটা দেখাল সে। 'যত তাড়াতাড়ি পারেন কাজটা করুন।'

'কী বাজে বকছ!' বললেন ডাক্তার।

'যা বলছি করুন। সেলাই করুন,' ঠাণ্ডা গলায় বলল ক্লাউসনার, কিন্তু প্রচ্ছন্ন হুমকির সুরটা ঠিকই টের পেলেন ডাক্তার। মুঠিতে কুড়োলের হাতল শক্ত করে চেপে ধরার দৃশ্যটাও তাঁর চোখ এড়াল না।

'আহ, বাজে বকো না তো!' বললেন তিনি। 'আমি গাছের ক্ষত সেলাইয়ের কাজ পারি না। চলো, ফেরা যাক।'

'তা হলে আপনি সেলাই করতে পারবেন না?'

'সম্ভব নয়।'

'ঠিক আছে। আপনার ব্যাগে আয়োডিন আছে?'

'থাকলে কী হবে?'

'তা হলে ক্ষতস্থানে আয়োডিন ঢেলে দিন। জ্বালা করবে। কিন্তু কিছুটা কাজ হবে।'

'দেখো, অনেক বকবকানি হয়েছে। এখন বাড়ি গেলে চলো, না হলে আমি গেলাম।' যাবার জন্য পা বাড়ালেন ডাক্তার।

'ক্ষতস্থানে আয়োডিন ঢেলে দিয়ে যান,' আবার শীতল কণ্ঠে আদেশ করল ক্লাউসনার।

ইতস্তত করতে লাগলেন ডাক্তার স্কট, দেখলেন কুড়োলের হাতলে

ক্লাউসনারের মুঠি শক্ত হয়ে গেছে। চোখে অদ্ভুত শূন্য দৃষ্টি। পাগলটা যা বলছে তাই করি, মনে মনে ভাবলেন তিনি। নইলে রাগের মাথায় আবার কী অঘটন ঘটিয়ে ফেলে।

'ঠিক আছে,' বললেন তিনি। 'দিচ্ছি আমি আয়োডিন লাগিয়ে।'

ডাক্তারি ব্যাগ খুলে আয়োডিনের বোতল আর কিছু তুলা বের করলেন স্কট। তুলোয় কিছু আয়োডিন ভিজিয়ে বীচ গাছটার কাটা জায়গাটায় ঘষতে লাগলেন। তারপর ওটা গর্তের মধ্যে ঠেসে দিলেন। চোরা চোখে দেখলেন কুড়োল হাতে তাঁর পাশে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে ক্লাউসনার।

'দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ,' বললেন ডাক্তার।

'এখন ওপরের ক্ষতেও আয়োডিন লাগান।'

ক্লাউসনার প্রথমে যে জায়গায় কুড়োলের কোপ বসিয়েছিল সেখানে আয়োডিন ভেজানো তুলো পুরে দিলেন ডাক্তার সাহেব। 'হয়ে গেছে,' বললেন তিনি।

সিধে হলেন ডাক্তার, বেশ সতর্কভাবে পরীক্ষা করলেন ক্ষতস্থানে ঠিকমত তুলো পোরা হয়েছে কি না। সন্তুষ্ট মনে হলো তাঁকে। 'এতেই কাজ হবে,' বললেন তিনি।

ক্লাউসনারও পরীক্ষা করে দেখল। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, আপাতত চলে যাবে।' এক পা পিছিয়ে এল সে। 'কাল এসে আবার চোখ বুলাবেন তো?'

'অবশ্যই,' বললেন ডাক্তার।

'আবার কিছু আয়োডিনও লাগাবেন?'

'প্রয়োজন হলে অবশ্যই লাগাব।'

'ধন্যবাদ, আঙ্কেল,' দরাজ গলা ক্লাউসনারের। কুড়োলটা ফেলে দিল দূরে। বিশাল হাসি ফুটে উঠল মুখে। আনন্দে ঝকঝক করছে চোখ। দু'হাতে ডাক্তার স্কটকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'কিছু মনে করবেন না, আঙ্কেল। হঠাৎ বেয়াদবি করে ফেলেছি। চলুন, এখন বাড়ি ফেরা যাক।'

মূলঃ রোল্ড ডাহ্‌ল

বৃষ্টি, তুমি এসো না

'ওই যে সে আবার,' জানালার খড়খড়ি দিয়ে কৌতূহলী চোখে তাকাল লিলিয়ান রাইট। 'সেই মহিলা, জর্জ।'

'কার কথা বলছ?' জিজ্ঞেস করল তার স্বামী। টিভির চ্যানেল অ্যাডজাস্ট করার চেষ্টা করছে। খেলা দেখবে।

'মিসেস সাক্কারো,' বলল লিলিয়ান। 'আমাদের নতুন প্রতিবেশী।'

'আচ্ছা।'

'সানবাথ করছে। সব সময় দেখি সানবাথে ব্যস্ত। মহিলার ছেলেটাকে আজ অবশ্য দেখতে পাচ্ছি না। এরকম ঝলমলে দিনে প্রায়ই দেখি ওদের উঠোনে দাঁড়িয়ে বল খেলছে। ছেলেটাকে কখনও দেখেছ, জর্জ?'

'ওর গল্প শুনেছি। সারাক্ষণই নাকি বাড়ির দেয়াল লক্ষ্য করে বল ছোঁড়ার প্র্যাকটিস করে।'

'ছেলেটা ভারি চমৎকার। শান্ত-শিষ্ট, ভদ্র। টমি ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতালে মন্দ হয় না। ছেলেটার বয়স টমির মতই। দশ-টশ হবে।'

'টমি সেধে কারও সাথে আলাপ জমাতে যায় না, জানোই তো।'

'অবশ্য সাক্কারোরা একটু রিজার্ভ টাইপের। নিজেকে গুটিয়ে রাখতেই বোধ হয় পছন্দ করেন। মি. সাক্কারো কী করেন জানিও না।'

'জানার দরকার কী? যা খুশি করুক।'

'লোকটাকে কখনও বাইরে যেতে দেখিনি, জানো। বেকার নাকি?'

'আমাকেও তো কেউ বাইরে যেতে দেখে না।'

'বারে! তুমি তো লেখক। বাড়িতে বসে লেখো। কিন্তু ওই লোক আসলে করেটা কী?'

'আমার ধারণা মিসেস সাক্কারোও জানেন না তাঁর স্বামী কী করেন। আর আমি কী কাজ করি তা জানেন না বলে তাঁর পেটের ভাতও নিশ্চয়ই হজম হচ্ছে না।'

'ওহ্, জর্জ,' জানালার কাছ থেকে চলে এল লিলিয়ান। বিতৃষ্ণা নিয়ে তাকাল টিভির দিকে। সোয়েডিয়েনস্ট ব্যাট করছেন।

'আমাদের একবার চেষ্টা করা উচিত, প্রতিবেশীদেরও উচিত।'

'কীসের চেষ্টা?' সোফায় নড়ে-চড়ে আরাম করে বসল জর্জ, হাতে কোকের পেল্লায় ক্যান। এই মাত্র খুলেছে ক্যানটা। গায়ে স্বেদ বিন্দু।

'ওদের সাথে দেখা করব।'

'তুমি না মহিলার সঙ্গে কথা বলেছ?'

'সে তো শুধু "হ্যালো" বলেছি। দু'মাস হলো ওরা এসেছে। এর মাঝে হাই-

হ্যালো ছাড়া কোন কথা হয়নি আমাদের। আসলে মহিলা খুব অদ্ভুত।'

'কেন?'

'সারাক্ষণ দেখি তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। আকাশে সামান্য মেঘ জমলেই হয়েছে। মহিলা ঘর ছেড়েই বেরোবে না। একবার ছেলেটা বাইরে খেলছে, হঠাৎ মহিলা ব্যাকুল হয়ে ডাকতে শুরু করল তার ছেলেকে। বলল বৃষ্টি আসবে। ছেলে মায়ের কথা শুনে এক দৌড়ে ঘরে। অথচ তখন ফকফকা রোদ। আকাশের এককোণে অল্প জমেছে মাত্র।'

'বৃষ্টি হয়েছিল?'

'আরে না। খামোকাই উঠোনে দৌড়ে গেছি আমি।'

লিলিয়ান রান্নাঘরে আছে, পেছন থেকে ডাক দিল জর্জ। 'ওরা অ্যারিজোনা থেকে এসেছে তো। তাই কখন বৃষ্টি হবে বুঝতে পারে না। মেঘ দেখলেই ভাবে বৃষ্টি নামবে।'

ঘুরে দাঁড়াল লিলিয়ান। 'ওরা কোত্থেকে এসেছে বললে?'

'অ্যারিজোনা। টমি বলেছে।'

'টমি জানল কী করে?'

'ওদের ছেলেটার সঙ্গে ওর কথা হয়েছে। বল খেলছিল দু'জনে একসাথে। ছেলেটা টমিকে বলেছে ওরা অ্যারিজোনা থেকে এসেছে। টমি এটুকুই শুনেছে। এরপর ছেলেটার মা তাকে ভেতরে ডেকে নিয়ে যায়। তবে জায়গাটা আলাবামাও হতে পারে। কারণ, তোমার ছেলের স্মরণশক্তির বহর তো জানই। কিছুই মনে রাখতে পারে না। তবে বৃষ্টি নিয়ে ওদের এত দুশ্চিন্তার কথা শুনে মনে হচ্ছে ওরা অ্যারিজোনা থেকেই এসেছে। ওখানে তো বৃষ্টি-টৃষ্টি কম হয়।'

'এ কথা তুমি আমাকে আগে বললে না কেন?'

'কারণ, টমি খবরটা আজকেই আমাকে দিয়েছে। ভেবেছি তোমাকেও বলেছে।'

আবার জানালার দিকে পা বাড়াল লিলিয়ান। 'মহিলার আসল পরিচয় আমাকে জানতেই হবে।' সে খড়খড়িতে চোখ রাখল। যা ভেবেছে তাই। মহিলা আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে উদ্বেগ নিয়ে।

দিন দুইয়ের জন্যে লাইব্রেরিতে গিয়েছিল জর্জ রেফারেন্স বই ঘাঁটতে। বাড়ি ফিরল বইয়ের পাহাড় নিয়ে। লিলিয়ান হাসতে হাসতে দরজা খুলে দিল; বলল, 'কাল তুমি কিছুই করছ না।'

'কথাটা যেন ঘোষণার মত শোনাল!'

'ঘোষণাই। কাল আমরা সাক্কারোদের নিয়ে মার্ফি পার্কে যাচ্ছি।'

'কাদের নিয়ে?'

'আমাদের প্রতিবেশীদের নিয়ে। আশ্চর্য, সাক্কারোদের নাম এর মধ্যে ভুলে গেছ?'

'ভুলো মন তো। যাক, কীভাবে ম্যানেজ করলে ওদেরকে?'

'আজ সকালে ওদের বাসায় গিয়েছিলাম। বেল টিপলাম।'

'তারপর?'

'বেল টিপে ধরেই আছি। দরজা খোলে না। মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় দরজা খুলে গেল।'

'মহিলা তোমাকে ভাগিয়ে দেয়নি?'

'আরে না। মহিলা খুব ভাল। আমাকে ভেতরে যেতে বলল। জানে তো আমি কে। বলল তার বাসায় এসেছি বলে সে খুব খুশি।'

'তারপর তুমি তাকে মার্ফি পার্কে যাবার পরামর্শ দিলে?'

'ঠিক ধরেছ। ভাবলাম বাচ্চারা মজা পায় এমন কোথাও যাবার কথা বললে মহিলার সাথে সখ্য গড়ে উঠতে সময় লাগবে না। মহিলা তো তার ছেলেকে নিয়ে বেরোতেই চায় না।'

'কোন-কোন মা অমনই হয়। সন্তানকে নিয়ে সবসময় দুশ্চিন্তা করে।'

'মহিলার বাসা যদি তুমি দেখতে! এমন ঝকঝকে তকতকে রান্নাঘর আমি জীবনে দেখিনি।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, দেখে মনেই হয় না এই রান্নাঘরে মহিলা কোনদিন রান্না করেছে। আমি পানি খেতে চাইলাম। ট্যাপ থেকে পানি এনে দিল মহিলা। এত সাবধানে গ্লাস ভরল যে এক ফোঁটা পানিও পড়ল না গ্লাসের বাইরে। তারপর পরিষ্কার ন্যাপকিন দিয়ে গ্লাস পেঁচিয়ে আমাকে পানি দিল।'

'তুমি বলা মাত্র মহিলা রাজি হয়ে গেল পার্কে যেতে?'

'না। সাথে সাথে রাজি হয়নি। স্বামীকে ডেকে জানতে চাইল আবহাওয়ার খবর। স্বামী বলল সবগুলো খবরের কাগজে সে পড়েছে কাল আবহাওয়া ভাল থাকবে। তবে সে রেডিওর সর্বশেষ আবহাওয়াবার্তাও শুনবে।'

'সব কাগজে তাই লিখেছে?'

'হ্যাঁ। ওরা আবহাওয়াবার্তার সমস্ত খবর জোগাড় করে রাখে দেখলাম। গাদা গাদা খবরের কাগজ ওদের বাড়িতে।'

'আর কী দেখলে?'

'দেখলাম মহিলা আবহাওয়া ব্যুরোর সাথে ফোনে কথা বলল। তাদের কাছে আবহাওয়া সম্পর্কিত লেটেস্ট খবরাখবর জানতে চাইল। তারপর স্বামীকে খবরটা জানাল। শেষে বলল ওরা যাবে। তবে আবহাওয়ার হঠাৎ কোন পরিবর্তন ঘটলে ফোন করবে আমাদেরকে।'

'বেশ, আমরা তা হলে কাল যাচ্ছি।'

সাক্কারো পরিবারের সবাই সুশ্রী এবং হাসিখুশি মেজাজের। বাসা থেকে বেশ খানিকটা দূরে জর্জদের গাড়ি দাঁড় করানো। সাক্কারোরা হেঁটে এল গাড়িতে। সুদর্শন, তরুণ পরিবার-প্রধানকে দেখে জর্জ তার স্ত্রীর কানে ফিসফিস করে বলল,

'তা হলে এই মানুষটিই তোমার আগ্রহের মূল কারণ।'

'হলে ভালই হত,' হালকা গলায় বলল লিলিয়ান, 'আচ্ছা, ভদ্রলোকের হাতে ওটা কী?'

'পকেট-রেডিও। আবহাওয়ার খবর শোনার জন্যে এনেছে নিশ্চয়ই।'

সাক্কারোদের ছেলেটা দৌড়াতে দৌড়াতে এল। হাতে বায়ু-চাপ মাপার যন্ত্র। তিনজনে মিলে বসল পেছনের সিটে। আলাপচারিতা জমে উঠতে সময় লাগল না।

সাক্কারোদের ছেলেটা সত্যি খুব ভদ্র আর বিনয়ী। মুখচোরা টমিকে ওর পাশে ম্লানই লাগল। লিলিয়ান বেশ মজা পাচ্ছে গল্প করতে। মনে হচ্ছে এত আনন্দ সে কখনও পায়নি।

মি. সাক্কারো রেডিওর ভলিউম কমিয়ে কানের কাছে ধরে রেখেছে। আবহাওয়াবার্তা শুনছে। তাকে একবারের জন্যেও রেডিও নামিয়ে রাখতে দেখা গেল না।

আজকের দিনটি ভারি সুন্দর। ঝকঝকে, ঝলমলে। তেমন গরমও পড়েনি। ঝিরঝির হাওয়া বইছে। আকাশ নীল টলটলে। মি. সাক্কারো তার ছেলের বায়ু-চাপ মাপার যন্ত্রের দিকে সতর্ক চোখে তাকাল। নাহ্, বৃষ্টি আসার কোন সম্ভাবনা নেই।

লিলিয়ান দুই বাচ্চাকে নিয়ে পার্কের বিনোদন কেন্দ্রে ঢুকল। অনেকগুলো টিকেট কিনল। সবগুলো রাইডে চড়ল। তাকে একাই সব টিকেট কিনতে দেখে মৃদু আপত্তি করল মিসেস সাক্কারো।

'প্লিজ,' তার হাত ধরে বলল লিলিয়ান। 'এবার আমাকে আপ্যায়ন করার সুযোগ দিন। পরেরবার আপনার।'

রাইড-টাইডে চড়ে স্বামীর কাছে এসে লিলিয়ান দেখল জর্জ একা। 'আরে—' বলতে গেল লিলিয়ান। তাকে থামিয়ে দিল জর্জ। 'মি. সাক্কারো রিফ্রেশমেন্ট স্ট্যাণ্ডের দিকে গেছেন। তাঁকে বলেছি তোমাদের জন্যে এখানে অপেক্ষা করব। তোমরা এলে তোমাদের সঙ্গে যোগ দেব।' তার কণ্ঠ কেমন গম্ভীর শোনাল।

'কোন সমস্যা?'

'না। কোন সমস্যা নেই। তবে মি. সাক্কারোকে আমার একটু অদ্ভুত মনে হয়েছে।'

'কী রকম?'

'লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে বেশ পয়সাঅলা। তবে বুঝতে পারছি না ওর আয়ের উৎসটা কী—'

'এখন কার বেশি কৌতূহল জাগছে, সাহেব?'

'না...মানে...তোমার কৌতূহল নিরসনের জন্যেই...মি. সাক্কারো বললেন উনি হিউম্যান নেচারের ছাত্র।'

'এজন্যেই এমন ভাবুক স্বভাবের আর এত-এত পত্রিকা পড়েন।'

'হতে পারে। তবে ওরা যে অ্যারিজোনা থেকে আসেনি এখন তা বুঝতে পারছি।'

'ওরা অ্যারিজোনার লোক নয়?'

'না। অ্যারিজোনার কথা বলতে ভদ্রলোক খুব অবাক হলেন। তারপর হেসে উঠে জানতে চাইলেন তাঁর কথায় অ্যারিজোনার টান আছে কি না।'

লিলিয়ান কী যেন ভাবল। তারপর বলল, 'অবশ্য ভদ্রলোকের অ্যাকসেন্টটা ঠিক বোঝা যায় না। দক্ষিণ-পশ্চিমে স্প্যানিশ বংশের অনেক মানুষ আছে। কাজেই ওরা অ্যারিজোনার হতেও পারে। আর সাক্কারো নামটা স্প্যানিশ হওয়াও বিচিত্র নয়।'

'আমার কাছে জাপানী জাপানী মনে হয়। যাক গে, চলো। ওরা অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে। আরে দেখো, ওরা কী নিয়ে আসছে।'

সাক্কারো দম্পতির হাতে রেশমী মিঠাইয়ের স্টিক। চিনির তৈরি গোলাপী মিঠাইগুলো ফোমের মত ফুলে আছে। মুখে দেয়া মাত্র গলে যায়। মিষ্টির আঠাল ভাব থেকে যায় জিভে।

সাক্কারোরা একটা করে মিঠাই দিল জর্জদের। ওরা খুশি হয়ে নিল।

মিঠাই খেয়ে আরও কিছুক্ষণ পার্কে ঘুরল ওরা। গুলি করে বেলুন ফাটাল, ছবি তুলল, টেপ রেকর্ডারে রেকর্ড করল গলা, এমনকী পাঞ্জাও লড়ল।

ঘোরাঘুরি করে খিদে পেয়ে গেছে টমির। সে হট-ডগ খাবে। জর্জ তাকে হট-ডগ কেনার পয়সা দিল। দোকানের দিকে ছুটল টমি। টমির সঙ্গে সাক্কারো পরিবারও গেল।

'আমার যেতে ইচ্ছে করছে না,' বলল জর্জ। 'আবার যদি ওরা রেশমী মিঠাই কিনে আনে, স্রেফ বমি করে দেব আমি।'

'জানি। তবে ওরা এবার শুধু বাচ্চাদের জন্যে মিঠাই কিনছে,' বলল লিলিয়ান। কাছেই রিফ্রেশমেন্ট স্ট্যাণ্ড। সাক্কারোদের দেখা যাচ্ছে এখান থেকে।

'আমি মি. সাক্কারোকে হ্যামবার্গার খাওয়াতে চাইলাম। উনি মুখ অন্ধকার করে এদিক-ওদিক মাথা নাড়লেন। খাবেন না,' বলল জর্জ।

'আর আমি মিসেস সাক্কারোকে অরেঞ্জ স্কোয়াশ খাওয়ার কথা বলতেই উনি এমন জোরে লাফ মেরে উঠলেন যেন ড্রিঙ্কটা আমি ওঁর মুখে ছুঁড়ে মেরেছি,' বলল লিলিয়ান। 'আসলে এরকম জায়গায় ওরা আগে কখনও আসেনি তো, তাই পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে সময় লাগছে।'

'রেশমী মিঠাই বোধহয় ওদের খুব প্রিয়। তাই খালি ওগুলোই খাচ্ছে।'

'হতে পারে।' সাক্কারোদের দিকে পা বাড়াল জর্জ। 'বৃষ্টি আসছে, লিলি।'

মি. সাক্কারো রেডিও চেপে রেখেছে কানে, উদ্বেগ নিয়ে বারবার পশ্চিম আকাশের দিকে তাকাচ্ছে। জর্জদের দেখে যেন ধড়ে প্রাণ ফিরে পেল। বলল এখনই বাড়ি ফিরতে চায়। কারণ, আকাশের মতি-গতি সুবিধের ঠেকছে না। ঝড় আসতে পারে। মিসেস সাক্কারো প্রায় ফুঁপিয়ে উঠল। অভিশাপ দিতে লাগল আবহাওয়া বিভাগের লোকজনকে। তাদেরকে সান্ত্বনা দিল জর্জ, 'স্থানীয় আবহাওয়া সম্পর্কে আগেভাগে ভবিষ্যদ্বাণী করা মুশকিল। বৃষ্টি না-ও আসতে পারে। আর আসলেও আধঘন্টার বেশি ঝরবে বলে মনে হয় না।'

এ কথা শুনে কেঁদে ফেলল সাক্কারোদের ছেলে। আর মিসেস সাক্কারো চোখে রুমাল চেপে ফোঁপাতে লাগল।

বৃষ্টিতে এদের এত ভয় কেন, অবাক হয়ে ভাবল জর্জ। সে হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'ঠিক আছে, চলুন। বাড়ি ফিরি তা হলে।'

ফিরতি যাত্রাটা হলো খুবই নিরানন্দময়। কেউ কোন কথা বলল না। মি. সাক্কারো বেশ জোরেই রেডিও ছেড়েছে, নব ঘোরাচ্ছে স্টেশন থেকে স্টেশনে, আবহাওয়া সংবাদ শুনছে। আবহাওয়াবার্তায় বজ্রসহ বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে।

সাক্কারোদের ছেলের বায়ু-চাপ মাপার যন্ত্র অর্থাৎ ব্যারোমিটারের কাঁটা দ্রুত নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে। মিসেস সাক্কারো থুতনির ওপর হাত রেখে চুপচাপ বসে আছে। ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছে আকাশের দিকে। জর্জকে অনুরোধ করছে আরও জোরে গাড়ি চালাবার জন্যে।

হঠাৎ বাতাস উঠল, ধুলোয় ভরে গেল সামনের রাস্তা। ওরা তখন ওদের বাড়ির রাস্তায় চলে এসেছে। বাতাসে শুকনো পাতা উড়তে লাগল। আকাশের বুক চিরে ঝিলিক দিল বিদ্যুৎ।

জর্জ বলল, 'আর দু'মিনিটের মধ্যে বাসায় পৌঁছে যাবেন, বন্ধুগণ। দুশ্চিন্তা করবেন না।'

গাড়ি থেকে নেমে গেট খুলল জর্জ। এই গেট ধরে সোজা রাস্তা চলে গেছে সাক্কারোদের বাড়ির দিকে। হঠাৎ টপ করে একটা ফোঁটা পড়ল ওর মাথায়। ঠিক সময়েই চলে এসেছি, ভাবল জর্জ।

কাঁপতে কাঁপতে গাড়ি থেকে নামল সাক্কারো পরিবার। তাদের মুখ শুকিয়ে এতটুকু। বিড়বিড় করে ধন্যবাদ দিল জর্জদের। তারপর রাস্তার শেষ মাথায়, নিজেদের বাড়ির উদ্দেশে পড়িমরি করে দৌড় দিল।

'সত্যি,' বলল লিলিয়ান, 'এরা বৃষ্টি যে এত ভয় পায়...'

লিলিয়ানের কথা শেষ হলো না, আকাশ ফুঁড়ে করে বড়-বড় ফোঁটা নিয়ে ঝুপঝুপিয়ে নেমে এল বৃষ্টি। যেন স্বর্গের বাঁধ হঠাৎ বিস্ফোরিত হয়েছে। ড্রাম পিটানোর শব্দে জর্জদের গাড়ির ওপর ঝমঝমিয়ে পড়তে লাগল জলধারা। সাক্কারো পরিবার অর্ধেক পথও যেতে পারেনি, দাঁড়িয়ে পড়ল। হতাশ হয়ে তাকাল নিজেদের শরীরের দিকে।

বৃষ্টিতে ওদের মুখগুলো ঝাপসা দেখাল; ঝাপসা এবং সঙ্কুচিত। ছোট হয়ে আসছে ওরা। তিনজনের শরীরই কুঁচকে ছোট হয়ে গেল, গা থেকে খসে পড়ল জামাকাপড়। তারপর তিনটে স্তূপ হয়ে পড়ে রইল রাস্তার ওপর।

নিজেদের গাড়িতে বসে অবিশ্বাস্য দৃশ্যটা আতঙ্কিত হয়ে দেখল জর্জ পরিবার। লিলিয়ান কোনমতে ফিসফিস করে বলল, 'ওরা চিনি দিয়ে তৈরি! তাই পানিতে গলে যাবার ভয় পাচ্ছিল!!'

মূলঃ আইজাক আসিমভ

মুচকি হাসি

[খ্যাতিমান সায়েন্স ফিকশন লেখক আইজাক আসিমভ 'দ্য ব্ল্যাক উইডোয়ার্স' নামে রহস্য গল্পের একটি সিরিজ রচনা করেন ১৯৭০-এর দশকের শুরুতে। পুরুষ চরিত্র-প্রধান এ সিরিজ নিয়ে মোট ৬৬টি গল্প লিখেছেন আসিমভ। বেশিরভাগই ছাপা হয়েছে 'ইলেরি কুইনস মিস্ট্রি ম্যাগাজিন'-এ। দারুণ জনপ্রিয় এ রহস্য গল্পগুলো গড়ে উঠেছে ছয়জন ক্লাব সদস্যকে নিয়ে, যারা নিউ ইয়র্কের মিলানো রেস্টুরেন্টের একটি প্রাইভেট রুমে প্রতি মাসে একবার মিলিত হয়। সেখানে একজন সদস্য হোস্টের দায়িত্ব পালন করে এবং সে সঙ্গে একজন অতিথিকে নিয়ে আসে। অতিথিটি হতে পারে তার বন্ধু, আত্মীয় কিংবা সহকর্মী (এখানে কোনও মহিলার প্রবেশাধিকার নেই)। তাদেরকে খাবার পরিবেশন করে ওয়েটার হেনরি। ব্ল্যাক উইডোয়ার্স ক্লাবের প্রতিটি সদস্যই হেনরিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখে। কারণ, গল্পের শেষে দেখা যায় মিতভাষী এই ওয়েটারটিই কঠিন সব রহস্যের জলবৎ তরলং সমাধান করে দিচ্ছে। সাধারণত যে অতিথিটিকে নিমন্ত্রণ করা হয় তার কোনও কঠিন সমস্যা নিয়েই সদস্যরা মাথা ঘামায়। এই সদস্যদের মধ্যে রয়েছে: জিওফ্রি আভালন, পেশায় আইনজীবী; ইমানুয়েল রুবিন, রহস্য লেখক; রসায়নবিদ জেমস ড্রেক; ক্রিপটোগ্রাফি এক্সপার্ট টমাস ট্রামবুল; চিত্রশিল্পী মারিয়ো গনজালো এবং ছড়াকার ও হাই স্কুলের অঙ্ক শিক্ষক রজার হ্যালস্টিড। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আসিমভের এই চরিত্রগুলো কোনওটিই কাল্পনিক নয় (ওয়েটার হেনরি ছাড়া)। ব্ল্যাক উইডোয়ার্স ক্লাবটি গড়ে উঠেছে 'ট্র্যাপডোর স্পাইডার্স' ক্লাবের অনুকরণে। লেখক ফ্লেচার প্র্যাট ১৯৪৪ সালে এ ক্লাবটি প্রতিষ্ঠা করেন। এখানেও আসিমভের গল্পের মত অতিথিদেরকে 'গ্রিল' বা জেরা করা হত। ক্লাবের সদস্য সংখ্যা ছিল ১৩। ওখানে নানান পেশার মানুষজন আসতেন। আসিমভ নিজেও কিছুকাল ক্লাবটির সদস্য ছিলেন।

আইজাক আসিমভের ব্ল্যাক উইডোয়ার্স সিরিজের রহস্য গল্পগুলোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো: এর সমাধান ঘরে বসেই এমন নিপুণভাবে দেয়া হয় যে, বিস্ময়ে পাঠক হাঁ হয়ে যান। আমার অসম্ভব ভাল লেগেছে গল্পগুলো। সেই ভাল লাগাটুকু পাঠকের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতেই আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। 'মুচকি হাসি' গল্পটি আসিমভের 'দ্য অ্যাকুইজিটিভ চাকল'-এর অনুবাদ।]

সেই রাতে ব্ল্যাক উইডোয়ার্সের মাসিক মিটিং-এর অতিথি ছিল হেনলি বারট্রাম। প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট দিনে মিটিংটির আয়োজন করে ব্ল্যাক উইডোয়ার্স ক্লাবের ছয় সদস্য মিলে। এবং এখানে কোনও মহিলার প্রবেশ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

আজকের মিটিং-এ অবশ্য একজন সদস্য অনুপস্থিত। বাকি পাঁচজনকে নিয়েই মিটিং চলছে।

জিওফ্রি আভালন এবারের মিটিং-এ হোস্টের দায়িত্ব পালন করছে। সে বেশ লম্বা, নিখুঁতভাবে ছাঁটা গোঁফ, গালে অল্প দাড়ি, বেশিরভাগই পেকে গেছে, তবে তার চুল অমাবস্যা রাতের মত কালো।

হোস্ট হিসেবে তার দায়িত্ব ডিনার শুরুর আগে আচার বা প্রথা অনুযায়ী টোস্ট করা! সে টোস্ট করার পরে অন্য সবাই 'আমেন' বলে চেঁচিয়ে উঠল এবং মদের গ্লাসে ঠোঁট স্পর্শ করে বসে পড়ল। আভালন ড্রিঙ্কের গ্লাসটি প্লেটের পাশে রাখল। এটি তার দ্বিতীয় ড্রিঙ্ক। অর্ধেকটা ভরা। ডিনারের সারাটা সময় গ্লাসটি এরকমই থাকবে এবং এটি আর স্পর্শ করা হবে না। সে পেশায় একজন পেটেন্ট লইয়ার। সে তেমন একটা মদ পান করে না। এ ধরনের অনুষ্ঠানে দেড় গ্লাস মদ পানই তার জন্য যথেষ্ট।

একেবারে শেষ মুহূর্তে সিঁড়ি বেয়ে থপথপ করে উঠে এলেন টমাস ট্রামবুল এবং ঘরে ঢুকেই যথারীতি সেই চিরাচরিত হাঁক, 'হেনরি। মরণাপন্ন একজন মানুষের জন্য স্কচ আর সোডা নিয়ে এসো।'

হেনরি বহু বছর ধরে এ ক্লাবে ওয়েটারের দায়িত্ব পালন করে আসছে। সে ট্রামবুলের জন্য আগেই স্কচ এবং সোডা রেডি করে রেখেছিল। তার বয়স ষাট হলেও মুখ বলিরেখার দাগশূন্য এবং বেশ রাশভারী চেহারা। সে খুব আস্তে কথা বলে। বলল, 'এই নিন, মিস্টার ট্রামবুল।'

বারট্রামের দিকে চোখ গেল ট্রামবুলের, আভালনকে এক পাশে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার গেস্ট?'

'ও নিজেই থাকতে চাইল,' ফিসফিস করে বলল আভালন। 'ভাল লোক। তোমার পছন্দ হবে।'

ডিনার পর্ব শুরু হলো যথারীতি ব্ল্যাক উইডোয়ার্সের সদস্যদের বিবিধ আলোচনার মাঝ দিয়ে। ইমানুয়েল রুবিন, আরেক দাড়িঅলা, সম্প্রতি রাইটার্স ব্লক থেকে মুক্তি পেয়ে কীভাবে একটি গল্প লিখে ফেলেছে–তার বিস্তারিত বর্ণনা দিতে লাগল। জেমস ড্রেক, চৌকোনা মুখ, মোচ আছে, দাড়ি নেই, অন্যান্য গল্পের কথা স্মরণ করে মাঝে-মাঝে ব্যাঘাত ঘটাল রুবিনের কথার মাঝখানে। সে একজন অর্গানিক কেমিস্ট হলেও পাল্প ফিকশন সম্পর্কে অগাধ জ্ঞান তার।

ট্রামবুল, একজন কোড এক্সপার্ট এবং নিজেকে সরকারের হোমরা-চোমরা কর্তাব্যক্তি বলে দাবি করে থাকেন, কিছুদিন আগে ক্লাবের আরেক সদস্য চিত্রকর মারিয়ো গনজালোর একটি চিত্র প্রদর্শনী দেখেছেন এবং ওটা ভাল লাগেনি বলে আর্টিস্টকে লক্ষ্য করে চেঁচামেচি করছিলেন। তবে গনজালো তাঁর গালাগাল গায়ে না মেখে মৃদু-মৃদু হাসতে থাকল।

বারট্রাম, বেঁটেখাট, স্থূলকায়, মাথার কোঁকড়া চুলে ছোট-ছোট কুঞ্চন, অতিথির ভূমিকায় শক্ত করে সেঁটে রইল। সে সবার কথা শুনছে, সবার দিকে

তাকিয়ে হাসছে, তবে নিজে কথা বলছে খুবই কম।

অবশেষে সেই সময়টি উপস্থিত হলো, মানে হেনরি সবাইকে কফি দিয়ে ডেজার্ট পরিবেশন করতে লাগল, এবং এটিই কোনও অতিথিকে জেরা করার মোক্ষম সময়।

ঐতিহ্যগতভাবে প্রশ্নকর্তার ভূমিকা সব সময়ই পালন করে থাকেন টমাস ট্রামবুল। তাঁর শ্যামবর্ণ মুখে বারোমেসে অসন্তোষের চিহ্ন দৃশ্যমান, প্রথম প্রশ্নটি যখন করলেন, তাঁকে বেশ রাগী-রাগী দেখাল। 'মিস্টার বারট্রাম, আপনার অস্তিত্বকে কীভাবে জাস্টিফাই করবেন?'

হাসল বারট্রাম। শুদ্ধ উচ্চারণে জবাব দিল, 'এ চেষ্টাটি আমি কখনও করিনি। আমার ক্লায়েন্টরা, আমি যখন তাদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারি, তারা আমার অস্তিত্ব জাস্টিফায়েড হতে দেখে।'

'আপনার ক্লায়েন্ট?' বলল রুবিন। 'আপনি কী করেন, মিস্টার বারট্রাম?'

'আমি একজন শখের গোয়েন্দা।'

'গুড,' বলল জেমস। 'এরকম কারও সঙ্গে আমাদের আগে কখনও পরিচয় হয়নি। ম্যানি, তুমি যখন তোমার সেই টাফ গাইকে নিয়ে হাবিজাবি লিখবে, একটু পরিবর্তনের জন্য সঠিক ডেটা পেয়ে যাবে।'

'আমার কাছ থেকে নয়,' দ্রুত বলে উঠল বারট্রাম।

ঘাউ করে উঠলেন ট্রামবুল, 'ইফ ইউ ডোন্ট মাইণ্ড, জেন্টলমেন, আমাকে প্রশ্নকর্তার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, কাজেই দয়া করে ব্যাপারটি আমার ওপর ছেড়ে দাও। মিস্টার বারট্রাম, আপনি বললেন কিছু অকেশনের কথা যা আপনাকে সন্তুষ্ট করে। আপনি কি সব সময়ই "সন্তুষ্টি" লাভ করেন?'

'এটি একটি বিতর্কিত বিষয়,' বলল বারট্রাম। 'আমি আসলে আজ আপনাদের সাথে এমন একটি বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই যা প্রশ্নবিদ্ধ। হয়তো আমার বিষয়টি নিয়ে আপনারা সাহায্য করতে পারবেন। আমি যখন প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে বিস্তারিত শুনি, তখন আমার সুবন্ধু জেফ আভালোনকে বলি এখানে আমাকে আমন্ত্রণ করার জন্য। সে আমার আবদার মেনে নেয় এবং আমি খুব খুশি হই।'

'আপনার সন্দেহপূর্ণ সন্তুষ্টি নিয়ে আপনি কি আলোচনা করতে চান, নাকি চান না?'

'চাই, যদি আপনারা অনুমতি দেন।'

ট্রামবুল অন্যদের দিকে তাকালেন তারা এ ব্যাপারে দ্বিমত প্রকাশ করে কি না দেখতে। কিন্তু কেউ কিছু বলল না। গনজালো মেনু কার্ডের পেছনে নতুন অতিথির ছবি আঁকছিল। ছবি মানে ক্যারিকেচার। এটি সে সব সময়ই করে। ক্যারিকেচারগুলো পরে স্থান পায় দেয়ালে, অন্যান্য সব ছবির সঙ্গে।

বারট্রাম কফির কাপে চুমুক দিল। 'গল্পের শুরু অ্যাণ্ডারসনকে নিয়ে। সে একজন অ্যাকুইজিটর।'

'ইকুইজিটর?' ভুরু কোঁচকাল গনজালো।

'অ্যাকুইজিটর। সে জিনিসপত্র সংগ্রহ করে, কেনে, রাস্তায় পছন্দসই কিছু চোখে পড়লে তা তুলে নিয়ে আসে। তার একটি বাড়ি আছে এসব জিনিসে ঠাসা। তার একজন বিজনেস পার্টনার ছিল। জ্যাকসন নাম।'

এমন সময় বাধা দিলেন ট্রামবুল। ভুরু কোঁচকানো। সব সময়ই তাঁর ভুরু কুঁচকে থাকে। 'এটি কি কোনও সত্য ঘটনা?'

'আমি শুধু সত্য ঘটনাই বলি,' মন্থর ও সুস্পষ্ট কণ্ঠে বলল বারট্রাম। 'বানিয়ে বলার মত কল্পনাশক্তি আমার নেই।'

'এটি কি কনফিডেনশিয়াল?'

'আমি এমনভাবে গল্পটি নিশ্চয় বলব না যাতে সহজেই ধরে ফেলা যায়। তবে গল্পটি বুঝে ফেলতে পাররাখাণটি কনফিডেনশিয়াল বলে বিবেচিত হবে।'

'আমি শর্ত মেনে চলি,'নে ঃলেন ট্রামবুল। 'তবে আপনাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি, এই চার দেয়ালের মধ্যে পাথা বলা হবে তা কখনও বাইরে ফাঁস হবে না। হেনরিও জানে এ কথা।'

দুটি কাপে কফি ঢালছিল হেনরি, মৃদু হেসে মাথা ঝাঁকাল।

বারট্রামও হাসল এবং বলে চলল, 'জ্যাকসন ছিল অত্যন্ত সৎ মানুষ। অ্যাণ্ডারসনের মত লোকের সঙ্গে জ্যাকসনের মত সৎ মানুষ ঠিক যায় না। ফলে দু'জনের মধ্যে মতদ্বৈধ দেখা দেয় এবং এক পর্যায়ে অত্যন্ত অসুবিধাজনক অবস্থার মধ্যে জ্যাকসন তার অংশীদারিত্ব বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়।

'অ্যাণ্ডারসনের অ্যাকুইজিটিভনেস ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছেছিল, কারণ সে একাই গোটা ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করছিল। এখন তার ইচ্ছা সে অবসরে যাবে, ব্যবসা-বাণিজ্য তার কর্মচারীরা দেখবে। তবে লাভের টাকাটা ঠিকই তার পকেটে আসবে। ওদিকে জ্যাকসনের সম্বল বলতে তার সততা ছাড়া আর কিছুই ছিল না।'

'শুরু থেকেই এ লোকগুলোকে আপনি নিশ্চয় চিনতেন না?' জিজ্ঞেস করল রুবিন, তার তীক্ষ্ণ চোখ ঝিকমিক করছে।

'একদমই না,' হেনরির ব্র্যাণ্ডির গ্লাসটা নাকের কাছে নিয়ে শুঁকল বারট্রাম, শুধু ওপরের ঠোঁট স্পর্শ করল মদ। 'যদিও আমার ধারণা, এ ঘরের দু'একজন ওদেরকে চিনতেন। এটি বেশ কয়েক বছর আগের ঘটনা।'

'অ্যাণ্ডারসন এক প্রচণ্ড গরমের দিনে আমার অফিসে এসেছিল। সেদিনই তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। "আমি যা হারিয়েছি তা আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে," বলল সে। আমি আমার ক্যারিয়ারে চুরি-চামারির প্রচুর কেস সামলেছি। তাই স্বাভাবিকভাবেই জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কী হারিয়েছেন?" সে জবাব দিল, "ড্যাম ইট, ম্যান। আমি কী হারিয়েছি সেটা জানার জন্যেই তো আপনার কাছে এলাম।"

'গল্পটি খাপছাড়াভাবে জানা গেল। অ্যাণ্ডারসন এবং জ্যাকসনের মধ্যে প্রচণ্ড ঝগড়া হয়। জ্যাকসন প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েছিল এবং এটাই স্বাভাবিক, যখন তার

মত একজন সৎ মানুষ দেখতে পায়, তার চারিত্রিক সততা ঢাল হিসেবে অন্যদের কাছে উপেক্ষিত হচ্ছে, তারা দোষ দেখেও চোখ বুজে থাকার ভান করছে। জ্যাকসন শপথ নেয় প্রতিশোধ নেবে। তার কথা হেসেই উড়িয়ে দেয় অ্যাণ্ডারসন।'

'ধৈর্যশীল মানুষের ক্রোধ থেকে সাবধান,' উদ্ধৃতি উচ্চারণ করল আভালন।

'আমিও তা-ই শুনেছি,' বলল বারট্রাম। 'যদিও এর পরীক্ষা নেয়ার মত ঘটনার মুখোমুখি হতে হয়নি আমাকে কখনও। অ্যাণ্ডারসনেরও না, কারণ সে জ্যাকসনকে ভয় পেত না। সে বলল, জ্যাকসন এতটাই সৎ মানুষ এবং প্রচণ্ড আইন মেনে চলা ব্যক্তি, তার পক্ষে কোনও বাজে কাজ করা সম্ভবই নয়। তার মাথায় জ্যাকসনের কাছ থেকে অফিসের চাবি ফেরত নেয়ার কথাই আসেনি। অফিস ছিল অ্যাণ্ডারসনের বাড়িতেই।

'ঝগড়ার কয়েক দিন বাদে এই চাবি ফেরত নেয়ার কথাটি অ্যাণ্ডারসনের মনে পড়ে গেল, যখন সে এক সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে দেখে সেখানে জ্যাকসন উপস্থিত। জ্যাকসনের সঙ্গে ছিল তার পুরানো অ্যাটাচি কেসটি। অ্যাণ্ডারসনকে ঘরে ঢুকতে দেখেই সে ওটা ঝট করে বন্ধ করে ফেলল। অন্তত অ্যাণ্ডারসনের তা-ই মনে হলো।

'অ্যাণ্ডারসন ওকে দেখে ভুরু কুঞ্চিত করে জিজ্ঞেস করল, "তুমি এখানে কী করছ?"

'"আমার কাছে কিছু কাগজপত্র ছিল, ওগুলো ফেরত দিতে এসেছি। কারণ, এগুলোর মালিক এখন তুমি," জবাব দিল জ্যাকসন। "এবং অফিসের চাবিও ফেরত দিতে এলাম।" এই বলে সে চাবিটা দিল অ্যাণ্ডারসনকে, ডেস্কে রাখা কাগজপত্রের দিকে ইঙ্গিত করল এবং তার লঝ্ঝরে অ্যাটাচি কেসের কমবিনেশন লক কাঁপা হাতে বন্ধ করল। জ্যাকসন ঘরের চারদিকে একবার চোখ বুলাল যা অ্যাণ্ডারসনের কাছে অনুসন্ধিৎসু চাউনি বলেই মনে হলো। তার চেহারায় ফুটে উঠল গোপন সন্তুষ্টির ছাপ। একটু হেসে বলল, "আমি এখন যাই।" সে উঠে দাঁড়াল।

'জ্যাকসনের গাড়ির এঞ্জিন গর্জে ওঠার শব্দ শুনতে পেল অ্যাণ্ডারসন কয়েক মুহূর্ত পরে এবং শুনল ওটা দূরে চলে যাচ্ছে এবং ঠিক সেই মুহূর্তে একটি চিন্তা তাকে প্রায় চলৎশক্তিহীন করে দিল। সে বুঝতে পারল তার কোনও জিনিস চুরি হয়ে গেছে এবং তার পরদিন সে এল আমার কাছে।'

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল ড্রেক, হাতের আধখালি ব্র্যাণ্ডির গ্লাসটি ঘোরাতে-ঘোরাতে প্রশ্ন করল, 'সে কেন পুলিশের কাছে গেল না?'

'একটু সমস্যা ছিল,' বলল বারট্রাম। 'অ্যাণ্ডারসন জানত না তার ঠিক কী জিনিস চুরি গেছে। কিছু চুরি হয়েছে, এ চিন্তা মনে আসতেই সে ছুটে যায় সিন্দুকের কাছে। তবে সিন্দুক ভাঙা বা খোলা হয়নি। সে ডেস্কের সব কিছু আতিপাতি করে খুঁজে দেখে। কিন্তু কিছুই খোয়া যায়নি। সে এক-এক করে প্রতিটি ঘরে যায়। কিন্তু তার মনে হয় সব কিছুই ঠিকঠাক আছে।'

'কী চুরি গেছে সে ব্যাপারে সে নিশ্চিত হতে পারেনি?' জিজ্ঞেস করল গনজালো।

'না। ঘর ভর্তি নানান জিনিস ছিল এবং অতশত জিনিসের হিসেবও তার ছিল না। সে আমাকে বলেছিল একদা সে অ্যান্টিক ঘড়ি সংগ্রহ করত। স্টাডি রুমের ছোট একটি ড্রয়ারে ঘড়িগুলো ছিল। মোট ছ'টা। একটাও চুরি যায়নি। তবে অ্যাণ্ডারসনের আবছা মনে পড়ছিল, মোট সাতটি ঘড়ি তার ছিল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও নির্দিষ্ট সংখ্যাটি সে মনে করতে পারেনি। আরও বাজে ব্যাপার হলো ছয়টি ঘড়ির মধ্যে একটি তার কাছে কেমন অচেনা লাগছিল। হতে পারে যে, তার কাছে মোট ছ'টাই ছিল এবং এর মধ্যে একটি কম'দামী ঘড়ির বদলে দামী ঘড়ি ছিল! গোপন জায়গায় লুকিয়ে রাখা আরও ডজনখানেক জিনিসের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটল। অ্যাণ্ডারসনের মনে হচ্ছিল অমুক জিনিসটি হারিয়ে গেছে। কিন্তু সেটি যে কী তা সে মনে করতে পারছিল না। তাই সে আমার কাছে আসে।'

'এক মিনিট,' বললেন ট্রামবুল। দড়াম করে হাতটি নামিয়ে আনলেন টেবিলের ওপর। 'অ্যাণ্ডারসন কী করে এত নিশ্চিত হলো যে, জ্যাকসন সত্যি কিছু সরিয়েছে?'

'আহ,' বলল বারট্রাম। 'গল্পের সবচেয়ে মজার জায়গা তো ওটাই। অ্যাটাচি কেস বন্ধ করা, ঘরের চারপাশে তাকিয়ে মুখে মুচকি হাসি ফুটে ওঠা, এসব কিছুই জ্যাকসনের প্রতি অ্যাণ্ডারসনের সন্দেহ জাগিয়ে তোলে। আর জ্যাকসন যখন ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল তখনও সে মুচকি-মুচকি হাসছিল। তবে সাধারণ হাসি সেটি নয়। আমি তা হলে এবারে অ্যাণ্ডারসনের জবানীতেই তার গল্পটি বলি। অন্তত যেটুকু মনে আছে।'

'"বারট্রাম," বলল সে। "মুখ টিপে হাসি আমি অনেকে দেখেছি। ওরকম মুচকি হাসিও জীবনে বহুবার দিয়েছি। তবে জ্যাকসনের হাসিটি ছিল অন্য রকম, সব থেকে আলাদা। এ হাসির মানে দাঁড়ায় একটাই—সে এমন একটা কিছু পেয়ে গেছে যেটার দখল সে মনে-প্রাণে চাইত। ওই মুচকি হাসির মানে যদি পৃথিবীর কেউ বুঝতে পারে, এমনকী সেটা বন্ধ দরজার পেছনে হলেও, তা হলাম আমি। আমার ভুল হতে পারে না। জ্যাকসন নিশ্চয় আমার কাছ থেকে কিছু চুরি করেছে এবং সেটা নিয়ে এখন গর্বও করছে!"

'এ বিষয়ে লোকটির সঙ্গে তর্ক করার কোনও অবকাশ ছিল না। সে ভিক্টিমাইজ হয়েছে, এ ভাবনা তাকে দারুণভাবে ব্যাকুল করে তুলেছিল। এবং তার কথা আমাকে বিশ্বাসও করতে হয়েছিল। জ্যাকসন বুঝতে পেরেছিল, অ্যাণ্ডারসনের কোনও জিনিস যদি সে চুরি করে নিয়ে যায় তা হলে সে ধাক্কা সামলানো অ্যাণ্ডারসনের পক্ষে খুবই কঠিন হবে। কারণ, অ্যাণ্ডারসন তাকে একজন সৎ মানুষ হিসেবেই জানত।'

রুবিন বলল, 'হয়তো সে অ্যাটাচি কেসটা নিয়েছিল।'

'না, না, ওটা জ্যাকসনেরই। বহুদিন ধরেই ওটার মালিক সে। সমস্যাটা

ওখানেই। অ্যাণ্ডারসন আমার কাছে এসেছিল তার কী জিনিস চুরি গেছে তা জানতে। আমার কাজ ছিল তার বাড়ি খুঁজে দেখে বলা যে, কোন্ জিনিসটি মিসিং।'

'সে নিজেই যদি বলতে না পারে তা হলে সে জিনিসটি খুঁজে বের করা কী করে সম্ভব?' অসন্তোষের সুরে বললেন ট্রামবুল।

'আমি এ কথাই ওকে বলেছিলাম,' বলল বারট্রাম। 'কিন্তু ও কোনও কথাই শুনতে চায় না। আমাকে বড় অঙ্কের টাকা দিতে চাইল সে, আমি হারি বা জিতি। বেশ অনেকগুলো টাকা। এবং অগ্রিম হিসেবে কিছু টাকা দিয়েও দিল। জ্যাকসনের মত একজন নন-অ্যাকুইজিটর ওকে ফাঁকি দিয়ে ওর জিনিস হাপিস করেছে, এ চিন্তাটাই উন্মাদ করে তুলছিল অ্যাণ্ডারসনকে। জ্যাকসন যাতে কোনওমতেই জিতে যেতে না পারে, সেজন্য যে-কোনও পরিমাণ অর্থ ব্যয়ে কোনওরকম কার্পণ্য ছিল না অ্যাণ্ডারসনের।

'আমি ওর দেয়া অ্যাডভান্সটা রেখে দিই। তারপর কাজে নেমে পড়ি। প্রথমেই ইন্সুরেন্সের তালিকাটি তুলে নিই হাতে। সবই আউটডেটেড। আর বড়-বড় সব ফার্নিচার, যেগুলো বাড়িতেই ছিল। আমি প্রতিটি ঘর তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখলাম। মেঝে, দেয়াল, সিলিং–কিছুই বাদ দিলাম না। নজর বুলালাম তাকগুলোর ওপর, প্রতিটি দরজা খুলে দেখলাম, প্রতিটি ক্লজিটে উঁকি দিলাম, প্রতিটি আসবাব পরীক্ষা করলাম। এমনকী চিলেকোঠা এবং বেসমেন্টেও হানা দিলাম।

'অ্যাণ্ডারসনের বাড়িটা বিরাট। আর কত যে মালপত্র! বাড়ি দেখা শেষই হয় না। ওদিকে অ্যাণ্ডারসন দিন-দিন বিভ্রান্ত হয়ে উঠছিল।

'এরপরে আমি বাড়ির অন্যপ্রান্ত থেকে সার্চ শুরু করলাম। এতে কোনও সন্দেহই নেই, জ্যাকসন চোখে পড়ে না, এমন ছোটখাট কোনও জিনিস সরিয়েছে। এমন কিছু, যা অ্যাণ্ডারসনের ঠিক চোখ এড়িয়ে যাবে না, আবার সেটি তেমন কিছুও নয়, যার সঙ্গে তার গভীর কোনও সম্পর্ক রয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, জ্যাকসন এমন কিছু সরাতে চাইবে, যেটি তার চোখে মূল্যবান। এবং অ্যাণ্ডারসন সেটিকে মূল্যবান ভাবলেই জ্যাকসন তৃপ্তি বোধ করবে। তা হলে জিনিসটা কী হতে পারে?'

'ছোটখাট কোনও চিত্রকল্প,' আগ্রহ নিয়ে বলল গনজালো। 'যেটি জ্যাকসনের কাছে অমূল্য মনে হলেও অ্যাণ্ডারসন হয়তো ওটাকে হাবিজাবি কিছু ভেবেছিল।'

'অ্যাণ্ডারসনের সংগ্রহের কোনও স্ট্যাম্প,' মন্তব্য করল রুবিন, 'যা জ্যাকসনের কাছে খুব মূল্যবান মনে হয়েছিল।' সে স্ট্যাম্প নিয়ে একটি গল্প লিখেছে কিছু দিন আগে।

'কোনও বই,' বললেন ট্রামবুল। 'যাতে পারিবারিক গোপন কথা লেখা ছিল এবং যার সাহায্যে জ্যাকসন অ্যাণ্ডারসনকে ব্ল্যাকমেইল করতে পারবে।'

'কোনও ফটোগ্রাফ,' নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল আভালন। 'যে ছবির কথা অ্যাণ্ডারসন ভুলে গিয়েছিল। ওটি হয়তো তার পুরনো কোনও প্রেমিকার ছবি ছিল, যেটি উদ্ধারের জন্য যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করতে রাজি অ্যাণ্ডারসন।'

'আমি জানি না তারা কী ধরনের কারবার করত,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল ড্রেক। 'তবে অনেক সময় কোনও প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে ঠুনকো, বাজে জিনিসেরও অনেক মূল্য থাকে। একটা কেসের কথা মনে পড়ছে, যেখানে–'

'আমি আসলে এ ধরনের সমস্ত সম্ভাবনার কথাই ভেবেছিলাম,' বাধা দিয়ে বলল বারট্রাম। 'এবং সবগুলো বিষয় নিয়ে অ্যাণ্ডারসনের সঙ্গে কথাও বলেছি। আমার কাছে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায় যে, শিল্পকলার বিষয়ে তার কোনও আগ্রহ নেই এবং এসব সত্যি তার কাছে আবর্জনা বিশেষ। সে স্ট্যাম্প সংগ্রহ করে না, যদিও তার সংগ্রহে অনেক বই আছে এবং এর মধ্য থেকে কোনও বই খোয়া গেছে কি না, সে ব্যাপারে সে নিশ্চিত করে কিছুই বলতে পারবে না। তবে অ্যাণ্ডারসন দৃঢ় গলায় বলেছিল, কোনও বইতে তার কোনও পারিবারিক গোপন কথা লেখা নেই, যা কি না একজন ব্ল্যাকমেইলারকে উৎসাহিত করে তুলতে পারে। তার পুরনো দিনের কোনও প্রেমিকাও নেই। সে যুবক বয়সে পেশাদার নারীদের মাঝেই আবদ্ধ থাকত এবং এদের কোনও ফটোগ্রাফ তার কাছে মোটেই মূল্যবান কিছু নয়। আমি একে-একে আরও নানান সম্ভাবনার কথা ভেবেছিলাম, কিন্তু সবগুলোই শেষ পর্যন্ত বাদ দিতে হয়।

'জ্যাকসন হয়তো নিজের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। সে হয়তো অকস্মাৎ প্রাপ্ত ধন নিয়ে নিজেকে জাহির করতে পারে এবং তার এই ধনের উৎস সন্ধানে নেমে পড়লে চুরি যাওয়া জিনিসটার হয়তো খোঁজও পেয়ে যেতে পারি।

'অ্যাণ্ডারসন ঠিক করল সে জ্যাকসনের ওপর লোক লাগাবে। চব্বিশ ঘণ্টা ওই লোক জ্যাকসনের ওপর লক্ষ রাখবে। তবে এটা করেও লাভ হলো না। কারণ, জ্যাকসন আগের মতই সাদামাঠা জীবন যাপন করে চলছিল। সে গরিবি হালে চলত, ভৃত্য শ্রেণীর একটি চাকরি খুঁজে নেয়, সেখানে নিজের সততা এবং সংযত চালচলন দিয়ে একটি ভাল অবস্থান গড়ে তোলে।

'অবশেষে একটি মাত্র বিকল্পই আমার কাছে ছিল–'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান,' বলল গনজালো। 'আমাকে অনুমান করতে দিন, আমাকে অনুমান করতে দিন,' সে এক চুমুকে গ্লাসের ব্র্যাণ্ডিটুকু শেষ করে হেনরিকে আরেক গ্লাস ব্র্যাণ্ডি দেয়ার ইশারা করে বলল, 'আপনি নিশ্চয় জ্যাকসনের কাছে জিজ্ঞেস করেছিলেন!'

'জিজ্ঞেস করার খুবই ইচ্ছে হচ্ছিল,' অনুতাপের গলায় বলল বারট্রাম। 'তবে সেটি যুক্তিসঙ্গত হত না। আমার পেশায় কোনওরকম প্রমাণ ছাড়া কারও বিরুদ্ধে আমি অভিযোগ আনতে পারি না। তা হলে লাইসেন্সই বাতিল হয়ে যাবে। তা ছাড়া অভিযোগ করা হলেও সে সঙ্গত কারণেই চুরির অভিযোগ অস্বীকার করে বসত।'

'তো, সেক্ষেত্রে...' ফাঁকা গলায় বলল গনজালো।

অন্য চারজনের ভুরুও কুঞ্চিত হয়ে আছে, তবে তারা কেউ কোনও মন্তব্য করল না।

বারট্রাম বলল, 'আপনারা অনুমান করতে পারছেন না, ভদ্রমহোদয়গণ, কারণ আপনারা এ পেশার সঙ্গে জড়িত নন। আপনারা শুধু জানেন রোমাঞ্চ সাহিত্যে যা পড়েন তা নিয়ে এবং ভাবেন আমার মত মানুষের কাছে প্রচুর বিকল্প থাকে যা দিয়ে কোনও সমাধান করা যায়। জেন্টলমেন, আমি যে বিকল্পটির কথা ভেবেছিলাম তা হলো ব্যর্থতা স্বীকার করা।

'আমি যখন অ্যাণ্ডারসনকে বিদায় বলতে গেলাম, দেখি, ততদিনে সে দশ পাউণ্ড ওজন হারিয়েছে। তার চোখে বিহ্বল, শূন্য দৃষ্টি, সে আমার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করতে-করতে তখনও একটার পর একটা ঘর ঘুরে দেখছিল এবং খুঁজছিল। সে বিড়বিড় করে বলছিল, "আমি ঠিক জানি, আমি ওর মুখে মুচকি হাসি দেখেছিলাম। ও আমার কাছ থেকে কিছু একটা নিয়ে গেছে। ও আমার কাছ থেকে কিছু একটা নিয়ে গেছে।"

'এরপরে দুই-তিনবার অ্যাণ্ডারসনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। সে তখনও তার হারানো জিনিসটি খুঁজে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু তা আর কখনওই খুঁজে পায়নি। সে ভীষণ হতোদ্যম হয়ে পড়েছিল। আমি যে ঘটনাটির কথা বললাম, তা পাঁচ বছর আগের। গত মাসে মারা গেছে অ্যাণ্ডারসন।'

সামান্য বিরতি শেষে আভালন বলল, 'হারানো জিনিসটি খুঁজে না পেয়েই?'

'হারানো জিনিসটি খুঁজে না পেয়েই।'

ট্রামবুল অসন্তুষ্ট স্বরে বললেন, 'আপনি কি আমাদের কাছে এসেছিলেন সমস্যাটির যাতে সমাধান করে দিই সেজন্য?'

'এক অর্থে তাই। অ্যাণ্ডারসন মারা গেছে এবং এতক্ষণ যা বললাম তা চার দেয়ালের বাইরে যাবে না বলেই আমরা জানি। কাজেই আমি কি এখন একটি জিনিস চাইতে পারি যা আগে চাইনি। ...হেনরি, দেশলাই দেবে?'

হেনরি এতক্ষণ অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে গল্প শুনছিল, পকেট থেকে দেশলাই বের করে জ্বেলে দিল বারট্রামের সিগারেট।

'তুমি যাদেরকে এত দক্ষতার সঙ্গে সেবা করে চলছ, এবারে তাদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই, হেনরি...জেন্টলমেন, আপনাদের সঙ্গে কি হেনরি জ্যাকসনের পরিচয় করিয়ে দিতে পারি?'

সবাই এমন অবাক হলো যে, কয়েক মুহূর্ত কথাই বলতে পারল না। শেষে চমক ভেঙে ড্রেক বলল, 'ও-ই সেই জ্যাকসন!'

'নিশ্চয়,' বলল বারট্রাম। 'জানতাম ও এখানে কাজ করছে এবং যখন শুনলাম আপনারা প্রতি মাসে এই ক্লাবে একবার মিটিং করেন, তখন অনেকটা নির্লজ্জের মতই চেয়ে দাওয়াত নিলাম। এখানেই শুধু আমি সেই বিখ্যাত মুচকি হাসির ভদ্রলোকটিকে দেখতে পাব।'

হেনরি হেসে মাথা নামাল।

বারট্রাম বলল, 'তদন্তের সময় আমি মাঝে-মাঝেই ভেবেছি, অ্যাণ্ডারসন ভুল করছে কি না, আদৌ কোনও চুরির ঘটনা ঘটেছে কি না। তবে যখনই মুচকি

হাসিটির কথা মনে পড়েছে, অ্যাণ্ডারসনের কথার ওপর বিশ্বাস রেখেছি।'

'আপনি ঠিক কাজটিই করেছিলেন,' মৃদু গলায় বলল জ্যাকসন। 'আমি সত্যি আমার এক সময়ের পার্টনার, যাকে আপনারা অ্যাণ্ডারসন বলে জানেন, তার কাছ থেকে একটি জিনিস চুরি করেছিলাম। তবে সেজন্য আমার কখনও অনুতাপ হয়নি।'

'মূল্যবান কিছু জিনিস নিশ্চয়, অনুমান করি।'

'খুবই মূল্যবান এবং এমন একটি দিন যায়নি, যেদিন আমি চুরির কথা ভেবে আনন্দ পাইনি এবং এ ভেবেই আনন্দ পেয়েছি, ধূর্ত লোকটির সেই জিনিসটি আর নেই যেটি আমি চুরি করে এনেছি।'

'তুমি ইচ্ছে করেই তার মনে সন্দেহের সৃষ্টি করেছিলে যাতে আনন্দ লাভ করতে পার?'

'জি, স্যর।'

'এবং ধরা পড়ার ভয় তোমার ছিল না?'

'এক মুহূর্তের জন্যও নয়, স্যর।'

'বাই গড,' হঠাৎ হুঙ্কার ছাড়ল আভালন। 'আমি আবারও বলছি কথাটি। একজন ধৈর্যশীল মানুষের ক্রোধ থেকে সাবধান। আমি একজন ধৈর্যশীল মানুষ এবং এই সওয়াল-জবাবে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমার ক্রোধ থেকে সাবধান, হেনরি। তুমি অ্যাটাচি কেসে কী নিয়ে গিয়েছিলে?'

'কিছু নিয়ে যাইনি তো, স্যর,' জবাব দিল হেনরি। 'ওটা খালিই ছিল।'

'সে কী কথা! তুমি ওর কাছ থেকে যা নিয়েছিলে তা কোথায় রেখেছিলে?'

'ওটা কোথাও আমাকে রাখতে হয়নি, স্যর!'

'বেশ তো, তা হলে তুমি কী নিয়ে গিয়েছিলে?'

'শুধু ওর মনের শান্তি, স্যর,' মৃদু স্বরে বলল হেনরি।

মূলঃ আইজাক আসিমভ

জন্মদিন

হালপারিনদের পরিবারটি বিরাট। যৌথ হলেও এই একটি পরিবার, যেখানে কারও সাথে কারও কোন্ গণ্ডগোল নেই, সংঘাত নেই। স্মিথ মনে মনে ঈর্ষাই করে এই পরিবারটিকে। বোধহয় নিজের কোন পরিবার নেই বলেই।

আজ দাদিমা হালপারিনের আশিতম জন্মদিন। ঢঙ দেখে আর বাঁচি না, মনে মনে ভাবে স্মিথ। কে কবে শুনেছে, অজ পাড়াগাঁয়েও আশি বছরের বুড়ির জন্মদিন ঘটা করে পালন করা হয়। নাহ্, 'ঘটা করে' বলাটা বোধহয় ঠিক হলো না। এই জন্মদিন আসলে আয়োজন করছে শুধু ওই জন ক্রস না কী যেন নাম, ওকেই দেখা যাচ্ছে। ছেলেটা দাদিমার বড় নাতি হ্যাংক হালপারিনের বন্ধু-টন্ধু হবে বোধহয়।

জন্মদিনের পার্টিতে সবাই উপস্থিত। দাদিমার পাঁচ ছেলে এক মেয়ে। পাঁচ ছেলের পাঁচ বউ, মেয়ে জামাই, চার নাতি, সব মিলে ষোলোজন। তবে বাচ্চাদের কাউকে দেখা যাচ্ছে না। ওরা লেকে গেছে নৌকা চড়তে।

পুরোদমে আয়োজন চলছে খানাপিনার। একটা ভেড়া জবাই করা হয়েছে, টার্কিগুলোর ছাল ছাড়ানো হচ্ছে। মেয়েরা সব রান্নায় ব্যস্ত। ছেলেরা এখানে-সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। গল্প করছে।

দাদিমা তাঁর সিংহাসনের মত চেয়ারে বসে ওয়াইনের গ্লাসে মৃদু চুমুক দিচ্ছেন আর উজ্জ্বল চোখে লক্ষ করছেন সবাইকে। মৃদু হাসির রেখা ফুটে আছে তাঁর ঠোঁটে।

দাদিমা দেখতে ছোটখাট, তবে প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। স্মিথ জানে, এ-গাঁয়ের সবচাইতে প্রভাবশালী পরিবার হালপারিনরা। এদের কথায় এখনও বাঘে-মোষে এক ঘাটে পানি খায়। পরপর তিনবার তিনি এখানকার শেরিফের পদে দাঁড়িয়েছেন। তিনবারই জয়ী হয়েছেন। লোকে গোপনে বলাবলি করে, আসলে টাকা দিয়ে তিনি সব ভোট কিনে নিয়েছেন। তবে প্রকাশ্যে এই কথা বলতে কেউ সাহস পায় না। কারণ, লোকের ধারণা, শহরের সবচাইতে কুখ্যাত ক্রিমিনাল দলটির সঙ্গে হালপারিন পরিবারের গোপন যোগাযোগ আছে। তিনি ওদের নিয়মিত মাসোহারা দেন। স্থানীয় প্রশাসনকেও তিনি নাকি টাকা খাইয়ে মুখ বন্ধ করে রেখেছেন। তবে এই কথা প্রকাশ্যে বলার মত বুকের পাটা কারও নেই। কে আর বেঘোরে জানটা খোয়াতে চায়? তবে কেউ বেঘোরে জান খুইয়েছে কি না শোনেনি স্মিথ। অনেকদিন ধরে সে হালপারিন পরিবারের আইনজীবী হিসেবে কাজ করছে। কই, হালপারিনদের কোন দুর্নীতি তো তার চোখে আজতক পড়েনি। বরং দেখেছে লোকজন দাদিমার কাছে কোন সাহায্যের জন্যে এলে তিনি

না করেন না। তারপরও লোকজন দাদিমাকে কেন ভয় পায় বুঝতে পারে না সে।

আশি বছর বয়সে জন্মদিন করার প্ল্যানটা দাদিমার বড় নাতি হ্যাংকের। তবে তিনি একটা শর্ত দিয়েছেন, বাইরের কাউকে দাওয়াত করা চলবে না। সম্পূর্ণ ঘরোয়াভাবে জন্মদিন পালন করতে হবে। কিন্তু জন ক্রসই সেদিন ওর নানীর জন্মদিনে স্মিথকে নিয়ে গিয়ে খুব বড়াই করে বলেছিল, 'দ্যাখ, আমরা নানীর জন্মদিনও করি। কিন্তু তোরা গাঁইয়া ভূতরা তো এ-ধরনের কারও জন্মদিনের কথা কল্পনাও করতে পারিস না।' ক্রস কথাটা হেসে বললেও হ্যাংকের খুব লেগেছিল। ক্রস সবদিক থেকে তাকে টেক্কা মারবে এ কেমন করে হয়? তখনই সে ঠিক করে তার দাদির জন্মদিন করতে হবে, আর এমন ধুমধাম করবে যাতে ক্রসের চোখ ট্যারা হয়ে যায়। অবশ্য ওদের বাড়িতে ঢোকার আগেই ক্রসের চোখ ট্যারা হয়ে গেছে। হ্যাংকদের বাড়িটাকে ছোটখাট একটা জমিদার বাড়িই বলা চলে। হালপারিনদের গ্রামের শেষ মাথা থেকে শুরু হয়েছে বিশাল বনভূমি এটা ওদের দাদিমার সম্পত্তি। গ্রামের হাইস্কুলটাও ওর দাদির নামে। ক্রস দেখেছে উঠতে-বসতে লোকজন সালাম করে হ্যাংকের দাদিকে। সেই সালামে থাকে ভয় মেশানো শ্রদ্ধা। ছোটখাট এই মানুষটাকে সবাই কেন এত ভয় পায় বুঝতে পারে না ক্রস। অত্যন্ত অমায়িক ব্যবহার দাদিমার। হ্যাংকের বন্ধু শুনে তিনি ওকে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন। আজ চারদিন ক্রস হ্যাংকদের বাড়িতে। অবাক হয়ে লক্ষ করেছে একমাত্র হ্যাংক বাদে আর সবাই যেন দাদিমার ভয়ে জড়সড়। হ্যাংকের বাবা আর চাচারা তাঁর প্রতিটি কথা পালন করছেন নীরবে। এমন তো নয় তিনি সব সময় মেজাজ দেখান ওঁদের সাথে। তবুও ওঁরা এরকম আড়ষ্ট হয়ে থাকেন কেন মাথায় ঢোকে না ক্রসের। বুড়ির মধ্যে রহস্যময় কী যেন একটা আছে, ঠিক ধরতে পারছে না সে। হ্যাংক বলেছে, 'দূর দূর। রহস্য-টহস্য আবার কী? ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি দাদিমাকে সবাই ভয় পায়। কেন ভয় পায় আমি নিজেও জানি না। তবে দাদিমার সাথে আমি কিন্তু খুব ফ্রি, তাই না?'

তা হ্যাংক ফ্রিই বটে। দাদিমার সাথে তার সম্পর্ক বন্ধুর মত। দাদীমাও তাঁর এই নাতিটিকে বিশেষ স্নেহের চোখে দেখেন। তাঁর একটা ছেলেও স্কুলের গণ্ডি পেরোতে পারেনি। অথচ হ্যাংক কি না হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মত জায়গায় পড়ছে। বড় নাতিটির সব আবদার তিনি মেনে নেন হাসিমুখেই। সে যখন এবার খুব করে ধরল তাঁর জন্মদিন করতে হবে, না করতে পারেননি দাদিমা। অন্য কেউ বললে তিনি হয়তো রাজি হতেন না। সম্পূর্ণ ঘরোয়া পরিবেশের এই অনুষ্ঠানটি তিনি বেশ উপভোগ করছেন। ইচ্ছে করেই বাইরের কাউকে দাওয়াত করেননি। আর সত্যি বলতে কী, তিনি এই গ্রামের কাউকে তাঁর জন্মদিনে অতিথি হওয়ার মত যোগ্য মনে করেন না। স্মিথের ব্যাপারটা অবশ্য আলাদা। সে গতকাল বিকেলে লণ্ডন থেকে এসেছে ওখানে একটা প্লট কেনার ব্যাপারে আলাপ করতে। দাদিমা ঠিক করেছেন লণ্ডনে ছয়তলা একটা ফ্ল্যাট তুলবেন। তাঁর ছয় ছেলে-মেয়েকে ওটা দান করবেন। ওরা তাঁর মৃত্যুর পর যদি এই গ্রামে থাকতে না চায়

তা হলে লণ্ডনে গিয়ে থাকবে। অবশ্য ওদের লণ্ডন থাকার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। কারণ, তাঁর প্রতিটি ছেলেই অকর্মার ধাড়ি। কোন কাজ করে না, খালি খায়-দায়-ঘুমায় আর আড্ডা মারে। সংসারের কোন চিন্তা নেই। এত সুখের নিবাস ছেড়ে ওরা দেশের বাইরে যাবে বলে মনে হয় না। তবে কি না বসে খেলে রাজার ধনও ফুরায়। তাই বাড়ি করার পরিকল্পনা করেছেন দাদিমা। বিশাল ফ্ল্যাট করবেন। ওটা থেকে প্রতিমাসে যা ভাড়া আসবে তা দিয়েই তাঁর অকর্মার ধাড়িগুলো দিব্যি খেয়ে পরে বাঁচতে পারবে।

দাদিমা হাতছানি দিয়ে ডাকলেন স্মিথকে। স্মিথ কাছে আসতে জানতে চাইলেন, 'জমিন কিনতে তোমার কয়দিন সময় লাগবে?'

'লণ্ডন গিয়ে সপ্তাহখানেকের মধ্যে সব ফর্মালিটি সেরে ফেলতে পারব, দাদিমা।'

'অ, ভেরি গুড। কোন ঝামেলা হইবে না তো?'

'জী না, দাদিমা। কোন ঝামেলা হবে না।'

'তয় বাড়িডা বানাইবে কেডা?'

'নামকরা এক আর্কিটেক্টের সাথে আমি কথা বলেছি, দাদিমা। উনি বাড়িটা কেমন হবে, কোন্ স্টাইলে হবে, এসব ছক এঁকে দেবেন।'

'হ, ভাল স্টাইলে বাড়িডা বানাইতে হইবে। লোকে যেন দেইখ্যা কয় এইডা হালপারিনদের বাড়ি।'

'জী, দাদিমা।'

এই সময় চড়া গলার আওয়াজ শুনে দোতলার ঝুল-বারান্দার দিকে তাকালেন দাদিমা। জোরে কথা বলা তিনি মোটেই পছন্দ করেন না। ঝুল-বারান্দার রেলিং-এ পা ঝুলিয়ে বসেছে হ্যাংক আর তার বন্ধু জন ক্রস। কী একটা ব্যাপার নিয়ে ওদের মধ্যে খুব তর্ক হচ্ছে। ক্রমেই গলার স্বর উঁচুতে উঠছে দু'জনের। ওরা আবার মারামারি শুরু করে না দেয়, ভাবল স্মিথ। তরুণ রক্ত হঠাৎই গরম হয়ে ওঠে।

'স্মিথ, পোলাপানগুলারে একটু আস্তে কথা কইতে কও। ওইহানে বসার কী দরকার? পইড়া গেলে তো মাথা ফাইট্টা ছাতু হইয়া যাইবে।'

স্মিথ পা বাড়িয়েছে, এই সময় ঘটনাটা ঘটল। হঠাৎ ক্রুদ্ধ একটা চিৎকার করে হ্যাংক প্রচণ্ড ঘুসি মারল ক্রসের মুখে। ক্রস টাল সামলাতে না পেরে ডিগবাজি খেয়ে নীচে, শক্ত চাতালে ছিটকে পড়ল। পড়ার পূর্বমুহূর্তে আকাশ ফাটানো আর্তনাদ করে উঠেছিল ক্রস, তারপর সব চুপ।

দৌড়ে গেল স্মিথ ক্রসের কাছে। চিৎ হয়ে পড়ে আছে ক্রস। চোখ দুটো খোলা, স্থির। ঝুঁকে পালস রেট পরীক্ষা করল স্মিথ। নেই, মাথার পেছন থেকে রক্তের মোটা একটা ধারা নেমে আসছে।

সোজা হয়ে দাঁড়াল স্মিথ। রক্তশূন্য হয়ে গেছে মুখ। ভাঙা গলায় বলল ও, 'মারা গেছে! ছেলেটা মারা গেছে!'

এই সময় হ্যাংক এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্রসের ওপর। চৌচির হয়ে যাওয়া রক্তমাখা খুলি দেখে যা বোঝার বুঝে নিল সে। মুহূর্তে ফ্যাকাসে হয়ে গেল মুখ, বিকৃত কণ্ঠে কান্নায় ভেঙে পড়ল। 'মরে গেছে! দাদি, ক্রস মরে গেছে! বিশ্বাস করেন, আমি ওকে মারতে চাইনি, কিন্তু ও আমাকে...'

দাদিমা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। লাশটার দিকে একপলক তাকালেন, হাসির রেখা মুখ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল তাঁর। কর্কশ গলায় কথা বলে উঠলেন তিনি, 'ও-ই তোরে আগে মারছে, হ্যাংক। আমি নিজের চউক্ষে দেখছি। আমরা সবাই দেখছি। দেখি নাই?'

ঘুরলেন তিনি, শেষ কথাটা বললেন স্মিথকে লক্ষ্য করে। তাঁর চোখে স্পষ্ট শাসানি।

স্মিথ অস্বস্তিতে নড়ে উঠল। 'আ-আমি ব্যাপারটার শুরু ঠিক লক্ষ করিনি, দাদিমা।'

'অবশ্যই করেছ,' ধমকে উঠলেন দাদিমা। 'তুমি অগো দিকে তাকাইয়া ছিলা, স্মিথ।'

স্মিথ কোন জবাব দেয়ার আগে হ্যাংক কথা বলে উঠল, 'দাদি, আ-আমি খুব দুঃখিত। আমার–আমার মাথায় এমন রক্ত চড়ে গেল...ও, খোদা, আমার নির্ঘাত ফাঁসি হবে...'

'চুপ কর, হ্যাংক। কান্দিস না,' নরম গলায় বললেন দাদিমা। স্মিথের দিকে ঘুরে বললেন, 'ও ধরা পড়লে অর ফাঁসি হইবে, না, স্মিথ?'

'জী।'

'আর যদি ধরা না পড়ে?'

'মানে?'

'যদি পুলিশ জানতে না পারে হ্যাংকের কারণে ওই ছ্যামরাডা মরছে, তাইলে?'

'তা হলে হ্যাংকের কিছুই হবে না। কিন্তু তা কী করে সম্ভব? এই রকম একটা জলজ্যান্ত...'

'চুপ। আর কোন কথা না। তুমি না কইলে পুলিশের বাবারও সাধ্য নাই কিছু করে। কিন্তু তোমারে আমি চিনি, স্মিথ। তুমি উপরে-উপরে যতই ভক্তি দেখাও, সুযোগ পাইলে আমাগো ক্ষতি তুমি ঠিকই করবা।'

'এ কী বলছেন, দাদীমা! আমি আপনাদের ক্ষতি করতে যাব কেন?' প্রতিবাদ করল স্মিথ।

'চুউপ!' প্রচণ্ড জোরে ধমকে উঠলেন দাদিমা।

'তোমারে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। তুমি একবার শহরে গেলে পুলিশের কাছে এই কথা ফ্লাশ করবা না, এইডা আমারে বিশ্বাস করতে কও?'

'কিন্তু, মা,' বললেন হ্যাংকের বাপ, 'আমাগো তো...'

'তুইও চুপ থাক, বিল। আমি যা কই এহন চুপ মাইরা শোন হগলডি।

বেবাক ঘটনা আমি নিজের চউক্ষে দেখছি। তোরাও দেখছুস। আসল ঘটনা কী ঘটল? এই স্মিথ আর হ্যাংকের বন্ধুডা ওই দোতলার বারান্দায় খাড়াইয়া কী কারণে জানি মারামারি বাজাইছে। দুইজনেই জড়াজড়ি কইরা ব্যালকনি দিয়া পইরা যাইয়া মাথা ফাইট্টা মরছে। পুলিশ আইলে আমরা অগো এই কথাই কমু। আমি আমার নাতি হ্যাংকরে কিছুতেই জেলে যাইতে দিমু না। আমাগো ফোরটিন জেনারেশনেও কেউ কোনদিন জেলে যায় নাই। আর কোনদিন যাইবেও না। হ্যাংক, তুই একটা কাম কর। লাশটারে আরও কয়েকখান ঘুসিটুসি মার, যাতে দেইখা মনে হয় তোর বন্ধু খুব মাইর খাইছে। আর তোমরা হগলডি স্মিথের ধইরা দোতলার বারান্দায় লইয়া যাও, হেরপর...'

হ্যাংক ছাড়া হালপারিন পরিবারের বাকি সবাই এবার বৃত্ত করে এগিয়ে যেতে লাগল স্মিথের দিকে। দাদিমা তাঁর চেয়ারে গিয়ে বসলেন।

বৃত্তটা ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। সবার চোখে খুনের নেশা। কোথাও কোন শব্দ নেই। দাদিমার চোখে চোখ পড়ল স্মিথের। অস্বাভাবিক উজ্জ্বল চোখে তিনি তাকিয়ে আছেন স্মিথের দিকে। হঠাৎ মৃদু শব্দ করে হেসে উঠলেন তিনি। হ্যাংকের বাবা হাতের মুগুরটা মাথার উপর তুললেন। শেষ মুহূর্তে এতিম স্মিথের চোখে ভেসে উঠল মরা মায়ের মুখটা। তারপরই বিদ্যুৎবেগে মুগুর নেমে এল ওর মাথার ওপর।

মূলঃ ফ্রেডরিক ব্রাউন

হীরে-রহস্য

সার্কাস কার না ভাল লাগে!

আমারও খুব পছন্দ খুব সার্কাস। সেই ছোটবেলা থেকেই আমি সার্কাস ভীষণ ভালবাসতাম। আর ইচ্ছে করত গোয়েন্দা হতে। কিন্তু খুব মুশকিলে পড়তাম দুই লাইনের মধ্যে কোন্ লাইনটাতে যাওয়া যায় তাই নিয়ে। এই দোটানার মধ্যে পড়ে হয়ে গেছি না ঘরকা, না ঘাটকা। তাই বাধ্য হয়ে 'ফিলম' করছি। ওসব এখন অতীত। ওসব শুরু করলে থামতে পারব না। হাজার হোক, বুড়ো মানুষ তো! বুড়োরা বকবকানি শুরু করলে থামতে চায় না। তখন আপনারাই বলবেন, হিচকক, তুমি বড্ড বেশি বকবক করো।

আপনারা তো আমার জীবনী শুনতে বসেননি। আপনারা পড়তে বসেছেন গল্প। তাই গল্পই পড়ুন। মাঝে মাঝে একটু চিন্তা করবেন যে আপনারা গল্পটার রহস্যের সমাধান করতে পারেন কি না। বলা যায় না, আপনারাও হয়তো এক-একজন দুর্দান্ত গোয়েন্দা হয়ে গেলেন। তা হলে আর দেরি নয়। এবার আমরা গল্পে ঢুকে পড়ি।

প্রথম পর্ব

সার্কাসের নাম ক্লানটন সার্কাস। শহরে এসেছে বেশ কিছুদিন হলো। চলছেও রমরম করে। জেরী ঘণ্টাখানেক আগে বেরিয়েছিল বাড়ি থেকে। শহরে গিয়েছিল। বাসে করে যেতে হয়। বেড়াতে যায়নি, গিয়েছিল একটা প্রয়োজনে। চাচার একটা চিঠি রেজিস্ট্রি করতে। শহরে এসে সার্কাসের তাঁবুর দিকে কিছুটা এগোতেই বুঝল কিছু একটা গোলমাল ঘটেছে। কী গণ্ডগোল বোঝা যাচ্ছে না। কারণ, সব কিছুই ঠিকঠাক চলছে।

তবু–

জেরী ঢুকছিল সার্কাসের পেছন দিককার রাস্তা দিয়ে। তার আবার সমস্ত কিছু নিয়েই চিন্তা-ভাবনা করা একটা অভ্যেস বলা যায়। তাই সার্কাসের ছোট তাঁবুটাও ভাল করে দেখছিল। ঘুরে ঘুরে দেখছে জেরী। কিছুটা দূরে তাঁবু। মাথাটা তেরপল দিয়ে ছাওয়া। তাঁবুর মাথায় শালুর ওপর বেশ বড় বড় করে লেখা ক্লানটন সার্কাস।

জেরীর সার্কাস দেখলেই মনের মধ্যে কেমন যেন হয়। এই সার্কাস, অর্থাৎ ক্লানটন সার্কাস সম্বন্ধে তো হবেই, এটা জানা কথা। কারণ, সার্কাসটা জেরীর চাচা এই বছর কিনেছেন। আর জেরী এই প্রথম বেরিয়েছে একটা সার্কাস দলের সঙ্গে

সফরে–বলা যায় নিজের দল। নেহায়েত চাচা রয়েছেন, তাই জেরীকে ওর মা-বাবা ছেড়েছেন। নইলে ছাড়তেন না। ক্লানটন সার্কাসের মালিক ছিলেন মি. ক্লেপল ক্লানটন। জেরীর চাচা ছিলেন এই সার্কাসের ম্যানেজার। গত শীতে মি. ক্লানটন জেরীর চাচাকে সব বেচে দিয়ে নিজের দেশে ফিরে গেছেন। তারপর থেকে জেরীর চাচা সার্কাস নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। তবে খেলা দেখানোই সার্কাস দলের একমাত্র কাজ নয়। আরও অনেক কাজ রয়েছে! তবে জেরীর অবশ্য বিশেষ কোন কাজ নেই। যার যখন দরকার হয়, জেরী তারই কাজ করে দেয়। চাচার সঙ্গে হিসেব-নিকেশ দেখাশোনার কাজকম্ম করে। চাচাও সেজন্য জেরীর ওপর বেশ খুশি। সম্ভবত সেই জন্যই ওকে ক্লাউনদের দলে খেলাও দেখাতে দেন মাঝে মাঝে। এটা একটা বড় সুযোগ।

সবার ভাগ্যে এই ঘটনাটা ঘটে না। অর্থাৎ সার্কাসে ঢুকেই কেউ ক্লাউনদের দলে খেলা দেখাতে পারে না। জেরী এই সুযোগ পেয়েছে তার চাচারই দৌলতে। তবে অন্যান্য ক্লাউনরাও আপত্তি করেনি। হাজার হোক মালিকের ভাইপো। সবাই, জেরীর সঙ্গে একটা সমঝোতা করে নিয়েছে। তাই জেরীও সার্কাসটাকে দারুণ ভালবেসে ফেলেছে। সে নিজেকে একজন খেলোয়াড় হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। কারণ, সবাই তাকে করুণা করবে খেলা পারে না বলে, এটা সে মোটেই চায় না। যা-ই হোক–তাঁবুটাকে জেরী বেশ ভাল করে ঘুরে ফিরে দেখল। প্রথমে খেলার তাঁবু–তার কাছেই ছোট্ট আরেকটা তাঁবু–সেই তাঁবু পেরিয়ে একটা জায়গা লাল তেরপলে ঘেরা। সেখানে রয়েছে জন্তু-জানোয়ারগুলো। এরপর আরেকটা তাঁবু–রান্নার জন্য। তারপর রয়েছে লোকজন, মালপত্র ইত্যাদি বয়ে নিয়ে যাবার জন্য কয়েকটি গাড়ি। সার্কাসটা খুব বড় না হলেও জেরীর ধারণা আমেরিকাতে যে সমস্ত ছোট ছোট সার্কাসের দল রয়েছে তার মধ্যে এটার খেলাই সবচাইতে ভাল।

সার্কাসের সব কিছুই দেখতে দেখতে জেরী এগোচ্ছে। কিন্তু অস্বাভাবিক কোন কিছুই তো তার নজরে আসছে না। তবু...কী যেন একটা নেই! কীসের যেন খামতি! কীসের যেন অভাব! হঠাৎ...হ্যাঁ, হঠাৎই ধরে ফেলল জেরী। চারদিক অস্বাভাবিক রকম নিস্তব্ধ! ভীষণ শান্ত! ভীষণ নীরব! আগস্ট মাস। চারদিকে ঝলমলে রোদ। চতুর্দিকে কী সুন্দর একটা ব্যস্ততার ভাব থাকবে–থাকবে একটা গুঞ্জন ধ্বনি–শোনা যাবে হাতুড়ির ওঠানামার আওয়াজ–সিংহের ঘড় ঘড় শব্দ–মাটিতে হাতির পদাঘাতের ঢিপঢিপে বাজনা, সবার আলাপ-আলোচনার গুনগুনানি–সেসব কিছু নয়। তার বদলে–চারদিক সুনসান। শব্দ একেবারে নেই তা নয়। যে শব্দটা শোনা যাচ্ছে তাকে বলা চলে একটা আর্তনাদ। জেরী তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এগোল। সামনে একটা বড় টানা গাড়ি। সেখানে এসে দেখল একদল লোকের জটলা। লোকগুলো চেয়ে রয়েছে জেরী আর জেরীর চাচার গাড়িটার দিকে। ঠিক বোঝা যায় না কী দেখছে! মি. নট দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর নিজের তাঁবুর কাছে। চোখেমুখে গভীর দুশ্চিন্তার ছাপ।

মি. নট–এই সার্কাসে তাঁর একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। ইনি হচ্ছেন প্লাস্টিক ম্যান। মি. নটের কার্যকলাপ প্লাস্টিকের সঙ্গেই দারুণ মেলে। তিনি শরীরটা ভেঙে চুরে বেঁকিয়ে শরীরের পেশীকে যখন যেমন খুশি তেমন করতে পারেন। সে এক অসম্ভব কসরতের খেলা। তা এমন ঘটনা প্লাস্টিক ছাড়া আর কীসের ওপরেই বা ঘটানো যায়! তাই মি. নটের হ্যাণ্ডবিলের নাম প্লাস্টিক ম্যান। তিনি সার্কাসে খেলা দেখাচ্ছেন দীর্ঘ তিরিশ বছর! জেরী গভীর উদ্বেগে মি. নটকে জিজ্ঞেস করল: 'কী ব্যাপার, মি. নট? কী হয়েছে? কোন গণ্ডগোল?'

নাঃ। মি. নট এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারলেন না। জেরী চটজলদি কদম বাড়াল সামনে। এগিয়ে যেতেই দেখল অ্যাণ্ডারসনের গাড়ি। অ্যাণ্ডারসন–দড়ির খেলা দেখায়। ওস্তাদ খেলুড়ে। কিন্তু অ্যাণ্ডারসনকেও মনে হলো খুবই অন্যমনস্ক! একটা খুঁটির দিকে দড়ির গিঁট ছুঁড়ে দিচ্ছে বার-বার। কিন্তু একবারও লাগছে না। জেরী খুবই অবাক হলো। কারণ, এমনটি তো কখনও হয় না! অবশ্য অ্যাণ্ডারসনের বউ খুব অসুস্থ। হাসপাতালে রয়েছে। তবে কি অ্যাণ্ডারসনের বউয়ের অসুখের বাড়াবাড়ি শুরু হলো! কে জানে?

অ্যাণ্ডারসনকে লক্ষ করে জেরী দেখতে পেল সে দূরে অফিস ঘরের কাছে গাড়িটার দিকে অন্যমনে চেয়ে রয়েছে। আরও এগিয়ে গেল জেরী। অ্যাণ্ডারসনের গাড়ি পেরিয়ে এল ইমো আর কিমোর গাড়ির কাছে। এরা দু'জন জাপানী জাদুকর। এদেরকে জীবনে কেউ হাসতে দেখেনি। তাই জেরী এদের দেখে কিছুই বুঝতে পারল না। দু'জনেরই মুখ নিরুত্তাপ–উদাসীন। জাদুকরদের গাড়ির উল্টো দিকেই রয়েছে আবদুল্লা আর আমেদের গাড়ি। এরা ব্যালেন্সের খেলা দেখায়। দু'জনেই অ্যারাবিয়ান এবং ব্যালেন্সের খেলায় ওস্তাদ। জেরী যেতে যেতে দেখল আমেদ আর আবদুল্লা খেলা প্র্যাকটিস করছে। আমেদ পা ফাঁক করে ছ'ফুটের ওপর লম্বা একটা অ্যালুমিনিয়াম রড মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অ্যালুমিনিয়াম রডের ঘের চার ইঞ্চির ওপর। রডের দু'দিকে রবারের ঢাকনা দেয়া।

রডের ওপরে মাথা নীচে দিয়ে পা ওপরে করে রয়েছে আমেদ। জেরীকে দেখেই হঠাৎ সে ব্যালেন্স হারিয়ে পড়ে গেল নীচে। আর আবদুল্লার মাথার ওপর থেকে অ্যালুমিনিয়াম রডটা টুপ করে মাটিতে পড়ে গেল। পড়বি তো পড় আবদুল্লার পায়ের গোড়ায়। আর একটু হলে একেবারে পায়ের উপর পড়ত। আবদুল্লা ঝটিতি রডটা তুলে নিয়ে তাকাল একবার অফিস গাড়ির দিকে। এর পরের গাড়িটা বামন এবং দীর্ঘদেহী মানবের। মেজর মাইট আর লম্বু। মাইটের দেহে লোদ লোদ মাংস আর লম্বু? সে বিরাট লম্বা। আট ফুটেরও ওপর। লম্বুর পাশে মাইট একেবারে শিশু। মেজরের হাইট তিন ফুটের বেশি। কিন্তু ওজন একুশ-বাইশ কেজি।

মেজরের সাজের বাহার রয়েছে। দু'হাতের দশটা আঙুলে দশটা হীরের আংটি সর্বদা ঝকমক করছে। এই সাজের বাহারের জন্যই মেজর ধারে-কর্জে জর্জরিত। মেজরের একটা ছড়ি ছিল। সেটা তার সর্বক্ষণের সঙ্গী। মাথার কাছটা বাঁকানো। খেলা দেখাতে দেখাতে হঠাৎ কারও পেছনে ছড়িটা আটকে দিত। অমনি পড়ে যেত হাসির হুল্লোড়। জেরী যেতে যেতে শুনল মেজর লম্বুকে বলছে: 'এই, আমাকে একটু উঁচুতে তুলে ধর না। আমি তো দেখতেই পাচ্ছি না।'

'দেখবি আর কী! আয়।' বলে লম্বু হাত দুটো পাতল। মেজর একলাফে হাতের ওপর উঠে এল। লম্বু ঝটিতি তাকে তুলে নিল কাঁধের ওপর। মেজর লম্বুর কাঁধে উঠে গম্ভীরভাবে চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। যেন সমস্ত জায়গাটা সরেজমিনে তদন্ত করে নিচ্ছে। জেরী লম্বুকে জিজ্ঞাসা করল: 'কী হলো? কোন অ্যাকসিডেন্ট নাকি?'

লম্বু জেরীর কথার উত্তর দিতে গেলে মেজর একটু ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ল। মাথার ওপর বেসামাল হয়ে চিৎকার করে উঠল: 'কী রে, ফেলে দিবি নাকি?'

'জেরী এসেছে দেখিসনি?'

'দেখেছি, দেখেছি। আমি কি চোখে দেখি না নাকি?'

'কী বলছিলে? কী হয়েছে? একটা চিৎকার শুনে বেরিয়ে এলাম। বাইরে আসতেই দেখি কোন সাড়াশব্দ নেই।'

'মনে হয় কিছু চুরিটুরি হয়েছে। কী যে আরম্ভ হলো এখানে, কে জানে! আশ্চর্য!'

'কেন?' জেরীর প্রশ্ন।

'চুরি লেগেই রয়েছে। এটা, নয় ওটা—আমি এবার পাতলা হব,' লম্বু সখেদে বলল।

'বা! বা! বেড়ে মজা না! যাবি কোথায়? যতক্ষণ আমার ওই ছড়িটা না পাচ্ছি ততক্ষণ এই জায়গা ছেড়ে নড়া নেই। কী ভাল ছড়িটা আমার। ইস্! দারুণ পয়া ছিল ওটা। তা ছাড়া তোর জুতো জোড়া? সেটাও তো পাওয়া দরকার! অমন সুন্দর হাতে তৈরি জুতো জোড়া! আহা-হা!'

'নিকুচি করছি ছড়ি আর জুতোর। আমি এবার পাতলা হব, এই সোজা কথা বলে দিলাম।'

জেরী এদের নিরর্থক কচকচানির মধ্যে না গিয়ে এগোল। তবে সত্যিই যদি মেজর মাইট অথবা লম্বু সার্কাস ছেড়ে দিয়ে চলে যায় তবে জেরীর চাচা সত্যিই খুব ঝামেলায় পড়ে যাবেন। কারণ, ওরা দু'জন সার্কাসের একটি বিশেষ আকর্ষণ। যা হোক, জেরী পা চালিয়ে চলল। এক্ষুণি তো আর ওরা যাচ্ছে না! পরের কথা পরে ভাবা যাবে। জেরীকে কে যেন ডাকল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর পেছন ফিরে দেখল ওকে ডাকছেন ভাগ্যদেবী। ভাগ্যদেবী! তাও আবার

সার্কাসে! হ্যাঁ, সব্বাই ওই বৃদ্ধা বেদেনী মহিলাকে ভাগ্যদেবী বলেই ডাকে। অদ্ভুত ভবিষ্যদ্বাণী করেন এই মহিলা। সম্ভবত তাই এই নাম। জেরী এগিয়ে গেল ভাগ্যদেবীর দিকে। ভাগ্যদেবীর হাতের উপর একটা ময়না বসে জেরীর দিকে পিটপিট করে তাকাচ্ছে। ভাগ্যদেবী পাখিটাকে আদর করে একটা নাম দিয়েছেন। মি. ডার্ক। হ্যাঁ, ওই নামেই ভাগ্যদেবী ময়নাকে ডাকেন। জেরী কাছে এগোতেই ময়না বলে উঠল: 'বিপদ! বিপদ! ভীষণ বিপদ!'

'থাম তো!' ভাগ্যদেবী ময়নাটাকে ধমক দিলেন। 'তোর খালি পাকা পাকা কথা!' তারপর জেরীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তবে ময়না যা বলেছে তা ঠিক। বিপদ আসছে। বেশ বিপদ! উইনিফ্রেড খুব মুশকিলে পড়েছেন।'

'উইনিফ্রেড...মাদাম উইনিফ্রেড, মানে আমাদের সাপের খেলা দেখান যিনি?'

'হ্যাঁ।'

'কী হলো তাঁর? শরীর খারাপ হয়েছে?'

'না। তবে তাঁর খুব বিপদ,' এবারে বলল ময়না নিজে।

ময়নার কথা শুনে ভাগ্যদেবী গম্ভীর হয়ে বললেন: 'না, না, অসুখ হবে কেন? তাঁর মন খুবই অস্থির। তিনি এখন রয়েছেন তোমার চাচার ঘরে। তাঁর বোধহয় কিছু চুরি গেছে!'

'এই মরেছে! আবার কী চুরি গেল! আচ্ছা ঝামেলা তো!'

জেরী তার চাচার গাড়ির দিকে দৌড়াল। হাঁফাতে হাঁফাতে অন্য তাঁবুগুলোকে পেছনে রেখে চাচার গাড়ির দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল। উত্তেজনায় দম নিতে পারছে না।

জেরীর চাচা–ফ্র্যাংক ম্যাসন।

চাচা বসে ছিলেন তাঁর টেবিলের সামনে। ঠিক উল্টো দিকেই বসে আছেন ম্যাডাম উইনিফ্রেড। চাচার চেহারা খেটে খাওয়া মানুষের মত। মুখের ভাব গম্ভীর। ম্যাডাম উইনিফ্রেড যথেষ্ট স্থূলকায়া। থলথলে স্বাস্থ্য। যেহেতু উইনিফ্রেড সাপের খেলা দেখান, তাই সবাই তাঁকে বলে 'সাপরানি'। হ্যাণ্ডবিলে তাঁর ছবিও ছাপা হয়। সেই ছবিতে তিনি চারদিকে সাপ নিয়ে বসে থাকেন বেশ বহাল তবিয়তে। তবে ভদ্রমহিলা কিন্তু মানুষ ভাল। সহজ, সরল, সাদাসিধে। তাঁর একটা ভাল গুণ আছে। শীতকাল হলেই সবাইকে ডেকে ডেকে উপযাচক হয়ে সোয়েটার বুনে দেন। দোষ কেবল একটাই। তা হলো ম্যাডামের সঙ্গে সবসময় সাপ থাকে। সে সাপ শুধু সঙ্গে থাকলেও না হয় কথা ছিল। সে সাপের ফণা আবার সর্বক্ষণ ম্যাডামের মাথা বরাবর দোল খাচ্ছে। ভয়ঙ্কর দৃশ্য!

জেরী ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ম্যাডাম প্রায় আর্তস্বরে চিৎকার করে উঠলেন: 'জেরী, আমার সাংঘাতিক বিপদ। আমার বেল হারিয়ে গেছে! দেখেছ তুমি?'

'বেল? বেল আবার কী?'

'আরে! তুমি কোথায় থাকো? বেল মানে আমার সাপ, আহা-হা! কী সুন্দর সাপ আমার। কতদিন থেকে আমার কাছে রয়েছে। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুও বলা যায়। কে নিল আমার বেলকে?' কান্নায় ম্যাডামের গলা প্রায় বুজে এল।

জেরী তো অবাক! সাপ চুরি গেছে! কেউ শুনেছে কোথাও! আশ্চর্য ব্যাপার! এ কী বিস্ময়কর চুরি! জেরী নিঃসন্দেহ হবার জন্য ম্যাডামকে প্রশ্ন করল: 'আপনি ঠিক জানেন যে সাপটা চুরিই গেছে?'

এবারে জেরীর চাচা মুখ খুললেন: 'আমিও তো একই কথা বলতে চাইছি। বুঝলে, আমার মনে হয় কোন ফুটো-টুটো দিয়ে তোমার ওই টেল না ডেল–'

'বেল।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। বেল বেরিয়ে কোথাও চলে গেছে। নইলে সাপ কে চুরি করবে বলো তো? তার প্রাণের মায়া নেই?'

'অসম্ভব! পালাতেই পারে না। ফুটোই নেই তো পালাবে কোথায়? গাড়িতে তো একটাই জানালা। সেটাও আবার মোটা তারের জাল দিয়ে আটকানো। আর জানালাটাও কত উঁচুতে। পালালেই হলো! সবচাইতে বড় কথা জালটা কাটা হয়েছে।'

'তাই নাকি?'

'তবে বলছি কী? যান না গিয়ে দেখে আসুন!'

'তাই ভাল। চল, জেরী, আগে দেখে আসি। তুমি কিন্তু যেয়ো না, বুঝলে? তুমি ভাল করে ব্যাপারটা ভাবো। কোন কিছু গোলমাল হচ্ছে কি না, দেখি কী করা যায়।'

শেষ কথাগুলো জেরীর চাচা ম্যাডামকে বলে উইনিফ্রেডের গাড়ির দিকে পা বাড়ালেন। পথে যেতে যেতে বললেন: 'কী মুশকিল বল তো! আচ্ছা হুজ্জত, যা হোক।'

বলতে বলতে পৌঁছে গেল তারা ম্যাডামের নাম লেখা গাড়ির সামনে। গাড়িটার সামনে থেমে জেরীর চাচা গজগজ করতে লাগলেন: 'কী যে সব কাণ্ড হচ্ছে! কোন উন্মাদ ঢুকে পড়ল কি না সার্কাস দলের মধ্যে, কে জানে! কী সব অর্থহীন চুরি! লম্বুর জুতো জোড়া গেল প্রথমে চুরি। তারপর ধর, মেজরের পয়া লাঠিটা। এরপর অ্যাণ্ডারসনের জাদু দেখানোর দড়িটা। চার নম্বর গেল তরবারি ভক্ষক স্যাবরের একটা তলোয়ার। আজ গেল একটা সাপ। আমার তো সত্যি কথা বলতে কী কিছুই মাথাতে আসছে না!'

জেরীও এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারল না। আসলে ও একেবারেই হকচকিয়ে গেছে। ও নিজেও ভেবে পাচ্ছে না, কার লাভ এই সমস্ত মূল্যহীন জিনিস চুরি করে। জেরীর চাচা আরেকটা কথা ইচ্ছে করেই চেপে গেছেন। তবে জেরী সেটা বুঝে গেছে। তা হলো–দিন পাঁচেক আগে মিউজিয়াম থেকে হীরে চুরির খবর।

হীরেটার নাম 'গ্রিন ফ্লেম', অর্থাৎ 'সবুজ শিখা'। দাম–এক লক্ষ ডলার!

হীরেটা যখন চুরি যায়, ক্লানটন সার্কাস তখন খেলা দেখাচ্ছিল মিউজিয়ামের ঘেঁষাঘেঁষি একটা মাঠে। জেরী ইচ্ছে করে মাথা থেকে হীরে চুরির কথাটা সরিয়ে দিল। কারণ, এখন তার নিজের দলের সমস্যা নিয়ে আগে ভাবা উচিত। ওসব বাইরের চুরির চিন্তা পরে হবে। ম্যাডামের ঘরের মধ্যে সাপ চুরির তদন্তই এখন মূল লক্ষ্য। জেরী আর তার চাচা সরাসরি যে ঘর থেকে সাপ চুরি হয়েছে সেখানে চলে গেল। একটা বড় লোহার দরজা। একটা ছেড়ে আরেকটা দরজা। তারপর তার দিয়ে বেড়া দেয়া জাল। এই জালের ওপরে ছোট-বড় বিভিন্ন মাপের নানান কাচের বাক্স। সেই কাচের বাক্সের প্রত্যেকটাতে নানারকম সাপ কুঁকড়ে-মুকড়ে শুয়ে রয়েছে। জেরী প্রথমে যখন এসেছিল তখন এই সাপগুলো দেখে ঘেন্নায় গা গুলিয়ে উঠত। এখন ব্যাপারটা গা সওয়া হয়ে গেছে। পরে অবশ্য জেরী জেনেছে যে সাপগুলোর কোন বিষই নেই। তা বিষই যখন নেই তখন কুলোপনা চক্কর থাকলেই বা ক্ষতি কী? জেরীর চাচা, ফ্র্যাংক বেশ ভাল করে চতুর্দিক দেখলেন ঘুরে ঘুরে। তদন্তে খুঁত নেই এতটুকু। চুরি তো!

তারপর রায় দিলেন: 'না, ম্যাডাম বাজে কথা বলেনি। বুঝলি, জেরী, ওই ডেল–'

'চাচা, বেল–'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বেলের বাইরে বের হবার কোন রাস্তাই নেই।'

'তাই তো দেখছি। ম্যাডাম সাপগুলোকে বেশ যত্নেই রাখেন।'

'তবে?'

'ভাবছি।'

'ওই দেখ, জালটা সত্যিই কাটা। বেশ নিখুঁতভাবেই কাটা।'

'লক্ষ করেছ, জানালাটা গাড়ির শেষে এবং ওই জালটা তিন দিক থেকে কেটে ফেলা হয়েছে!'

'হ্যাঁ।'

'ভেতরের কাজ শেষ। এবার চলো বাইরেটা দেখা যাক।'

ফ্র্যাংক আর জেরী গাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে জানালার বাইরের দিকটাতে এল। জানালাটা বাইরের মাটি থেকে বেশ কিছুটা উঁচুতে। ফ্র্যাংকের মাথা ছাড়িয়েও আরও কয়েক ফুট ওপরে। ফ্র্যাংক নীচ থেকে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না ভেতরটা। তখন জেরীকে তাঁর কাঁধে চেপে একবার ভেতরটা জানালার বাইরে থেকে উঁকি দিয়ে দেখতে বললেন।

জেরী যথারীতি কাঁধে চেপে জানালা দিয়ে ভেতরে উঁকি মারতে গিয়ে হঠাৎ মাটির দিকে তাকাল। মুখ দিয়ে একটা বিস্ময়ের আওয়াজ বের হলো: 'ওটা কী?'

জেরীর চাচা অবাক হয়ে মুখ তুলতেই জেরী আঙুল দিয়ে মাটির ওপরটা দেখাল। ফ্র্যাংক সবিস্ময়ে দেখলেন–জানালার নীচে ছড়ানো বালি। তার ওপর

বিশাল মাপের জুতোর দাগ!

জেরী অবাক হয়ে ভাবল, কী আশ্চর্য! জুতোর ছাপটা তো লম্বুর। তার মানে কাল রাত্রে লম্বু এখানে এসেছিল। কিংবা...

জেরী কী যেন বলতে গিয়েও বলল না। কারণ, ওর মনে হচ্ছিল এ-ধরনের কাঁচা মন্তব্য করা ঠিক হবে না। ব্যাপারটা চেপে গিয়ে চাচাকে বলল: 'ছেড়ে দাও। এবার জানালা দিয়ে নজর করে দেখি অন্য কোন সূত্র পাওয়া যায় কি না!'

জেরী জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে দিয়ে দেখল জানালা থেকে সাপগুলো অনেক নীচে। নাগাল পাওয়া যায় না। কিন্তু একটা বাক্স ফাঁকা। বেল সম্ভবত ওই বাক্সেই ছিল।

জেরী মাটিতে নামল।

জেরীর চাচা ভীষণ চিন্তায় পড়লেন।

'তা হলে?' বলল জেরী।

'লম্বু এ কাজ করেনি।'

'কী করে বুঝলে?'

'প্রথমত জানালা দিয়ে লম্বুর কাঁধ ঢুকবে না। আর দ্বিতীয়, লম্বু সাপ খুব ঘেন্না করে।'

'ঠিক আছে, তোমার কথাই না হয় মেনে নিলাম। লম্বু না হয় গলতে পারে না জানালা দিয়ে, কিন্তু মেজর তো পারে।'

'হ্যাঁ। মেজর মাইট লম্বুর কাঁধে চেপে জানালা গলে গিয়ে সাপটা...'

'সম্ভব। কিন্তু জানালা দিয়ে তো শুধু গললেই হবে না। হাতও তো পৌঁছতে হবে সাপ পর্যন্ত। মেজরের হাত কি অতদূর গিয়ে পৌঁছবে? এটা সম্ভব না।'

'হাতের দরকার কী? মেজরের বাঁকানো ছড়িটা দিয়েই তো কাজ উদ্ধার হবে। ওই দুই ব্যাটারই কাজ, তোকে বলে দিচ্ছি।'

'তা না-ও হতে পারে, চাচা। লম্বুর জুতো আর মেজরের ছড়ি তো আগেই চুরি গেছে, তাই না?'

'তাতে হলোটা কী?'

'চোর তো লম্বুর জুতো পরে মেজরের ছড়ি দিয়ে কাজ উদ্ধার করতে পারে যাতে দোষটা সরাসরি লম্বু আর মেজরের ওপর এসে পড়ে। এদিকটাও তো ভাবা দরকার।'

মি. ফ্র্যাংক কেমন মুষড়ে পড়লেন জেরীর ব্যাখ্যা শুনে। আরও চিন্তিত দেখাল তাঁকে।

ওপরে ওপরে জুতো, ছড়ি, দড়ি, তলোয়ার বা সাপ চুরি সবটাই কেমন যেন অর্থহীন বলে মনে হয়। কিন্তু...হ্যাঁ, সব মিলিয়ে এই 'কিন্তু'টাই প্রধান। কারণ, মি. ফ্র্যাংক পরিষ্কার বুঝতে পারছেন যে সবক'টা চুরির পেছনেই একটা উদ্দেশ্য কাজ করেছে। কিন্তু আসল উদ্দেশ্যটা কী? এদিকে এই ছোটখাট চুরিগুলোকে কেন্দ্র করে ক্লানটন সার্কাসের লোকদের মনে একটা সন্দেহের রেখা গজিয়ে উঠছে

বেশ ভালরকমভাবেই। জেরী আর মি. ফ্র্যাংক কোনভাবেই এই চুরিগুলোর বিষয়ে সঠিক কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারছিল না। ফ্র্যাংক একবার বললেন: 'এমনও হতে পারে যে লম্বু আর মেজরের জুতো, ছড়ি আদৌ চুরি যায়নি। ওরা মিথ্যে গুজব ছড়িয়েছে।'

'তাতে ওদের লাভ? তবু যদি মেনে নেয়া যায়, তবে স্যাবরের তলোয়ার বা আণ্ডারসনের জাদু দেখানোর দড়ি এগুলোই বা যাবে কোথায়?'

'ওই বেঁটেটাই নিয়েছে। ম্যাডামের সাপের জন্য জানালার জাল কাটতে। এ আমি বাজি ধরে বলতে পারি।'

'উদ্দেশ্য তো থাকবে একটা।'

'সেটা কী করে বলব? মিউজিয়ামে যে হীরে চুরি হয়েছে সেটাকে ধামাচাপা দেবার জন্যও হতে পারে। যা হোক সাপটা পেলে ঘটনাটা অনেকটা পরিষ্কার হবে।'

'তা হবে অবশ্য।'

'সবগুলো তাঁবু একবার নিজে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখা দরকার। বিশেষ করে লম্বু আর মেজরের গাড়ি।'

'সাবধান, ওরা যেন ব্যাপারটা বুঝতে না পারে। তা হলে কিন্তু দল ছেড়ে চলে যেতে পারে। লম্বু এমনিতেই ঘাবড়ে গেছে। মেজরকে বলছিল যে দল ছেড়ে দেবে।'

'ঘাবড়ে কি আর আমরা যাইনি! দল ছাড়ার কথা যখন বললি, তখন বলি, বেলকে পাওয়া না গেলে দল অনেককেই ছাড়তে হবে। দল ভেঙেও যেতে পারে। তার আগেই এ চুরির কিনারা করতে হবে। নইলে সমূহ ক্ষতি এই দলের। আমাদের সাংঘাতিক দুর্নাম হয়ে যাবে।'

মি. ফ্র্যাংক হাঁটতে হাঁটতে চললেন নিজের গাড়ির দিকে। তাঁর পিছু পিছু চলল জেরী। ওদের ফিরতে দেখে ম্যাডাম হড়বড়িয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

'পেলেন আমার বেলকে?'

'না। তবে আশা করছি পাব,' উত্তর দিলেন ফ্র্যাংক একটু ভেবে ম্যাডামকে জিজ্ঞেস করলেন: 'আচ্ছা, তোমার ওই শেল...'

'বেল।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বেল কতটা লম্বা বলতে পারো?'

'প্রায় ছ'ফুট। এক ইঞ্চি কম। আর বেড় তিন ইঞ্চি মতন। আহা, আমার সবগুলো সাপের মধ্যে সবচাইতে ভাল।'

'ঠিক আছে, এবার খুব মন লাগিয়ে খুঁজব। তুমি এক কাজ করো, তুমি তোমার গাড়িতে বসে বরং বিকেলের শো-এর জন্য তৈরি হও, আমি দেখছি কী করা যায়।'

'যাই তবে। ওদের, মানে আমার সাপগুলোকে আজ ডিম সেদ্ধ খাওয়াব। যদিও আজ ওদের ডিম খাওয়ার দিন নয়, তবু বেলটার জন্য মনটা ভাল নেই তো,

তাই আগেই খাইয়ে দিই। পরে না হয় আবার খাওয়াব।'

ম্যাডাম নিজের গাড়ির দিকে পা বাড়ালেন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল জেরী আর ফ্র্যাংক দু'জনেই। ম্যাডাম বেরিয়ে যাবার পর ফ্র্যাংক ম্যাডামের যাবার পথের দিকে তাকিয়ে বললেন: 'বুঝলি, জেরী, উইনিফ্রেডের খুব আঘাত লেগেছে।'

'হুঁ।'

'আসলে সাপগুলোকে একেবারে নিজের সন্তানের মত ভালবাসে। ঘটনাটি আমাদের একটু ভাল করে খতিয়ে দেখতে হবে। এর কিনারা করতেই হবে।'

'কিন্তু কী করে?'

'আমি এদিকটা ভাল করে তল্লাশি চালিয়ে দেখছি, যদি না পাওয়া যায় বেলকে, তবে...। না পাওয়া গেলে চলবে না। পেতেই হবে।'

'তল্লাশি করার সময় কি আমার থাকবার দরকার আছে?'

'না।'

'তা হলে আমি একটু পার্কারের কাছে যাই।'

'তল্লাশিটা একটু অন্যরকমভাবে করব, বুঝলি?'

'কীভাবে?'

'যখন তাঁবুর ভেতরে সবাই খেলাধুলায় ব্যস্ত থাকবে সেই ফাঁকে আমরা এদিকে তল্লাশি চালাব।'

'সেই ভাল। তা হলে কেউই বুঝবে না।'

'তুই কিন্তু তখন অফিস ঘর সামলাবি।'

'বেশ।'

'তার আগে এক কাজ কর।'

'কী?'

'চট করে কিছু খেয়ে নে।'

'নিচ্ছি।'

জেরী বাইরে এল। রোদের তেজ বেশ বেড়েছে। সার্কাসে যে একটা থমথমে ভাব ছিল তা আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে। চারদিকে আবার হৈ চৈ—

বেশ একটা জমজমাট ভাব ফিরে আসছে আবার। তবে আবহাওয়ায় একটা চাপা থমথমানি ভাব রয়েই গেছে। ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই সবার কানেই খবরটা গেছে। লম্বু আরও ঘাবড়ে গেছে নির্ঘাত। সার্কাসে যারা কাজকর্ম করে তারা কুসংস্কারে এত বিশ্বাস করে! একবার যদি সার্কাস সম্বন্ধে তাদের ধারণা গজিয়ে যায় যে এই সার্কাসটা অপয়া, ব্যস, সার্কাসের দল তা হলে টেঁসে গেল। সে সার্কাসে কেউ কাজ করবে না। আর সার্কাসে যদি খেলোয়াড়রাই কাজ না করে তবে তা চলবে কেমন করে?

জেরী যেতে যেতে এই সমস্ত কথাই আপন মনে ভাবছিল। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মাথায় কী যে খেলে গেল তার। সে কেমন নিশ্চিন্ত হয়েই গেল এই রহস্যের কিনারা সে করতে পারবে। কিন্তু কেমন করে? অতঃপর জেরীর কাছে সেটাই

প্রশ্ন!

আমি আলফ্রেড হিচকক আপনাদের গল্প পড়ার মাঝে একটু অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছি। খুব অল্প সময়ের জন্য। কয়েক সেকেণ্ড মাত্র। আসলে জেরী তো রহস্যের সমাধান করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েই নিয়েছে! তাই আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। জেরী যদি বাচ্চা ছেলে হয়ে রহস্যের কিনারার জন্য উঠে-পড়ে লাগে, তবে আপনারা কি এত মূর্খ যে আপনারা পারবেন না? অবশ্য নিশ্চয়ই আপনাদের মধ্যে কেউ-কেউ নিশ্চিত সমাধানে হয়তো পৌঁছেই গেছেন, তাঁদের অনুরোধঃ দয়া করে রহস্যটা বন্ধুদের ভেঙে দেবেন না। তাঁদেরও চেষ্টা করতে দিন। কারণ, সবাই তো আপনার মত বুদ্ধিমান নন। এতক্ষণ ধরে যা-যা ঘটেছে তা নিশ্চয়ই আপনারা বার-বার খতিয়ে দেখেছেন এবং দুটো 'সূত্র'ও নিশ্চয়ই ধরে ফেলেছেন। ও, বাবা! অমন চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে রয়েছেন কেন? যাচ্ছি, বাবা, যাচ্ছি। এত তাড়াতাড়ি কয়েক সেকেণ্ড হয়ে গেল!!!

দ্বিতীয় পর্ব

মি. পার্কার। ইনস্যুরেন্স কোম্পানির ডিটেকটিভ। যে হীরেটা মিউজিয়াম থেকে চুরি হয়েছে তা ইনস্যুরেন্স করা ছিল। সুতরাং টাকা তো তাদের দিতেই হবে। কিন্তু হুট করে বললেই তো এক লাখ ডলার কেউ দেয় না।

আর বিশেষ করে ইনস্যুরেন্স কোম্পানি তো নয়ই। ওদের আবার নানান ফ্যাচাং। এমনি সাধারণ অবস্থাতেই টাকা দিতে গাঁইগুঁই করে। আর এ তো চুরির কেস। চুরির কিনারা করার চেষ্টা না করেই মুফতে এক লাখ ডলার হাতে তুলে দেবে? তাই হয় নাকি? অতএব মি. পার্কার হীরে চুরির তদন্তে বহাল হয়েছেন। জেরী মি. পার্কারের সন্ধানে ঘুরছিল। পেয়ে গেল তাঁকে। রান্নার তাঁবুর বাইরেই।

যে জায়গাতে হীরেটা চুরি হয়েছে সে জায়গার নাম মিলারটন। সার্কাসের দল সেখানে, ওই মিউজিয়ামের পাশেই কিছুদিন খেলা দেখিয়েছিল। সুতরাং পার্কার দিশে না পেয়ে সার্কাসের দলেই ভিড়ে গেছে। কারণ, তদন্তের শুরু তো এক জায়গা থেকে করতেই হবে। সার্কাস থেকেই শুরু হোক।

মি. পার্কার! চেহারাটা চোখে পড়ার মত। রোগা সিরিঙ্গে মার্কা। মাথায় মরুভূমির মত বিশাল টাক। জায়গায় জায়গায় মরূদ্যানের মত দু'চারটে চুল। চুল না বলে রোঁয়া বলা ভাল। কান দুটোর সঙ্গে খরগোসের কানের দারুণ মিল। সর্বদা লতপত করছে। খুব বেশি গরম পড়লে মি. পার্কার খুব সহজেই মাথা দুলিয়ে কান দিয়ে হাওয়া খেতে পারেন।

জেরী গিয়ে দেখল মি. পার্কার রাঁধুনী প্যাডির সঙ্গে জমিয়ে গল্প করছে। প্যাডি রান্না করছে। মি. পার্কার তাঁবুর ঢালে হেলান দিয়ে আসর জাঁকিয়ে বসেছেন। কী এত গল্প কে জানে!

এই প্যাডির একটা অতীত রয়েছে। প্যাডি আগে বিশাল বিশাল ওজন

নির্দ্বিধায় তুলে ফেলত। ওজন তোলার খেলাই প্যাডি দেখাত। প্যাডির একটাই দুর্বলতা ছিল। তা হলো খাওয়া। প্রচুর খেত। প্যাডির খাওয়া একটা দর্শনীয় বস্তু ছিল। এত খেয়ে খেয়ে প্যাডির চেহারা হয়ে গেল থলথলে। গায়ে জমে উঠল মেদের পাহাড়। অগত্যা কী আর করা! আগের কাজ করতে প্যাডির কষ্ট হত। তাই বাধ্য হয়েই রান্নাঘরের দায়িত্বে এসে রান্না করাটাকেই জীবনের লক্ষ্য বলে মেনে নিল। কী করা যাবে! প্যাডি কী ছিল—প্যাডি কী হয়েছে!

যা হোক—জেরী গিয়ে দেখে প্যাডি আর মি. পার্কার দু'জনেই কফির কাপ হাতে খোশ গল্পে মত্ত। প্যাডি তার পুরানো গল্প বলে চলেছে:

'কী বলি, বলুন? আগে লোকে সার্কাস দেখতে চাইত। আর এখন? সার্কাস দেখতে যেন কোন আগ্রহই নেই! আশ্চর্য! কত্তো ছোট্ট বয়স থেকে সার্কাসে আছি জানেন? এ দল, ও দল, সব দল ঘুরে শেষে এখানে এসেছি। কম জায়গা তো ঘুরলাম না। কম দলও দেখলাম না। সর্বত্রই চোর-জোচ্চোরে ভরা। তবে আমাদের এই ক্লানটন সার্কাসে ওসব নেই। ভারি ভাল জায়গা। আপনি কী ভেবেছেন যে হীরে চোরের হদিশ আপনি আমাদের সার্কাসে পাবেন? হাসালেন। সে গুড়ে বালি। এখানে ওসব মরে গেলেও পাবেন না।'

পার্কার বিষম খেলেন!

এ লোকটা কী করে জানল যে তিনি চুরির তদন্তে এসেছেন? ভারি অবাক কাণ্ড তো! আসলে পার্কার ভেবেছিলেন তিনি এমন ছদ্মবেশ নিয়েছেন, কেউ তাঁকে চিনতেই পারবে না। পার্কার প্যাডিকে বেশ হতবাক হয়েই শুধালেন: 'তোমায় কে বলল যে আমি হীরে চুরির তদন্তে এসেছি এখানে? আচ্ছা মুশকিল তো!'

প্যাডি একটু ইতস্তত করছিল উত্তর দিতে।

এমন সময় দেখা গেল জেরী এদিকে আসছে। পার্কার জেরীকে দেখেই জোরে ডাকলেন: 'এই যে, জেরী, আমি এখানে। তোমাকেই খুঁজছিলাম। দরকারি কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

জেরী প্যাডির কাছ থেকে এক প্লেট স্টু চেয়ে নিয়ে ঘরের এক কোণে পার্কারকে নিয়ে বসল। এমনভাবে যাতে তাদের কথা কেউ না শুনে ফেলে। পার্কার বলতে শুরু করলেন: 'শোনো, জেরী, ব্যাপারটা বেশ গোলমেলে।'

'আমারও তাই ধারণা।'

'তুমি তো সার্কাসের মধ্যেই রাতদিন ঘোরাঘুরি করছ।'

'তা তো ঘুরতেই হয়।'

'তা হলে তো সার্কাসের লোকজনদের মনের ভেতরের কথাবার্তা তুমি অতি সহজে জানতে পারো।'

'বলতে পারেন। সবটা না হলেও অল্প অল্প।'

'তবে তো হীরে কে নিয়েছে তাও জেনে গেছ নিশ্চয়ই। আমার কি মুশকিল জানো?'

'কী?'

'মনে হয় সবাই জেনে গেছে যে আমি একজন গোয়েন্দা। তাই কেউ মুখ খুলতেই চাইছে না।'

'তা হতেই পারে।'

'এক কাজ করবে?'

'কী কাজ?'

'তুমি আমাকে হীরের ব্যাপারে সাহায্য করবে? তাতে হীরে উদ্ধারের জন্য যে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে তার ভাগ হবে ফিফটি-ফিফটি। রাজি?'

'ভাবছি।'

'ভেবো না। ভেবো না। বেশি ভাবলে আমার মত তোমার মাথাতেও টাক পড়ে যাবে। শুধু এটুকু জেনে রাখো যে পুরস্কারের পরিমাণ পাঁচ হাজার ডলার। তার অর্ধেক আড়াই হাজার, এক্কেবারে মুফতে।'

জেরী মুহূর্ত কয়েকের জন্য ভাবতে বসল:

এটা পার্কার ঠিক বলেননি যে সার্কাসের সমস্ত লোকজনের সঙ্গেই আমার ঘনিষ্ঠতা আছে। এদের মধ্যে কয়েকজন রয়েছে যারা এখনও আমি নতুন বলে আমায় খুব একটা পাত্তা দেয় না। এখন তাদেরকে যদি বিশ্বাস করাতে হয় তবে বেশ কিছুদিন প্রাণ দিয়ে তাদের সঙ্গে মিশতে হবে। নয়তো এমন একটা কিছু করা দরকার যাতে তারা আমার দিকে খুব সহজেই চলে আসে। কিন্তু কী করা যাবে? তা ছাড়া আমার মনে হয় যদি সত্যিই কেউ সার্কাসের মধ্যেই হীরে নিয়ে থাকে তবে সে মানে মানে আগেই সার্কাস থেকে কেটে পড়ুক। লোক জানাজানি হবার আগেই। পরে না হয় লোকে জানুক। সার্কাসের সুনাম তো ক্ষুণ্ণ হবে না। এই সব ভেবে জেরী পার্কারকে জিজ্ঞেস করল: 'আচ্ছা, মি. পার্কার, আপনি কী করে এত শিওর হলেন যে আমাদের সার্কাসের কেউ হীরেটা চুরি করেছে?'

'কারণ আছে, ভাই। নইলে কি মিছেমিছি এখানে গ্যাঁট পাকিয়ে বসে আছি?'

'কী কারণ?'

'শোনো বলছি। আচ্ছা, মিলারটন মিউজিয়াম, মানে যেখান থেকে হীরেটা চুরি হয়েছে সেখান থেকে তোমাদের এই সার্কাসের তাবুটা কতটা দূরে ছিল বলো তো?'

'সে কী করে বলব? আমি কি মেপে দেখেছি?'

'আরে, কী মুশকিল, আমিই কি মেপেছি? আন্দাজের কথা বলছি।'

'মনে পড়ছে না।'

'ধরো সিকি মাইল মত। এবারে আমার ধারণার কথা শোনো। গত শনিবার সকালবেলা, যখন তোমরা সবাই জিনিসপত্র গোছগাছ করছ, তাঁবু-টাবু গোটাচ্ছ, মানে ওই জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গায় যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছ, তখন...'

'তখন কে চুরি করতে যাবে?'

'অসুবিধেটা কোথায়? যে চোর, সে আগেই প্ল্যান করে রেখেছিল। তোমাদের ব্যস্ততার ফাঁকে মিউজিয়ামের পেছনের দিকে যে মোটা লতানো গাছটা রয়েছে

সেটা বেয়ে উঠে চুপি চুপি দোতলায় গিয়ে উঠল।'

'বেশ, তারপর বলে যান।'

'তারপর দোতলার জানালা ডিঙিয়ে ঘরে ঢুকল।'

'বেশ, ঢুকল।'

'তারপর কাচের শো-কেস ভেঙে সেখান থেকে বাক্স সমেত হীরেটা নিয়ে ভিজে বেড়ালের মত আবার তাঁবুতে ফিরে তোমাদের সাথে মিশে গেল।'

জেরী পার্কারের কথাটা এক মনে ভাবছিল। জেরীর কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে পার্কার শুধালেন: 'কী, কেমন মনে হচ্ছে প্ল্যানটা? কাজটা খুব পাকা নয়?'

জেরী সাড়া দিল না। পার্কার 'মৌনতা সম্মতির লক্ষণ' ভেবে আরও উৎসাহে বলে চললেন: 'বুঝলে, জেরী, চোর খুব চালু। ব্যাটা অন্য জিনিসের ধারপাশ দিয়েও যায়নি। অথচ সাধারণ সিঁধেল চোর হলে কিন্তু ঠিক অন্য কিছু জিনিসও নিত। এ ব্যাটা কেবল হীরেটাই ঝেঁপেছে। ঝেঁপেছে ঝাঁপুক। কিন্তু একটা মুশকিল আছে হীরেটা চুরি করার।'

'কেন? কীসের মুশকিল?'

'মুশকিলটা এই যে, হীরে জিনিসটা ইচ্ছে করলেই তুমি বাজারে বেচতে পারবে না।'

'তাতে হলোটা কী?'

'তাতে হলো এই যে মালটা এখনও চোর বাবাজীরই হেফাজতে।'

'আপনি আর পুলিশের দল এর থেকে এই সিদ্ধান্তে এলেন?'

'নিশ্চয়ই। বেচতে না পারলে হীরেটা রাখবে কোথায়? নিজের কাছেই তো!'

'তা হয়তো। কিন্তু কীভাবে আপনাদের এটা ধারণা হলো, তা বুঝতে পারছি না।'

'কেন? এ কথা বলছ কেন?'

'কারণ, হীরে চুরি গেছে—এ কথা জানার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সার্কাসের তাঁবুর প্রতিটি খানাখন্দ পুলিশ এসে তন্ন তন্ন করে খুঁজে গেছে। তার সঙ্গে আমাদের গাড়ি-ঘোড়া, লোকজন কেউই বাদ যায়নি। প্রথম শোটা আমাদের ক্যানসেলও করতে হয়েছে। আমাদের তাতে লোকসানও কম হয়নি। তাতে কিছু পেলেন কি?'

'তা পাইনি বটে।'

'তবে? শুধু তাই নয়, ওই ঘটনার পর থেকে সবাই আপনাদের ওপর দারুণ রেগে আছে কিন্তু।'

'এটা ভুল বললে, জেরীবাবু। রেগে আছে বটে, কিন্তু সব্বাই নয়। একজন রাগেনি, সে নার্ভাস হয়ে গেছে, ভয় পেয়েছে। কারণ, চোর তো সবাই নয়। চোর শুধু ওই একজনই। চোরটা হীরে রাখার বাক্সটি ছুঁড়ে ফেলে গেছে জঙ্গলে। বাক্সটা আবার সোনার।'

'তাই নাকি?'

'নিশ্চয়ই। শুধু কি তাই? যে জঙ্গলে ওই হীরে রাখার বাক্সটা ফেলে গেছে তা একেবারে তাঁবুর গায়ে গায়েই বলতে পারো।'

'আচ্ছা!'

'তুমি বলতে পারবে কেন চোরটা ওই বাক্সটা, যা কি না নিরেট সোনার তৈরি, সেটা না নিয়ে জঙ্গলে ফেলে দিল?'

'জানি না, মানে ঠিক বলতে পারব না।'

'কারণ, চোর জানে যে ওই বাক্স সমেত হীরে রাখার চাইতে শুধু হীরে লুকিয়ে রাখা অনেক বেশি সহজ।'

'এটা আপনি ঠিক বলেছেন।'

'অবশ্যই ঠিক বলেছি। নইলে চোর কি সাধু-সন্ত নাকি যে সোনার তৈরি বাক্সের লোভ নির্দ্বিধায় হজম করল? সুতরাং বুঝতেই পারছ যে হীরেটা কাছাকাছিই কোথাও আছে।'

'সেটা অবশ্য...মানে...' জেরী যুক্তিতে কাবু হয়ে মিইয়ে পড়ল। '...মানে সাহায্য আপনাকে আমি না হয় করব, কিন্তু যদি–'

'বাঃ! চমৎকার! এবার "কিন্তু", "যদি" এগুলো দূরে সরিয়ে রেখে যা বলি মন দিয়ে শোনো। ঘটনাটা হলো–'

'দাঁড়ান। আপনাকে আমি একটা শর্তে সাহায্য করতে পারি।'

'আবার কী শর্ত? তোমাকে তো পুরস্কারের কথাটা বললাম!'

'না, আমি পুরস্কারের কথা বলছি না।'

'তবে?'

'আমি বলছি যে আপনি যদি বেলকে আগে খুঁজে দেন তবেই আপনাকে সাহায্য করব।'

'বেল আবার কী? ওটা কি খায় না মাথায় দেয়?'

'দুটোর একটাও নয়। বেল হলো আমাদের সর্পরানি ম্যাডাম উইনিফ্রেডের পোষা সাপ।'

'অ্যাঁ!! কী ভয়ানক! তোমরা তো ভাল মজা পেয়েছ! বিষধর সাপ-টাপ ছেড়ে-ছুঁড়ে দিয়ে একাকার কাণ্ড! এখন কী হবে!'

'ম্যাডামের সাপে মোটেই বিষ নেই। তা ছাড়া ইনি সাপ ছেড়েও রাখেন না। বেলকে কেউ চুরি করেছে।'

'সাপ আবার কে চুরি করবে?'

'তা কী করে বলব? তবে যেভাবে লম্বুর জুতো, মেজরের ছড়ি, অ্যাণ্ডারসনের দড়ি, স্যাবরের তলোয়ার চুরি গেছে ঠিক সেইভাবেই বেলও চুরি গেছে।'

'না, বাবা, আমি ওই সব সাপ-ব্যাঙের মধ্যে নেই। আমি তো জন্তু-জানোয়ারের গোয়েন্দা নই। আমি মানুষের গোয়েন্দা।'

জেরী এবার গলার পর্দা একটু চড়াল, 'দেখুন, মি. পার্কার, একটা সোজা

কথা বলি। আমার চাচা কিছুক্ষণের মধ্যেই নিখোঁজ বেলের সন্ধানে তাঁবুর মধ্যে খোঁজাখুঁজি শুরু করবেন। চাচার খুব ইচ্ছে যে আপনি তাঁকে এ বিষয়ে সাহায্য করেন।'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ। আপনার অসুবিধেটা কোথায়? আপনার নিজের কাজটাও তো এই ফাঁকে হয়ে যাবে।'

'নিজের কাজ মানে?'

'আপনার হীরে খোঁজার কাজ।'

'তাই তো!'

'এমনও তো হতে পারে, তখন সবগুলো জায়গা ঠিক মত দেখা হয়নি। এবার সেই সব জায়গা ভাল করে দেখবেন। আপনি তো গোয়েন্দা, আপনার চোখে ঠিক পড়বে।'

'বলছ? অবশ্য এই প্ল্যানটা ভালই দিয়েছ।'

'তা হলে আপনি রাজি?'

'রাজি। এখন আমাকে এই বেল নামের হারানো মানুষের একটা বিবরণ দাও।'

'বেলকে মানুষ বলছেন কেন? বললাম না বেল একটা সাপ!'

'ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ। তা এই সাপানুষটি দেখতে কেমন?'

'সাপানুষ মানে? আপনি সাপ আর মানুষে এমন গুলিয়ে ফেলছেন কেন? শুনছেন তো বেল একটা সাপ।'

'বুঝেছি, বুঝেছি। আসলে মানুষ খোঁজার কাজ করি তো। সাপখোপ কখনও খুঁজিনি। তাই গুলিয়ে যাচ্ছে।'

'ঠিক আছে।'

'বেশ এবার তোমার ইয়ের বর্ণনাটা বলো।'

'বেল লম্বায় ছ'ফুট থেকে এক ইঞ্চি কম, ঘের হলো সাড়ে তিন ইঞ্চি। গায়ের রং সাদার ওপর কালো ডোরা। শান্তশিষ্ট। দেখতে সুন্দর।'

'বয়েস?'

'বয়েস? তা ধরুন ভালই। ঠিক কত বলতে পারব না। তবে আগের মত তেজ আর নেই।'

'ভাল। এই অভিজ্ঞতাটা আমার একেবারেই নতুন বলতে পারো। এতদিন মানুষ কিডন্যাপ হত, এখন দেখি সাপও কিডন্যাপ হয়। ভেরি সারপ্রাইজিং!'

'সেটা ঠিক।'

'এখন ভাবো তো সাপটাকে কোথায় লুকিয়ে রাখা যায়?'

'বলুন আপনি।'

'ধরো গাড়ির টায়ারে, কিংবা হোস পাইপে?'

'কিংবা ধরুন বাক্সের মধ্যে বা ছড়ির মধ্যে। যার মধ্যেই রাখুক, চাচা সব কিছু খুঁটিয়ে দেখবেন। আপনি বরং চাচার সঙ্গেই দেখা করুন।'

পার্কার আর সেখানে এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন না। দ্রুত এগিয়ে গেলেন জেরীর চাচার সন্ধানে।

ওদিকে জেরী খেতে খেতে খুব চিন্তায় পড়ে গেল। অনেকেই তখন খেতে আসতে শুরু করেছে। সবার মুখে ম্যাডাম আর তার সাপ নিয়ে আলোচনা। প্যাডি জেরীর কাছে টুকটুক করে এগিয়ে গেল। জেরী মুখ তুলে চাইতেই প্যাডি বলল:

'এইসব কী হচ্ছে বলো তো, জেরী?'

'কীসের কী হচ্ছে?'

'আবার একটা সাপ চুরি গেল!'

'তাই তো ভাবছি।'

'আমার কেমন যেন লাগছে।'

'কী ব্যাপার?'

'এ-ধরনের চুরি-চামারি...আবার নাকি চতুর্দিক, মানে এই সার্কাসের ভেতর চারদিক খোঁজা হবে?'

'হ্যাঁ। বেলকে পেতেই হবে।'

'গতবার তো মিলারটনের পুলিশের দল এসে আমার ফ্রিজের বরফ সরিয়ে ভেঙে দেখেছিল হীরে আছে কি না। এবার আবার ফ্রিজ হাঁটকে দেখবে না তো যে, সাপ আছে কি না! বলা যায় না, বাবা। এদিকে কাল রাতে আমার এক ঝুড়ি ডিম কে বা কারা যেন ঝেঁপে দিয়েছে! কী যে সব হচ্ছে!'

জেরী প্যাডিকে সান্ত্বনা দিয়ে এগিয়ে গেল তার চাচার গাড়ির দিকে। মনের মধ্যে অজস্র চিন্তা। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। কে যেন তার কাঁধে হাত দিয়েছে। জেরী তাকিয়ে দেখে ভাগ্যদেবী–বাঁ হাতে পোষা ময়না মি. ডার্ক। জেরীকে দেখেই বলে উঠল: 'বিপদ কিন্তু...ভীষণ বিপদ!'

'চুপ। একদম চুপ,' ধমকে উঠলেন ভাগ্যদেবী। তারপর জেরীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার, তোমার চেহারাটা কেমন শুকনো দেখাচ্ছে! খুব চিন্তায় পড়েছ?'

'হ্যাঁ।'

জেরী ভাগ্যদেবীকে সব কথা খুলে বলল।

সব শুনে ভাগ্যদেবী বললেন: 'নিরাশ হবার কিছু নেই। এক কাজ করো, আমার সঙ্গে আমার ঘরে চলো। দেখি, ডার্ক তোমার সম্বন্ধে কী বলে?'

জেরীকে নিয়ে এলেন ভাগ্যদেবী তাঁর ঘরে। ঘরের মধ্যে একটা কাঠের টেবিল। তাতে ছ'টা খাঁচা। সেই খাঁচাগুলোর প্রত্যেকটার এক কোণে কাগজের বাক্সে গাদা খানেক ছোট কাগজ ভাঁজ করে রাখা। ভাগ্যদেবী টেবিলের ওপর পাখিটাকে ছেড়ে দিলেন। ডার্ক সাহেব কিন্তু চুপ করে রইলেন। এ আবার কী হলো!

ডার্কবাবু তো এগোতেই চান না। জেরী চুপ করে দাঁড়িয়ে। ডার্ককে গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভাগ্যদেবীর ঠোঁটের কোণে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল। ভাগ্যদেবী নিজের মনেই বললেন: 'বুঝেছি। খাটনির মজুরী চাই। তাই তো? দাও তো, জেরী, ওকে কিছু।'

জেরী পকেটে হাত ঢুকিয়ে খুচরো কিছু পয়সা বের করল। ডার্ক সেই পয়সা মুখে করে একটা বাক্সে ফেলে দিল। তারপর এগুল খাঁচাগুলোর দিকে। প্রথমে ঢুকছিল মাঝের খাঁচাটায়। ভাগ্যদেবী শিস দিতেই পিছিয়ে এসে চলে গেল একদম শেষের খাঁচায় টুপটুপ করে পা ফেলে। সেখানে গিয়ে পিটপিট করে চেয়ে সবগুলো কাগজে ঠোঁট বুলিয়ে একটা স্লিপ ঠোঁট দিয়ে তুলে নিল। তারপর খাঁচা থেকে বেরিয়ে এল।

ভাগ্যদেবী জেরীকে বললেন: 'হাত পাতো।'

জেরী হাত পাততেই ডার্ক কাগজটা জেরীর হাতে তুলে দিল। জেরী খুলে লেখাটি পড়ল:

'লক্ষ্যে যদি পৌঁছতে চাও,
সোজা পথ বেছে নাও,
ফল পাবে তাই যা তুমি চাও।'

ভাগ্যদেবী জেরীকে শুধোলেন উদ্‌গ্রীব হয়ে: 'অশুভ কিছু নেই তো?'

'না। তবে আমার ঝামেলাতে এটা কতটা সাহায্য করবে বলতে পারছি না। এমনিতে ঠিকই আছে।'

'ভাবো ভাল করে। ডার্কের উপদেশ তো! আমি আজ পর্যন্ত ডার্কের উপদেশ ব্যর্থ হতে দেখিনি। আবারও বলছি ডার্ক সাহেবের উপদেশ—সোজাসুজি ভাবো। কথাটা মনে রাখবে।'

তৃতীয় পর্ব

জেরী এসে চেয়ারে বসল। অফিস ফাঁকা। চাচাও নেই। বেলকে খুঁজতে ব্যস্ত। জেরীর মাথায় এখন একরাশ চিন্তা। অনেক ভেবেচিন্তে ও হাতে কাগজ আর কলম তুলে নিল। ভেবে দেখল সব কিছু লিখে ফেলাই ভাল। অন্তত ও যা জেনেছে সেগুলো। এমনও হতে পারে যে মি. ডার্ক যে সোজাসুজি সব কিছু দেখতে বলেছে সেটা হয়তো পাওয়া ঘটনাগুলোর কথাই। যা-ই হোক, জেরী লিখতে শুরু করল। কিছুক্ষণ কসরত করার পর মোটামুটি একটা খসড়া খাড়া করে ফেলল।

চুরির তালিকা

প্রথম: একটা হীরে—দাম এক লাখ ডলার।
দ্বিতীয়: এক জোড়া বিশাল জুতো—লম্বুর। তেমন দামি নয়।
তৃতীয়: মেজর মাইটের ছড়ি—সামান্য দাম।
চতুর্থ: একটা দড়ি—সামান্য দাম।

পঞ্চম: একটা সাপ–সামান্য দাম।

চুরি সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন

প্রথম প্রশ্ন: কে চুরি করেছে?

দ্বিতীয় প্রশ্ন: বিভিন্ন লোকে ওই ছ'টা জিনিস চুরি করেছে, না একই লোকের কীর্তি?

তৃতীয় প্রশ্ন: হীরের সঙ্গে জুতো বা অন্য জিনিসের কী সম্পর্ক?

চতুর্থ প্রশ্ন: এমনও কি হতে পারে যে হীরে আর জুতোর মধ্যেই সম্পর্ক? অন্য জিনিসগুলো এমনি চুরি করেছে?

লেখা শেষ করে জেরী চুরির লিস্ট আর তার ওপর প্রশ্নগুলো ভাল করে বারকয়েক পড়ল। তারপর নিজের মনেই চিন্তা করতে লাগল। হীরে চুরির কারণটা বোঝা যায়। কিন্তু অন্যগুলো? বাকি পাঁচটা চুরি? ব্যাপারটা কি এক ধরনের ফাজলামি? হঠাৎ জেরীর প্যাডির সঙ্গে কথাবার্তাগুলো মনে পড়ে গেল। তখন চুরির লিস্টে আরেকটা নাম জুড়ল। সপ্তম নম্বরে এল–এক ঝুড়ি ডিম সেদ্ধ।

ডিমগুলো কে চুরি করবে? কেনই বা চুরি করবে? তা-ও আবার অতগুলো ডিম? আচ্ছা, এমন কি হতে পারে, ভীষণ খিদে পেয়েছে বলে ওই ডিমগুলো চুরি করেছে? না, ব্যাপারটা আগাগোড়া গণ্ডগোলে ভরা। ভেবেও কোন থই পাওয়া যাচ্ছে না। কী ভাববে? কোন্ দিক দিয়ে ভাবনা শুরু করবে? কেমন করেই বা ভাবনা শেষ করবে–জেরী কোন হদিশই পাচ্ছে না। এমন সময় চাচা এসে ঘরে ঢুকলেন। গম্ভীর মুখ। কুঁচকে রয়েছে কপাল। একটি চেয়ারে বসে বললেন: 'না, সাপটা পেলাম না।'

'দেখেছ ভাল করে?'

'সব জায়গায় দেখেছি। সর্বত্র আঁতিপাঁতি করে খুঁজেছি, কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা।'

'মি. পার্কার গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, ভাল কথা–ওই লোকটা, পার্কার, ওটা পার্কার না ম্যাসাকার?'

'কেন?'

'কেন আবার কী? ওই ব্যাটা গোয়েন্দা না কচু! ওর খালি ঝোঁক ড্রাম, টায়ার, হাতির খাবারের চৌবাচ্চা এসবের ওপর। প্যাডি তো তাকে মেরেই দিত।'

'সে কী?'

'তবে বলছি কী? ব্যাটা প্যাডিকে বলে চিনি আর ময়দার বস্তা ফাঁকা করে দেখাতে। আস্ত একটা উজবুক।'

'তবে তো মুশকিল।'

'কী যে করব কিছু বুঝতে পারছি না।'

'আমিও।'

'এতদিন ধরে সার্কাসে আছি, এমন অদ্ভুত ঘটনা দেখিনি। অনেকদিন আগে অবশ্য একবার ঘূর্ণিঝড় হয়েছিল। কিন্তু সে তো অন্য ব্যাপার! যাক গে, এখন শো-এর সময় হলো...'

এমন সময় দরজার বাইরে পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। আওয়াজ শুনে কয়েক মুহূর্ত থেমে রইলেন মি. ফ্র্যাংক। জেক ফ্যারেল এসে ঢুকল ঘরে।

মি. ফ্র্যাংক জিজ্ঞেস করলেন: 'কী খবর, ফ্যারেল? সব খুঁজে পেয়েছ? বেলকে?'

'জী না। কেবল বেলকেই পাওয়া যায়নি। এ ছাড়া সব পাওয়া গেছে।'

'কোথায় পাওয়া গেল?'

'রান্নার তাঁবুর পেছনের ফাঁকা জমিতে সবক'টা পোঁতা ছিল একসঙ্গে–পাঁচটার মধ্যে চারটে।'

'পোঁতা ছিল? টের পেলে কীভাবে?'

'সদ্য খোঁড়া মাটি দেখে আমাদের মধ্যে একজনের সন্দেহ হতে সে আমাকে ডেকে দেখায়। তারপর আমি লোক দিয়ে মাটি কুপিয়ে দেখি সবক'টা জিনিস। কোন কিছুতেই হাত দিইনি। আপনি গিয়ে একবার দেখে নিন সমস্ত ব্যাপারটা।' জেরীর চাচা বেশ অবাক সব শুনেটুনে। ফ্যারেলের পিছু পিছু এগিয়ে গেলেন অকুস্থলের দিকে। জেরীও চলল চাচা আর ফ্যারেলের পেছন পেছন।

তিনজনেই চলে এল রান্নার তাঁবুর পেছনের জমিতে।

এদিকে ততক্ষণে সার্কাসের প্রথম প্রদর্শনীর টিকিট বিক্রি শুরু হয়ে গেছে। লোকজনও এক-এক করে আসতে শুরু করেছে। ফলে দলের লোকদের ভেতরে বেড়েছে ব্যস্ততা। তারাও ছোটাছুটি শুরু করে দিয়েছে। জেরী আর জেরীর চাচা গিয়ে অকুস্থলে পৌঁছতেই জেক একটা তেরপলের ঢাকা তুলে দিয়ে বলল: 'এই যে, মি. ম্যাসন–এখানেই সবগুলো জিনিস একসঙ্গে পাওয়া গেছে। দেখে নিন।'

আগ্রহে জেরী আর জেরীর চাচা কাটা গর্তের ভেতর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে আরকী! মাটির মধ্যে প্রায় ফুট দুয়েক গর্ত। তার ভেতরে কফিনের মত একটা কালো বাক্স। বাক্সের ঢাকনাটা আবার ভাঙা। তাতে একটা ভাঙা তলোয়ার লম্বা করে শোয়ানো। জেক নিচু হয়ে বাক্সটা তুলে নিয়ে এল। ওপরে নিয়ে এসে প্রথমে তলোয়ারটা টেনে বের করল। তলোয়ারটা সরিয়ে নিতেই চোখে পড়ল লম্বুর বিশাল জুতো জোড়া, ব্লেড দিয়ে শত টুকরো করা! তারপর–মেজর মাইটের ছড়ি। ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে আছে! অ্যাণ্ডারসনের দড়ি–দড়ির একটা মাথা একটা পুতুলের গলায় জড়ানো। পুতুলটার হাতে আবার কালো রং দিয়ে একটা সাপ আঁকা। ঠিক যেন ম্যাডামেরই সাপ। অদ্ভুত ব্যাপার!

দেখে জেরীর মনে হলো, যে এগুলো পুঁতে রেখেছে সে যেন এই জিনিসগুলোর মালিককে ভয় দেখাতে চাইছে। কিন্তু কেন? জেরীর চাচা ফিসফিস

করে জেককে নির্দেশ দিলেন: 'তাড়াতাড়ি এগুলো সরিয়ে ফেলো। কেউ যেন জানতে না পারে যে এখানে জিনিসগুলো এইভাবে পাওয়া গেছে!'

জেক তাড়াতাড়ি জিনিসগুলোর ওপর তেরপল দিয়ে ঢাকা দিল। তারপর মি. ফ্র্যাংককে বলল: 'মনে হয় সবাই জেনে গেছে। কারণ, অনেকেই আমাদের খুঁড়তে দেখেছে। সুতরাং, জানাটা অসম্ভব নয়।'

'কী যে তোমরা কর! ব্যাপারটা একটু গোপনে করতে পারলে না? আশ্চর্য!' চাচা একটু বিরক্তই হলেন। তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন: 'শোনো, জেক, তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে। তুমি এসো আমার সঙ্গে। আর জেরী, তুই শো-এর জন্য তৈরি হয়ে নে।'

ওরা বেরিয়ে যেতেই জেরীও এগোল। জেরীর মাথায় এখন একটাই চিন্তা–সব কিছুই পাওয়া গেল। কিন্তু বেল! বেলকে কেন পাওয়া গেল না? সমস্ত ঘটনাটা একেবারে আদ্যন্ত সাজানো। কিন্তু কেন? কী উদ্দেশ্য? চোর কী চায়? সার্কাস দলের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ানো কি চোরের উদ্দেশ্য? যাতে সবাই দল ছেড়ে বেরিয়ে যায়? নাকি সার্কাসটার তেজ ঠাণ্ডা করাই চোরের লক্ষ্য? কে জানে?

জেরী গ্রীনরুমে পৌঁছে নিজের মেক-আপের বাক্সটা টেনে নিয়ে মেক-আপ করতে বসে গেল তাড়াতাড়ি। জ্যাক–ক্লানটন দলের বিখ্যাত মূকাভিনেতা কাম ক্লাউন জেরীকে দেখে বলল: 'তোমার আজ বেশ দেরি হয়ে গেল দেখছি।'

জেরী আর কথা বাড়াল না। নিজের সাজপোশাক পরতে লাগল। সাজসজ্জা শেষ করে জেরী জ্যাককে বলল: 'মি. জ্যাক, এখন আমি যা খেলা দেখাই, পরের বছর কি আপনাদের মত খেলা দেখাতে পারব?'

'দাঁড়াও, এ বছরটা আগে যাক!'

'কেন?'

'কেন আর? যা সব শুনছি তাতে কতদিন যে এখানে টিকব কে জানে!'

'এ কথা বলছেন কেন?'

'শুনেছ কি যে জিনিসগুলো চুরি গিয়েছিল তা সব মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে?'

'শুনলাম।'

'সবাই খুবই ঘাবড়ে গেছে।'

'কেন?'

'মনে হয় ভূত-প্রেতের কাণ্ড!'

'না, না, তা-ও আবার হয় নাকি?'

'না হবার কী আছে? প্রেত-পিশাচের কাণ্ড তো জান না। কয়েকজন তো এক্ষুণি দল ছেড়ে দিয়ে কেটে পড়তে চাইছে।'

'কারা চলে যেতে চাইছে?'

'কেন, লম্বু, ম্যাডাম, মেজর, অ্যাণ্ডারসন–এরা সবাই। আমার মনে হয় না এরা আর সামনের বছর কেউ চুক্তি করবে!'

জেরী আর কথা না বাড়িয়ে নিজের সাজসজ্জা শেষ করল।

ও নিশ্চিত যে নিশ্চয়ই কেউ সার্কাসটাকে লাটে তুলতে চাইছে। আসলে হিংসে।

তবে শুধুমাত্র হিংসেই নয়। এর পেছনে অন্য কোন প্ল্যান রয়েছে। শুধুমাত্র সার্কাসের ক্ষতিসাধনই একমাত্র উদ্দেশ্য নয়।

তাঁবুর মধ্যে ঝমঝম করে বেজে উঠল সার্কাসের বাজনা। জেরী ছুট লাগাল। এরপর ও আর ঘণ্টাখানেক কোন সময়ই পেল না। কারণ–খেলা। এক ঘণ্টা ধরে জেরী টানা খেলা দেখিয়ে চলল। তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় খেলাগুলো। তবু খেলা তো বটে।

এর মধ্যে আবার অন্যান্য বড় খেলোয়াড়দের খেলা দেখানোর সময় খেলার সাজ-সরঞ্জাম হাতের কাছেও এগিয়ে দিতে হলো। ক্লানটন সার্কাসের একটা নিয়ম আছে। তা হলো–অন্য খেলোয়াড়দের খেলা দেখাতে গিয়ে গোলমাল হলে ক্লাউনরা যা হোক একটা কিছু করে দর্শকদের মন অন্যদিকে নিয়ে যেত। জেরী ক্লাউনের খেলা দেখাত। সুতরাং জেরীকেও সেই একই কাজ করতে হত। আজ যেন দর্শক ভোলানোর কাজটা বেড়ে গেল। কারণ, আজ খেলাই জমে উঠল না। নিষ্প্রাণ। কোন উত্তেজনা নেই। কেমন যেন ম্যাটম্যাটে।

খেলোয়াড়রাও যা করছে তা করতে হয় বলেই করছে। কোন আগ্রহ নেই। মাইনে নিচ্ছে, তাই যেন খেলা দেখানো। এদের সঙ্গে তাল মিলিয়েছে জানোয়ারগুলোও। হাতির মধ্যে যে পালের গোদা তাকে তো শত চেষ্টাতেও ট্রেনার নাচাতেই পারল না। সিংহের খাঁচার মধ্যে দুটো সিংহ মিলে মারপিটই বাধিয়ে বসল নিজেদের মধ্যে, যা সার্কাসের ইতিহাসে কোনদিন ঘটেনি। ইমো আর কিমো–দশ-বিশটা জ্বলন্ত মশাল নিয়ে যারা চোখ বেঁধেও নির্দ্বিধায় লোফালুফি করতে পারে, সেই ইমোর হাত ফসকে মশালের আগুনে নিজেরই হাত পুড়ে গেল। কী আশ্চর্য!

আমেদ আর আবদুল্লার ব্যালেন্সের খেলাতে প্রথম দিকে কোন গোলমাল হয়নি। বেশ চলছিল।

দর্শকরাও মুগ্ধ হয়ে দেখছিল।

কিন্তু হঠাৎ কী হলো!

যেই ছ'ফুট লম্বা অ্যালুমিনিয়ামের রডটা নিয়ে খেলা দেখাতে গেল তখনই হলো মুশকিল। রডটা ধুপ করে মাটিতে পড়ে গেল। অথচ এই রড দিয়ে আমেদ আর আবদুল্লা দিনের পর দিন খেলা দেখিয়ে গেছে। কোন সমস্যাই হয়নি! আসলে আজ সবার যেন কী হয়েছে! জেরী এসব দেখে খুবই অবাক। কী হচ্ছে এসব!

আমেদ আর আবদুল্লা আর খেলা না দেখিয়ে পরস্পরকে গালাগাল দিতে দিতে গ্রীনরুমে ছুটল। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো জ্যাকের মূকাভিনয়।

দারুণ উপভোগ করছে দর্শক। ঘন ঘন হাততালি। জ্যাকের পরই ট্র্যাপিজের খেলা। গা শিরশিরানি খেলা। সমস্ত দর্শক টানটান হয়ে বসে থাকে। সবচাইতে

উত্তেজক আর আকর্ষণীয় খেলা! খেলা দেখাবে ফার্ডিনাণ্ড আর তার বউ। দু'জনেই ইটালির লোক। ওদের দু'জনের খেলা দুর্দান্ত জমে যায়। খেলা শুরু হলো। দিব্যি চলছে। দর্শক হতবাক, বিস্মিত, মুগ্ধ হয়ে দেখছে। এমন সময় হঠাৎ ফার্ডিনাণ্ডের হাত ফসকে তার বউ সবেগে নীচে পাতা জালের ওপর এসে পড়ল। কী কাণ্ড!

দর্শক উত্তেজনায় আর্তনাদ করে উঠল। মিসেস ফার্ডিনাণ্ড জালের ওপর দাঁড়িয়ে দর্শকদের অভিবাদন জানাল। দর্শক ঠাণ্ডা। তারপর ফার্ডিনাণ্ড তার দলবল নিয়ে বেরিয়ে গেল। জ্যাক খেলার ছলে গলা নামিয়ে জেরীকে বলল: 'বুঝলে, ওরা কেউ আগামী বছর থাকছে না। আমি লিখে দিচ্ছি। তুমি মিলিয়ে নিয়ো।'

'সে কী?'

'হ্যাঁ, বলে দিলাম। শুনলাম অ্যাণ্ডারসন পালিয়েছে। মাইট আর লম্বুও পালাবার ফিকির খুঁজছে। তোমার চাচা ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে গেছেন শুনলাম।'

জেরী খেলা দেখাতে দেখাতেই ভাবতে লাগল: লম্বু, মাইট নিশ্চয়ই চুরি করেনি, কিন্তু...সব ঘটনা জুড়ে এক মতলব...একটা চক্রান্ত...গভীর চক্রান্ত...কিন্তু...সব ব্যাপারটা কেউ যেন সাপের মত প্যাঁচালো করতে চাইছে। কারণ, তার হিংসা, নাকি কোন কদর্য...সাপ? ...সাপ? ...আচ্ছা, সাপের মত প্যাঁচালো কেন? সাপ কি সর্বদা পেঁচিয়েই থাকে? ...তা কেন...সাপ তো...অ্যাঁ, তা হলে কী?...হঠাৎ জেরীর কাছে যেন সমস্ত বিষয়টাই জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। আরে, এ তো ভারি সোজা! জেরী এতক্ষণ যে ধাঁধার মধ্যে ঘোরাফেরা করছিল হঠাৎ তার যেন সমাধান হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। জেরী হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। হ্যাঁ।

এবার সমস্ত চুরির একটা অর্থ পাওয়া যাচ্ছে বটে।

১। কফিন...ওটা তো...বোঝা যাচ্ছে...

২। লম্বুর জুতো...সেটাও...

৩। মাইটের ছড়ি...সেটারও...

৪। তারপর সাপ...খুবই দরকার...

৫। লম্বু আর মেজর মাইটের ঘাবড়ে যাওয়া...তাও...

৬। চুরি যাওয়া ডিম সেদ্ধ...তা ওটাও দরকার বইকি...

৭। মি. ডার্ক বলল...সোজাসুজি চলো...তাই তো দরকার চলা...

৮। সারাদিনে দু'-দু'বার ধুপ করে আওয়াজ শোনা গেল...

জেরী খেলাটা চটজলদি শেষ করে ফেলল। আর দেরি করলে গোলমাল হয়ে যাবে। জ্যাককে বলল: 'মি. জ্যাক, আমার একটু কাজ আছে। আমি চললাম।' বলে জ্যাকের উত্তরের অপেক্ষা না করে এক দৌড়ে তাঁবুর বাইরে চলে এল। সোজা এগোল জ্যাক যেখানে গাড়িগুলো রেখেছে সেই জায়গাতে।

গাড়িগুলো যেদিকটায় রয়েছে সেদিকটা নির্জন। কেউ নেই। সুনসান! লম্বু আর মাইট তাদের নিজেদের গাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে সমানে ঝগড়া করে চলেছে।

আরেকটু এগোতেই দেখতে পেল–ফার্ডিনাণ্ডের দল তাদের গোছগাছ শেষ করছে। শেষ হলে সার্কাস ছেড়ে কেটে পড়বে। অ্যাণ্ডারসনের গাড়িটাও নেই। তার মানে অ্যাণ্ডারসনও কেটে পড়েছে। এসব দেখার সময় জেরীর একদম নেই। ও একটা নীল রঙের গাড়ি খুঁজছে। ওটা চলে যায়নি তো! না, যায়নি।

একটু এগোতেই গাড়িটা জেরীর নজরে এল। যায়নি, তবে যাবার মুখে। দু'জন লোক সেই নীল রঙের গাড়িটা টেনে নিয়ে জুতে দিচ্ছে গাড়ির এঞ্জিনের সঙ্গে। ওদিকে চালকের আসনে ড্রাইভার এঞ্জিনে স্টার্টও দিয়ে দিয়েছে। কেলেঙ্কারী! জেরী দৌড়ে গেল গাড়িটার পেছন দিকে। একটানে খুলে ফেলল পেছনের দরজা। গাড়িটা অল্প এগোতে শুরু করেছে। জেরী গাড়ির মধ্যে উঠে গাড়ির ভেতরটা আঁতিপাঁতি করে খুঁজতে লাগল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই যা খুঁজছিল পেয়ে গেল। লম্বা আর ভারীও বটে। জেরী মালটাকে কোন মতে চালিয়ে নিয়ে এক লাফে গাড়ি থেকে নেমে সামনের দিকে ছুট লাগাল। প্রাণপণে ছুটতে ছুটতে ভাবতে লাগল: লোক দুটো দেখেনি তো তাকে!

জেরীর আশঙ্কা অমূলক নয়। লোক দুটো তাকে দেখে ফেলেছে। কারণ–গাড়িটা থেমে গেল আচমকা। লোক দুটো জেরীকে গালমন্দ করতে করতে ওর পেছন পেছন দৌড়তে দৌড়তে আসছে। তবে জেরী নার্ভাস হয়ে থেমে গেল না। ওই ভারী জিনিসটা একরকম টানতে টানতেই দৌড়াতে লাগল। ওদিকে লম্বু আর মাইট তখনও ঝগড়া করে চলেছে। জেরী ওদের কাছে এসে চিৎকার করে বলল: 'বাঁচাও, মেরে ফেলল।'

ইতোমধ্যে অনুসরণকারীদের একজন জেরীকে ল্যাং মেরে ফেলে দিয়েছে। জেরী উপুড় হয়ে পড়েছে। হাত থেকে ভারী জিনিসটা ছিটকে পড়েছে। জেরীর মাথাটা গিয়ে পড়েছে শক্ত পাথরের উপর। চোখে নেমে এসেছে রাজ্যের অন্ধকার!

আমি আলফ্রেড হিচকক

আবার গল্পের সাথে ফিরে এলাম–তবে খুব বেশি সময় নয়। জেরীর জ্ঞান ফেরা পর্যন্ত। যাক গে, জ্ঞান যখন ফেরে ফিরুক। আমার খুব তাড়া নেই। তবে হ্যাঁ, কিছু ভাবলেন কি? নিশ্চয়ই পেরেছেন। আপনারা তো আমার মত নন। আবার এ কথাও ঠিক যে, সবাই নিশ্চয়ই পারেননি। ভাল কথা, যাঁরা পারেননি, অথচ চেষ্টা করেছেন প্রচুর, তাঁদেরকে বলি–বেলকে যে চুরি করা হয় তার কারণ কিন্তু একটাই। তারপর জুতো, ছড়ি এবং দড়ি–এগুলো চুরির কারণ দুটো। তারপর ধুপ করে শব্দটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এ কী? সবই তো বলে দিলাম। তা হলে আপনারা করবেন কী? না, না, এ তো ভাল কথা নয়। ভাবুন, ভাবুন।

শেষ পর্ব

অবশেষে জেরীর জ্ঞান ফিরল। চোখ মেলে জেরী প্রথমেই দেখল তার চাচাকে।

পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে জেক ফ্যারেল। জেরী ভাল করে চাইতে পারছিল না। মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছিল প্রচণ্ড। তাও তাকিয়ে দেখল যে লম্বু একটু দূরে লোক দুটোকে শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। জেরীর চাচা জেরীকে চোখ খুলতে দেখে উদ্বেগের স্বরে শুধালেন: 'জেরী, এখন কেমন লাগছে?'

'ভাল।'

জেরী একবার ওঠার চেষ্টা করল। তারপর উঠে বসল।

লাগেনি খুব বেশি।

'জেরী, আমি তো কিছুই বুঝছি না। ব্যাপারটা কী? তুই-ই তা হলে ওই জিনিসগুলো চুরি করেছিলি?'

'না, না। কেবল জেক ফ্যারেল যেটা ধরে আছে সেটাই আমি নিয়েছিলাম। আসলে ওটা আমাকে বাধ্য হয়েই নিতে হয়েছে! ঘটনাটা আসলে আগাগোড়া আমি ধরে ফেলেছি!'

'শুনি তো কী ধরতে পেরেছিস।'

'ঠিক আছে। আমি প্রথম থেকে বলছি। ঘটনাটা যাকে বলে জলবৎ তরলং।'

'তাই?'

'খুব সোজা। মানে বুঝে গেলে আর কঠিন থাকে না।'

'সে তো বটেই। সেরে গেলে রোগ তো ভালই হয়। যাক গে, অত পিটপিট না করে সোজাভাবে বল তো ব্যাপারটা কী?'

এসবের মাঝখানে শো শেষ হয়েছে।

পিলপিল করে লোকজন সার্কাসের তাঁবু থেকে বেরোচ্ছে। চারদিকে থিকথিক করছে মানুষ। লোকজন দেখে ফ্র্যাংক বললেন: 'এখানে কিছুই শোনা যাবে না। শুনলেও বোঝা যাবে না। চল, বরং আমার গাড়িতে চল। লম্বু, মাইট-ওই দু'জনকেও নিয়ে এসো।'

যেই কথা সেই কাজ।

লম্বু ধরে টানতে শুরু করল দু'জনকে। ওরাও আসবে না, লম্বুও ছাড়বে না। যা-ই হোক, লম্বু এক রকম জোর করেই নিয়ে এল। পেছন পেছন মি. পার্কারও এলেন। হতভম্ব হয়ে গেছে সবাই। তবুও ভাবটা এমন যে, দেখি না ব্যাপারটা কী! দরজা বন্ধ করে লম্বু গ্যাঁট হয়ে টুলে বসে পড়ল। অতঃপর জেরী শুরু করল।

পাঁচটা চুরি: ধরল জেরী

এই ঘটনা আরম্ভ হয়েছিল ঠিক পাঁচ দিন আগে। হ্যাঁ, পাঁচ দিন-মিলারটন মিউজিয়াম থেকে পাঁচ দিন আগেই সোনার বাক্স সমেত হীরেটা চুরি হয়। দারুণ দামি হীরে। ঠিক সেদিন থেকেই ঘটনা ঘটার সূত্রপাত। (এর মাঝে পার্কার বলতে গিয়েছিলেন: 'তবে? আরে, বাবা, এ হলো আমার বুদ্ধি। আমি কি সাধেই বলেছিলাম যে এখানেই চোর রয়েছে!'-কিন্তু জেরীর গল্প তাতে বাধা পেল না। কারণ, পার্কারের দিকে তখন কারোরই কান নেই।) সার্কাসটা চলছিল

মিউজিয়ামের গায়েই। চোর মিউজিয়ামের পেছনের লতানো গাছ বেয়ে দোতলার জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকে হীরেটা চুরি করেছে। বেশ পাকা চোর। (পার্কার: আমি তো তোমাকে আগেই বলেছিলাম।) স্বাভাবিকভাবেই পুলিশ আমাদের সার্কাসকে সন্দেহের চোখে দেখল। দেখবেই। কারণ? কারণ অনেক...

প্রথমত, আমরা মিলারটনে বাইরে থেকে এসেছি।

দ্বিতীয়ত, আমাদের দলে খেলোয়াড়ের অভাব নেই।

তৃতীয়ত, লতা বেয়ে দোতলায় ওঠা সার্কাসের লোকদের কাছে অতি সোজা কাজ, বলাই বাহুল্য।

অতএব সার্কাস জুড়ে চলল জোর তল্লাশি। এসব আপনারা সবাই জানেন। তল্লাশি হবার ফলে চোর বাবাজী তো গেল খুবই ঘাবড়ে। হীরেটা তার কাছে থাকা আর নিরাপদ নয়। তা হলে ধরা পড়ার খুবই সম্ভাবনা। হীরেটা চোরের পক্ষে লুকানোটা খুবই জরুরি হয়ে পড়ল। কিন্তু কোথায়? জায়গাটা এমন হওয়া দরকার যাতে পুলিশের নজর না পড়ে। গাড়িতে লুকিয়ে রাখার সাহস হলো না। অতএব সোনার বাক্সটা ছুঁড়ে ফেলল। কারণ, শুধু হীরা লুকানো যায়। কিন্তু সোনার অতবড় বাক্স কোথায় লুকাবে? আপাতত কোথায় লুকাল সে কথা ছেড়ে বাকি পাঁচটা চুরির ব্যাপারে কিছু কথা বলে নিই। (পার্কার: তুচ্ছ ব্যাপারগুলো...মানে...যদি...) লম্বুর জুতো চুরি হলো হীরে চুরির পরের রাত্রেই। লম্বুর তো ভারী চিন্তা হলো। (লম্বু: তা তো হবেই। কত দাম ছিল ওটার!) তারপর গেল মেজরের ছড়ি। (মেজর: ইস্, আমার অমন পয়া ছড়িটা!) এরপর স্যাবরের তলোয়ার, অ্যাণ্ডারসনের দড়ি, ইত্যাদি। এরপর কিন্তু ধরা যায় না যে কেন এগুলো চুরি হলো! মনে হয় ছিঁচকে চোরের কাণ্ড। (পার্কার: সোজা ব্যাপার। বেলকে চুরি করার জন্যেই...) কিন্তু চুরিগুলো খুবই ভেবে-চিন্তে করা। বেলকে চুরি করার জন্য নয়। যদিও বেলকে চুরি করার সময় এগুলো কাজে লেগেছে বটে! তবে ওটা মুখ্য উদ্দেশ্য নয়।

(পার্কার দমে গেলেন খানিকটা।) ওই চুরিগুলোর প্রধান উদ্দেশ্য হলো সার্কাসে যারা কাজ করছে তাদের মনে ভয়ের উদ্রেক ঘটানো। নার্ভাস করে দেয়া এবং এইজন্য কালো কফিনে মাল ঠেসে পুঁতে রাখা হয়। যাতে সবাই মনে করে যে সার্কাসে অশুভ দৃষ্টি পড়েছে। প্রেতাত্মা ভর করেছে সার্কাসের ওপর। (এখন সবাই চুপ। কারও মুখে আর বাক্য সরে না।) মূল উদ্দেশ্যই হলো বেলকে চুরি করা। চোর কিন্তু একজন নয়–দু'জন। বেলকে চুরি করার সময় একজন মাটিতে দাঁড়িয়েছে, অন্যজন তার কাঁধে চেপে বেলকে হাতিয়েছে। ওদের দু'জনের ইচ্ছে ছিল বেলকে চুরি করেই কেটে পড়বে। অনেকেই নার্ভাস হয়ে চলে যাচ্ছিল। ওরাও তাদের সঙ্গে পা চালিয়ে চলে যেত দিব্যি। কেউ সন্দেহ করত না। প্ল্যানটাতে কোন খুঁত ছিল না। কারণ, বেলকে নিয়ে আর কে মাতামাতি করবে! বেল তো সাপ ছাড়া কিছুই নয়। অনেক কিছুই অর্থহীন চুরি হচ্ছে। সবাই ভাববে বেলও তেমনি একটা চুরি।

এবার থেকে জেরীর গল্পে প্রত্যেকেই একটা না একটা প্রশ্ন করতেই থাকল কৌতূহলের চোটে। প্রত্যেকেই উত্তেজনায় টানটান হয়ে বসে রয়েছে। কিছুতেই অস্থিরতা চাপতে পারছে না। ফ্র্যাংক জেরীকে থামিয়ে বললেন: 'দাঁড়া, দাঁড়া, তুই বলছিস হীরে চুরি আর বেল চুরি...দুটোর মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে!'

'নিশ্চয়!'

'কী করে?'

'আমিও আগে বুঝিনি। কিন্তু যখনই শুনলাম বেল চুরি যাবার পর প্যাডির এক ঝুড়ি ডিম সেদ্ধ চুরি গেছে তখন আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হলাম।'

এবার জেক বলল: 'তাই তো। ঠিকই ধরেছ তুমি। ম্যাডাম তো সাপগুলোকে ডিমই খাওয়ান! তা হলে ব্যাপারটা দাঁড়াল কী?'

'যে চোর হীরে হাতিয়েছিল তাদের হীরে লুকানোর জন্য একটা আদর্শ জায়গা দরকার হয়ে পড়েছিল। সেজন্যই বেলকে চুরি করে। তারপর ধরুন, একটা ডিম একটুখানি ভেঙে বেলকে খাইয়ে দিলেই কাম ফতে। হীরে রইল নিশ্চিন্ত, নিরাপদ জায়গাতে।'

'তাই তো।'

'অনেক সাপই তো ছিল, কিন্তু বেলকেই কেন ওরা বেছে নিল?'

'কারণ, ওরা সাপটা যেখানে রাখবে সেই জায়গার পক্ষে বেল হলো আদর্শ লেংথের সাপ।'

ফ্র্যাংক বললেন, 'লেংথ, বেল...আমার তো সব গুলিয়ে যাচ্ছে। অবশ্য বেলের পেটে যে হীরে লুকানো যেতে পারে সেটা আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু...'

জেক বলল, 'কিন্তু বেলকে কোথায় লুকানো হলো?'

'আমারও তো সেই একই প্রশ্ন। বেলকে রাখল কোথায়? তুই অবাক করলি, জেরী। এত কথা বলছিস, কিন্তু এই কথাটার ধারপাশ দিয়ে যাচ্ছিস না।'

জেরী বলল, 'বলছি।' বলে জেরী ছ'ফুট লম্বা অ্যালুমিনিয়ামের রড হাতে নিল। যে রড দিয়ে আমেদ আর আবদুল্লা খেলা দেখাত সেই রডটা। তারপর বলল: 'এই রডটা চিনতে পারছেন?'

সবাই যথারীতি মাথা দোলাতে জেরী কথার খেই ধরল: 'এটা দৈর্ঘ্যে ছ'ফুট আর এর বেড় চার ইঞ্চি অথবা একটু বেশি। আর বেল ছ'ফুটের এক ইঞ্চি কম, মানে একাত্তর ইঞ্চি লম্বা আর চওড়ায় সাড়ে তিন ইঞ্চি।'

প্রায় সম্মিলিত প্রশ্ন ছুটে এল জেরীর দিকে: 'তাতে কী হলো?'

'তাতেই তো সব হলো,' জেরীর ঠাণ্ডা উত্তর। 'অ্যালুমিনিয়ামের রড তো এত ভারী হবার কথা নয়। এখন ভারী বলেই ব্যালেন্স হচ্ছিল না। তাই আমেদ আর আবদুল্লা দু'জনের কেউই আজ ভাল করে খেলা দেখাতে পারেনি।'

সবাই সম্মতিসূচক মাথা ঝাঁকাল। কথা বন্ধ হয়ে গেছে। সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মত জেরীর কথা শুনছে।

'সবচাইতে বড় কথা, রডটা মাটিতে পড়ে ঠং করে শব্দ না হয়ে ধুপ করে শব্দ হয়েছে। মি. ডার্ক আমাকে সোজাসুজি দেখতে উপদেশ দিয়েছে। সুতরাং, আমার দৃঢ় বিশ্বাস কোন ভুল আমি করিনি।'

এরপর জেরী যেটা করল, সেটা খুবই চমকপ্রদ। বিরাট রডটার এক পাশের ঢাকনা খুলে ফেলে দিয়ে মাটির দিকে খোলা মুখটা রেখে খুব জোরে ঝাঁকুনি দিতেই বেল সটান এসে ধুপ করে মাটিতে পড়ল পাকিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে আবদুল্লা আর আমেদ দুরন্ত বেগে দরজা লক্ষ্য করে ছুট লাগল। যাবে কোথায়? লম্বু গল্প শুনতে শুনতে এদের ওপর চোখ রেখেছিল। ঝটিতি উঠে দরজা আগলে দাঁড়াল। আমেদ আর আবদুল্লা অগত্যা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। ফ্র্যাংক সাপটা কুড়িয়ে নিয়ে বললেন: 'আহা রে, বেচারা বেল, দম আটকেই মারা গেছে। বুড়োও হয়ে গিয়েছিল তো, তাই শরীরেও আর তেমন শক্তি ছিল না। যাক গে, যা হবার তা তো হয়েই গেছে। ম্যাডাম দুঃখ পাবে। কিন্তু কী আর করা যাবে। এখন দেখা যাক জেরীর ভাবনা কতটা সঠিক। সত্যিই সাপের পেটে হীরেটা আছে কি না।'

এতক্ষণ পর আবার পার্কারের মুখ ফুটল: 'বুঝলে, জেরী, সত্যিই যদি সাপের পেটে হীরেটা থাকে তবে তো পুরস্কার পাওয়া যাবেই।'

'সে তো যাবেই।'

'তো সেই পুরস্কারের ভাগটা তোমারই না হয় বেশি হবে।'

ফুঁসে উঠলেন জেরীর চাচা: 'বাহ্! পুরস্কার দেবার মালিক যেন উনি! জেরীই তো সব করল, বাবা! তুমি আর কী করেছ! পুরোটাই জেরী পাবে।'

পার্কার একেবারেই চুপসে গেলেন।

তা হলে? হীরে কি সাপের পেটে পাওয়া গেল?

আসুন, বিষয়টা সম্পর্কে আপনাদের খুলে বলি।

হ্যাঁ। ঠিকই ধরেছেন। সাপের পেটেই হীরে মিলল। জেরী পারল বটে! ওইটুকুন বাচ্চা ছেলে ধরে ফেলল! আপনারাও অনেকে নিশ্চয়ই ধরে ফেলেছেন। যাঁরা ধরে ফেলেছেন তাঁদের বলছি না। যাঁরা ধরতে পারেননি তাঁদের বলছি—অর্থাৎ আমার মত মাথামোটা যাঁরা তাঁদেরকেই বলা।

আবদুল্লা আর আমেদ দু'জনেই হীরে চুরিতে ওস্তাদ। ওদের আসল ব্যবসা হীরে চুরি। সারা গ্রীষ্মকাল পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্য ভাল মানুষ সেজে সার্কাসে খেলা দেখায়। শীতকালে এদের অন্যরূপ। যা হোক, আমেদ-আবদুল্লার ব্যাপার না হয় বোঝা গেল। তা সত্ত্বেও একটা প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যায়। তা হলো—বেলের পেট থেকে তো ওরা আগেই হীরে সরিয়ে ফেলতে পারত। কিন্তু তা করল না কেন? কারণ, প্রথমত, অত দামি হীরে তাড়াতাড়ি বাজারে বিক্রি করা যায় না। দ্বিতীয়ত, বেলের পেট কেটে যদি আগেভাগে হীরে বের করে বেলকে ফেলে রাখত তবে তো ওদের চালাকিটা আগেই ধরা পড়ত। তাই না?

হ্যাঁ, ভাগ্যদেবীরও একটা ভূমিকা রয়েছে। উনি এবং ওনার ময়না মি. ডার্ক

'সোজাসুজি' ভাবতে বলে জেরীকে ভবিষ্যদ্বাণী করে দিয়েছিলেন। সেটাও একটা ব্যাপার। তবে জেরীর ধারণা, ভাগ্যদেবী পুরো ব্যাপারটা জানতেন। বেদে-বেদেনীদের রেওয়াজঃ জানলেও না বলা। সেই ধারা রক্ষা করে ভাগ্যদেবীও কিছুই বলেননি। তবে আভাস দিয়ে দিয়েছিলেন। আভাসটা হলো, সাপ শুধু বেঁকে নয়, সোজাও থাকতে পারে।

মূলঃ আলফ্রেড হিচকক

পুলিশ পুলিশ খেলা

সর্বমোট ১৮ হাজার ডলার; অথচ একটা পয়সাও খরচ করার জো নেই। ডেভি উইয়াট টাকার বাণ্ডিলগুলো ছড়িয়ে দিল টেবিলের ওপর। তাকিয়ে রইল নোটের তাড়াগুলোর দিকে। দৃশ্যটা ফিল পেনিকের নার্ভে চাপ সৃষ্টি করল।

'দুশ্চিন্তা বাদ দাও তো, খোকা,' বলল বয়সী লোকটা। 'চিন্তা করতে করতে তো এ বয়সেই হার্ট অ্যাটাক বাধিয়ে বসবে।'

'দুশ্চিন্তা কি আর খালি খালি করছি!'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ডেভ, টাকাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে চামড়ার একটি ব্রিফকেসে ঢোকাল। উদাস ভঙ্গিতে ব্রিফকেসটা ছুঁড়ে মারল নিজের খাটিয়ায়। মিনিটখানেক পরে লম্বা হলো বিছানায়, হাতজোড়া বাঁধল মাথার পেছনে।

'আমি বাইরে যাচ্ছি,' হঠাৎ ঘোষণা করল ফিল।

'কোথায়?'

'কিছু স্যাণ্ডউইচ আর একটা খবরের কাগজ কিনব। তারপর একটু হাঁটাহাঁটি করব।'

শুকিয়ে গেল ছোকরার মুখ। 'কাজটি কি ঠিক হবে?'

'তোমার কাছে বিকল্প কোন ব্যবস্থা আছে? শোনো, এখানে আরও ক'টা দিন এভাবে বসে থাকলে হাড়ে জং ধরে যাবে।' এক কক্ষের ফ্ল্যাটের চারপাশে চোখ বুলাল ফিল। গত দু'দিন ধরে ওরা এ ঘুপচির মধ্যে লুকিয়ে আছে। নাক দিয়ে 'হুহ্' জাতীয় একটা শব্দ করল সে। বিরক্তি ও বিতৃষ্ণার বহিঃপ্রকাশ। জ্যাকেটটি টেনে নিয়ে গায়ে চড়াল ফিল।

'নিজের ঘাড়টাকে সামলে রেখো,' বলল ছেলেটা। 'ধরা পড়ে গেলে আমাকে দুষো না যেন। ওই মহিলা পুলিশদের সঙ্গে–'

'শাট আপ! আমি ধরা পড়লে তোমার ঘাড়টাও নিরাপদে থাকবে না। কাজেই আমাকে বদ দোয়া কোরো না।'

দ্রুত বিছানায় উঠে বসল ডেভি। 'ইয়ার্কি নয়। সত্যি তুমি ঝুঁকিটা নেবে?'

হাসল বয়সী লোকটা। তবে তার হাসি দেখে কিছুই বোঝা গেল না। তিনবার জেলখাটা দাগী আসামী সে। ধূসর মাথায় নরম একটা টুপি চাপিয়ে ওটা নেড়ে চেড়ে ঠিকঠাক বসিয়ে নিল।

'ঝুঁকি আমরা আগেই নিয়ে ফেলেছি,' দরজা খুলল ফিল! 'ওই মহিলার একটা ব্যবস্থা না করলেই নয়। ব্যাপারটা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

শোল্ডার-হোলস্টার থেকে .৩৮ বের করে কার্তুজ পরীক্ষা করল সে, তারপর আগের জায়গায় ফিরে গেল অস্ত্রটি। তার অঙ্গভঙ্গি, নড়াচড়ায় কোন আড়ষ্টতা

নেই, একদম স্বাভাবিক। ছেলেটা আবার উপলদ্ধি করল সে একজন প্রফেশনালের সঙ্গে কাজ করছে।

ঢোক গিলল ডেভি। 'নিশ্চয়, ফিল। পুরো ব্যাপারটাই আমি তোমার উপর ছেড়ে দিয়েছি।'

রাস্তায় শিশুরা ছোটাছুটি করছে, খেলছে। ফিল পেনিক শিশুদের উপস্থিতি পছন্দ করে। বিশেষ করে যখন হাইড-আউটের প্রয়োজন হয়। যেসব এলাকায় শিশু বেশি, ওসব জায়গায় পুলিশি অ্যাকশন কম। ফিল এমনভাবে রাস্তা ধরে হাঁটছে যেন সে ভোরের কাগজ কিংবা সিগারেট কিনতে বেরিয়েছে। কেউ তার দিকে দ্বিতীয়বার ফিরে তাকাল না। যদিও ফিলের বেশভূষা বস্তিবাসীদের চেয়ে দামী।

ডেভির কথাটা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে, 'পুরো ব্যাপারটাই আমি তোমার ওপর ছেড়ে দিয়েছি,' কাজটা ও সুচারুভাবে করতে পারবে বলে বিশ্বাস ছোকরার। যদিও প্রফেশন্যাল ফিল ঠিক নিশ্চিত নয় কাজটা ঠিকভাবে করা যাবে কি না।

সহজ-সরল একটা প্ল্যান ছিল ওটা। এ জন্য বিস্তৃত কোন প্রস্তুতিও ছিল না। ব্রুকলিনের কলোনিয়ান স্টাইলের ছোট একটি ব্যাংকের মেসেঞ্জার ছিল লোকটা। সে-ই সব খোঁজ-খবর নিয়ে এসেছিল। তবে ওরা স্বপ্নেও ভাবেনি ডাকাতি করতে গিয়ে এতগুলো টাকা পেয়ে যাবে। কিন্তু পেয়ে গেছে। আর সংবাদবাহক ছোঁড়াটা বুকে দুটো গুলি খেয়েছে। সে মরে গেছে না বেঁচে আছে তা-ও জানে না ফিল। অবশ্য তাতে ওর কিছু আসে যায় না। এবারে যদি ধরা পড়ে ফিল, বাকি জীবনটা জেলে পচেই মরতে হবে।

কিন্তু ওদের কাছে টাকা আছে। আর এটাই সবচে' গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গত কুড়ি বছরে এই প্রথম এতগুলো টাকা একসঙ্গে হাতে এসেছে ফিল পেনিকের।

ডাকাতির আনন্দটা উপভোগ করা যেত যদি সাক্ষীকে পুলিশ খুঁজে না পেত। মহিলাকে ওরা যখন লক্ষ করেছে ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে বেশ। ব্যাংকের বিপরীতে, রাস্তার ধারের একটি বাড়ির দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল মহিলা। মধুরঙা সোনালী চুল, বায়ান্ন নাম্বার রাস্তার মেয়েদের মত ফিগার, ধারাল, তীক্ষ্ণ চোখ। ফিলের চোখে চোখ পড়লেও মহিলার চেহারায় বিন্দুমাত্র ভাবান্তর ঘটেনি। স্রেফ শীতল চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল গুলিবিদ্ধ ব্যাংক মেসেঞ্জার বুকে হাত চেপে ধরে লুটিয়ে পড়েছে ফুটপাতে। তারপর মহিলা সদর দরজা বন্ধ করে ঘরে চলে যায়।

ডেভি মহিলাকে খুন করতে যাচ্ছিল, তাকে বাধা দেয় ফিল। ওদের গুলির শব্দ বেশ উচ্চকিত আওয়াজ তুলেছে, আর কোন ঝুঁকির মধ্যে যেতে চাইছিল না ফিল। রাস্তার ধারে অপেক্ষমাণ গাড়িতে ঝটপট উঠে পড়ে দু'জনে, রওনা হয়ে যায় পূর্ব নির্ধারিত হাইড-আউটের দিকে।

একটি খবরের কাগজের স্টলের সামনে এসে দাঁড়াল ফিল। সিগারেট, ক্যাণ্ডিবার আর 'জার্নাল' কিনল। খুদে ক্যাফেটেরিয়ার দিকে হাঁটতে হাঁটতে

কাগজের হেডলাইনে চোখ বুলাচ্ছে। ব্যাংক ডাকাতির খবরটা নীচের দিকে, বক্স করে ছেপেছে। কাগজ পড়ে নতুন কিছুই জানা গেল না। মধুরঙা স্বর্ণকেশী পুলিশের সঙ্গে কথা বলেছে। ব্যাংকের সংবাদবাহককে যে দুই খুনী গুলি করে হত্যা করেছে তাদেরকে সে সনাক্ত করতে পারবে। গুলি করে হত্যা...ডানে-বামে মাথা নাড়ল ফিল। বেচারা!

খাবারের দোকানে ঢুকে ও চারটে রোস্ট বিফ স্যাণ্ডউইচ আর আধডজন ঠাণ্ডা বিয়ারের ক্যান কিনল। তারপর ফিরে এল অ্যাপার্টমেন্টে। চিন্তায় নিমগ্ন।

ফিল ঘরে ঢুকতেই ছোকরা টান মেরে ছিনিয়ে নিল খবরের কাগজ। উন্মুখ হয়ে পড়ল খবরটা। মুখ তুলে চাইল সে। গোলাকার তরুণ চেহারা ভয়ে পাংশুটে। 'এখন আমরা কী করব, ফিল? এই মহিলা তো আমাদেরকে ফাঁসিতে ঝোলাবে!'

'টেক ইট ইজি,' বিয়ারের একটি ক্যান খুলল ফিল।

'তুমি আমার সঙ্গে মশকরা করছ? শোনো, পুলিশ কিন্তু সবার আগে তোমাকেই খুঁজবে।'

ভুরু কোঁচকাল ফিল। 'তাতে কী?'

'তাতে কিছুই না? এই মহিলার সামনে ওরা তোমাকে নিয়ে যাবে এবং মহিলা চেঁচিয়ে ঘোষণা করবে তুমি হত্যাকারী। তখন আমার কী হবে?'

ফিল পিস্তল বের করে পরখ করতে করতে বলল, 'আমি মহিলার মুখ বন্ধ করে দেব।'

'কীভাবে? মহিলাকে হয়তো শত-শত পুলিশ পাহারা দিয়ে রাখছে। ওরা কোন ঝুঁকি নেবে না। তা হলে কী করে তুমি ওর মুখ বন্ধ করবে?'

'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে,' বলল ফিল। 'আমার উপর শুধু আস্থা রাখো, খোকা! ঠিক আছে?'

'রাখছি। তবে–'

'বললাম তো আমার ওপর বিশ্বাস রাখো। একটা কথা ভুলে যেয়ো না, ডেভি,' পার্টনারের দিকে কটমট করে তাকাল সে। 'তুমি যদি তোমার অস্থির আঙুলগুলোকে সামলে রাখতে, তা হলে এসব কিছুই ঘটত না।'

ওরা স্যাণ্ডউইচ খেল, পান করল বিয়ার। তারপর বয়সী লোকটা চামড়ার ব্রিফকেস খুলে টাকার পাতলা একটা বাণ্ডিল বের করে নিজের ওয়ালেটে পুরল।

'অ্যাই,' ডাক দিল ডেভি।

'গলা ফাটাতে হবে না। প্ল্যানটা কাজে লাগাতে কিছু অর্থকড়ি খরচা করতে হবে। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত এ ঘর থেকে এক পা-ও কোথাও যাবে না।' গায়ে আবার জ্যাকেট চড়াল ফিল। 'উল্টোপাল্টা কিছু করার চিন্তা স্বপ্নেও ভেবো না, খোকা। মনে রেখো, আমি না ফেরা পর্যন্ত এ ঘর থেকে তোমার বেরুনো মানা। আর কোন অনুপ্রবেশকারীকে দেখলে তোমার চুলকানো আঙুলগুলোকে প্রস্তুত রেখো।'

'আচ্ছা, ফিল,' বলল ছোকরা।

ট্যাক্সি পেতে সময় লাগল। ট্যাক্সিতে চড়ে লোয়ার সেভেনথ এভিন্যুর একটি গার্মেন্ট হাউসে যেতে বলল ড্রাইভারকে।

গার্মেন্ট হাউসের পাঁচতলায়, ঘষা কাচের খাঁচার পেছনে বসা মেয়েটিকে ফিল বলল, 'আমি মার্টি হার্শের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'দুঃখিত, মি. হার্শ একটা কনফারেন্সে–'

'কনফারেন্সের কাল্পনিক গপ্পো আমাকে শুনিয়ো না। ফোন তুলে ওকে বলো ব্রুকলিন হাইটস থেকে ওর এক বন্ধু দেখা করতে এসেছে। শুনলেই বুঝতে পারবে কে এসেছে।'

নাক কুঁচকে ফোন করল মেয়েটা।

যে লোকটা তড়িঘড়ি ছুটে এল ফিলের সঙ্গে দেখা করতে সে বেঁটে এবং ভুঁড়িঅলা। গায়ে শুধু শার্ট, জ্যাকেট নেই। সূর্যাস্ত রঙের টাই ঘাড়ের পেছনে ঝুলছে। 'আ, হ্যালো,' সুইচবোর্ডের দিকে তাকিয়ে নার্ভাস ভঙ্গিতে বলল সে। 'ফিল, চলো, হলওয়েতে গিয়ে কথা বলি? আমার ঘরে একজন কাস্টোমার আছে।'

'কী হলো, মার্টি? বন্ধুকে দেখে শরম লাগছে?'

'প্লীজ, ফিল!'

হলওয়েতে এসে মার্টি বলল, 'তোমাকে এখানে আসতে আমি মানা করেছিলাম।' মুখের ঘাম মুছল সে। 'ব্যাপারটা আমাদের দু'জনের কারোর জন্যই মঙ্গলজনক নয়। ফোনে কথা বললেই হত।'

'তুমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছ না,' বলল ফিল। 'আমি তোমার কাছ থেকে গরম কিছু কিনতে আসিনি। আমি ও ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছি, মার্টি।'

'আচ্ছা? তা হলে কেন এসেছ?'

'আমার একটা কাজ করে দিতে হবে, মার্টি। পুরানো বন্ধুত্বের খাতিরে।'

ছোট ছোট চোখজোড়া সরু হয়ে এল। 'কী কাজ?'

'তোমার তো একটা বড় ইউনিফর্ম ডিপার্টমেন্ট আছে, তাই না?'

'হ্যাঁ, তো? ওখানে আর্মি এবং নেভীদের জিনিসপত্র ভাড়া দিই এবং বিক্রি করি। তোমার দরকারটা কী শুনি?'

'একটা ইউনিফর্ম,' সরল গলায় বলল ফিল। 'আর কিছু না। স্রেফ একটা পুলিশের ইউনিফর্ম। তবে জিনিসটা নতুন হওয়া চাই।'

'দ্যাখো, ফিল–'

'আমাকে ফিরিয়ে দিয়ো না, মার্টি। আমাদের বন্ধুত্ব কিন্তু অনেক দিনের। আমার এক বন্ধুর সঙ্গে একটু মশকরা করব। তুমি ওরকম একটা জিনিস নিশ্চয় জোগাড় করে দিতে পারবে, পারবে না?'

ভুঁড়িঅলা মার্টির কপালে ভাঁজ পড়ল। 'ওরকম জিনিসের কোন অভাব নেই আমার কাছে। তা ছাড়া একদম নতুন কিছু ইউনিফর্ম বানিয়েওছি আমি। তবে ওতে এখনও ব্যাজট্যাজ লাগানো হয়নি। আর অস্ত্রের ব্যবস্থাও করা যায়নি।'

'ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। ওসব আমি ম্যানেজ করে নেব। ওই ইউনিফর্মে কাজ হবে তো? মানে আমাকে দেখতে পুলিশ বলে মনে হবে?'

'অবশ্যই মনে হবে। সে গ্যারান্টি তোমাকে দিতে পারি।'

'চমৎকার। তা হলে জিনিসটা নিয়ে এসো, মার্টি।' মার্টি ওর দিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে রয়েছে দেখে যোগ করল ফিল, 'পুরানো দোস্তীর খাতিরে, কেমন?'

ফিল নেমে এল রাস্তায়, বগলে সমতল, বড়সড় একটি বাক্স। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে একটা ট্যাক্সি ডাকল হাত নেড়ে। ড্রাইভারকে চৌমাথার একটি ঠিকানায় যেতে বলল। ওখানেই ব্যাংকের সংবাদবাহককে হত্যা করেছে ডেভি উইয়াট।

ঝুঁকিপূর্ণ কাজ, তবে ঝুঁকিটা নিতেই হচ্ছে। ফিল জানে না স্বর্ণকেশী এ মুহূর্তে থানায় নাকি নিজের বাড়িতে পুলিশ পরিবেষ্টিত হয়ে রয়েছে।

ক্যাব থেকে নামার মুহূর্তে জবাবটা পেয়ে গেল সে। স্বর্ণকেশীর বাড়ির সামনে পাহারা দিচ্ছে উর্দিধারী দুই পুলিশ।

রাস্তার চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিতেই কাঙ্ক্ষিত জিনিসটি নজরে পড়ে গেল ওর। ছোট একটি রেস্টুরেন্ট, সামনে লাল ডোরাকাটা চাঁদোয়া। ওদিকে দ্রুত পা বাড়াল ফিল। রেস্টুরেন্টের সাইনবোর্ড চোখে পড়ল—অ্যাঞ্জি'স। জানালার কাচে সেঁটে রাখা মেনুতে একবার চোখ বুলিয়ে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল ও।

ঘরের চারপাশটা একবার পরখ করে নিল ফিল। ঝঞ্ঝাটমুক্ত পরিবেশ বলেই মনে হচ্ছে। মূল ডাইনিংরুমের পরে, হলওয়েতে পুরুষদের বাথরুম। ওটার পাশে বেরুবার একটা রাস্তাও আছে। এক্সিটটা কাজে লাগবে ফিলের।

রেস্টুরেন্টে খদ্দের বেশি নেই। ফিল হলওয়ের পাশের একটি টেবিল দখল করল, হাতের প্যাকেটটা রাখল বিপরীত দিকের চেয়ারে। বিরস বদনের এক ওয়েটার এলে তাকে খাবারের অর্ডার দিল ফিল। চলে এল খাবার। বাসি চেহারার স্প্যাগেটি ধৈর্য নিয়ে চিবুতে থাকল সে। তারপর ঢুকল বাথরুমে।

দ্রুত কাপড় বদলাল ফিল। পুরানো পোশাক ঢোকাল সঙ্গে নিয়ে আসা বাক্সে, শক্ত করে বাঁধল রশি। শার্টে লাগাল ব্যাজ, পুলিশি হোলস্টারে ঢোকাল .৩৮।

সাইড ডোর দিয়ে বেরুনোর সময়, দরজার পাশে রাখা আবর্জনার ড্রামে বাক্সটা ছুঁড়ে ফেলে দিল ফিল।

নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে রাস্তা পার হলো ও, সোজা এগোল অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ।

'হাই,' দুই পুলিশের একজনকে উদ্দেশ্য করে বলল ফিল, 'ওয়েবারকে দেখেছ তোমরা?' ওয়েবার এক থানার লেফটেন্যান্ট। তার সঙ্গে যৎসামান্য পরিচয় রয়েছে ফিলের।

'ওয়েবার? না তো! ওর কি এখানে আসার কথা?'

'হুঁ। আমি ফোর্থ প্রেসিংক্ট থেকে এসেছি। কিছুক্ষণ আগে ফোন করেছিল ও। আমরা গতরাতে একজনকে গ্রেফতার করেছি। ব্যাংক ডাকাতির অভিযোগ। হয়তো এ লোকটাকেই খুঁজছ তোমরা...'

'তো আমাদেরকে কী করতে বলো?' জিজ্ঞেস করল এক পুলিশ।

ঘোঁতঘোঁত করে উঠল ফিল। 'কী করতে বলব আমি নিজে জানলে তো! আমাকে পাঠিয়েছে বুনো হাঁস ধরার জন্য। ওয়েবারের তো এখানে এর মধ্যে চলে আসার কথা।'

'কেন আসছে না বলতে পারব না, ভাই,' হাই তুলল অপর পুলিশ।

'মহিলা এখনও আছে তার বাসায়?' নিরাসক্ত চেহারা নিয়ে জানতে চাইল ফিল।

'হুঁ,' জবাব দিল দ্বিতীয় পুলিশ। 'বিশ্রাম নিচ্ছে।' খিক খিক হাসল। 'ওর সঙ্গে বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ পেলে চান্সটা হারাতাম না।'

'ওর সঙ্গে একটু কথা বলা দরকার। গ্রেফতারকৃতের বর্ণনা দিলে মহিলা হয়তো এ ব্যাপারে কোন সাহায্য করতে পারবে।'

'কী জানি!' খচখচ গাল চুলকাল প্রথম পুলিশ। 'আমরা তো গ্রেফতারের কথা কিছু শুনিনি।'

'ধুরো, বাদ দাও তো,' বলল দ্বিতীয় পুলিশ কর্মকর্তা। ঘুরল ফিলের দিকে। 'মহিলা ফোর-ই-তে আছে।'

'ওকে,' বলল ফিল। পা বাড়াল অ্যাপার্টমেন্টে। 'ওয়েবার এলে বোলো আমি ওপরে আছি। ঠিক আছে?'

'আচ্ছা।'

পিছনে দরজা বন্ধ করল ফিল, স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর ঢুকে পড়ল অটোমেটিক এলিভেটরে, ৪ লেখা নাম্বারে চাপ দিল।

চারতলায় এসে E লেখা দরজায় মৃদু টোকা দিল ফিল।

'ইয়াহ্?' ক্লান্ত একটি নারী কণ্ঠ ভেসে এল, তবে ভীত নয়। 'কে?'

'পুলিশ,' ফুরফুরে গলায় জানান দিল ফিল। 'আপনাকে একটা ছবি দেখাতে নিয়ে এসেছি, লেডি।'

'কীসের ছবি?' দোরগোড়ায় কাছিয়ে এল কণ্ঠ।

'গত রাতে এক লোককে আমরা গ্রেফতার করেছি, তার ছবি। হয়তো এ লোককেই খুঁজছি আমরা।'

চেইন তোলার শব্দ শুনল ফিল; খুলে গেল দরজা। সামনাসামনি স্বর্ণকেশীকে তেমন কম বয়েসী এবং খুব বেশি আকর্ষণীয়া লাগল না। পরনে হাউসকোট, ফর্সা উরু ঝিলিক দিচ্ছে। সেদিকে মহিলার বোধহয় খেয়াল নেই।

ঘরে ঢুকল ফিল, মাথা থেকে খুলে নিল ক্যাপ। 'আমি বেশি সময় নেব না, লেডি,' দরজা বন্ধ করে দিল ও।

ওর দিকে পিছন ফিরল মহিলা, কদম বাড়াল সামনে। অলস ভঙ্গিতে হোলস্টারের বোতাম খুলে পিস্তল বের করল ফিল। স্বর্ণকেশী ঘুরতেই দেখল তার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আগ্নেয়াস্ত্রের নল। চিৎকার দিতে মুখ হাঁ

করল সে তবে কোন রা বেরুল না।

'চিৎকার দিয়েছ কি গুলি করব,' মসৃণ গলায় বলল ফিল। একটা সোফার কিনারে মহিলাকে দাঁড় করাল, পাশের ঘরে একবার চকিতে তাকাল। 'ওই ঘরটা কীসের?'

'বেডরুম,' বলল স্বর্ণকেশী।

'মুভ।'

মহিলা বিনাবাক্যব্যয়ে ফিলের আদেশ পালন করল। ওর হুকুমে শুয়ে পড়ল বিছানায়–লাজুক হাসছে। মহিলা নিশ্চয় ভেবেছে ওকে হত্যা করার জন্য নয়, অন্য কোন অভিপ্রায় নিয়ে এসেছে অস্ত্রধারী। ফিল একটা বালিশ নিয়ে মহিলার পেটে গুঁজে দিল।

'এটা ধরে থাকো,' নির্দেশ এল।

আদেশ পালিত হলো। ফিল বালিশের গায়ে পিস্তল ঠেকিয়ে গুলি করল। স্বর্ণকেশীর চেহারায় প্রথমে ফুটল বিস্ময়, তারপর ক্রোধ এবং প্রতারিত হওয়ার বেদনা, তারপর সে মারা গেল।

গুলির ভোঁতা আওয়াজ হয়েছে, তবু নিশ্চিত হতে চায় ফিল। রাস্তার দিকে মুখ ফেরানো জানালায় হেঁটে গেল, তাকাল নীচে। দুই পুলিশ তখনও ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে বকবক করছে। মৃদু হাসল ফিল, হোলস্টারে অস্ত্র পুরে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

অনাগ্রহ নিয়ে ওকে দেখল দুই পুলিশ।

'খবর কী?' জিজ্ঞেস করল প্রথমজন।

'মহিলার কাছ থেকে কাজে লাগানোর মত তেমন কোন তথ্য পাইনি,' জানাল ফিল। 'ওয়েবার খুব হতাশ হবে।' হাত নাড়ল সে। 'আমি থানায় গেলাম। আবার দেখা হবে।'

ওরা বলল, 'আবার দেখা হবে।' আবার শুরু হয়ে গেল বকবকানি।

মোড় ঘুরল ফিল। ট্যাক্সিস্ট্যাণ্ডে গিয়ে চড়ে বসল একটি ক্যাবে।

'কী ব্যাপার, অফিসার?' দাঁত বের করে হাসল ড্রাইভার। 'আপনার গাড়ি হারিয়ে ফেলেছেন?'

'বেশি কল্পনা করতে যেয়ো না,' ফিল লোকটাকে কোথায় যেতে হবে বলল। গাড়ির পেছনের আসনে বসে রইল চুপচাপ। টাকার কথা ভাবছে।

গন্তব্যে পৌছুতে সাঁঝ গড়াল। আস্তানা থেকে চার ব্লক দূরে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল ফিল, বাকি রাস্তাটুকু পাড়ি দিল হেঁটে। কয়েকটা বাচ্চা ওকে দেখে শিস দিল। পরনের ইউনিফর্মের জন্য ওকে ভেবেছে পুলিশ। মুচকি হাসল ফিল।

প্রশান্ত মন নিয়ে সিঁড়ি বাইল ও। ধাক্কা মেরে কপাট খুলেছে, ডেভি ওর পেটে গুলি করল। ভুলটা কী করেছে উপলব্ধি করার আগেই দ্বিতীয় গুলিটা ফুটো করে দিল ওর কপাল।

মূলঃ হেনরি স্লেসার

পরিত্রাণ

দুর্বল শরীরটা চাপা পড়ে আছে দামী কম্বলের নীচে, ছ'টা মোটা বালিশ ছড়ানো বিছানার চারপাশে। জ্যাকব বম্যান বিষ দৃষ্টিতে দেখলেন তাঁর বাটলার চার্লস ঘরে ঢুকছে। একটা ট্রে বিছানার ওপর রাখল। তারপর টেনে দিল জানালার পর্দা। সকালের ঝকঝকে আলোয় ভরে গেল ঘর।

'জানালাটা খুলে দেব, স্যর?' জিজ্ঞেস করল চার্লস।

'চাও নাকি আমার ঠাণ্ডা লাগুক?'

'না, স্যর। আচ্ছা, আর কিছু লাগবে, স্যর?'

মাথা নাড়ালেন জ্যাকব। কিছু লাগবে না। ন্যাপকিন বিছালেন পেটের ওপর। হাত বাড়ালেন নাস্তার প্লেটের ঢাকনি সরাতে, থেমে গেলেন হঠাৎ। চার্লস। এখনও দাঁড়িয়ে আছে জানালার পাশে প্রভুভক্ত রক্ষীর মত।

'বকশিশের জন্যে দাঁড়িয়ে আছ?' কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করলেন জ্যাকব।

'জী না, স্যর। অপেক্ষা করছি মিস নেভিনসের জন্যে। ড. হোমস বলেছেন আপনাকে কখনও একা রেখে যাওয়া চলবে না, স্যর।'

'যাও। যাও,' বললেন জ্যাকব। 'আমি যদি মনস্থির করি পাঁচ মিনিটের মধ্যে মরব, তখন তোমাকে ডাকব'খন। এখন দূর হও।'

চার্লস চলে যাচ্ছে, তাকে চোখ দিয়ে অনুসরণ করলেন জ্যাকব। যাবার সময় দরজা বন্ধ করে গেল বাটলার। জ্যাকব এবার রুপোর প্লেটের ঢাকনি সরালেন। একটা ডিম পোচ, এক টুকরো টোস্ট, যৎসামান্য মোরব্বা আর এক কাপ ফিকে রঙের চা। ব্যস, এই হলো নাস্তার মেন্যু। থু! বিতৃষ্ণা নিয়ে প্লেটের খাবারগুলো দেখলেন জ্যাকব, তারপর ঘুরলেন জানালার দিকে। বাইরে চমৎকার একটি দিন। বম্যান ম্যানসনের বিশাল সবুজ লন সূর্যালোকে ঝলমল করছে, বাগানের শ্বেতপাথর আর ব্রোঞ্জের ছোট-বড় নানা মূর্তি থেকে যেন জেল্লা ছিটকে বেরুচ্ছে। সবগুলোই গৃহকর্তার রুচি এবং আভিজাত্যের পরিচয় দিচ্ছে। ড্রাইভওয়েটা বেঁকে গেছে ঘোড়ার খুরের নালের মত, বাম প্রান্তের শেষ মাথায় ইটের ছোট একটা কটেজ। কেয়ারটেকার থাকে। কেয়ারটেকার কভেনি ঝুঁকে একটা অ্যাজালিয়া (Azalea) বেড দেখছে। ড্রাইভওয়ের ডান দিকে ছুঁচাল লোহার গেটের সামনে দোতলা সমান গ্যারেজ। গ্যারেজের দরজা খোলা। জ্যাকব দেখলেন তাঁর শোফার মিসেস বম্যানের ঝকঝকে নীল কনভার্টিবলটাকে ন্যাকড়া দিয়ে মুছছে। সেই সাথে বকবক করে চলেছে জ্যাকবের নতুন নার্স মিস নেভিনসের সাথে। গেট ছাড়িয়ে আউটার লন সোজা গিয়ে মিশেছে রাস্তার সাথে। জ্যাকবের ঘর থেকে রাস্তা অনেক দূর। দৃষ্টি পৌঁছায় না অত দূরে।

বেচারা জ্যাকব বম্যান, মনে-মনে ভাবলেন তিনি। তাঁর জীবনে ভাল জিনিসগুলো বড় দেরিতে এসেছে। অবশেষে বিশাল এক বাড়ির মালিক হবার আনন্দ উপভোগ করতে ব্যর্থ জ্যাকব। চোখ ঘুরিয়ে দেয়ার মত অপূর্ব সুন্দরী এক তরুণীকে অবশেষে বিয়েও করতে পেরেছেন তিনি। কিন্তু বয়সের পার্থক্য তাঁকে এমন চুপসে দিয়েছে যে চোখ ঝলসানো রূপসী স্ত্রীর কাছ থেকে সুখ পাবার অবস্থা তাঁর নেই। মানুষের মনের কথা বুঝতে পারার মত অবিশ্বাস্য ক্ষমতারও অধিকারী হয়েছেন তিনি অবশেষে। কিন্তু সারাক্ষণ চাকর-বাকর পরিবৃত হয়ে থাকেন যিনি, তাঁর এ ক্ষমতা থেকেই বা কী লাভ?

বেচারা জ্যাকব বম্যান, আবার নীরবে দুঃখ প্রকাশ করলেন তিনি নিজেকে নিয়ে। সম্পদ, ভাগ্য এবং জ্ঞান পেয়ে কী লাভ হলো?

এ ঘরের চৌহদ্দিতে তাঁকে সারাক্ষণ বন্দি থাকতে হয়। কোথাও যেতে পারেন না তিনি। যাবার ক্ষমতাও নেই।

ঘড়ির দিকে তাকালেন জ্যাকব। ন'টা বেজে ছয়। ঘড়ির চারপাশে অজস্র ওষুধের বোতল। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঘড়ি ধরে তাঁকে ওষুধ গিলতে হয়। তবে এ কাজটা ভাড়া করা নার্সরাই করে। তিনি আবার চোখ ফেরালেন জানালায়। সাদা ইউনিফর্ম পরা নার্স ঘড়ির দিকে তাকাল বিরক্তি নিয়ে, তারপর শোফারকে চুমু খেয়ে বাড়ির উদ্দেশে হাঁটা দিল। মেয়েটা স্বর্ণকেশী, সুঠামদেহী। হাঁটার ভঙ্গি চমৎকার। শক্তি যেন ফুটে বেরুচ্ছে গা থেকে প্রতিটি পদক্ষেপে। আর এই শক্তিরই বড় অভাব জ্যাকব বম্যানের। মেয়েটিকে ঝুল-বারান্দার ছাদের নীচে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখলেন তিনি। নাস্তার প্লেটে মনোনিবেশ করলেন জ্যাকব। মেয়েটি রাঁধুনী এবং মেইডকে সুপ্রভাত জানাবে, মনে-মনে ভাবলেন তিনি। তার মানে ডিম পোচ এবং টোস্ট শেষ করার সাথে সাথে দরজার কড়া নাড়বে নার্স।

টোস্টের শেষ টুকরোটা চিবুচ্ছেন জ্যাকব, এমন সময় নক হলো দরজায়। তিনি বললেন, 'দূর হও।' দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল নার্স হাসিমুখে।

'গুড মর্নিং, মি. বি,' খুশি-খুশি গলায় বলল সে। হাতের পেপার ব্যাগটা নামিয়ে রাখল ড্রেসারের ওপর, রাতের নার্সের লিখে যাওয়া চার্টের দিকে অবহেলা ভরে একবার তাকাল। তারপর জানতে চাইল, 'কেমন আছেন আজ?'

'বেঁচে আছি,' জবাব দিলেন জ্যাকব।

'আজকের দিনটা খুব সুন্দর, না?' বলল মেয়েটি, হেঁটে গেল জানালার ধারে। 'আমি বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম। মনে হচ্ছিল বসন্ত এসেছে। জানালা খুলে দিই?'

'না। খুলো না। তোমার ডাক্তার বন্ধু বলেছে খোলা হাওয়ায় ঠাণ্ডা লেগে যাবে।'

'ওহ, ঠিক আছে...ভুলেই গেছিলাম কথাটা। আসলে নার্স হিসেবে আমি কোন কর্মের নই, তাই না?' হাসল সে।

'তুমি নার্স,' বললেন জ্যাকব। 'তবে অন্যদের চেয়ে ভাল নার্স। আমাকে

কখনও একা রেখে যেতে চাও না।'

'আপনি বাড়িয়ে বলেছেন, মি. বি। আমি তেমন নিবেদিতপ্রাণ নই।'

'নিবেদিতপ্রাণ? তুমি সুন্দরী, বয়স অল্প। তোমার তো অন্য কিছুতেও আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। তুমি হয়তো মনে-মনে ভাবছ, "আমি কিছুদিন নার্সিং-এর কাজ করব। কাজটা সহজ। টাকাও পাওয়া যাবে ভাল। টাকা জমিয়ে বিয়ে করে ফেলব।"'

অবাক দেখাল মেয়েটিকে। 'ড. হোমস যেদিন আমাকে এই কাজের অফার দিলেন, ঠিক এসব কথাই ভেবেছি সেদিন। আপনি খুব বুদ্ধিমান, মি. বি।'

'ধন্যবাদ,' শুকনো গলায় বললেন জ্যাকব। 'বয়স বাড়লে মানুষের বুদ্ধিও বাড়ে।' চায়ের কাপে চুমুক দিতেই চেহারা বিকৃত হয়ে গেল তাঁর। 'থু! কী বিশ্রী স্বাদ! সরাও এটাকে।' কম্বলের নীচে লাথি মারলেন তিনি।

'চা-টা আপনার শেষ করা উচিত,' বলল মিস নেভিনস।

'সরাতে বললাম না!' খেঁকিয়ে উঠলেন জ্যাকব।

'মাঝে মাঝে আপনি একদম বাচ্চা ছেলেদের মত করেন,' চায়ের কাপটা জ্যাকবের হাত থেকে নিয়ে নিল নার্স।

'ঠিক আছে। আমি বাচ্চা ছেলে আর তুমি বাচ্চা মেয়ে। এখন এসো দু'জনে গল্প করি।'

মাথার বালিশ ঠিক করতে যাচ্ছিলেন তিনি, মেয়েটি হাত লাগাতে থেমে গেলেন।

'আচ্ছা, ফ্রান্সিস,' নার্সের মুখের সাথে প্রায় মুখ লাগিয়ে বললেন তিনি, 'তুমি তোমার স্বামী হিসেবে কাউকে পছন্দ করেছ?'

'মি. বি, কোন মেয়েকে এমন ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে নেই।'

'মেনে নিলাম এটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন। কিন্তু এ প্রশ্নের জবাব তুমি আমাকে না বললে আর কাকে বলবে? আমি কি তোমার গোপন কথা কাউকে বলে দেব? কক্ষনও না। কাকে বলব? তোমার স্পেশালিস্ট ডাক্তার আমাকে একটা ফোন পর্যন্ত করতে দেয় না। আমার ব্রোকারের সাথে কথা বলারও সুযোগ নেই এ ঘরে ফোন নেই বলে। ডাক্তারের ধারণা, আমি যদি শুনি ব্যবসায়ে লোকসান হচ্ছে তা হলে নাকি আর ধাক্কা সামলাতে পারব না। সে জানে না খবরের কাগজ দেখেই আমি বলে দিতে পারি কত লাভ বা ক্ষতি হচ্ছে। ...আচ্ছা, সত্যি করে বলো তো,' দুষ্টুমির ভঙ্গিতে হাসলেন তিনি, 'তোমার লাভার দেখতে কেমন?'

'মি. বি! ভবিষ্যৎ স্বামী এক জিনিস। কিন্তু লাভার...?' জ্যাকবের মাথায় বালিশ গুঁজে দিয়ে ফ্রান্সিস নেভিনস জানালার ধারের চেয়ারে গিয়ে বসল। বলল, 'জানি না আমার সম্পর্কে আপনি কী ঠাউরে বসেছেন।'

রাগ করলেন জ্যাকব। 'আমার ধারণা তুমি খুব সুন্দর, মিষ্টি একটি মেয়ে। তবে আজকালকার মিষ্টি মেয়েরা পঞ্চাশ বছর আগের মেয়েদের তুলনায় অনেক আলাদা। আমি খারাপ বা ভাল বলছি না, বলছি আলাদা। আর তোমার বয়স তো

আমার স্ত্রীর চেয়েও কম। জানি লোকে আমার বউয়ের দিকে তাকালে আর চোখ ফেরাতে চায় না। তোমাকেও নিশ্চয়ই অনেকে ফিরে ফিরে দেখে।'

'আপনার স্ত্রীর সাথে আমার কিছুতেই তুলনা হতে পারে না। তাঁর মত সুন্দরী দ্বিতীয়টি দেখিনি আমি।'

'শুনলে আমার স্ত্রী খুশি হত,' বললেন জ্যাকব। 'যাক গে, এবার তোমার লাভার সম্পর্কে একটু বলো তো শুনি।'

'এত করে যখন শুনতে চাইছেন...' লাজুক ভাব ফ্রান্সিসের চেহারায়, তবে ভেতরে ভেতরে খুশি। 'অবশ্য এখন পর্যন্ত ব্যাপারটা স্থায়ী রূপ পায়নি। মানে আমরা এখনও ডেট-টেট করিনি।'

'করেছ নিশ্চয়ই,' বললেন জ্যাকব। 'কিন্তু বলতে চাইছ না। ভাবছ ডেটিং-এর কথা বললে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দেব।'

'সত্যি বলছি, মি. বম্যান...'

'তবে ডেটিং-এর ডেট ঠিক করেছ কবে? জুনে?'

'জুলাই,' বলল মেয়েটি, হাসছে।

'তোমার প্রেমিক নিশ্চয়ই সুদর্শন এবং শক্তিশালী?'

'জী।'

'আর ভদ্র?'

মাথা ঝাঁকাল মেয়েটি, উদ্ভাসিত মুখ।

'ভাল কথা,' বললেন জ্যাকব। 'ভদ্রলোকদেরই বিয়ে করা উচিত...তবে খুব ভদ্র হলে আবার বিপদ আছে। বেশি ভদ্রলোকরা বেশি আছাড় খায়। আমার কথাই ধরো। আমি অতিরিক্ত ভদ্র সেজে কী করেছি? কোথায় এসে পৌঁছেছি? কোথাও না। তাই একটু আলাদা হতে শিখেছি আমি। তবে মানে এই নয় যে আমি আর আগের মত ভুলচুক করি না। তবে ভুল করলেও সেটা শোধরানোর চেষ্টা করি। ...আর ভুল মানুষকে বিয়ে করাটা জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল হয়ে দেখা দিতে পারে। তুমি যার সাথে প্রেম করছ তার নাড়ি-নক্ষত্রের খবর নিশ্চয়ই সব জানো?'

'জী। সে খুব অসাধারণ একজন মানুষ। আপনি তাকে চেনেন, মি. বম্যান। যদি তার সাথে একবার কথা বলতেন...' থেমে গেল মেয়েটি, ঠোঁট কামড়াচ্ছে।

'লোকটি কে জানতে বড় ইচ্ছে করছে,' বললেন জ্যাকব। 'আমার কোন বন্ধু?'

'না, না। তেমন কেউ নয়।'

'ড. হোমস?' ঢিল ছুঁড়লেন জ্যাকব।

'আরে না!'

'এই লোক কি আমার অধীনে কাজ করে?' চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন জ্যাকব, মেয়েটির চেহারা দেখছেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। 'চার্লস? ...না, না। চার্লস না। চার্লসকে তুমি তেমন পছন্দ করো না জানি। করো, ফ্রান্সিস?'

'না, করি না,' হঠাৎ জ্বলে উঠল মেয়েটি। 'ও আমাকে দেখলে এমন ভাব করে যেন আমি...আমি একটা...নিজেকে কেউকেটা ভাবে চার্লস। আসলে ও একটা ইঁদুর।'

মুচকি হাসলেন জ্যাকব। 'ঠিক বলেছ। চার্লস একটা ইঁদুর। ...তা হলে কে হতে পারে? আমার কেয়ারটেকারকেও তোমার সাথে মানাবে না। কারণ, সে বুড়ো...' থেমে গেলেন তিনি, হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল চাউনি, চোখের তারায় দুষ্টুমি, মুখ হাঁ হয়ে আছে। ফ্রান্সিসের পেছনে তাকালেন তিনি, জানালার বাইরে চলে গেল দৃষ্টি। বললেন, 'এক মিনিট। একটা ক্লু অন্তত দাও। সে কী কাজ করে? স্টক এবং বণ্ড? তেল? টেক্সটাইল?' গলার স্বর ক্রমে উঁচুতে উঠছে। 'অথবা ট্রান্সপোর্টেশন?'

'আপনি জেনেও না জানার ভান করছেন,' বলল ফ্রান্সিস। 'আপনি জানেন ওর নাম ভিক। বাজি ধরে বলতে পারি আগেই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন আপনি। আপনাকে অবশ্য আগেই আমার বলা উচিত ছিল। কিন্তু–' দরজায় নক করল কে যেন, থেমে গেল মেয়েটি।

'দূর হও,' বললেন জ্যাকব।

খুলে গেল দরজা। ভেতরে ঢুকলেন মিসেস বম্যান। লাল চুল তাঁর। টকটকে হলুদ সোয়েটার আর টাইট স্ল্যাক্সে দুর্দান্ত লাগছে তাঁকে। বোঝার উপায় নেই এই মহিলার বয়স ত্রিশ।

'সবাইকে সুপ্রভাত। না, না। উঠে দাঁড়াতে হবে না। বসো তুমি,' বললেন তিনি ফ্রান্সিসকে। 'রোগীর কী অবস্থা?'

'ভয়ঙ্কর,' বললেন জ্যাকব।

হেসে উঠলেন মিসেস বম্যান। হাসিটা প্রাণহীন এবং কৃত্রিম লাগল জ্যাকবের কাছে। স্বামীর গালে হাত রাখলেন তিনি। 'রাতে ভাল ঘুম হয়েছে তো?'

'ওর সাথে থাকতে কষ্ট হয় না তোমার?' ফ্রান্সিসকে জিজ্ঞেস করলেন মিসেস বম্যান। 'জানি না কীভাবে ওকে সঙ্গ দাও তুমি!'

'স্রেফ টাকার জন্যে,' বললেন জ্যাকব। 'ঠিক তোমার মত।'

জোর করে মুখে হাসি ফোটালেন মিসেস বম্যান। 'ওর কথাবার্তা একদম বাচ্চাদের মত, না? ভাল কথা, কমলা রঙের বড়িটা ওকে খাইয়েছ?'

'খেয়েছি,' বললেন জ্যাকব।

'না। খাননি,' বলল ফ্রান্সিস। 'সোয়া ন'টা বেজে গেছে? ইস, আমি–'

'ন'টা বিশ,' ঠাণ্ডা গলায় বললেন মিসেস বম্যান। 'আচ্ছা, আমি খাইয়ে দিচ্ছি। টেবিল থেকে একটা ভায়াল খুলে একটা বড়ি নিলেন তিনি। গ্লাসে পানি ঢাললেন রুপোর জগ থেকে।

অন্য দিকে মাথা ঘুরিয়ে রাখলেন জ্যাকব। 'আমি আমার ওষুধ নিজেই খেতে পারি। আর তোমাকে নার্সের ভূমিকায় একদম মানাচ্ছে না।' বড়িটা মুখে পুরে পানি দিয়ে ঢক করে গিলে ফেললেন তিনি। তারপর বললেন, 'কলেজ ছাত্রীদের

ড্রেস পরে কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি?'

'মার্কেটে যাব। শপিং করব।'

'ভিক আপনার গাড়ি রেডি করে রেখেছে,' জানাল ফ্রান্সিস। 'পালিশ করায় নতুনের মত লাগছে।'

'তা তো লাগবেই।'

'নতুনের মত লাগার কী দরকার। নতুন একটা গাড়ি কিনে ফেললেই পারো,' বললেন জ্যাকব।

'নতুন গাড়ি কেনার কথা মাথায় আছে,' বললেন মিসেস বম্যান। 'আগে তুমি সুস্থ হয়ে ওঠো। তারপর দু'জনে চড়ার মত একটা স্পোর্টস কার কিনব। লং ড্রাইভে বেরোব। শুধু দু'জনে।'

'শুনে আমার আর তর সইছে না,' ব্যঙ্গ করলেন জ্যাকব।

স্বামীর বক্রোক্তি গায়ে মাখলেন না মিসেস বম্যান। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আরে, জানালা বন্ধ করে রেখেছ কেন? বাইরে কী সুন্দর রোদ দেখেছ?'

'দেখেছি। কিন্তু জানালা খুলে ঠাণ্ডা লেগে মরতে চাই না।'

মুখে বাঁকা হাসি, মিসেস বম্যান লম্বা আঙুল ছোঁয়ালেন স্বামীর ঠোঁটে, তারপর কপালে খোঁচা দিলেন।

'আজ তোমার চুমু পাওনা হয়নি,' বললেন তিনি ঠাট্টা করে। ফিরলেন ফ্রান্সিসের দিকে। 'ও যদি চ্যাটাং চ্যাটাং করে তা হলে ওর সাথে কথা বোলো না। তা হলেই ও ঠিক হয়ে যাবে।' ষড়যন্ত্রের ভঙ্গিতে হাসলেন তিনি। ঘুরলেন স্বামীর দিকে। 'আজ তাড়াতাড়ি ফিরব।'

'আমার তো আর যাবার কোন জায়গা নেই,' বললেন জ্যাকব। 'আমি আছি এখানেই।'

'আসি তা হলে,' মিষ্টি করে বললেন মিসেস বম্যান। বেরিয়ে গেলেন।

'দরজাটা বন্ধ করে দাও,' ফ্রান্সিসকে বললেন জ্যাকব।

'মিসেস বম্যানকে খুব সুন্দর লাগছিল, তাই না?' দরজা বন্ধ করে জ্যাকবের কাছে ফিরে এল ফ্রান্সিস। 'ওরকম স্ল্যাক্স পরার সৌভাগ্য যে কবে হবে!'

'তোমার প্রেমিককে বললেই পারো। বিয়ের আগে।'

'ভিকের কাছে চাইলে ও কিছু মনে করবে না। ওর ভেতরে ঈর্ষা বলতে কিছু নেই। বহুবার আমাকে বলেছে লোকজন যখন আমার দিকে তাকিয়ে থাকে, ব্যাপারটা নাকি উপভোগ করে ও।'

'আর ভিক যখন অন্য মেয়েদের দিকে তাকিয়ে থাকে?' জিজ্ঞেস করলেন জ্যাকব।

'আমি সহ্যই করতে পারি না।'

'মেয়েরা তা হলে ভিককে দেখলে খুব আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, না?'

'মাঝে মাঝে এ নিয়ে বিব্রতকর ঘটনাও ঘটেছে। কিছু মেয়ে আছে হ্যাংলা টাইপের। সুদর্শন পুরুষ দেখলেই গলে পড়ে। এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে দুই

হপ্তা আগে। নাইট ক্লাবে। সেদিন ভিকের ছুটি ছিল।'

ফ্রান্সিসকে কথায় পেয়ে বসেছে। সে বকবক করেই চলল। জ্যাকব জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। স্ত্রীকে দেখলেন লন ধরে গ্যারেজের দিকে হেঁটে যাচ্ছে। ধীরে সুস্থে, নিতম্বে ঢেউ তুলে হাঁটছে। যে-কোন পুরুষের মাথা খারাপ হয়ে যাবে তার হাঁটা দেখলে।

'মেয়েটাকে দেখেই বমি আসছিল,' বলে চলেছে ফ্রান্সিস। 'ওকে আমাদের টেবিলে আসতে দেখে খুবই অবাক হয়ে যাই আমি। কুচকুচে কালো চুল। তবে চুলে কদ্দিন চিরুনি পড়েনি কে জানে। ঠোঁটে মনে হয় লিপস্টিকের পুরো টিউবটা খালি করেছে...'

অন্যমনস্কভাবে ফ্রান্সিসের গল্প শুনছেন জ্যাকব, লক্ষ করছেন স্ত্রীকে। গাড়ির কাছে পৌঁছে গেছে সে, এবার দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়াল, কথা বলছে ভিকের সাথে। কী একটা কথায় খুব জোরে হেসে উঠল। হাসির আওয়াজ এতদূর থেকে শুনতে পাবার কথা নয়। তবু যেন শুনতে পেলেন জ্যাকব। চটুল, মোহনীয় ভঙ্গির হাসি। শরীরের রক্ত গরম করে দেয়। ভিক একটা পা তুলে রেখেছে গাড়ির বাম্পারে, চওড়া হাতজোড়া ভাঁজ করা বুকের ওপর, হাসছে তার মনিবানীর সাথে তাল মিলিয়ে।

'...মেয়েটা নির্ঘাত মদ খেয়েছে,' নিজের গল্পে পুরোপুরি ডুবে গেছে ফ্রান্সিস। 'আমি কল্পনাই করতে পারি না কোন মেয়ের অত সাহস হয় কী করে! অচেনা একজনের কোলে ধপ করে বসে পড়ে তাকে চুমু খেয়ে ফেলল! তাও তার প্রেমিকার সামনে?'

'ভিক তখন কী করল?' জানালা থেকে দৃষ্টি ফেরালেন জ্যাকব।

'কী করবে? কিছুই না। মানে কী-ই-বা বলার ছিল ওর? চারপাশে লোক গিজগিজ করছে। ও চেষ্টাকৃত হাসি ফোটাল মুখে, ভান করল যেন এটা একটা ঠাট্টা। কিন্তু আমি মেনে নিতে পারছিলাম না ব্যাপারটা। ওদিকে মেয়েটা ভিকের কোল ছেড়ে উঠছিল না। ভিক যে ওকে ঠেলা-ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেবে তাও পারছিল না। কারণ, সবাই দেখছিল আমাদেরকে। আমার খুব রাগ হচ্ছিল। আপনাকে একটা কথা বলি, মি. বম্যান। আমার কিন্তু সাংঘাতিক রাগ। বিশেষ করে ভিককে নিয়ে কিছু ঘটলে কী কাণ্ড করে ফেলি নিজেও বুঝতে পারি না।'

'বেটির মত কাণ্ড?' জিজ্ঞেস করলেন জ্যাকব।

নীচের ঠোঁট কামড়াল ফ্রান্সিস। 'আপনি ঘটনাটা জানেন জানতাম না তো! ওই ব্যাপারটা নিয়ে আমি সত্যি দুঃখিত, মি. বম্যান। আমি লাঞ্চ আনতে কিচেনে ঢুকেছি। এমন সময় দেখি বেটি জড়িয়ে ধরে আছে ভিককে। ধাঁ করে রাগ চড়ে গেল মাথায়।'

'শুনেছি আমি,' হাসছেন জ্যাকব। 'বেটি চলে যাবার সময় দেখা হয়নি ওর সাথে। তবে চার্লস বলেছে মেয়েটার চেহারাটা নাকি আর দর্শনযোগ্য ছিল না।'

'বোধহয় বেশি জোরে খামচে দিয়েছিলাম,' মেঝের দিকে তাকিয়ে বলল

ফ্রান্সিস। 'সত্যি আমি দুঃখিত। ওর কাছে ক্ষমা চাইতেও গেছিলাম। বেটি আমার কথা শুনতেই চাইল না। যেন সব আমার দোষ।'

'আর নাইট ক্লাবের মেয়েটার কী হলো?'

'মেয়েটার চুল টেনে ধরে ভিকের কোল থেকে নামিয়ে দিয়েছি,' লাজুক গলায় নিজের কীর্তির কথা স্বীকার করছে ফ্রান্সিস। 'ভিক বাধা না দিলে হয়তো খামচে মেয়েটার চোখই গেলে দিতাম। মাথায় আগুন ধরে গেছিল আমার। কত বড় আস্পর্ধা, ভিককে চুমু খায়! আমার কাছে ছুরি থাকলে ঠিক খুন করে ফেলতাম শয়তানীকে।'

'তাই নাকি?' বললেন জ্যাকব। ফ্রান্সিসকে ছেড়ে আবার জানালার দিকে ফিরে গেল তাঁর দৃষ্টি। ভিক কিংবা তাঁর স্ত্রী কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। লন ছুঁয়ে গেল তাঁর চোখ, পাথর এবং ব্রোঞ্জের মূর্তির ধারেও কেউ নেই। কভেনি এখনও তার অ্যাজালিয়া বেড নিয়ে ব্যস্ত। মিসেস বম্যানের গাড়ির হুডে একটা অদ্ভুত ছায়া চোখে পড়ল জ্যাকবের। চোখ কুঁচকে তাকালেন ওদিকে। ওটা সম্ভবত গাড়ি মোছার ন্যাকড়া, ভাবলেন তিনি।

'তো ভিককে নিয়ে এভাবে যে মেয়েদের সাথে মারামারি করো, খারাপ লাগে না?' অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলেন তিনি।

'খারাপ লাগবে কেন? আর ভিককে আমি দোষও দিই না। সে তো আর কারও সাথে ভাব জমাতে যায় না। মেয়েগুলোই বরং ওর গায়ে ঢলে পড়ে।'

'ঠিক বলেছ,' সায় দিলেন জ্যাকব। চোখ কুঁচকে গ্যারেজের জানালার দিকে তাকালেন। এক পলকের জন্যে হলদে রঙের একটা ঝিলিক যেন দেখতে পেলেন ওখানে। নাকি সূর্যের আলোয় কাঁচের প্রতিফলন দেখছেন? উঁহু, জানালাটা খোলা; সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত হয়নি। আবার হলদে রঙের ঝিলিক চোখে পড়ল তাঁর। উজ্জ্বল হলুদ রঙের এক টুকরো কাপড়। কোন কিছু থেকে ধীরে ধীরে খসে পড়ছে। এরপর জানালার কাঁচে আর কিছু দেখতে পেলেন না। মুচকি হাসলেন তিনি। 'আমার ধারণা ভিক খুব বিশ্বস্ত,' বললেন তিনি। 'দোষ যদি কারও থাকে তা হলে ওই মেয়েগুলোই দায়ী। তোমার রাগ এবং ঈর্ষা হওয়াটাই স্বাভাবিক। তোমার জিনিসের ওপর কেউ হাত বাড়ালে তুমি তাকে ক্ষমা করবে কেন? রাগের চোটে খুন করে ফেললেও তোমাকে দোষ দেব না। জানোই তো, যুদ্ধ আর প্রেমে খুন-খারাবি অপরাধ নয়।'

'ভিক ছাড়া আমি কিছু বুঝি না। ও আমার জান।' কথাগুলো বলার সময় লালচে হয়ে উঠল ফ্রান্সিসের চেহারা।

'তাতে আমার কোনই সন্দেহ নেই,' বললেন জ্যাকব। 'তুমি এখন যাও। আমি একটু ঘুমাব।'

'বই পড়বেন?' বলল ফ্রান্সিস। 'চমৎকার একটা থ্রিলার নিয়ে এসেছি। বাসে বসে পড়েছিলাম। আপনি পড়ে দেখতে পারেন। বই পড়লে ঘুম চলে আসবে

তাড়াতাড়ি।'

'ধন্যবাদ,' বললেন জ্যাকব। 'রেখে যেয়ো বইটা। তবে যাবার আগে আমার একটা ছোট্ট কাজ করে দাও।' বিছানার সাথে লাগোয়া টেবিলের ড্রয়ার খুললেন তিনি। ছোট, ধূসর রঙের একটা রিভলভার বের করলেন। 'ভয় পেয়ো না। এ জিনিস আমি রাখি চোর-ডাকাত মোকাবিলার জন্য। অনেকদিন ধরে ড্রয়ারে পড়ে আছে এটা। সাফসুতরো করা হয়নি। বুঝতে পারছি না কলকজা ঠিকঠাক আছে কি না। তুমি এটা ভিককে দিয়ে আসতে পারবে? বলবে একটু যেন চেক করে দেয়।'

'পারব না কেন?' ফ্রান্সিস হাত বাড়িয়ে অস্ত্রটা নিল। 'বাহ্, কী হালকা! আমার ধারণা ছিল পিস্তল বা রিভলভার খুব ভারী হয়।'

'এসব রিভলভার মহিলারা ব্যবহার করে,' বললেন জ্যাকব। 'মহিলা এবং বুড়োরা। তবে সাবধান। ওটাতে কিন্তু গুলি ভরা আছে। গুলিগুলো খুলে নিলেই ভাল হত। কিন্তু কীভাবে খুলতে হয় জানি না।'

'আমি সাবধানেই নিয়ে যাব,' হাতলটা শক্ত করে চেপে ধরল ফ্রান্সিস। 'আপনি ঘুমানোর চেষ্টা করুন। চার্লসকে বলব আসতে?'

'দরকার নেই। তুমি তোমার প্রেমিকের সঙ্গে গল্প করো গে। কিছুক্ষণ আগে বোধহয় ওকে ওর দোতলার ঘরে যেতে দেখেছি।'

'আমি তো জানি ভিক ওর ঘরেই আছে। ঘুমুচ্ছে,' বলল ফ্রান্সিস।

'তা হলে ওকে ঘুম থেকে ওঠাও। ছেলেবেলার মত কানের কাছে "কুক" করে ডাক দাও। লাফ দিয়ে উঠবে।' হাসলেন জ্যাকব।

হাসল ফ্রান্সিসও। 'জেগে উঠে যদি রেগে যায় তা হলে কিন্তু বলব আপনিই আমাকে কুবুদ্ধিটা দিয়েছেন।'

'আচ্ছা, বোলো,' বললেন জ্যাকব।

ফ্রান্সিস যাচ্ছে, তার দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে রইলেন তিনি। তারপর বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়লেন। চোখ বোজা। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে শরীর। চোখটা লেগে এসেছে, এমন সময় প্রথম গুলির শব্দটা শুনলেন তিনি, তার পরপরই আরেকটা গুলির আওয়াজ হলো। তারপর আরও একটা বিস্ফোরণের শব্দ ছড়িয়ে পড়ল লনে। ইচ্ছে করল মাথা তুলে জানালা দিয়ে দেখেন, কিন্তু শরীর টেনে তুলতে কষ্ট হবে বলে চুপচাপ শুয়ে রইলেন। তা ছাড়া, ভাবলেন তিনি, কী-ই-বা করার আছে তাঁর? তিনি তো শয্যাশায়ী, পক্ষাঘাতগ্রস্ত একজন মানুষ মাত্র।

মূলঃ হ্যাল ড্রেসনার

ডিটেকটিভ

আমার নাম উইলিয়াম মরিস। খুব সাধারণ একজন মানুষ আমি। তবে আমার দৃষ্টিশক্তির প্রখরতা এবং উপলব্ধি করার ক্ষমতা আর দশজনের চেয়ে আলাদা। আমার শখও একটু ভিন্নরকম। আমি অপরাধ আর অপরাধীদের নিয়ে পড়াশোনা করতে ভালবাসি। গত ত্রিশ বছরে এডগার অ্যালান পো থেকে শুরু করে আগাথা ক্রিস্টি পর্যন্ত, এমন কোন রহস্য সাহিত্যিক নেই যাঁর লেখা আমি পড়িনি। তবে গোয়েন্দা গল্পে সেরকম গোয়েন্দা আমার পছন্দ নয় যারা অতিমানব এবং ভাগ্যের সহায়তায় অলৌকিক কিছু ঘটিয়ে ফেলতে পারে। আমি বরং সাধারণ গোয়েন্দাদের পছন্দ করি যারা দৃষ্টিশক্তি এবং কমন সেন্স বা উপলব্ধি ক্ষমতার সাহায্যে রহস্য উদ্‌ঘাটন করে।

মানুষ দেখা আমার আরেকটি শখ। কেউ ভালবাসে পাখি দেখতে, কারও পছন্দ মাছ। আমি মজা পাই বিভিন্ন পেশার মানুষদের আচরণ লক্ষ করে। তারা কীভাবে হাঁটে, কথা বলে, প্রার্থনা করে, খায়, বই পড়ে ইত্যাদি খুঁটিনাটি সমস্ত কিছুই আমি আগ্রহ নিয়ে 'পর্যবেক্ষণ' করি। আমার তীক্ষ্ণ চোখ কিছুই এড়ায় না।

একটা ঘটনা বা সূত্র থেকে আপনি হয়তো কিছুই বুঝতে পারবেন না, তবে একাধিক ঘটনার সাথে যোগসূত্র স্থাপন করতে পারলে দুইয়ে দুইয়ে চার মেলানো সম্ভব। অবশ্য এটা ঠিক, আমার অনুমান সবসময় না-ও মিলতে পারে। তবে এরকম দুইয়ে দুইয়ে চার মেলানোর ঘটনার কথা ভাবতে ভাল লাগে আমার, বিশেষ করে অবসরে।

দু'একটা উদাহরণ দিই, শুনুন।

একবার ট্রেনে চড়ে যাচ্ছি। আমার বিপরীত দিকে বসেছে এক তরুণী। কাঁদছিল সে। লক্ষ করলাম মেয়েটির অনামিকায় বিয়ের আংটি নেই। ধরে নিলাম ডিভোর্স হয়ে গেছে তরুণীর, তাই মনের দুঃখে কাঁদছে।

আরেকবার এক লোককে দেখলাম রাস্তার ধারে আধঘণ্টা ধরে একঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে। হাতে খবরের কাগজ। কিন্তু আদৌ কি পেপার পড়ছে সে? গত ত্রিশ মিনিটে একবারও পৃষ্ঠা উল্টে দেখেনি লোকটা। তবে কি সে ডিটেকটিভ, নজর রাখছে কারও ওপর? অপেক্ষা করছে সামনের বাড়িটা থেকে কে বেরিয়ে আসে দেখার জন্যে? নাকি তার গার্লফ্রেণ্ডের জন্যে অপেক্ষা করছে? উঁহুঁ, তা হতে পারে না। গার্লফ্রেণ্ডের সাথে দেখা করার উদ্দেশ্য হলে আরও ভাল জামা-কাপড় পরে আসত, জুতোও পালিশ করা থাকত।

কে কোন্ দেশের, কোন্ জাতের মানুষ, তাও বের করার চেষ্টা করি আমি। ধরুন, লাঞ্চ করতে ঢুকলাম কোন ব্যস্ত রেস্টুরেন্টে, করি কী, একটা টেবিলে গিয়ে

চুপচাপ বসে থাকি। খাবার আসতে দেরি হলেও বিরক্ত হই না। ঘাড় ঘুরিয়ে মানুষজন দেখি। ভাবি, ওই লোকটা কি জার্মান কিংবা ওই মেয়েটা ইটালিয়ান, নাকি স্প্যানিশ? দেয়ালের ধারের লোকটা নির্ঘাত দক্ষিণ চিনের। অবশ্য সহজে চেনা যায় আমেরিকানদের।

ওদের চুলের কাটিং কম-বেশি সবার প্রায় একই রকম, টাই পরে সবসময় উজ্জ্বল রঙের, আর দেখবেন আমেরিকানরা সারাক্ষণ চুইংগাম চিবুচ্ছে। ওরা কী যে মজা পায় এই জিনিসটাতে বুঝি না। আমার বিশ্রী লাগে।

তো এভাবে মানুষজন দেখি, নানা চিন্তা করি। আর মাঝে মাঝে ভাবি, যদি গল্পে পড়া গোয়েন্দাদের মত আমিও হতে পারতাম।

আমার নামটা আপনারা শুনেছেন, আমার বিচিত্র শখ সম্পর্কেও এইমাত্র জেনে গেলেন। এখন আমার পেশার কথা বলি। আমি একজন জুয়েলার, আরও পরিষ্কার ভাবে বলতে গেলে জুয়েলারের সহকারী আমি। তবে হেঁজিপেঁজি কোন গহনার দোকানে কাজ করি না আমি। চাকরি করি রেগনিয়ারে। এটার নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন? রেগনিয়ারের গহনা পৃথিবীবিখ্যাত। আমরা যে ধরনের অ্যান্টিক জুয়েলারি বিক্রি করি তা কেনার সামর্থ্য রাখেন কেবল ধনকুবেররা। আমাদের প্রধান খদ্দের হলেন কোটিপতি তেল-ব্যবসায়ী, ফিল্ম-তারকা বা ফুটবল মাঠের সুপারস্টার পর্যায়ের মানুষজন। তিনশো বছরের নীচের পুরানো কোন গহনা বিক্রি করি না আমরা। কোন-কোনটির রয়েছে রোমান্টিক ইতিহাস। কিছু-কিছু জুয়েলারি আছে যার মালিক এক সময় ছিলেন কোন রাজকুমার বা রাজকুমারী।

বিশ্বখ্যাত হলেও আমাদের দোকানটা ছোট, পুরানো ফ্যাশনের। ভেতরটা প্রায় অন্ধকার। অনেকটা চার্চের মত। ইচ্ছে করেই আধুনিক স্টাইলে আমরা দোকানের ডিজাইন করিনি। ঢুকেই বাম দিকে লম্বা কাউন্টার। এখানে ধনী খদ্দেরদের মূল্যবান গহনা দেখাই আমরা। কাউন্টারের পেছনে আরেকটা ছোট কাউন্টার। ওখানে দোকানের আরেক সহকারী, মিস সাসকাইণ্ড কাজ করে। দোকানের পেছন দিকে ছোট একটা অফিস আছে। আমাদের মালিক, মি. রেগনিয়ার বেশির ভাগ সময় ওখানেই বসেন। ডিউক পদবির নীচে কেউ এলে তিনি দেখা করেন না। বেশির ভাগ জুয়েলারি সিন্দুকে তালা মারা, অল্প কিছু গহনা ডিসপ্লের জন্যে দোকানের জানালার সামনে রাখি। ওটা লোহার গরাদ দিয়ে ঘেরা।

প্রতিদিন সকালে আমার কাজ হলো কিছু জুয়েলারি জানালার সামনে সাজিয়ে রাখা। রাতে গহনাগুলোর জায়গা হয় সিন্দুকে। সেদিনও যথারীতি ডিসপ্লেতে গহনা রাখছি, হঠাৎ নজর চলে গেল এক তরুণীর দিকে। সে আমাদের দোকানের বিপরীত দিকে, রাস্তার ওপারে দাঁড়ানো। স্থিরদৃষ্টিতে আমাদের পাশের দোকানের দিকে তাকিয়ে আছে। মিনিট বিশেক লাগল ডিসপ্লেতে গহনা রাখতে, মেয়েটা পুরো সময়টা চেয়েই রইল এদিকে। পাশের দোকানটা এক আণ্ডারটেকারের। সে

কফিন, কাফনের কাপড় ইত্যাদি বিক্রি করে। মেয়েটা বোধহয় ওই দোকানের ডিসপ্লেতে সাজানো কাফনের কাপড়, শবাধার ইত্যাদি দেখছে। ডিসপ্লেতে সমাধির ছবিও আছে। কিন্তু ওসব জিনিস এত মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করার কারণ বুঝতে পারলাম না। মেয়েটার কেউ মারা গেছে? হয়তো। কিন্তু কালো পোশাক পরে নেই মেয়েটা, চেহারায় শোকের চিহ্নও দেখা যাচ্ছে না। বরং তার পরনে ক্যাটকেটে হলুদ রঙের কোট, পায়ে হলুদ স্যাণ্ডেল। মাথায় হ্যাট নেই, কাঁধ ছোঁয়া চুলের রঙ হলুদ, অবহেলায় ছড়িয়ে রয়েছে। উদাসীন মনে হলো মেয়েটাকে, চিত্রশিল্পীরা যেমন হয়ে থাকে। তবে চিত্রশিল্পী হলেও খুব একটা ভাল অবস্থায় নেই মেয়েটা দেখেই বোঝা যায়। দরিদ্র, হতক্লিষ্ট চেহারা।

ডিসপ্লেতে গহনা সাজানোর কাজ শেষ, মেয়েটাকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখছি, এমন সময় এক লোক ঢুকল দোকানে। এক নজরেই বুঝে ফেললাম লোকটা আমেরিকান—চুইংগাম চিবানো আমেরিকান। লম্বা, সুগঠিত শরীর, মদ খাওয়া লাল মুখ। পরনে কালচে ধূসর কোট, টাইটা বহু-রঙা। বয়স মধ্য পঁয়ত্রিশ চলছে, অনুমান করলাম।

'সুপ্রভাত, স্যর,' বললাম আমি। 'আপনাকে কি সাহায্য করতে পারি?

'পারেন,' চুইংগামটা মুখের এক পাশে ঠেলে দিল সে, স্পষ্ট ইয়াংকি উচ্চারণে বলল, 'আমাকে কিছু আংটি দেখান।'

'অবশ্যই, স্যর। কী ধরনের আংটি দেখতে চাইছেন?'

'দেখান ভাল কিছু।'

সেফ খুলে আংটির ট্রেটা বের করে রাখলাম লোকটার সামনে। সে দু'তিনটে আংটি নাড়াচাড়া করে দাম জানতে চাইল। লক্ষ করলাম লোকটা বাঁ-হাতি। বোঝা গেল আংটি সম্পর্কে তার ধারণা একেবারেই সীমিত। কারণ, উল্টোপাল্টা দাম বলছিল সে।

ট্রের ভেতর খুব সুন্দর একটা আংটি ছিল। হীরের চারপাশে রুবি বসানো, ফুলের মত। তিনশো বছরের পুরানো আংটি ওটা। জিনিসটার মালিক ছিল এক রাজপরিবার। মি. রেগনিয়ার খুবই উচ্চমূল্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন আংটিটার। কারণ, এটা বিক্রি করার তেমন ইচ্ছে নেই তাঁর। কিছু-কিছু গহনা আছে যেগুলোকে তিনি সন্তানের মত আগলে রাখেন। আমেরিকানটা ওই ফুলের মত আংটিটাকেই পছন্দ করে বসল। দাম শুনে আপত্তি জানাল। বলল খুব বেশি দাম। আরও কিছু আংটি দেখতে চাইল সে। দেখালাম। পছন্দ হলো না। সেফের ভেতর চার নম্বর ট্রের দিকে নজর গেল তার।

'ওই ট্রেটা একটু দেখান,' বলল সে। ঘুরে দাঁড়ালাম আমি সেফ থেকে ট্রে বের করতে, প্রায় সাথে সাথে ফিরেও এলাম কাউন্টারে। ঠিক তখন দেখলাম রুবি বসানো হীরের আংটিটা প্রথম ট্রে থেকে অদৃশ্য। ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। ইশারা করলাম মিস সাসকাইওকে। সে আমার পাশে এসে দাঁড়াল। আমেরিকানটাকে বললাম, 'ফ্লাওয়ার রিংটাই বোধহয় আপনার পছন্দ হয়েছে, স্যর। আংটিটা দিন।

একটা সুন্দর বাক্সে ভরে ওটা আপনাকে দিই।' হাত বাড়ালাম আমি।

'এখনও কোন আংটি পছন্দ করে উঠতে পারিনি আমি,' বলল আমেরিকান। 'আসলে পছন্দ করা না করা আমার ওপর নির্ভর করে না। দু'একটা আংটি দেখেছি। বুঝতে চেষ্টা করেছি আমার স্ত্রীর পছন্দ হবে কি না। সে নিজেই আসবে আংটি দেখতে।'

'তা হলে ফ্লাওয়ার রিং! কোথায় গেল ওটা?' কর্কশ গলায় জানতে চাইলাম আমি। ঘুরে দাঁড়ালাম মিস সাসকাইণ্ডের দিকে। 'তুমি একটু মি. রেগনিয়ারকে এখানে আসতে বলবে?'

কাউন্টার থেকে বেরিয়ে এলাম আমি। খুঁজতে শুরু করলাম আংটি। আমেরিকানটাও যোগ দিল আমার সাথে। খানিক পর মি. রেগনিয়ার এবং মিস সাসকাইণ্ডও আংটি খোঁজার কাজে নেমে পড়লেন। মি. রেগনিয়ারের চেহারা থমথম করছে। তবে চুপ হয়ে রইলেন তিনি। মিস সাসকাইণ্ড বলল, 'ওনার ট্রাউজারের ভাঁজটা একবার দেখা দরকার।'

অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ। ট্রাউজারের পায়ের কাছের ভাঁজে আংটির মত ছোট জিনিস লুকিয়ে রাখা খুব সহজ। কিন্তু আমেরিকানটা খুব অপমান বোধ করল তাকে সার্চ করার কথা শুনে। রাগে লাল মুখ আরও লাল হয়ে গেল, চুইংগাম চিবানোও বন্ধ হয়ে গেল। তবে লোকটার ট্রাউজারের ভাঁজে কিছুই পেলাম না।

হেসে উঠল আমেরিকান। 'আপনারা কি ভেবেছেন আমি আংটি চুরি করে ট্রাউজারের ফোল্ডে রেখেছি?'

'না, স্যর, না। অবশ্যই না,' চট করে বললেন মি. রেগনিয়ার। 'আপনাকে কেন সন্দেহ করব? তবে ইনশিওরেন্স কোম্পানিতে যখন ব্যাপারটা রিপোর্ট করব তখন ওরা জানতে চাইবে খদ্দেরকে ঠিকঠাকমত সার্চ করা হয়েছে কি না। যদি কিছু মনে না করেন অনুগ্রহ করে একবার আমার অফিসে আসুন। আমি—'

'কোন অসুবিধে নেই,' হাসি হাসি মুখ করে বলল আমেরিকান। 'ইচ্ছে করলে আমার আগাপাছতলা সার্চ করে দেখতে পারেন।' সে মি. রেগনিয়ারের সাথে ঢুকে গেল তাঁর অফিসে। কিন্তু তার কাছে আংটির হদিশ মিলল না।

ওদিকে আমি আর মিস সাসকাইণ্ড পাগলের মত আংটি খুঁজে বেড়াচ্ছি। কিন্তু পাচ্ছি না। আমি নিশ্চিত আমেরিকানটাই আংটি চুরি করেছে। কিন্তু কীভাবে? আর চুরি করে জিনিসটা রেখেছে কোথায়? বড়ই রহস্যময় ব্যাপার।

আংটি খুঁজে পাবার ব্যর্থ চেষ্টায় আমরা গলদঘর্ম, এমন সময় এক খদ্দের এল দোকানে। এ সেই মেয়ে যে দীর্ঘক্ষণ ধরে আণ্ডারটেকারের দোকানের দিকে তাকিয়ে ছিল।

মেয়েটার হাতব্যাগটা দামি। তবে পুরানো এবং জীর্ণ। তার কাপড় চোপড়েরও একই দশা। বোঝা যায় এক সময় মেয়েটার পয়সা ছিল, এখন গরিব হয়ে গেছে। কিছু কিনতে আসেনি সে, এসেছে বিক্রি করতে।

কাউন্টারের ওপর হাতব্যাগ রাখল মেয়েটা, কাগজের ছোট একটা প্যাকেট বের করল, ওটা রাখল ব্যাগের পাশে। লক্ষ করলাম বাঁ হাতে কাজটা করল সে। তার আঙুলগুলো খাট, নখে ময়লা।

প্যাকেট খুলে দেখলাম ভেতরে সস্তা একটা গহনা। সোনার কাজ করা ব্রোচ, তাতে ঝুটো নীলকান্তমণি। দাম হবে বড়জোর ত্রিশ শিলিং।

'এ জিনিসটা মেরামত করে দিতে পারবেন?' ব্রোচের ভাঙা পিন দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল মেয়েটা।

'দুঃখিত, ম্যাডাম,' বললাম আমি। 'রেগনিয়ার মেরামতের কাজ করে না।'

'ঠিক আছে,' বলল সে। তারপর, যেন হঠাৎ করেই তার হাতটা লেগে গেল কাগজের প্যাকেটে। ওটা কাউন্টারের এ ধারে, আমার পায়ের কাছে পড়ে গেল। আমি কেন 'হঠাৎ করেই' কথাটা বলেছি, কারণ ওটা হঠাৎ ঘটেনি। ইচ্ছে করে ঘটানো হয়েছিল। ওটা ছিল ধূর্ত একটা কৌশল।

ব্যাপারটা ধরে ফেললাম নিচু হয়ে প্যাকেটটা তোলার সময়। বিদ্যুৎচমকের মত একটু আগের সমস্ত ঘটনা মনে পড়ে গেল আমার। বুঝতে পারলাম ফ্লাওয়ার রিংটার ভাগ্যে কী ঘটেছে। দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে নিতে আর সমস্যা হলো না।

প্যাকেটটার ভেতর ব্রোচ মুড়ে ওটা ফেরত দিলাম মেয়েটাকে। সে ডান হাতে প্যাকেটটা তুলে হাতব্যাগে ঢোকাল, ঘুরে দাঁড়াল চলে যাবার জন্যে।

'এক মিনিট, ম্যাডাম,' ডাক দিলাম আমি।

আমার গলা শুনতে পেলেও ভান করল শোনেনি। মেয়েটা পা বাড়াল দরজার দিকে।

'মাফ করবেন,' পেছন থেকে বললাম আমি। 'যদি না দাঁড়ান অ্যালার্ম টিপে দেব আমি। বন্ধ হয়ে যাবে দরজা।'

দাঁড়িয়ে পড়ল মেয়েটা তবে ফিরে চাইল না।

মিস সাসকাইণ্ড তার কাউন্টারের পেছনে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আমি মেয়েটার কাছে গেলাম। 'ম্যাডাম,' বললাম আমি। 'আমরা চাই না এখানে কোন অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হোক। অনুগ্রহ করে বাঁ পকেটে রাখা আংটিটা ফেরত দিন। না দিলে মিস সাসকাইণ্ড অ্যালার্ম টিপে দেবেন।'

মেয়েটার মুখ মড়ার মত সাদা হয়ে গেল, ভীষণ ভয় পেয়েছে। ওর জন্যে দুঃখ হলো আমার। একটাও কথা না বলে বাঁ পকেটে হাত ঢোকাল সে, বের করে আনল আংটি। আমার হাতে ওটা দিয়েই দৌড় দিল সে, যেন আগুন লেগেছে দোকানে।

মেয়েটা চলে গেছে, মি. রেগনিয়ার আমেরিকানটাকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন দোকান থেকে। লোকটার মুখে তৃপ্তির চওড়া হাসি। তবে হাসছেন না মি. রেগনিয়ার। কাগজের মত সাদা মুখ। খুব পছন্দের জিনিস ছিল তাঁর ফ্লাওয়ার রিংটা। দারুণ আঘাত পেয়েছেন ওটা হারিয়ে। কথা বলার সময় কেঁপে গেল

গলা, 'আমি দুঃখিত, স্যর। আশা করি আমার দিকটা বুঝতে পারবেন এবং আমাকে ক্ষমা করে দেবেন।'

ঠিক সেই সময় আমি মি. রেগনিয়ারকে আংটিটা দেখালাম। বিস্ময়, আনন্দ এবং কৃতজ্ঞতায় ঝলমল করে উঠল তাঁর মুখ। আর আংটিটা দেখামাত্র বন্দুকের বুলেট বেরুবার মত দোকান থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল আমেরিকান।

'কীভাবে...কী করে আংটি পেলে তুমি?'

ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন মি. রেগনিয়ার।

'শুনুন তা হলে,' শুরু করলাম আমি। 'আমেরিকানটাকে দেখেই আমার খটকা লেগেছিল। ও ধরনের খদ্দের খুব একটা আসে না আমাদের দোকানে। তা ছাড়া লোকটার কথা শুনেই বুঝতে পারছিলাম জুয়েলারি সম্পর্কে তার ধারণা স্পষ্ট নয়। রেগনিয়ারের খদ্দেররা অ্যান্টিক জুয়েলারি সম্পর্কে ভালভাবে খোঁজ-খবর নিয়ে তারপর আমাদের দোকানে আসে। কিন্তু এই লোকটার আগমনের কারণ কী? প্রশ্ন করলাম নিজেকে।'

'ঠিক বলেছ,' বললেন মি. রেগনিয়ার। 'অমন ভাবাটাই স্বাভাবিক। চালিয়ে যাও, উইলিয়াম।'

'তারপর,' বলে চললাম আমি, 'ওই তরুণী মেয়েটা এল। তাকে অনেকক্ষণ রাস্তার ওপার থেকে আমাদের পাশের দোকানের ডিসপ্লের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখেছি।'

'আণ্ডারটেকারের দোকান?' জিজ্ঞেস করলেন রেগনিয়ার। 'অদ্ভুত তো!'

'আমারও তাই মনে হয়েছিল। অবাক হলাম ভেবে মেয়েটা কেন সস্তা একটা ব্রোচ মেরামতের জন্যে আমাদের দোকানে এল। সবাই জানে রেগনিয়ার সস্তা কোন জিনিস কেনা-বেচা করে না আর এখানে সস্তা জুয়েলারি মেরামতের প্রশ্নই নেই।'

'অবশ্যই নেই,' বললেন মি. রেগনিয়ার। 'তারপর?'

'মেয়েটা বাঁ-হাতি নয়, তারপরও সে বাঁ দিয়ে ব্যাগ খুলে প্যাকেট বের করেছে। আর বাঁ হাতটা রেখেছে ঠিক সেখানে যেখানে বাঁ-হাতি আমেরিকানটা দাঁড়িয়ে ছিল। সে-ও ওখানে বাঁ হাত রেখে ট্রের আংটি দেখছিল। এর পরপরই আমি দেখি ফ্লাওয়ার রিংটা ট্রেতে নেই।'

'রিংটা নিয়ে সে কী করেছিল?' জিজ্ঞেস করলেন মি. রেগনিয়ার।

'ওখানেই তো আসল মজা,' বললাম আমি। 'কাগজের প্যাকেটটা তোলার সময় হঠাৎ সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যায় আমার কাছে। আমেরিকানটাকে সার্চ করার সময় সে খুব রেগে গিয়েছিল। লক্ষ করেছি সে তখন চুইংগাম চিবুচ্ছিল না। ভেবেছিলাম রাগের চোটে চুইংগাম চিবানো বন্ধ হয়ে গেছে। আসলে তা নয়। আমি যখন তার জন্যে চতুর্থ ট্রেটা নিয়ে আসার জন্যে ঘুরে দাঁড়িয়েছি, সে চট করে আংটিটা মুখে পুরে দিয়েছে। চুইংগামের সাথে আটকে ফেলেছিল আংটি। আংটিসুদ্ধ চুইংগাম তো গিলে ফেলা যায় না। আমাদের দোকানে ওয়েস্ট

পেপার বাস্কেটও নেই যে ওটা তার মধ্যে ফেলে দেবে। আমি লক্ষ করেছি কাউন্টার থেকে এক চুল নড়েনি সে। তা হলে আংটিটা কোথায় রেখেছে? কাউন্টারের নীচে ছাড়া কোথায় রাখবে? সে কাউন্টারের নীচে গামসুদ্ধ আংটিটা আটকে রেখে দিয়েছে। জানত মেয়েটা এসে ওটা নিয়ে যাবে। আমি নিশ্চিত, মেয়েটা ওর ভাড়া করা। দু'জনে আংটি চুরির পরামর্শ করেই দোকানে ঢুকেছিল। সে আণ্ডারটেকারের দোকান দেখার ভান করে আসলে আমাদের ওপর নজর রাখছিল। দোকানে ঢুকে আমেরিকানটা কাউন্টারে যেখানে দাঁড়িয়েছিল সে-ও সেখানে দাঁড়িয়েছে। তারপর ইচ্ছে করে কাগজের প্যাকেটটা ফেলে দিয়েছে কাউন্টারের নীচে যাতে আমি উবু হয়ে ওটা তুলতে গেলেই আংটিটা হাপিশ করতে পারে। ঠিক তাই করেছিল সে। কিন্তু সে ঘুরে দাঁড়াবার সময় আমি গামের চিহ্ন দেখে ফেলি কাউন্টারের গায়ে। তারপর দুইয়ে দুইয়ে চার মেলাতে আর কষ্ট হয়নি। ওই দেখুন, কাউন্টারের গায়ে এখনও চুইংগামের দাগ রয়ে গেছে।'

মি. রেগনিয়ার দেখলেন। দেখল মিস সাসকাইণ্ডও। আমাদের দোকানে চুরির ঘটনা এই প্রথম। মি. রেগনিয়ার স্বভাবতই রেগে গেলেন। তবে আমাকে ধন্যবাদ জানাতে ভুললেন না। আর মিস সাসকাইণ্ড টাকরায় জিভ বাধিয়ে 'চুক চুক' শব্দ করল। কোন ব্যাপারে আপসেট হয়ে পড়লে অমন করতে দেখেছি ওকে আগেও।

মূলঃ নিকোলাস বেন্টলি

পূর্ণিমার রাতে

পরিচয় না জানা পর্যন্ত কেউ বিশ্বাস করতে চায় না মালা এবং মিনি মা-মেয়ে; দেখলে মনে হয় দুই বোন, মিনি তার মায়ের চেয়ে সামান্য লম্বা। লোকে বলে, 'মালা, তোমার মেয়েটি খুব সুন্দরী।' তারা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে মেয়েটির দিকে। মিনি যেন মুক্তো, সবসময় ঝলমল করছে। ও যেমন রূপবতী তেমনই আচরণে সংযত।

মেয়ের দিকে তাকালে মালার মনে হয় নিজেকেই দেখছে। তরুণী বয়সে মেয়ের মতই অসম্ভব রূপবতী ছিল সে। তবে মালার বয়স এমন কিছু বেশি নয়। এখনও কেউ কেউ আছে যে মালার জন্য পাতালে যেতেও দ্বিধা করবে না।

মাঝে মাঝে মালা ভাবে এই লোকটির কথা তার এমন মনে পড়ে কেন? লোকটা নিশ্চয় মুক্তো ব্যবসায়ী, নইলে তার কথা ভাবলেই মালার চোখ দিয়ে মুক্তো ঝরে কেন? মেয়ে বড় হয়েছে; তার এখন পরপুরুষের চিন্তা করা মোটেই ঠিক হচ্ছে না। এতগুলো দিন তো সে এসব থেকে দূরেই ছিল; মন কেন আবার উচাটন হতে লাগল? নিজেকে সংযত করতেই হবে। সামনের হপ্তায় মেয়ের বিয়ে; তার এখন এসব খারাপ চিন্তা করা মোটেই উচিত হচ্ছে না–মোটেই না।

'প্রিয়তমা আমার,' গতকালই লোকটার চিঠি পেয়েছে মালা। 'ভুলো না আমায়।'

তবে সে যতবার গাঁয়ে এসেছে প্রতিবারই তাকে নিরুৎসাহিত করেছে মালা। দরজা বন্ধ করে রেখেছে, বুজে থেকেছে চোখ। কিন্তু লোকটা নাছোড়বান্দা। মালা তার জীবন; মালাকে ছাড়া তার শান্তি নেই। বহুদিন ধরে মালার জন্য অপেক্ষা করছে সে, আকুতি জানিয়ে আসছে, প্রেম আর আবেগের জ্বালা সইছে।

মালা জানে আজ রাতে লোকটা আসবে। প্রতি পূর্ণিমা রাতে সে আসে। মালার দরজায় আঙুলের গাঁট দিয়ে ঠকঠক শব্দ করে। আজ পূর্ণিমা রাত। আজ রাতটা হবে ঠাণ্ডা, কুয়াশায় ঢাকা এবং স্থির। মালা কখনও লোকটার জন্য দরজা খুলে দেয়নি। আজ রাতে কি খুলবে? কয়েক বছর আগের ঠাণ্ডা এক পূর্ণিমা রাতের কথা মনে পড়ে যায় মালার। ও নাচছিল আম বাগানে। তার দোপাট্টা উড়ে চলে গিয়েছিল লোকটার হাতে। সে খালি মাথায়, মুখে চাঁদের আলো মেখে লোকটার কাছে গিয়েছিল। তার কাঁধে দোপাট্টা জড়িয়ে দিয়েছিল সে– ঠিক এখন যেভাবে ওটা জড়িয়ে আছে। শিরশিরে একটা ঢেউ ওঠে মালার শিরদাঁড়ায়।

মিনি রাস্তা ধরে হেঁটে আসছে। দেবদারুর মত লম্বা, সুঠাম তনু। এত ফর্সা ত্বক, কেউ হাত দিলে যেন দাগ পড়ে যাবে। ওর মাথায় দোপাট্টা জড়ানো, চোখ মাটিতে রেখে হাঁটছে মিনি।

মন্দির থেকে ফিরছে মেয়েটি। সবার মঙ্গল চেয়ে দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করেছে। মাকেও বলেছে প্রার্থনা করতে। মিনির বিশ্বাস, প্রার্থনা করলে ঈশ্বর তা মঞ্জুর করেন। মালা হেসেছে। তার প্রার্থনা মঞ্জুর করা হলে কী চাইবে সে?

'বাবা এখনও ফিরল না!' অনুযোগ মিনির কণ্ঠে।

'আজ তার ফেরার কথাও না। কাল যদি বাড়ি আসতে পারে তো ভালই। তাকে অনেক কিছু কিনতে হবে। বিয়ে আর লোক খাওয়ানোয় অনেক হ্যাপা। কিছু যেন কম পড়ে না যায় সেদিকে লক্ষ রাখতে হয়,' ব্যাখ্যা করল মালা।

রূপাখচিত দোপাট্টা খুলে মা'র কাঁধে রাখল মিনি। মা'র সাধারণ দোপাট্টাটি নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল।

পূর্ণিমা চাঁদের আলো গাছের ডালের ফাঁক দিয়ে চুইয়ে আসছে, থইথই করছে মালার মুখ। পূর্ণিমা চাঁদ কেমন নেশা ধরায় মালার বুকে, মনে হয় ও যেন মাতাল হয়ে গেছে। আর চার দিন বাদে মহিলারা এসে ওর উঠোনে বসে বিয়ের গীত গাইবে। তারা তার মেয়ের হাতের তালুতে আর পায়ে মাখিয়ে দেবে মেহেদী। পরিয়ে দেবে বিয়ের পোশাক, গহনায় সাজিয়ে দেবে গা। লাল টকটকে সিল্কে কেমন দেখাবে তার মেয়েকে? বর আসবে ঘোড়ায় চড়ে, মেয়েকে নিয়ে যাবে নিজের বাড়িতে। প্রেম করবে তার সঙ্গে। চুমু খাবে মেহেদী পরা হাত আর পায়ে।

খুব বেশি দিন হয়নি এসব ঘটেছে মালার জীবনে। কিন্তু মিনির বাবা কখনও তার পায়ে চুমু খায়নি কিংবা কোনদিন মেহেদী পরা হাতের তালু নিজের চোখের ওপর চেপে ধরেনি। সে সবসময় ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফেরে। খেয়ে বিছানায় শুয়েই নাক ডাকতে শুরু করে। মাঝে মাঝে পুত্র সন্তানের কামনায় ব্যাকুল হয়ে উঠলে মাঝরাতে মালার ওপর চড়াও হয়। আর এত দ্রুত ব্যাপারটা ঘটে যায় যে অতৃপ্ত মালাকে শান্ত হতে রাতের আকাশের তারা গুণতে হয়। মাঝরাতের এই কাণ্ডে প্রতি বছর একটি করে মেয়ে উপহার দিয়েছে মালা। অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে তারা ভূমিষ্ঠ হয়েছে, অনাদরে বিদায় নিয়েছে। শুধু টিকে গেছে মিনি। অবিকল মায়ের চেহারা পেয়েছে সে। মায়ের মত মেয়ের বড় বড় হরিণী চোখ, তার লম্বা, কালো চুল সরু কোমর ছাপিয়ে যায়। মায়ের মতই ভরাট একজোড়া বক্ষের অধিকারিণী সে।

মিনি রান্নাঘরের বাসন কোসন ধুয়ে রাখল, উঠোনের দরজা বন্ধ করে নিজের ঘরে ঢুকল ঘুমাতে। একা হয়ে গেল মালা।

রাত অনেক হয়েছে। চাঁদ উঠে এসেছে মাঝ আকাশে। এমন ঝলমল করছে যেন সমস্ত আলো ঢেলে দিয়েছে মালাদের বাড়ির উঠোনে। শীত পড়েছে। তবে তেমন ঠাণ্ডা লাগছে না মালার। নিজেকে প্রশ্ন করল, উঠোনে কেন একা বসে আছে সে? কাউকে কি আশা করছে? মিনি বিছানায় গেছে, তার বাপ শহরে। এমন চাঁদনী রাতে তার বাড়ির বাইরে থাকার দরকার কী? পূর্ণিমা রাতে মালা নিজেকে ঘরের মধ্যে আটকে রাখে, যাতে প্রলোভনের কবলে পড়ে না যায়। কিন্তু

আজ রাতে সে মেয়ের রুপোখচিত দোপাট্টা জড়িয়ে রেখেছে মাথায়। রুপালি চাঁদের আলোয় দোপাট্টার রুপোর কাজগুলো ঝকমক করছে, যেন আকাশের তারারা আশ্রয় নিয়েছে মালার মাথায়। ঝিলমিল করছে তার চোখের পাতায়, মুখে এবং কাঁধে। একটা রাতজাগা পাখি ডেকে উঠল আম বাগানে–অক্, অক্ অক্।

মেয়ের কথা ভাবছে মালা। তার মেয়ের আর এক হপ্তার মধ্যে বিয়ে হয়ে যাবে। তারপর সে একা হয়ে যাবে–এ বাড়ির প্রকাণ্ড উঠোনে একদম একা। শিরশির করে উঠল গা। খালি উঠোন তাকে আতঙ্কিত করে তোলে। তবে একা থাকার অভ্যাস করতে হবে তাকে। তার স্বামী টাকা রোজগারের ধান্ধায় খুব বেশি ব্যস্ত। সে লোককে সুদে টাকা ধার দেয়। অনেক রাতে বাড়ি ফেরে শুধু খাটিয়ায় শরীরটাকে ফেলে দেয়ার জন্য। সে টাকার পেছনে এত দৌড়াচ্ছে কেন একদিন জিজ্ঞেস করেছিল মালা। জবাব পায়নি।

ঘরে গেল মালা। মেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। মড়ার মত ঘুমাচ্ছে। লাল চুড়িগুলো খুলে রেখেছে। বালিশের পাশে। বোকা মেয়ে! ঘুমের মধ্যে একবার পাশ ফিরলেই মটমট করে ভেঙে যাবে কাঁচের চুড়িগুলো। মালা ওগুলো তুলে নিয়ে আলমারির ওপর রাখল। তারপর কী মনে করে নিজেই পরে ফেলল। এক হাতে ছ'টা, অন্য হাতে ছ'টা। অন্ধকারেও ঝিলিক দিচ্ছে চুড়িগুলো। চুড়িঅলার কাছ থেকে নতুন কিনেছে মিনি।

মালা চাঁদের আলোয় ভেসে যাওয়া উঠোনে ফিরে এল, মাথায় জড়ানো মেয়ের ঝলমলে দোপাট্টা, দু'হাতে উজ্জ্বল লাল রঙের চুড়ির রিনিঠিনি। নিজেকে নববধূর মত লাগছে–উষ্ণ, লাস্যময়ী। শিরায় গরম রক্ত বইতে লাগল মালার।

দরজায় মৃদু টোকার শব্দ হলো। এসেছে সে। সেই একই রকম টোকা–ভীরু, ইতস্তত ভঙ্গি। চিঠিতে লিখেছিল সে আসবে: 'ডিসেম্বরের পূর্ণিমা রাতে তোমার দরজায় টোকা দেব আমি। যদি মন চায় তো খোলা রেখো দরজা। আর মন না চাইলে খুলো না। কিন্তু আমি যেভাবে সবসময় করে আসছি, দরজায় টোকা দিয়েই যাব।'

টুক, টুক, টুক–খুব নরম, খুব মিষ্টি, আমন্ত্রণের আহ্বান জানানো টোকা। সে ছাড়া আর কে! পূর্ণিমা রাতের নিশাচর। হঠাৎ একখণ্ড কালো মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ল চাঁদ, আঁধারে ঢেকে দিল বিশ্ব চরাচর।

মালার পা ওকে টেনে নিয়ে চলল অন্ধকার উঠোন দিয়ে। কাঁপা হাতে দরজার খিল খুলল। পরমুহূর্তে বাঁধা পড়ল শক্ত হাতের আলিঙ্গনে। ঠোঁটে মিশে গেল ঠোঁট; দাঁত ঘষা খেল দাঁতে। গত বিশ বছর ধরে চেপে রাখা আবেগের বন্যার বিস্ফোরণ ঘটল, ভাসিয়ে নিয়ে গেল দু'জনকে।

মালা জানে না কীভাবে সে গাঁয়ের বাইরের বো গাছটার নীচে চলে এসেছে। মনে নেই কীভাবে বো গাছের পাশের মাঠে ওরা শুয়ে পড়েছে–জানে না কতক্ষণ ওরা সেখানে ছিল। ভোর বেলা গাঁয়ের পাশ দিয়ে যাওয়া রেলগাড়ির শব্দে সজাগ হয়ে উঠল ও। প্রেমিকের আলিঙ্গন থেকে ছাড়িয়ে নিল নিজেকে, মাথায় জড়াল

দোপাট্টা, তারপর দ্রুত পায়ে ফিরে চলল বাড়িতে।

হাত থেকে চুড়ি খুলে মেয়ের বালিশের পাশে রেখে দিল মালা। রুপোখচিত দোপাট্টায় আদর করে হাত বোলাল। নিজের দোপাট্টাটা নিয়ে শুয়ে পড়ল খাটিয়ায়। সাথে সাথে ঘুমিয়ে পড়ল। এমন তৃপ্তির ঘুম জীবনে ঘুমায়নি। যেন সারাজীবন না ঘুমিয়ে কেটেছে তার। যখন জাগল মালা, সূর্য উঠোনে রোদ ছড়াচ্ছে।

'তুমি একদম বাচ্চাদের মত ঘুমাচ্ছিলে!' ঠাট্টা করল মিনি।

মিনি ঘরদোর এবং উঠোন ঝাঁট দিয়ে রান্নাও করে ফেলেছে। স্নান সেরে নিয়েছে। এখন মন্দিরে যাবে। দোপাট্টায় জেসমিন ফুল বেঁধে নিয়েছে তার দেবতাকে উৎসর্গ করার জন্য।'

মিনি খাওয়ার পরে খাটিয়ায় শোয়া মালা অলসভঙ্গিতে আড়মোড়া ভাঙল। এখনও ঘুমের রেশ কাটেনি, স্বপ্নগুলো মাথার মধ্যে রয়ে গেছে।

মৃদু ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। উঠোনে রোদ। মালার কানায় কানায় ভরা এক বাটি দুধ খেতে খুব ইচ্ছে করছে। তাতে জেসমিন ফুলের কয়েকটি পাপড়ি ভাসবে। মাথা ঘোরা দূর করার মহৌষধ। মালার চোখ বুজে এল, খুলল, আবার বুজল।

'ও, মালা! মাগীটা গেল কই?' চেঁচিয়ে উঠল একটা কণ্ঠ। মুখে ঠাস করে যেন একটা চড় খেল মালা।

'এমন কথা জীবনেও শুনিনি, বাপু!' বলল আরেকটি কণ্ঠ।

'অথচ বিয়ের বাকি আর মোটে চার দিন!'

'আমার মেয়ে কী করেছে?' রাগে গরগর করতে করতে উঠে বসল মালা। 'তোমরা ওকে গাল দিচ্ছ কেন? সবাই জানে ও কত ভাল মেয়ে। বাছুরের মত নিষ্পাপ।'

খিকখিক হাসির শব্দ শোনা গেল। একজন মুখ বাঁকিয়ে বলল, 'তোমার নিষ্পাপ বাছুর কাল সারারাত গোবর ঘেঁটেছে।'

গা ঠাণ্ডা হয়ে এল মালার। শরীর থেকে যেন রক্ত শুষে নিল কেউ, ফেকাসে হয়ে গেল চেহারা।

লাজো, তার প্রতিবেশী বলল, 'অন্ধকারের মধ্যে মাগী পরপুরুষের সঙ্গে বেরিয়েছে, আমি প্রস্রাব করতে বাইরে যেতে দেখি দু'জনে মাঠের মধ্যে জড়াজড়ি করছে। আমি সারারাত দু'চোখের পাতা এক করতে পারিনি। আমাদের ঘরেও তো মেয়ে আছে, বাপু। তারা তো জীবনেও এভাবে বাবা-মা'র মুখে চুনকালি মাখাবে না।'

মালা পাথর হয়ে বসে রইল খাটিয়ায়। চেহারা দেখে মনে হলো না কানে কিছু ঢুকছে।

গাঁয়ের চৌকিদার লাজোর গল্পের যোগানদার হয়ে এল।

'মালা বৌদি,' ডাকল সে।

'কী, জুম্মা?' গভীর কুয়ো থেকে যেন ভেসে এল মালার কণ্ঠ।

'বৌদি, কাল রাতে যা দেখেছি তা সত্যি বড় লজ্জার। গাঁয়ের চৌকিদারী করতে করতে মাথার চুল পাকিয়ে ফেললাম, কিন্তু এমন নোংরা ঘটনা জীবনে দেখিনি। তোমার মেয়ে তো তার মুখে চুনকালি মাখাল। কাল রাতে বো গাছটার নীচে এক লোকের সঙ্গে দেখলাম তাকে। আমি ওদের কাছ থেকে বড় জোর হাত দশেক দূরে ছিলাম। দু'জনে মিলে সে কী জড়াজড়ি আর চুমোচুমি! নিজেদেরকে ছাড়া বাকি দুনিয়ার কথা ভুলে গিয়েছিল তারা। আমি তোমাদের বাড়ির দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম আর চার দিন পরে এ বাড়িতে বিয়ে হবে, কত আমোদ ফুর্তি হবে। এমন সময় উঠোনের দরজা খুলে বেরিয়ে আসে তোমার মেয়ে। আমি ভোর হওয়ার আগেই মাঠ থেকে ফিরেছি। তোমার মেয়ে ছিনালি শেষ করে কখন বাড়ি ফিরেছে জানি না। আমার মেয়ে হলে ওকে এতক্ষণে দু'টুকরো করে গাঙে ভাসিয়ে দিতাম।'

মালা বিস্ফারিত চোখে চৌকিদারের দিকে তাকিয়ে রইল, মুখে রা সরছে না।

জুম্মার পরে এল পাহারাদার রতন। রাগে ফেটে পড়ছে।

'কোথায় ছিনাল মাগী?' গাঁক গাঁক করতে লাগল সে।

'ছিনালি করার জন্য আর মাঠ ছিল না?' কথা বলার সময় লাফাতে লাগল সে। তার চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে ভিড় করে এল প্রতিবেশীরা। 'আমি কুয়োর ধারে গেছি, এমন সময় দেখি দোপাট্টা দিয়ে মুখ ঢেকে মাঠ থেকে বেরিয়ে আসছে সে। ভেবেছি প্রস্রাব করতে গেছে। একটু পর তার প্রেমিককেও দেখলাম ওই মাঠ দিয়ে বেরিয়ে যেতে। নিজের চোখে দেখেছি দু'জনকে।'

এমন সময় মিনিকে দেখা গেল ভিড় ঠেলে আসতে। তাকে নিয়ে যা আলোচনা হয়েছে সবই শুনেছে। তীক্ষ্ণ গলায় প্রতিবাদ করল সে, 'আপনি মিথ্যা বলছেন, কাকা!'

'আমাকে মিথ্যাবাদী বলিস এত সাহস তোর, ছুকরি? বেশ্যা কোথাকার! আমার মাঠে তুই না গেলে এই চুড়ি কোত্থেকে এল?' গায়ের চাদরের খুঁট খুলে ভাঙা লাল চুড়ি বের করে মিনির হাতের তালুতে ঠাস করে ফেলল সে। মিনি হাতে পরা চুড়ি গুণল। এগারোটা। চোখের সামনে বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগল দুনিয়া।

মহিলারা পরস্পর চোখাচোখি করল। তারা মিনিকে চুড়ি কিনতে দেখেছে। মোট বারোটি চুড়ি কিনেছিল মিনি। লাল চুড়িগুলোর প্রতি তার আকর্ষণ ছিল বেশি।

নারী-পুরুষের ফিসফিসানিতে ভরে উঠল উঠোন। মিনির হবু শ্বশুর এবং শাশুড়ি ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল। রাগের চোটে মালার সামনে বিয়ের উপহার সামগ্রী ফেলতে লাগল: জামাকাপড়, টাকা, আংটি। বরপক্ষকে এগুলো দেয়া হয়েছিল। আঁতকে উঠল জনতা। মহিলারা তাদের কান স্পর্শ করল, তরুণীরা দাঁতে নখ কাটতে লাগল। তাদের সমাজে বিয়ে ভেঙে যাওয়া মানে জীবনটাই বরবাদ হয়ে যাওয়া। মিনি যে কাণ্ড করেছে, সব কথা জানাজানি হওয়ার পর ওকে কেউ বিয়ে করবে না। এখন কী করবে সে? সবাই বলাবলি করল এটাই ঠিক

হয়েছে। ছিনালি মাগীর ঠিক সাজা হয়েছে।

লোকের কঠোর সমালোচনা আর গালি গালাজের আওয়াজ ছাপিয়ে ঝপাস করে একটা শব্দ শোনা গেল। এক মুহূর্তের জন্য অসাড় হয়ে গেল জনতা। তারপর কেউ একজন চিৎকার করে উঠল, 'কুয়ো!' কুয়োয় কী ঘটেছে ব্যাখ্যা করতে হলো না কাউকে। কী ঘটেছে বুঝতে পেরেছে সবাই।

মিনিকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। নম্র আর ভদ্র মিনি, যে জীবনে গলা চড়িয়ে কথা বলেনি কারও সঙ্গে, যে জেসমিন ফুলের মত পবিত্র আর খাঁটি, যে মিনি মানুষের মঙ্গলের জন্য দেবতার কাছে প্রার্থনা করতে কখনও ক্লান্তি বোধ করত না, সেই মিনির জন্য হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল সবাই, ছুটল কুয়োর দিকে। আর মালা আতঙ্কে জমে গিয়ে বসে রইল নিজের জায়গায়। তার উঠোনে কেউ নেই। খালি। তার উঠোন এত খালি কখনও লাগেনি—আর এই শূন্যতা কোনদিন পূরণ হবে না।

মূলঃ কার্তার সিং দুগাল

অন্ধ গলি

গতকালের ঘটনা কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারছে না ইন্দর। জীবনে কম দুঃখকষ্ট পায়নি সে, কিন্তু এ ঘটনা তাকে অপমানের সাগরে ঠেলে দিয়েছে। যত ভুলতে চেষ্টা করছে ততই মনের মধ্যে গেড়ে বসছে ওটা।

সিনেমা টিনেমায় তেমন যায় না ইন্দর, আজ রাতে একটি ছবি দেখবে ঠিক করল। হয়তো অশান্ত হৃদয় খানিকটা শান্ত হবে এতে। রাতে খাওয়া সেরে ছোট মেয়েটিকে বলল সে, 'নির্মল, তোর মাকে বলিস ফিরতে দেরি হবে আমার।' বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল ইন্দর। কানের মধ্যে এখনও দমাদম বাড়ি খাচ্ছে সুপারিনটেনডেন্টের কথাগুলো: 'ইন্দর, চাকরি করার ইচ্ছে থাকলে আরও সাবধানে কাজ করতে হবে। আমি তোমার মত অকম্মার ধাড়িকে কিন্তু রাখব না, বলে দিচ্ছি!'

'অকম্মার ধাড়ি!' 'অকম্মার ধাড়ি!' আমি কি সত্যি তাই? ভাবে ইন্দর।

মাত্র ক'দিন আগে কোম্পানির হিসাব-পত্তর অডিট হওয়ার পরে এই সুপারিনটেনডেন্টই ইন্দরের পিঠ চাপড়ে কত প্রশংসা করেছিলেন। আর গতকাল তিনি কী বললেন? ওহ্! কী অদ্ভুত এই লোকগুলো! এখন একটা কথা বলছে তো পরের মুহূর্তে পাল্টে ফেলছে সুর। মত বদলাতে তাদের একদণ্ড সময় লাগে না। আমার মত 'জী, হুজুর' টাইপের লোক, যে আট ঘণ্টা অফিস ডিউটির বদলে দশ ঘণ্টা কাজ করে, ডানে-বাঁয়ে না তাকিয়ে চাকরের মত প্রাণপণে খেটে চলেছে, তার প্রতিও এদের বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞতা নেই, ভাবছে ইন্দর। কোনওদিন বেতন বাড়ানোর কথা বলেনি সে, ঘরে অভুক্ত সন্তান রেখে, নিজে প্রায়ই না খেয়ে অফিস করছে ইন্দর। কিন্তু এই লোকগুলোর কাছ থেকে একটুও সহানুভূতি মেলে না।

ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে প্রেক্ষাগৃহে পৌঁছে গেল ইন্দর। আজ সোনালি পাড়ের শাড়ি আর রঙিন ব্লাউজ পরা সুন্দরীরা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারল না। নিজের ভাবনায় সম্পূর্ণ ডুবে রয়েছে ইন্দর।

প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ। পর্দায় চোখ থাকলেও মন ওখানে নেই ইন্দরের। দর্শক মনোযোগ দিয়ে ছবি দেখছে, একমাত্র ইন্দরের মনই বোধহয় পড়ে আছে অন্য কোথাও। রঙিন দৃশ্য, জনপ্রিয় গান, তরুণী নায়িকা, কিছুই তার মাঝে আবেগের সৃষ্টি করতে পারল না। নিজের ভাবনায় এমন নিমগ্ন সে, ছবি কখন শেষ হয়ে গেছে টেরও পেল না। সকল দর্শক চলে যাওয়ার পর যেন চমক ভাঙল তার। গভীর রাতে ক্লান্ত পা তাকে টেনে নিয়ে এল বাড়িতে। বুকটা আগের মতই ভার হয়ে আছে।

প্রদীপটা টিপ টিপ জ্বলছে। ওর স্ত্রী, অপেক্ষা করে করে ক্লান্ত, চেয়ারে বসে ঝিমুচ্ছে। চোখের পাতা ভারী হয়ে এলেও কান জোড়া সতর্ক। দরজা খোলার শব্দ পেলেই উঠে পড়বে। আলুথালু কালো চুল বউয়ের সৌন্দর্য এতটুকু ম্লান করতে পারেনি। জানালা দিয়ে কিছুক্ষণ স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকল ইন্দর। শকুন্তলা সেই

আদর্শ স্ত্রীদের একজন যে স্বামী অন্তঃপ্রাণ, যে কোনও মূল্যে স্বামীকে সুখে রাখার প্রাণান্ত চেষ্টা চালিয়ে যায় সে। সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ শুনে ঝিমুনি কেটে গেল শকুন্তলার, দ্রুত এগোল দরজা খুলতে। ভিতরে ঢুকল ইন্দর, কোনও কথা না বলে শুয়ে পড়ল বিছানায়। কিন্তু ঘুম এল না।

গতকালের ঘটনার জন্য নিজেকে কোনওভাবেই দায়ী করে না ইন্দর। অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান মানুষও সকাল সাতটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা আটটা পর্যন্ত যদি প্রচণ্ড এই গরমে কাজ করে, ভুল হতে তার বাধ্য। আর ইন্দরের মত রোগা, শুকনো, প্যাঁকাটি ধরনের মানুষ, যার ভাগ্যে খুব কমই এক কাপ দুধ জোটে, যে মাখন খাওয়ার কথা চিন্তাই করতে পারে না, এমন গাধার খাটুনির পরে তার ভুল হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।

ইন্দর অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে কাজ করে। গতকাল সন্ধ্যায়, হিসাবে যোগ দেয়ার সময়, ৭ এর জায়গায় ভুল করে ৯ লিখে ফেলেছিল। এটা স্রেফ 'স্লিপ অভ দ্য পেন' বলা চলে। বিরাট কিছু ভুল নয়, পরদিন সকালেই ঠিক করা যেত, ডাবল-চেকিং-এর সময়। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সে সুযোগটা পায়নি ইন্দর। সুপারিনটেনডেন্ট ওই কাগজগুলোর জন্য ডেকে পাঠালেন এবং যথারীতি ভুলটা তাঁর চোখেও পড়ে গেল। ভুলটা ইন্দরের হত না, তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে হয়েছে। গত সন্ধ্যায় অসুস্থ ছেলেটার জন্য ওষুধ কিনে বাড়ি ফেরার তাড়া ছিল।

ইন্দর এসব কথা ভাবছে। ক্লান্ত, অবসন্ন সে। কিন্তু বুকের ভিতর একটা ঝড়ও উঠছে। যেন অগ্নিগিরি ফুঁসছে, বিস্ফোরণ ঘটবে। সুপারিনটেনডেন্ট ওই সামান্য ভুলটুকুর জন্য সবার সামনে এভাবে অপমান করলেন তাকে!

উথাল পাথাল মন নিয়ে বিছানায় শুয়ে থাকা গেল না। উঠে পড়ল ইন্দর। তারপর আবার শুয়ে পড়ল। আবার উঠল। বুকের ভিতর যন্ত্রণা হচ্ছে খুব। সুপারিনটেনডেন্টের কথাগুলো হুলের মত বিঁধে আছে গায়ে। মালিকপক্ষ সব সময়ই নিজেদের স্বার্থ বড় করে দেখে। লাখ লাখ টাকা কামাচ্ছে তারা ইন্দরের মত লোকজনকে ব্যবহার করে। অথচ ইন্দরদের প্রতি তাদের কোনও সহানুভূতি নেই। ইন্দরের বাচ্চাটা অসুস্থ জানার পরেও ওকে এক ঘণ্টা আগে ছুটি দেননি সুপারিনটেনডেন্ট। তাঁকে কি মানুষ বলা যায়? অবশ্যই না। লোকটা একটা মানুষখেকো। বাড়ির বাইরে কেউ ঠাণ্ডায় যখন থরথর করে কাঁপছে, সুপারিনটেনডেন্টের মত লোকেরা তখন গরম কাপড়ে শরীর মুড়ে গরম গরম খাবার আর পানীয় গিলছে। কী অমানবিক!

এসব কথা ভাবতে গিয়ে বুকের তোলপাড়টা বেড়ে গেল ইন্দরের, কাঁপতে লাগল রাগে।

এখনও পচে যায়নি সে, নিজেকে শোনাল ইন্দর, বিসর্জন দেয়নি আত্মসম্মান যে এই অনাচার মেনে নিতে হবে। মাংসপেশীতে এখনও তারুণ্যের শক্তি আছে।

প্রদীপের আলো নিভে যাওয়ার আগে দপ করে জ্বলে ওঠার মত ইন্দরের অপুষ্ট শরীর আর মনে যেন নতুন আত্মবিশ্বাসের বান ডাকল। এ অন্যায় সে কিছুতেই

মেনে নেবে না। প্রতিবাদ করতে হবে। কয়েক মুহূর্ত সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগল ইন্দর। অনাহার আর চাকরির বেতন কোন্‌টাকে বেছে নেবে সে? শেষে আত্মসম্মানের জয় হলো। না খেয়ে মরতে রাজি ইন্দর তবু অপমান সহ্য করে থাকবে না। হ্যাঁ, কালকেই সে চাকরি ছেড়ে দেবে।

সিদ্ধান্তটা নেয়ার পর আর বিছানায় শুয়ে থাকতে পারল না ইন্দর। এখুনি পদত্যাগপত্র লিখবে। অন্ধকারে দেশলাইর বাক্স হাতড়ে বেড়াল। দেশলাই দিয়ে প্রদীপ জ্বালাল। কিন্তু প্রদীপের শিখা দপদপ করে জ্বলেই নিভে গেল। তেল নেই! হতাশ হয়ে বিছানায় আবার শুয়ে পড়ল ইন্দর। পাশের ঘর থেকে ভেসে এল বাচ্চার খকখক কাশি। সাথে সাথে ওর চিন্তাধারা নতুন ধারায় প্রবাহিত হতে লাগল। একটু আগে নেয়া সিদ্ধান্ত নিয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। চাকরি ছেড়ে দিলে বাচ্চাটাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া হবে না? ওর স্ত্রী সংসার যুদ্ধে এমনিতেই ক্লান্ত, ঘরে টাকা না থাকলে সে দিশেহারা হয়ে পড়বে না? ইন্দর কি সেধে পিচ্ছিল পথে এগোচ্ছে না, যে রাস্তায় হড়কে গিয়ে একেবারে পাতালে ঢুকতে হবে? চাকরি থেকে পদত্যাগ করা আর নিজের মৃত্যু পরোয়ানা ঘোষণা একই কথা নয় কি? ঈশ্বর! ভাবল ইন্দর, কী ভুল একটা পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছিল সে। পরিবারের প্রতি তার একটা দায়িত্ব আছে, আর সেই দায়িত্বে সে অবহেলা করতে চেয়েছে। নিজে হয়তো না খেয়ে থাকা যায়, কিন্তু স্ত্রী-পুত্র-কন্যা? তারা কী দোষ করেছে? এই নিষ্ঠুর, উদাসীন সমাজে কেউ তাদেরকে এক মুঠো খাবার দিতে এগিয়ে আসবে না, খবরও নেবে না। না খেয়ে মরতে হবে তার পরিবারকে! ভাবতেই শিউরে উঠল ইন্দর।

'বাবা! বাবা! ওঠো! সকাল হয়ে গেছে। অফিসে যাবে না?' মেয়ে নির্মলের চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেল ইন্দরের। মেয়েটার গলা অবিকল তার মায়ের মত। ভোরের আলোয় কচি মুখটাকে দেখছে ইন্দর। কোঁকড়ানো কালো চুল গোল হয়ে আছে ফর্সা, ছোট্ট কপালের উপর। কী সুন্দর লাগছে দেখতে!

তবে মেয়ের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকার সুযোগ পেল না। হাতের তালু দিয়ে চোখ ঘষতে ঘষতে নেমে পড়ল বিছানা থেকে। অফিসের দেরি না হয়ে যায়, সেই ভয়ে ভীত। আয়নার সামনে দাঁড়াল ইন্দর। চেহারায় শুধু হতাশা আর না পাওয়ার বেদনার ছাপ, গত রাতের বিদ্রোহী চিন্তা চেতনার চিহ্নমাত্র নেই। 'তুমি পরিবারের কর্তা, ইন্দর,' মনে মনে বলল সে। 'সন্তান ও স্ত্রীর ভরণপোষণ করতে তুমি বাধ্য।' বুকের গভীরে হতাশার চিৎকার শুনল ইন্দর, কিন্তু চিৎকারটাকে গলা টিপে ধরল সে, গলা টিপে ধরল আত্মসম্মানবোধ ও অহঙ্কারের।

দ্রুত মুখ ধুয়ে নিল ইন্দর। জামাকাপড় পরল। কোনও মতে নাস্তা সারল। তারপর সাইকেলের ক্যারিয়ারে ফাইলপত্র বেঁধে দু'চাকার বাহনটাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সামনে লম্বা একটা দিন পড়ে আছে, আর মনের ভিতরে সেই দিনের দৈর্ঘ্য ক্রমে বেড়েই চলেছে। সামনে লম্বা একটা রাস্তা পড়ে আছে। অন্ধ একটা গলি। যেখান থেকে বেরুবার পথ নেই।

মূল: গুরমুখ সিং জিৎ

খিদে

নিশাত প্রেক্ষাগৃহে *'প্রেমিকের রক্ত'* রজত জয়ন্তী পার করছে। গত পঁচিশ হপ্তার প্রতিটি দিন হাউসফুল গেছে। ছবি হিট হওয়ার কারণ দর্শক বড় পর্দায় নিজেদের প্রেমের জীবন নিখুঁতভাবে ফুটে উঠতে দেখেছে। ছবির সাফল্যে খুশি প্রযোজক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন গোটা শহরের রাস্তায় আনন্দ মিছিল বের করবেন। পাবলিসিটির ভার দেয়া হয়েছে ঠিকাদার সুন্দর সিংকে।

সুন্দর সিং-এর বয়স পঁয়তাল্লিশের কোঠায়। খোশ মেজাজের সুন্দরের বাসা নিশাত সিনেমা হল-এর কাছেই। আপন বলতে এ দুনিয়ায় কেউ নেই তার। বচন সিং নামে বছর পনেরোর একটা ছেলেকে রেখেছে সে রান্না-বান্না এবং ফাইফরমাশ খাটার জন্য। বচন সিং সকালে এবং রাতে মনিবের জন্য রান্না করে, বাকি সময়টা সিনেমার প্ল্যাকার্ড নিয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। এজন্য সে মাসে ২৫ রুপী বেতন পায়—পুরো টাকাটাই শরণার্থী শিবিরে, তার মাকে পাঠিয়ে দেয়।

*'প্রেমিকের রক্ত'*র আনন্দ মিছিল সকাল আটটায় শুরু হলো নিশাত সিনেমা হল থেকে। সুন্দর সিং মাথায় লাল টকটকে পাগড়ি পরেছে, তাতে পাখির পালক গোঁজা। হাতে একটা পতাকা নিয়ে ব্যস্ত ভঙ্গিতে ছোটাছুটি করে মিছিলটাকে নানা নির্দেশ দিচ্ছে। মিছিলের সামনে রাজা লালের ব্যাণ্ড দল। দলের পিছনে একটা ট্রাক। তাতে ছবির নায়ক-নায়িকার বিশাল ছবি। একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে প্রেমিকের হৃদয় থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। রক্তের স্রোত গিয়ে মিশেছে প্রেমিকার পায়ের তলায়। ট্রাকের পিছনে হোর্ডিং দিয়ে সাজানো এক সার গরুর গাড়ি। গাড়ির পিছনে বুকে এবং পিঠে সিনেমার ছবি বেঁধে কয়েকজন লোক; সবার শেষে কতগুলো শিশু, হাতে প্ল্যাকার্ডসহ লাঠি। এদের মধ্যে আছে বচন সিং।

বচন সিং পরিষ্কার জামা এবং পাজামা পরেছে, জুতোও পালিশ করেছে। তবে তার চেহারায় আনন্দ নেই। দলে সবার শেষে হাঁটছে সে রাস্তায় চোখ রেখে, বিষণ্ন ভাব নিয়ে। তার মনিব সুন্দর সিং ফিল্ড মার্শালের মত হুকুম করল গরুর গাড়োয়ানদের সার বেঁধে চলতে; বাচ্চাগুলোকে লক্ষ্য করে খেঁকিয়ে উঠল যাতে তারা লাইন ভেঙে না ফেলে।

দেখার মত দৃশ্য একটা। ধনী লোকের আয়োজিত মিছিল এটা, তবে যারা এতে অংশ নিয়েছে তাদের সবাই খুবই গরীব—স্রেফ পেটের দায়ে ধুলোমাখা রাস্তায় ভবঘুরের মত হেঁটে বেড়াতে রাজি হয়েছে।

শহরে ঢুকল মিছিল। মূল রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল, নগরীর সবচেয়ে বড় রুটির দোকান 'ডেলবিস'-এর পাশ ঘেঁষে হাঁটছে। ডেলবিস-এর মাথায়, সাইনবোর্ডে প্রকাণ্ড একটি পাউরুটির ছবি। বচন সিং-এর চোখ চলে গেল

ওদিকে। সাথে সাথে জিভে জল চলে এল। জিভ বের করে ঠোঁট চাটল। রুটির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, হাঁ করে তাকিয়ে আছে সাইনবোর্ডের দিকে। সুন্দর সিং-এর কর্কশ কণ্ঠ দড়াম করে বাড়ি খেল কানের পর্দায়, 'ওই বচইন্যা, ওই হারামির পুত, দাঁড়াইয়া রইছস ক্যা? হাঁটতে থাক।'

বচন সিং দৌড়ে গেল মিছিলের দিকে। তবে মন পড়ে রইল রুটির ছবিতে। মিছিলের সঙ্গে হাঁটছে, কিন্তু ভাবছে বিজ্ঞাপনের ছবির কথা। ওর পা চলছে একদিকে, মন অন্য দিকে। নিজের কঠিন জীবনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।

মনিবকে নাস্তা দিতে প্রতিদিন সকাল ছ'টায় ঘুম থেকে উঠতে হয় বচন সিংকে। নাস্তার মেন্যু থাকে চা, ডেলবিস থেকে আনা মন মাতানো গন্ধের পাউরুটি আর মাখন। পাউরুটিতে মাখন মাখিয়ে নাস্তা সারে সুন্দর সিং। বচনের জন্য শুধু রুটির শক্ত ছালটুকু রেখে দেয়। ওটাই চায়ে ভিজিয়ে খায় বচন। বচন সিং-এর স্বপ্ন একদিন সে প্রচুর মাখন মাখিয়ে ডেলবিসের গোটা একটা পাউরুটি খাবে। কিন্তু মাকে বেতনের পুরো টাকাটাই পাঠিয়ে দিতে হয় বলে আস্ত একটা রুটি কিনে খাওয়ার মত বিলাসিতা করার সুযোগ নেই তার। একবার সুন্দর সিং-এর শরীর ভাল ছিল না, এক টুকরো রুটি খেয়ে বাকিটা চাকরকে দিয়ে দিয়েছিল সে। ওই দিনের স্মৃতি ভুলতে পারে না বচন। প্রার্থনা করে তার মনিবের পেটে যেন আবার গণ্ডগোল হয় এবং সে যেন মাখন মাখিয়ে রুটি খাওয়ার সুযোগ পায়। দোকানের ছবিটি বচনের মনে এমন খিদের সৃষ্টি করল যে সে কল্পনায় এক কামড়ে গোটা রুটিটি গিলে ফেলল।

সকালে নাস্তা খেয়ে সুন্দর সিং প্রার্থনা করে, 'মহান গুরু! তুমিই সত্যিকারের সম্রাট। তোমাকে লাখোবার জানাই প্রণাম। গুরু গোবিন্দ, তোমার দয়াতেই দুটো খেয়ে পরে আছি গো, গুরু। তুমিই তোমার অনুগত ভৃত্যের খিদে মেটাও।' তারপর সুন্দর সিং বেশ বড় করে তৃপ্তির ঢেকুর তোলে।

প্রতিদিন সকালে এ প্রার্থনা শোনে বচন সিং। সে ভাবে, কী অদ্ভুত ব্যাপার, মহান গুরু কাউকে কাউকে সব কিছু দেন, আবার কাউকে কিছুই দেন না! প্রতিদিন সকালে সুন্দর সিং গোটা পাউরুটি মাখন মাখিয়ে খেতে পায় আর তার কপালে জোটে শক্ত ছালটুকু। সুন্দর সিং গায়ে চড়ায় সিল্কের শার্ট আর তাকে শুতে হয় ছেঁড়া কম্বল গায়ে দিয়ে! সকালে উঠে বেচারা বচনকে নাস্তা সারতে হয় পাউরুটির শুকনো টুকরো টাকরা চায়ে ডুবিয়ে!

মাঝে মাঝে বচন প্রশ্ন করে নিজেকে, সে কেন মহান গুরুকে ধন্যবাদ জানায় না। একদিন সে প্রার্থনায় বসল। বলল, 'মহান গুরু, সত্যিকারের সম্রাট! তুমি আমাকে যা দিয়েছ তার জন্য লাখোবার জানাই প্রণাম।' এ কথা বলার পরে নিজেকে বোকা বোকা লাগে বচনের। সে কেন গুরুকে ধন্যবাদ দিল? শুধু রুটির শুকনো ছালের জন্য? সুন্দর সিং কৃতজ্ঞতা জানাতে পারে, কারণ সে প্রতিদিন গোটা পাউরুটি আর মাখন খাওয়ার সুযোগ পায়। সে (বচন) যদি গুরুকে ধন্যবাদ জানায় তা হলে সারাজীবনই তাকে হয়তো রুটির ছাল খেয়েই থাকতে

হবে।

একবার নাস্তায় দিন কয়েকের জন্য রুটি খাওয়া বাদ দিল সুন্দর সিং, বদলে দুধ খেতে লাগল। বেচারা বচনের এখন রুটির ছালও জোটে না সকালে। পাউরুটির কথা ভাবলেই মুখ ভরে ওঠে জলে। মাখন আর রুটি কিনতে খুব ইচ্ছে করে। কিন্তু টাকা পাবে কোথায়?

রাস্তায় মিছিল শেষে বেজায় ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরল বচন। পা জোড়া টনটন করছে ব্যথায়, রুটি আর মাখনের জন্য খিদেটা খোঁচা দিচ্ছে পেটে। সুন্দর সিং ঘরে এল। জামা কাপড় বদলে চলে গেল *'প্রেমিকের রক্ত'*র অভ্যর্থনা পার্টিতে।

বচন সিং-এর কারও কাছ থেকে ধার নেয়ার অবস্থাও নেই। মিছিলে কয়েকজনের কাছে আট আনা পয়সা ধার চেয়েছিল। দেয়নি কেউ। হয়তো তাদের কাছে পয়সা ছিল না কিংবা ভেবেছে বচন ধার শোধ করতে পারবে না। সিনেমা হলের রেস্টুরেন্ট থেকে বাকিতে মাখন-রুটি আনার চেষ্টা করেছিল বচন। কাজ হয়নি। সুন্দর সিং-এর হুকুম দেয়া আছে তার চাকরকে বাকিতে কিছু দেয়া যাবে না। বচন সিং তার চারপায়াতে শুয়ে পড়ল। পেটে দাউ দাউ খিদের আগুন।

ঘুমানোর আগে প্রার্থনা করল সে। সে তো লাখ টাকা কিংবা মোটর গাড়ি চাইছে না—শুধু আধখানা পাউরুটি আর খানিক মাখন পেলেই সে খুশি। অথচ এটুকু থেকেও সে বঞ্চিত। সে প্রাণপণে প্রার্থনা করে চলল: 'মহান গুরু, সত্যিকারের সম্রাট, আমি সবাইকে ফেলে তোমার দুয়ারে এসেছি। লোকে বলে তোমার দয়ার অন্ত নেই। আমি তো দেখেছি নিশাত সিনেমা হলের মালিককে আর ঠিকাদার সুন্দর সিংকে দু'হাত ভরে দিয়েছ। কিন্তু তুমি কেন অন্যদের মত আমাকে কিছু দিচ্ছ না? তা হলে আমরা কার কাছে যাব? তুমি যদি সত্যি অসীম দয়াময় হও তা হলে তোমার ভৃত্যকে একটি গোটা পাউরুটি খেতে দাও। যদি তা না দাও তা হলে বুঝব তুমি শুধু অল্প ক'জন ধনী মানুষের গুরু। আমি তখন নতুন একজন গুরুকে খুঁজে নেব।' প্রার্থনা করতে করতে ঘুমে জড়িয়ে এল বচন সিং-এর চোখ।

...সে রাতে অদ্ভুত একটা অনুভূতি নিয়ে জেগে গেল বচন। ঘরটা উজ্জ্বল আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে। এক ঝলমলে, কান্তিমান পুরুষ ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে বচনের ঘরে ঢুকলেন। তার হাতের উপর সাদা রঙের একটি বাজপাখি ডানা ঝাপটাচ্ছে। স্বয়ং গুরু গোবিন্দ সিং এসেছেন! বচন এক ছুটে গুরুর পায়ের কাছে মাথা দিয়ে পড়ল। তারপর তিনপেয়ে কাঠের টুলটি এগিয়ে দিল গুরুকে বসতে দিতে। গুরু জড়িয়ে ধরলেন বচনকে।

'বেটা, প্রার্থনার সময় তুমি আমাকে স্মরণ করেছ!'

'জী, গুরু!' হাতের তালু দিয়ে চোখ ঘষতে ঘষতে বলল বচন।

'তুমি আমার কথা স্মরণ করলে কেন, বেটা?' সহৃদয় গলায় জানতে চাইলেন গুরু।

'সত্যিকারের সম্রাট! আমাদের হৃদয়ের গোপন অভিলাষ কোনও কিছুই তো আপনার কাছে অজানা নেই। আপনি তো জানেন কী দুঃখকষ্টে কাটছে আমার জীবন!'

'বেটা, তুমি আমার কাছে কী চাও, বলো। যা চাইবে, পাবে।' বচন চুপ করে রইল।

'বেটা, লজ্জা পাবার কিছু নেই। তোমার মন যা চায় বলে ফেলো।'

'সত্যিকারের সম্রাট! আমি যা চাইব আপনি সত্যি তা আমাকে দেবেন?'

'হ্যাঁ, বেটা; তুমি অন্তরের অন্তঃস্তল থেকে আমার কথা মনে করেছ। কাজেই তুমি যা চাইবে তা পাবে।'

'তা হলে আমাকে ডেলবিস থেকে গোটা একটা পাউরুটি আর মাখন এনে দিন।' ঠোঁট চেটে অস্পষ্ট গলায় বলল বচন।

'ডেলবিসের রুটি আর মাখন! মাত্র সাত আনার জিনিস তুমি আমার কাছে চাইলে! বেটা, তোমাকে যখন কেউ কিছু দিতে চায় তার পদমর্যাদা বুঝে চাইতে হয়। তুমি এ জীবন এবং পরের জীবনের জন্য সুখ কামনা করো আমার কাছে। পৃথিবীর উপর আধিপত্য বিস্তার করার ক্ষমতা চাও, আমি তোমাকে তা দেব। তোমাকে আমি ত্রিভুবনের অধীশ্বর বানিয়ে দেব।'

'না, প্রভু! আমি আধিপত্য কিংবা ক্ষমতা চাই না। আজকাল রাজাদেরকে সাধারণ মানুষ রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেয়। আমি শুধু গোটা একটি পাউরুটি পেলেই সন্তুষ্ট থাকব। আরও অনেক গরীব মানুষের মত আমিও রুটি খেতে চাই। আমার রাজ্য শাসনের লোভ নেই; তবে আমি সারাটা জীবন খিদে আর অভাব নিয়েও কাটাতে চাই না। আমার এ জীবন থেকে খিদে দূর করুন; পরের জীবন নিয়ে আমার কোনও মাথাব্যথা নেই।'

'তুমি যা চেয়েছ শীঘ্রি পেয়ে যাবে। আমি এ পৃথিবীতে আবার আসব। ভারতকে বিদেশী হামলার হাত থেকে শুধু রক্ষা করতে নয়, প্রতিটি ভারতীয়কে রুটি-মাখন খাওয়ানোর জন্য। আমার প্রত্যাবর্তনের জন্য অপেক্ষা করো।'

'মহান গুরু! আমি অনেক দিন ধরে অপেক্ষা করছি। দয়া করে আর বেশি সময় নেবেন না, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে আসবেন।'

'দেরি করব না।'

কান্তিমান পুরুষটি ঘোড়ায় চেপে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

'ওই বচইন্যা। ওঠ, শালা অলসের ধাড়ি! প্রায় দুপুর হইয়া গেছে আর তুই এখনও ঘুমাইতাছোস। যা, ডেলবিস থিকা রুটি আর মাখন নিয়া আয়।'

বচন এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল। তবে ডেলবিস কথাটা কানে যেতে লাফ দিয়ে উঠে বসল সে বিছানায়—এখনও তন্দ্রাচ্ছন্ন।

'মহান গুরু! আপনি সত্যি চলে এসেছেন, আর এত তাড়াতাড়ি! আমার ডেলবিসের রুটি আর মাখন কই?'

সুন্দর সিং ঠাট্টার দৃষ্টিতে তাকাল ছেলেটার দিকে। 'ওই, কোন্ গুরুর লগে কথা কস? নেশাটেশা করস নাই তো? তোর জন্য আমি নাস্তা আনব নাকি তুই আমার জন্য আনতে যাবি? হারামজাদা, তাড়াতাড়ি ডেলবিসে যা। মাখন-রুটি নিয়ায়।'

'একজন আমার জন্য খুব শিগ্গির ডেলবিস থেকে মাখন-রুটি নিয়ে আসবেন।'

চোখ মেলে চাইল বচন। সুন্দর সিং কটমট করে তাকিয়ে আছে তার দিকে। চট করে চোখ বুজে ফেলল বচন। আবার শুয়ে পড়ল চারপায়াতে।

সুন্দর সিং চারপায়ার একটা কোনা তুলে ধরে উল্টে দিল। বচন গড়িয়ে ধপাস করে পড়ে গেল মাটিতে।

মূলঃ কৃষেন সিং ধোড়ি

দেবতার বিচার

পীরের কবরের পাশে আম গাছের নীচে চুপচাপ বসে আছে নূরা। শিক্ষকের দেয়া বাড়ির কাজে মগ্ন। তার বোন রহমতি পীরের সমাধিস্থলের কাছে, শহীদ শিখদের মাঠ থেকে গরুর জন্য জাব কাটছে।

আমাদের মাঠের ধারের শহীদদের কবরের নাকি অনেক শক্তি, শুনেছি আমি। আমরা শিখ ধর্মের অনুসারীরা এ কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি। এতই ভক্তি করি যে শহীদদের সমাধি উদ্দেশ্য করে কিছু অর্ঘ্য নিবেদন না করা পর্যন্ত স্কুলে যাওয়ার অনুমতিও মেলে না। দাদুর বিশ্বাস শহীদদের আশীর্বাদ আছে বলেই আমি সব পরীক্ষায় পাশ করে যাচ্ছি।

গরমের এই দিনে, আমিও নূরার সঙ্গে বসে আছি আম গাছের নীচে। নূরা স্কুলের পড়ায় মনোযোগী, আমি রহমতিকে লক্ষ করতে লাগলাম। ও আমাদের মাঠ থেকে জাব কাটছে। রহমতিকে আমিও খুব পছন্দ করি। ওকে নিয়ে নূরার সঙ্গে কথা বলার লোভ সামলাতে পারলাম না।

'দুই বোনের মধ্যে কাকে তুই বেশি পছন্দ করিস?' জিজ্ঞেস করলাম। 'রহমতি নাকি জয়না?'

'জয়না,' বড় বোনের কথা বলল নূরা। ওর বড় বোনের বিয়ে হয়েছে চার বছর হলো।

'রহমতিকে কেন পছন্দ করিস না?' ভয়ে ভয়ে জানতে চাইলাম। নূরা না আবার ভুল বুঝে বসে আমাকে।

'একবার ও আমাকে মেরেছিল। কিন্তু জয়না কোনদিন হাত তোলেনি আমার গায়ে,' অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে জবাব দিল নূরা। মনোযোগ দিল পড়ায়। আমার কথার উল্টো অর্থ করেনি বলে খুশি হলাম মনে মনে। রহমতির দিকে তাকালাম আবার। ওর ছন্দায়িত ভঙ্গিতে জাব কাটার দৃশ্যটি বড় মনোহর।

এমন সময় শহীদদের সমাধিস্তম্ভের পিপুল গাছে কর্কশ গলায় ডেকে উঠল একটা ময়ূর, বিরাট ডানা মেলে উড়াল দিল। গা থেকে খসে পড়া একটা পালক বাতাসে ভাসতে ভাসতে নেমে আসতে লাগল মাটিতে। আমি তখন নিয়মিত ময়ূরের পালক জমাই। ঝলমলে রঙের পালকটাকে বাতাসে ভাসতে দেখে পড়া মাথায় উঠল আমার। বই-টই ফেলে পড়িমরি ছুটলাম পালকের জন্য। তবে মাটিতে নামার সুযোগ পেল না ময়ূরের পালক, তার আগেই, শূন্যে থাকতেই খপ্ করে ওটাকে ধরে ফেলল রহমতি।

'আমাকে পালকটা দাও,' উদ্বেগ নিয়ে বললাম আমি।

‘আমি আগে এটা ধরেছি,’ ঠাণ্ডা গলায় জবাব এল।

‘তাতে কিছু আসে যায় না!’ হুমকি দিলাম আমি। ‘দিতে বলেছি। দিতে হবে।’

‘আচ্ছা, তাই নাকি? দিতে হবে?’ মুখ বাঁকাল রহমতি। ‘দেব না।’

‘দাও বলছি। তোমার কাছে আমি জীবনেও আর কিছু চাইব না,’ বললাম আমি।

‘এই নাও,’ বলে পালকটা দূরে ছুঁড়ে দিল রহমতি। কাটা জাব জড়ো করে আঁটি বাঁধল, তুলে নিল মাথায়। তারপর হাঁটা দিল বাড়ির দিকে। ওর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারলাম না আমি। দেখলাম ওজনের ভারে সামান্য কুঁজো হয়ে গেছে রহমতি। ওর সঙ্গে বেশি খারাপ ব্যবহার করে ফেললাম কি না ভেবে কিঞ্চিৎ মন খারাপ হলো।

সমাধিস্তম্ভে দেখলাম নূরার দরবেশতুল্য বাবা নামাজ পড়ছেন। নূরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে তাঁর পাশে। দু’জনের ঘাড়ে শিখ ধর্মের প্রতীক হলদে রুমাল পেঁচানো। বেখাপ্পা লাগছে। ওঁরা মুসলমান থেকে কিছুদিন হলো শিখ ধর্ম গ্রহণ করেছেন। আমি যে সময়ের কথা বলছি তখন দেশ জুড়ে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলছে। পুব পাঞ্জাবে মুসলমানদেরকে নিরাপত্তার খাতিরে গলায় হলদে রুমাল বেঁধে রাখতে হত।

দেশ বিভাগ ভারতকে দু’টুকরো করে ফেলেছে। শিখরা নিয়ম করেছে ভারতে বসবাসকারী মুসলমানদেরকে ধর্মান্তরিত হতে হবে। পাকিস্তানের মুসলমানরাও প্রতিশোধ নিতে সেখানকার হিন্দু কিংবা শিখদেরকে মুসলমান হতে বাধ্য করছে। আমাদের এলাকার বেশিরভাগ মুসলমান, তাও গোঁড়া সুন্নি। কিন্তু তবু তাদের কিছু করার নেই। কারণ, তারা ভারতে রয়েছে আর ধর্মান্তরিত না হলে খুন হয়ে যেতে হবে।

মুসলমানদের ধর্মান্তরিত করার জন্য আমাদের গাঁয়ে একটা অনুষ্ঠান করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রচুর পরিমাণে লোহার বালা, কাঠের চিরুনি এবং হলদে রুমাল নিয়ে আসা হয়। মুসলমান থেকে শিখ ধর্মে ধর্মান্তরের জন্য প্রস্তুত মুসলমানদেরকে প্রসাদ খাওয়ানোর প্রক্রিয়া চলছে, এমন সময় শ্লেষ্মা জড়িত একটি কণ্ঠ বলে উঠল, ‘ধর্মান্তরিত করে লাভ কী? ওরা কিন্তু অন্তরে মুসলমানই থেকে যাবে।’ মুখে আফিমের গুলি গুঁজে দিয়ে কথাটা বলেছেন বাবা ফুমান সিং।

‘তা হলে আপনি আমাদেরকে কী করতে বলেন?’

‘ওদেরকে শুয়োরের মাংস খাইয়ে দাও।’ বললেন তিনি।

‘সীমান্তে আমাদের লোককে ধরে ওরা জোর করে গরু খাইয়ে দিয়েছে,’ বলল একজন।

ধর্মান্তরিত করতে মুসলমানদেরকে শুয়োরের মাংস খাওয়ানোর ব্যাপারে একমত হলো সবাই। সাথে সাথে চার পাঁচটা শুয়োর মেরে চড়িয়ে দেয়া হলো রান্না। আশপাশের গাঁয়েও একই কাজ করা হলো।

মুসলমানরা শুনল তাদেরকে শুয়োরের মাংস খেতে হবে। ভাবলেশহীন রইল তাদের চেহারা। কারণ তারা তো জীবনের আশা ছেড়েই দিয়েছে।

'আমাদের গুরুরা কিন্তু শুধু প্রসাদ খাইয়ে দীক্ষিত করেন,' আমার বাবা মৃদু প্রতিবাদের সুরে ফিসফিস করলেন বাবাজীর কাছে।

'তোমার মুখখানা একটু বন্ধ রাখো, বাপু। নীরবতার চেয়ে ভাল কিছু নেই।' বললেন বাবা ফুমান সিং। পা বাড়ালেন মাংসের পাত্রের দিকে। রান্নার স্বাদ পরখ করবেন।

অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত মুসলমানকে শিখ ধর্মে দীক্ষিত করা হলো। শিখ ধর্মের পাঁচটি প্রতীক গায়ে চড়িয়ে শুয়োরের মাংস খেতে লাগল ওরা।

'আমরা তো আগে হিন্দুই ছিলাম। হারামজাদা আওরঙ্গজেব এসেই না আমাদেরকে ধর্মান্তরিত করল।' শুয়োরের মাংস খাওয়ার পক্ষে নিজের যুক্তি দাঁড় করাতে চাইল একজন। বাবাজী এবং গাঁয়ের বয়োজ্যেষ্ঠ কয়েকজন বাকিদের কাছ থেকে খানিক দূরত্ব বজায় রেখে বসেছেন। তাঁরা সবাই অভিজাত সান্ধু হিসেবে নিজেদেরকে দাবি করেন।

'পাতিয়ালার মহারাজা একজন সিন্ধু,' বাবাজীকে বলতে শুনলাম আমি। 'সিন্ধু আর সান্ধুরা একই গোত্রের মানুষ। পার্থক্য হলো আমাদের জায়গীরদার আমাদেরকে শুধু আফিমের গুলি খেতে দেয়। আর মহারাজা সকল আরাম আয়েশ ভোগ করার সুযোগ পান।' এদের এসব কথা অর্থহীন মনে হলো আমার কাছে। কী বলছে বুঝতেও পারছি না।

'নূরার পরিবারের লোকজনকে তো দীক্ষা দেয়া হলো না, বাবা,' বললাম আমি। 'চুপ!' বাবা ধমক দিলেন আমাকে। 'আমি ওদের সবাইকে পাঁচটি প্রতীকই দিয়েছি। ওরা ওগুলো পরছেও। নূরার বাবা সুফী মানুষ। আমাদেরকে সম্মান করেন। আমি সবার সামনে তাঁর সম্মানহানি করতে পারব না।'

বদরু আর তার পরিবারকে দীক্ষা দেয়া হয়েছে কি না জানতে চাইলেন আমার ঠাকুরদা। বাবা তাঁকে বোঝাতে সমর্থ হলেন বদরু বাবার সামনে শুয়োরের মাংস খেয়েছেন। কারও মনে যাতে সন্দেহ না জাগে এজন্য বাবা গম্ভীর মুখে কসমও খেলেন।

রহমতি এখন হাতে লোহার চুড়ি পরে, গলায় জড়িয়ে রাখে হলদে রুমাল। ওর বাবা বদরু এবং নূরার হাতেও লোহার বালা, গলায় হলদে রুমাল। তবে এগুলো পরেই ওরা নামাজ আদায় করে লুকিয়ে লুকিয়ে। এ মুহূর্তে আমি ছাড়া মাঠে কেউ নেই বলে নামাজ পড়ার সাহস পাচ্ছেন নূরার বাবা। কারণ, আমি তাঁর ছাত্র। ওরা জানে আমি গাঁয়ের কাউকে ওদের নামাজ পড়ার খবর ফাঁস করে দেব না। কেন করব, যেখানে রহমতির সাহায্য ছাড়া আমি ক্লাস থ্রীর অঙ্ক করে কুলিয়েই উঠতে পারি না।

আমার চোখে এখনও ভেসে ওঠে সেই দিনটি–রহমতি জাবের আঁটি মাথায় চেপে হাঁটছে, বদরু আর নূরা নামাজে ব্যস্ত। মাটিতে নতজানু হওয়ার সময় জমিন

স্পর্শ করল ধার্মিক মানুষটির মেহেদী রাঙানো লম্বা দাড়ি। তাঁর লক্ষ্ণৌ শার্ট সামান্য ময়লা। আমি কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে ওদের নামাজ দেখছি। এমন সময় ভেসে এল চিৎকার: যো বোলে সো নিহাল, সৎ শ্রী আকাল। চিৎকার করছে শিখরা। ভয়ে জমে গেল সবাই। ছুটতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল নূরা। ঘোড়ায় চড়ে এল ওরা। কতগুলো বর্শার আঘাতে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেল নূরার শরীর। নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে এল। চিৎ হয়ে পড়ে থাকল মৃত নূরা।

আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখে আমি চেয়ে থাকলাম ঘোড়সওয়ারদের দিকে। ওরা ইতিমধ্যে ঘিরে ফেলেছে বদরুকে। সুফি মানুষটা হাত জোড় করে প্রাণ ভিক্ষা চাইছেন। হাতের বালা আর গলার হলদে রুমাল দেখিয়ে বলছেন তিনি একজন শিখ। শেয়ালের মত গোঁফঅলা এক নিহাং শিখ খেলার ছলে কোপ মারল বদরুর বালা পরা হাতে। কনুই থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল হাত। বদরু অন্য হাতটা তুলে অনুনয় করতে গেলেন, শয়তানটা তাঁর এ হাতটাও কেটে ফেলল।

'এ শুয়োরটাকে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দাও,' একজন চেঁচিয়ে উঠে ছুটে এল আমার দিকে।

পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেয়ার মানে, এ মুসলমানকে হত্যা করো।

'ও শিখের ছেলে, গর্দভ,' একটা কণ্ঠ বাধা দিল তাকে। এ সেই নিহাং যে নূরাকে প্রথম বর্শা মেরেছে। সে ঝুঁকে আমাকে কোলে তুলে নিল।

এরপর কী হয়েছে আমি জানি না। কারণ, এরপর আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।

জ্ঞান ফিরে দেখি বারান্দার বিছানায় শুয়ে আছি। কাঁদতে কাঁদতে আমার মা'র চোখ লাল। ফুলে গেছে।

'ওর জ্ঞান ফিরেছে। আর ভয় নেই। বাচ্চা তো তাই ধাক্কাটা সামলাতে পারেনি,' বাবাজী বললেন মাকে।

'আমার বাচ্চাটাকে তো ওরা প্রায় মেরেই ফেলছিল,' চোখ মুছলেন মা। 'ঈশ্বরই তোকে বাঁচিয়েছেন, বাবা।' তিনি দোপাট্টা দিয়ে আমার মুখ মুছিয়ে দিলেন।

'শহীদ শিখদের আশীর্বাদেই ও এ যাত্রা রক্ষা পেয়েছে। সমাধিতে পুজো দিয়ে এসো,' বললেন বাবাজী। সবাই সায় দিল তাঁর কথায়। পুজোর জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগল।

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে নূরার মৃত্যুর কথা মাকে বললাম আমি। কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলাম রহমতির কোনও খবর জানেন কি না। মা অশ্রুসজল চোখে বললেন, শিখ রায়টিরা গাঁয়ের অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে জয়না আর রহমতিকেও ধরে নিয়ে গেছে। অনেককেই খুন করেছে ওরা, প্রায় পঞ্চাশ জনের মত। নতুন হলদে রুমাল আর চকচকে লোহার বালা হাতে যাকে দেখেছে তাকেই হত্যা করেছে ওরা।

গাঁয়ের সবাই শহীদদের উদ্দেশে পুজো দেয়ার জন্য প্রস্তুত হলো। সবার মধ্যে আতঙ্ক। বাবা ফুমান সিং চুপ মেরে গেছেন। কী করবেন বুঝতে পারছেন

না। কিছুক্ষণ আগে খবর পেয়েছেন তাঁর দীর্ঘদিনের বন্ধু ঘনশ্যাম দাসকে শিখরা ভুল করে মেরে ফেলেছে। সে তাঁর মুসলমান এক বন্ধুর জন্য হলদে রুমাল নিয়ে যাচ্ছিল। বন্ধুটি নব্য ধর্মান্তরিত। দাঙ্গাকারীরা ঘনশ্যামকে মাঠের মধ্যে পেয়ে যায়। তার পরিচয় জানার প্রয়োজনও বোধ করেনি। মহা ব্যস্ততা তাদের। তারা আরও কয়েকটি গ্রাম লুঠ করেছে। হলদে রুমাল দেখলেই হলো, তারা ধরে নেয় এরা 'ধর্মান্তরিত'।

শহীদদের মাঠে প্রার্থনা করার সময় বাবাজী, মানে আমার ঠাকুরদা ঘনশ্যাম দাসের কথা ভাবছিলেন। ওকে একদিন মরতে হত। কিন্তু এই আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত, নিষ্ঠুর মৃত্যু মেনে নেয়া যায় না কিছুতেই। ঘনশ্যাম দাসের মৃত্যু সবার মধ্যে অনিশ্চয়তা নিয়ে এসেছে। এর মানে হলো হলদে রুমাল ব্যবহারকারী, সে হিন্দু বা শিখ যা-ই হোক, রেহাই মিলবে না। এখন প্রাণের ভয়ে আতঙ্কিত মুসলমানরাই রেহাই পেয়ে যাচ্ছে আর মারা পড়ছে শিখরা।

বাবাজী গুরু গোবিন্দর পুত্রদের উদ্দেশে জোরে জোরে প্রার্থনা সঙ্গীত গাইলেও তাঁর মন কাঁদছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বীভৎসতার জন্য। সবশেষে যাঁরা নিজেদের ধনসম্পদ বিলিয়ে দিয়েছেন দুঃখী মানুষের জন্য, লড়াই করেছেন পাপীদের বিরুদ্ধে, বিশ্বাসের জন্য উৎসর্গ করেছেন জীবন, তাঁদের উদ্দেশে স্তোত্র পাঠ করলেন তিনি। 'বিশ্বাসের জন্য জীবন উৎসর্গ' করার সময় গলা বুজে এল বাবাজীর। তিনি আর কিছু বলতে পারলেন না। প্রার্থনার বাকি অংশ শেষ করলেন আমার বাবা। প্রার্থনা শেষে বাবা আমাকে শহীদের সমাধিতে প্রসাদ দিয়ে আসতে বললেন, আমি সমাধির উপর প্রসাদ রাখলাম। পিপুল গাছ থেকে উড়ে এল কাকের দল। চোখের পলকে সাবাড় করল প্রসাদ।

বাবা সবাইকে প্রসাদ বিতরণ শেষে চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েছেন, বাবাজী এগিয়ে গেলেন তাঁর দিকে। হাত ধরে বললেন, 'তোমার ছেলেটাকে পীরের কবরেও কিছু প্রসাদ দিতে বলো।' পীরের সমাধির দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি। ওদিকে তাকিয়ে নূরার কথা মনে পড়ে গেল আমার। পিপুল গাছটা মনে করিয়ে দিল রহমতিকেও। ওটার নীচে দাঁড়িয়ে মুখ ভেংচাচ্ছিল ও আমাকে। কাজটা কি ও রাগ করে করেছে, নাকি ভালবেসে, কোনওদিনই তা জানতে পারব না আমি।

'পীরের কবরে প্রসাদ দেব কেন?' বিস্মিত হলেন বাবা।

'হত্যাযজ্ঞের কথা ভুলে যাওনি নিশ্চয়,' বাবাজী ফিসফিস করে বললেন আমার বাবাকে। মাঠের সীমানা ছাড়িয়ে দূরে টেনে নিয়ে গেলেন। সম্ভবত শহীদদের সমাধিস্থলে দাঁড়িয়ে কথা বলতে সাহস পাচ্ছেন না। শহীদরা যদি অভিশাপ দেয়!

'হুঁ, মনে আছে,' তেতো গলা বাবার।

'যারা ধর্মান্তরিত হয়েছে তারা খুন হয়েছে, তাই না?'

'তো?' বাবার বিস্ময় এখনও কাটেনি।

'যারা ধর্মত্যাগ করতে চায়নি তারা বেঁচে গেছে প্রাণে, জানোই তো।'

'আপনার কথা বুঝতে পারলাম না,' ভুরু কুঁচকে আছে বাবার।

'বুঝতে না পারলে কিছু করার নেই,' ধমকে উঠলেন বাবাজী, বাবা তাঁর কথার মর্ম উদ্ধারে ব্যর্থ বলে বিরক্ত।

'শোনো,' গলার স্বর আরও নামল বাবাজীর, যাতে শহীদরা শুনতে না পান। 'যারা মুসলমান থেকে গেছে তাদের কোনও ক্ষতি হয়নি। কাজেই কে বলতে পারে আগামীকাল পীররা আমাদের শহীদদের চেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠবেন না?'

বাবাজীর কথা বুঝতে পারলাম আমি। এক ছুটে কিছু প্রসাদ রেখে এলাম পীরের কবরে। বাবা আমাকে বাধা দিলেন না।

হয়তো পীরের পক্ষে কথা বলছেন বলে বাবাজী এখনও বেঁচে আছেন, কে জানে!

মূলঃ গুলজার সিং সান্ধু

ফুলশয্যা

নব-বিবাহিতা স্ত্রীর চোখ থেকে দৃষ্টি তুলে চাইল কেশি । তাকাল প্রাচীন আদলে তৈরি খাটের মাথায় । ওখানে, দেয়ালে ঝুলছে তার মায়ের বাঁধানো একখানা ছবি । মা দেখতে খুব সুন্দরী ছিলেন, সুগঠিত শরীর, বড় বড় চোখ, লম্বা, বাঁকানো পাপড়ি; সামান্য ফাঁক হয়ে আছে পাতলা ঠোঁট জোড়া হাসির ভঙ্গিতে, ধবধবে, মুক্তোর মত সাদা দাঁতের সারি দেখা যাচ্ছে । মা'র চেহারাই যেন পেয়েছে বিয়ে করে আনা নতুন বউ । দুই নারীর মধ্যে কী অদ্ভুত মিল! মাথাটা চট করে ঘুরে উঠল, মেরুদণ্ড দিয়ে বয়ে গেল শীতল স্রোত । মাথায় ঝাঁকি দিল কেশি, ছবি থেকে সরিয়ে নিতে চাইল চোখ । পারল না ।

মাত্র ক'বছর আগেও মা'র বুকে মাথা রেখে শুয়ে থাকত কেশি, এখন যেমন শুয়ে আছে স্ত্রীর বুকে । সেই সব স্মৃতি ধেয়ে এল বন্যার মত । স্ত্রীর পটল চেরা চোখ এবং তৃষ্ণার্ত অধরে চুম্বন করার বদলে শরীর থেকে পিছলে নেমে এল কেশি, শুয়ে থাকল পাশে বিধ্বস্ত পুরুষের মত । বিছানার ওপর চাঁদোয়ার মত করে সাজানো ফুলের মালাগুলোর দিকে ফাঁকা চোখ । হাত নিঃসাড় পড়ে আছে জেসমিনের পাপড়ির ওপর । ইচ্ছা করছে বিছানা থেকে লাফ দিয়ে নামে, পালিয়ে যায় এই সুগন্ধি ফুলশয্যা থেকে । এখানে নিজেকে বন্দির মত লাগছে কেশির ।

তবে বিছানা থেকে লাফিয়ে নামল না কেশি । যেখানে ছিল, শুয়ে থাকল সেখানেই । নিশ্চল, নীরব । ওর বউ কী ভাববে! ভয়টা গ্রাস করল কেশিকে । আবার ঝাঁকি দিল মাথা । আগের চেয়ে জোরে । তবে এতে মা'র চেহারা মনের আয়না থেকে মুছতে তো পারলই না, বরং স্মৃতিগুলো বাঁধভাঙা বন্যার মত ভিড় করতে লাগল মনে । ...সেই একই বিছানা, একই ঘর । কেশির বাবা-মা পাশাপাশি শুতেন । কেশি বারান্দায় নিজের খাটিয়া থেকে দেখছে ওদেরকে । বাবার পাশে মাকে কী অদ্ভুত সুন্দর লাগছে!

...আয়নার সামনে বসে চুল আঁচড়াচ্ছেন মা । কেশি দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে লক্ষ করছে তাঁকে । রূপকথার গল্পে শোনা পরীর মত সুন্দরী তার মা । মা আয়নায় ছেলেকে দেখে কাছে ডাকলেন । সে এগিয়ে এসে মা'র কোলে মাথা গুঁজল । একহাত দিয়ে মা তার মাথায় হাত বোলাচ্ছেন, অন্য হাতে চুল আঁচড়াচ্ছেন ।

...বাবার কী হয়েছে? এক লোক প্রতিদিন আসছে বাবাকে দেখতে । লোকটার গলায় পেঁচিয়ে থাকে একজোড়া সাপ । সে সাপের লেজ কানে ঢুকিয়ে বাবার কব্জিতে ছোঁয়ায় সাপের মাথা । এরপর বাবার হাতে বড় বড় সুই ফুটিয়ে দেয় । বাবা চিৎকার করেন না, তবে ভয়ে আর্তনাদ ছাড়ে কেশি । মা তাকে বুকে চেপে ধরেন, নিয়ে যান পাশের ঘরে ।

...মাটিতে শুয়ে আছেন বাবা। নড়াচড়া করছেন না। সবাই কাঁদছে। মা কাঁদছেন; তিনি ছেলেকে একটা চুমু খেলেন, তারপর আবার কাঁদতে লাগলেন। মহিলারা মা'র হাতের চুড়ি ভেঙে ফেলল, মুছে দিল সিঁথির সিঁদুর। কেশিকে তারা মা'র কোল থেকে প্রায় টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে আনল। কেশি নামতে চায় না কিছুতেই। সে গলা ফাটিয়ে কাঁদতে থাকে। কিন্তু তাকে সান্ত্বনা দেয়ার কেউ নেই।

...সেই একই বিছানা। বাবা আগে যেখানে ঘুমাতেন সেখানে শুয়েছে কেশি। মা তার পাশে। মা'র পরনে সাদা শাড়ি। দেয়ালের ঘুলঘুলি দিয়ে রোদ ঢুকছে, কিন্তু মা ঘুমাচ্ছেন মরার মত। কেশি স্থির চোখে দেখছে মাকে। সত্যি পরীর মত রূপবতী তার মা। চোখ বোজা, আলুথালু চুল ছড়িয়ে রয়েছে দু'কাঁধে। এ যেন গল্পের সেই ঘুমন্ত রাজকন্যা। মাকে জাদু দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে.। রাজকুমার এসে তার ঘুম ভাঙাবে। কেশি ঝুঁকল মা'র দিকে, চুমু খেল গালে। চোখ মেলে চাইলেন মা, বাড়িয়ে দিলেন হাত, কোলে টেনে নিলেন তাকে। ছেলের কপালে, চোখে এবং ঠোঁটে চুমু খেলেন।

...মা'র বুকে মাথা রেখে শুয়ে আছে সে। মা রাজকুমারের গল্প শোনাচ্ছেন। সাত সাগর পাড়ি দিয়ে রাজার কুমার যাচ্ছে তার প্রেয়সীর সঙ্গে দেখা করতে। গল্প শেষ করে মা জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি কোনও রাজকুমারীকে বিয়ে করবে?'

'আমি তোমাকে বিয়ে করব।'

'পাগল! ছেলে কি কখনও মাকে বিয়ে করতে পারে?'

মা কথা দিলেন তিনি ছেলের জন্য অবিকল তাঁর মত দেখতে একজন কনে খুঁজে আনবেন।

'তারপর এই বিছানাটাও আমার হয়ে যাবে,' মা'র অপূর্ব সুন্দর চোখে চোখ রেখে বলল সে।

'অবশ্যই। এ খাট এবং বিছানা আমি তোমাকে এবং তোমার বউকে আমার তরফ থেকে বিয়ের উপহার দেব।'

'কী হলো? শরীর খারাপ লাগছে?' কেশির দিকে ফিরে শুল নববধূ, কপালে হাত রাখল। আঙুল চালিয়ে দিল চুলের মধ্যে। 'কিছু হয়নি,' বলল কেশি। হাসার চেষ্টা করল। বদলে লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

মা কথা রেখেছেন। যে মেয়েকে পছন্দ করেছেন কেশির জন্য, সে হুবহু তার মা'র প্রতিচিত্র। কেশির বউয়ের চোখ জোড়া পটল চেরা, ধারাল দেহবল্লরী, নরম ওষ্ঠ, হাসলে ঝিকিয়ে ওঠে মুক্তোর মত দাঁতের সারি। যৌতুকে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে প্রকাণ্ড বিছানাও পাঠানো হয়েছে, তবে মা নিজের বিছানা ছেলেকে বিয়েতে উপহার দিয়েছেন। এমনকী নব দম্পতির জন্য নিজের শোবার ঘর পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছেন।

কনে তার বরের দিকে ঝুঁকে এল। চোখে চোখ রাখল। স্বামী হঠাৎ ঠাণ্ডা

মেরে গেল কেন তার কারণ খুঁজছে। কিন্তু রহস্য উদ্ধার করা গেল না। এক মুহূর্ত ইতস্তত করল সে, তারপর চুলে আদর করতে লাগল।

এক মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকল কেশি; তারপর হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরল বধূর ঘাড়, টেনে নিল কাছে। আদর করল চুলে, গালে এবং ঠোঁটে। মস্তিষ্ক থেকে দূর হয়ে গেছে মাকড়সার জাল। নারীর নরম, উষ্ণ শরীর তার রক্ত গরম করে তুলল। চুমু খেল স্ত্রীকে, মুখ গুঁজে দিল কবোষ্ণ বক্ষে। নববধূর সঙ্গে প্রেম করার এই-ই সময়, ভাবল সে। ছবিটির দিকে তাকাতে চাইল না কেশি। মাথা না তুলে খাটের ওপরে, হেড-বোর্ডে একটা বালিশ গুঁজে দিল। তারপর চাইল মুখ তুলে। তার মা বালিশের আড়াল থেকে এখনও উঁকি দিচ্ছেন। 'না, না, না,' চিৎকার করে উঠল কেশি। বিছানায় পিঠ দিয়ে পরাজিতের মত শুয়ে পড়ল। প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে তার, লাফ মেরে নেমে এল বিছানা থেকে।

পূর্ণিমার আলো আসছে পর্দার ফাঁক দিয়ে। বারান্দা ভেসে যাচ্ছে নরম রুপোলি জোছনায়। বাগানে চাঁদের আলোর রেখার দিকে কেশির অন্যমনস্ক দৃষ্টি। ঠাণ্ডা বাতাসে উত্তেজিত স্নায়ু ক্রমে শীতল হয়ে আসছে। ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল কেশি। নেমে এল বাগানে। বাতাসে দোল খাচ্ছে ডালিয়া। বাগান ঘিরে রেখেছে সুন্দর করে ছাঁটা হেনার ঝাড়। তার ওপাশে মেরীগোল্ড। কেশি কয়েকটি ফুলের গন্ধ নিল, আদর করে হাত বোলাল দু'একটি ফুলের গায়ে। দিনের বেলা, সূর্যালোকে ফুলগুলোর বর্ণালী রঙে যেন ঝলসে যায় চোখ। চাঁদনি রাতে এখন নরম লাগছে ওগুলো। উত্তেজিত স্নায়ুতে প্রশান্তির প্রলেপ যেন। ঝলমলে হলুদ এবং গোলাপি রঙের ফুলগুলোকে দেখাচ্ছে ম্লান সাদা।

বাড়ির দেয়ালের সামনে চলে এল কেশি। ওখানে ফুটে আছে জেসমিন। দেয়ালের গাঢ় ছায়ায় জেসমিন ফুলগুলোকে মুক্তোর মত লাগছে দেখতে। জোছনার আলোয় একটা গানের কয়েকটি কলি মনে পড়ে গেল কেশির:

'বহুদিন পরে ফুটল জেসমিন আমার বাগানে
উঠোন ভরে গেল মৌ মৌ গন্ধে
স্বর্গীয় এক সৌরভে।'

উঠোন সত্যি ফুলের গন্ধে মৌ মৌ করছে। কেশি আড়ষ্ট ভঙ্গিতে হেঁটে গেল গেটের দিকে। পায়চারি করতে লাগল। লক্ষ করল বাড়ির কিনারের ঘরে আলো জ্বলছে। মা নিশ্চয় এখনও ঘুমাননি। হয়তো খালা আর ফুপুরা এখনও কেশি এবং নববধূর গল্পে মশগুল। বাসর সাজাতে মা'র না জানি কত কষ্ট হয়েছে। মহিলারা ডাইনিং রুম থেকে টেবিল-চেয়ার সরিয়ে ওখানে বধূর বসার জায়গা করেছে। কেশি যখন বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে, মহিলারা ওইসময় বিয়েতে পাওয়া উপহার সাজিয়ে রাখতে ব্যস্ত। উপহার এবং যৌতুক পাওয়া জিনিসগুলো সাজিয়ে রাখা হয়েছে কেশি এবং তার মা'র ঘরে। প্রচুর লোক এসেছে কেশির বিয়েতে। তাদের আপ্যায়নে কেটে গেছে মা'র দিন। বিছানায় গা এলিয়ে দেয়ার সময় পাননি। কেশি দেখেছে মা বারবার বেডরুমে ঢুকছেন এবং বের হচ্ছেন। সঙ্গে

তার খালা এবং এক তরুণী, মা'র দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়। নববধূর ঘর সাজিয়ে দিচ্ছিল সে মহা উৎসাহে। মা'র মুখ জ্বলজ্বল করছে আনন্দে। নানা ছুতোয় মা'র ঘরে ঢুকে মা কী করছেন দেখতে চেয়েছে কেশি। কিন্তু বারবারই ওরা হেসে, জোর করে ঘর থেকে ওকে বের করে দিয়েছে।

মা'র ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিতে পারছিল না কেশি। মা'র বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, বাইশ বছর ধরে বৈধব্য জীবন-যাপন করছেন তিনি। এ জীবনের দুঃখ কষ্ট তাঁর চেহারায় এনে দিয়েছিল একটা কাঠিন্য, চোখের কোলে কালি পড়েছিল তাঁর। কিন্তু কী এক যাদু মন্ত্রবলে সেই কাঠিন্য চেহারা থেকে উধাও, চোখের নীচে কালিও নেই। সাদা শাড়িতে অপূর্ব লাগছিল মাকে। কেশি তার মা'র মত সুন্দরী জীবনে দেখেনি।

কেশি ভয় পাচ্ছিল রাত্রি জাগরণ এবং ক্লান্তিতে অসুস্থ হয়ে পড়বেন মা। সে প্রতিরাতে বিছানায় যাওয়ার আগে মাকে বলে, 'শুতে যাও, মা।' কিন্তু মা শুতে যান না। উল্টো ছেলের শিয়রে বসে মাথার তালুতে তেল মেখে দেন। কেশি ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত বসে থাকেন।

...মাথার তালুতে তেল না ঘষলে ঘুম আসে না কেশির। পরীক্ষার সময় সারারাত জেগে পড়া তৈরি করত সে। মা মাথায় তেল ঘষে দিতেন মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা রাখার জন্য। মা তারপর কপাল টিপতেন, মখমলের মত নরম হাতের স্পর্শে রাজ্যের ঘুম এসে জড়ো হত কেশির চোখে। অবশেষে ঘুমিয়ে পড়ত সে।

ঘুম আনার এ কৌশল মা'র কাছ থেকেই শিখেছে কেশি। ক্লান্তি কিংবা দুশ্চিন্তায় মা যখন অনিদ্রায় ভোগেন, কেশি মা'র শিয়রের কাছে বসে। মা'র ঘুম না আসা পর্যন্ত তার কানের পেছনে ঘষে দেয় তেল। কৈশোরে, তেরো-চোদ্দ বছর বয়সে তার মা তার মাথা টেনে নামিয়ে চুমু খেতেন ঠোঁটে। কিন্তু বড় হবার পরে, যখন ব্যাচেলর ডিগ্রী পেল কেশি, শেষ করল মাস্টার্স ডিগ্রী এবং স্থানীয় কলেজে যোগ দিল মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে, তারপর থেকে মা আর তাকে ঠোঁটে চুমু খান না, চুম্বন করেন কপালে।

কেশি বারবারই ভাবছিল এসব আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য থেকে মাকে উদ্ধার করে জোর করে শুইয়ে দেবে বিছানায়। কিন্তু ভয়ানক ব্যস্ত মাকে মহিলাদের দঙ্গল থেকে বিচ্ছিন্ন করা গেল না। তিনি ফুলশয্যায় ফুলের পাপড়ি বিছাতে ব্যস্ত। শহরের সবগুলো ফুলের দোকানে লোক পাঠিয়ে ফুল কিনে এনেছেন তিনি। টাকা ওড়াচ্ছেন খোলাম কুচির মত, যেন অর্থ অতি তুচ্ছ একটি বস্তু। কেশির বলতে ইচ্ছে করল, 'মা, নিজের শরীরের ক্ষতি করে এসব কেন করছ তুমি? এসব ফেস্টুন, ফুলের পাপড়ি, মালা, আচার-অনুষ্ঠান, সব কিছুর চেয়ে আমার কাছে মূল্যবান তোমার ভালবাসা! তুমি এসব করতে গিয়ে তো অসুস্থ হয়ে পড়বে।' মাকে এ কথা বলেওছে কেশি। জবাব পেয়েছে, 'খোকা, আমার বিয়েটা হয়েছিল খুব সাদামাটাভাবে।' কেশি প্রতিবাদ করতে গেলে মা বলেছেন, 'তোমার বাবা

ছিলেন নিম্ন আয়ের কেরানী। আমি চাই না আমার পুত্রবধূর সাদামাঠা বিয়ে হোক। তুমি শুধু দেখো তোমার বউয়ের জন্য কী সুন্দর করে ফুলশয্যা সাজাই।'

এ ঘরে বহুদিন ছিল কেশি। ঘরটির সবকিছু তার বড় চেনা—বিছানা, আসবাব, তার মা'র ড্রেসিং টেবিল, ভ্যানিটি ব্যাগ, চুড়ির বাক্স, টেবিল ল্যাম্প (এটা তিনি বোম্বে থেকে কিনেছিলেন) ইত্যাদি আগের জায়গাতেই আছে। জেসমিনের পাপড়ি এবং ফুলের মালার জন্য আরও খোলতাই চেহারা যেন পেয়েছে ওগুলো। চাঁদোয়া থেকে লম্বা মালাগুলো ঝুলছে, যেন মশারির মত ঘিরে রেখেছে বিছানা। বিছানার চাদরেও অসংখ্য মালা ছড়ানো। তার বউ ফুলের মালার ওপর শুয়ে আছে, যেন ফুল দেবী। মুখের অর্ধেকটা ঘোমটার আড়ালে ঢাকা। বিছানার চাদর ধবধবে সাদা।

মা'র বিয়ের দৃশ্য কল্পনায় দেখার চেষ্টা করল কেশি। বাবা খাল বিভাগের নিম্ন পর্যায়ের কেরানী ছিলেন। তাঁদের ফুলশয্যা নিশ্চয় হয়েছে গোয়ালঘরের মত কোনও ঘরে, দড়ির খাটিয়ায়, হারিকেনের মিটমিটে আলোয়। দৃশ্যটা আবছা লাগল কেশির কাছে, পরিষ্কার হয়ে ধরা দিচ্ছে না। পরে তার বাবা পদোন্নতি পেয়ে নির্বাহী প্রকৌশলী হন। মা এরপর যা যা চেয়েছেন সবই পেয়েছেন। কিন্তু বিয়ের রাতের হতাশার কথা তিনি কোনওভাবেই ভুলতে পারেন না। তিনি ছেলের ফুলশয্যা মনের মত করে সাজিয়েছেন, যেমনটি স্বপ্ন দেখতেন নিজের জন্য। কিন্তু কাজটা করতে গিয়ে ছেলেকে তিনি ফেলে দিয়েছেন মানসিক যন্ত্রণায়। ওই বেডরুমে ঢুকলেই অতীতের স্মৃতি হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে মনের মধ্যে।

'দার্শনিকের বুলি কপচে সময় নষ্ট কোরো না, বাছা,' ওর এক শ্যালা হাসতে হাসতে বলেছিলেন কেশিকে। তাঁর হাসি এবং কথা কেশির মস্তিষ্কে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে...সে আসলে করছেটা কী? তার বউ কী ভাবছে তাকে নিয়ে? কেশি শুনেছে ফুলশয্যার রাতে স্বামীর পুরুষত্বহীনতার কারণে অনেক জীবন ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু বিয়ের প্রথম রাতেই কি একজন পুরুষকে তার পৌরুষের পরিচয় দিতে হবে? মেয়েরা এটা কেন আশা করে? বাসর সাজানোর সময় কি তারা এক ধরনের আনন্দ অনুভব করে, মনে পড়ে যায় নিজেদের ফুলশয্যার রাতের কথা? তার মাও কি...?

তার মা'র মনে দুঃখ, বিয়ের সময় স্বামীর দারিদ্র্যের কারণে বাসর সাজাতে পারেননি। ছেলের বাসর এমনভাবে সাজিয়েছেন, যেমনটা আশা ছিল নিজের বিয়েতে সাজাবেন...। কেশি মাথার চুল খামচে ধরল। কেন সে মাকে বাসর সাজাতে বলেছিল? কিন্তু তখন তো সে ছোট ছিল। এত কিছু বুঝত না। মা'র তো ব্যাপারটা বোঝা উচিত ছিল।

বারান্দায় চলে এল কেশি। তার বউ ছায়াকুঞ্জের পাশে দাঁড়ানো। 'তোমার শরীর ভাল লাগছে না?' উদ্বেগ নিয়ে জানতে চাইল সে।

'আমি ঠিক আছি।'

'আমার কোনও আচরণে কষ্ট পেয়েছ?'

কেশির ইচ্ছে করল অট্টহাসি দেয়। কিন্তু হাসল না। তার বউয়ের খালি একটাই চিন্তা–স্বামীকে খুশি রাখা। নববধূর কোমর জড়িয়ে ধরল কেশি হাত দিয়ে, ঘরে পা বাড়াল। প্রায় ধাক্কা মেরে বিছানায় বসিয়ে দিল স্ত্রীকে। ঝুঁকল। টান মেরে খুলে ফেলল ব্লাউজ।

নববধূ বালিশগুলো আগের মত সাজিয়ে রেখেছে। কেশির চোখ আবার গিয়ে পড়ল মা'র ছবিতে। আবার টলে উঠল মাথা। বউ জড়িয়ে ধরেছিল তাকে, ঝাঁকি মেরে নিজেকে মুক্ত করল কেশি, নেমে পড়ল বিছানা থেকে। বউ খপ করে চেপে ধরল হাত।

'কী হলো?'

কেশি দরজার দিকে তাকাল। মা যদি নিজের ঘরের বদলে কেশির ঘরে বাসর সাজাতেন কত ভাল হত! কিন্তু কেশির ঘর যৌতুকে পাওয়া আসবাবসহ অন্যান্য উপহারে পূর্ণ। ওই ঘরের চাবি পর্যন্ত তার কাছে নেই। হতাশ চেহারা নিয়ে বারান্দায় দৃষ্টি ফেরাল কেশি। মেঝেতে থইথই করছে জোছনা। সে চেঁচিয়ে উঠল, 'দেখো, কী সুন্দর চাঁদের আলো। চলো, একটু ঘুরে আসি।'

নববধূ বিছানা ছাড়ল, বিন্যস্ত কাপড় ঠিকঠাক করল। আয়নায় চট করে একবার বুলিয়ে নিল নজর, আঁচড়াল চুল, কপালে তুলে দিল ঘোমটা। স্বামীর পেছন পেছন এগোল।

গেট থেকে বারান্দা পর্যন্ত বার দুই হাঁটাহাঁটি করল দু'জনে। কেউ কোনও কথা বলছে না। জোছনা নিয়ে কী যেন বলে নীরবতা ভাঙার চেষ্টা করল বধূ একবার। তবে স্বামীর তরফ থেকে সাড়া না পেয়ে চুপ হয়ে গেল। নীরবে পায়চারি করে চলল ওরা।

স্বামীর এমন অদ্ভুত আচরণে অবাক নববধূ। তার বান্ধবীদের কাছ থেকে (এদের কেউ কেউ মাও বনে গেছে) ফুলশয্যার রাতে নবদম্পতির মধ্যে মধুর কত কিছু ঘটে বলে গল্প শুনেছে। স্বামী শুরুও করেছিল সেভাবে। হঠাৎ কী হলো তার কে জানে, বদলে গেল মন। বধূ শুনেছে তার স্বামী খুব বিদ্বান মানুষ, ভদ্র, বিনয়ী, সবাই তাকে সম্মান করে। সে কলেজে পড়ায়। বধূর বাবা হবু জামাতার ব্যাপারে শুধু সহকর্মী লেকচারারদের কাছে খোঁজখবর নেননি, ছাত্রদের কাছ থেকেও খোঁজ নিয়েছেন। ছেলের ব্যাপারে সবকিছু জেনে, সন্তুষ্ট হওয়ার পরেই কেবল এ বিয়েতে এগিয়েছেন। কেউ কখনও বলেনি ছেলে খেয়ালী কিংবা মাথায় গণ্ডগোল আছে। কিন্তু স্বামী তাকে আদর করতে গিয়েও করল না, ঈশ্বর জানে তার কপালে কী আছে। চোরা চোখে স্বামীকে একবার দেখল বধূ, পাশে হাঁটতে লাগল। জোছনা রাতের মায়াবী পরিবেশ তার মনে কোনও ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে পারছে না।

কেশির মন যেন প্রহেলিকার মত; সঙ্কট থেকে উত্তরণের কোনও উপায় দেখতে পাচ্ছে না। কোমরের পেছনে হাত বেঁধে একভাবে পায়চারি করে চলেছে। আবার গেটের সামনে আসার পরে দ্রুত বলল কেশি, 'চলো, রাস্তা থেকে হেঁটে

আসি।'

'কিন্তু এখন তো অনেক রাত,' মৃদু গলায় আপত্তি জানাল নববধূ।

কেশির মনে পড়ল ওর এক বন্ধু বলেছিল গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড এবং জলের ট্যাংকের মাঝখানের গলিপথটুকু বেশ নিরিবিলি, চমৎকার–প্রেমিক-প্রেমিকার ঘুরে বেড়ানোর জন্য উৎকৃষ্ট জায়গা...'শুধু জলের ট্যাংক পর্যন্ত যাব।'

গেট খুলল কেশি। স্ত্রী নীরবে অনুসরণ করল তাকে। কেশি জায়গাটির বিশদ বিবরণ দিতে শুরু করল: একসময় এ এলাকায় রেলওয়ের সিনিয়র ইংরেজ কর্মকর্তারা বাস করতেন। ওই সময় এলাকাটি খুবই অভিজাত আবাসিক এলাকা হিসেবে পরিচিত ছিল। স্বাধীনতার পরে বাংলোগুলো দখল করে নেয় ভারতীয়রা। ময়দার কলের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কেশি ব্যাখ্যা করল কীভাবে এখানে গম এবং শস্য দানা পেষা হয়। কোল্ড স্টোরেজ দেখিয়ে বলল এখানে চল্লিশ হাজার মন আলু রাখা যায়। ছাপাখানার সামনে এসে জানালা দিয়ে উঁকি দিল কেশি। জোরে জোরে ব্যাখ্যা করল কীভাবে কাগজ ছাপা হয়। রেলওয়ে স্টেশনের দিকে যাচ্ছিল সে। মনে পড়ে গেল গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড এবং জলের ট্যাংকের মাঝখানের গলিপথের কথা। লেভেল ক্রসিং-এর গেটের দিকে ঘুরল ওরা। বন্ধ। পাশের একটি গেট দিয়ে ঢুকে রেললাইন পার হলো দু'জনে। চলে এল জলের ট্যাংকের সামনে। অর্ধেক রাস্তা আলোময়, বাকি অর্ধেক অন্ধকার। অন্ধকার রাস্তার দিকে পা বাড়িয়েছে কেশি, আপত্তি জানাল নববধূ। 'বাড়ি চলো। অনেক রাত হয়েছে।'

কেশি স্ত্রীর কোমর জড়িয়ে ধরল ডান হাতে। 'একটু শুধু হেঁটে আসব। দেখবে গাছের ডালের ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো রাস্তায় পড়ে কী সুন্দর লাগছে।'

'অন্ধকার রাস্তায় যাবার কী দরকার?'

'তুমি ভয় পেলে নাকি?' ঠাট্টা করল কেশি। চুমু খাওয়ার জন্য মুখ নামাল।

নিজেকে জোর করে ছাড়িয়ে নিল বধূ। লজ্জায় লাল। 'তুমি কী করছ...খোলা রাস্তায়...এভাবে...'

হেসে উঠল কেশি। আবার জড়িয়ে ধরল স্ত্রীর কোমর। চেঁচিয়ে বলল, 'আমার বউয়ের সঙ্গে যা খুশি আমি করব। কার বাপের কী!' আবার ঝুঁকে এল সে চুমু খেতে। এবারও চুম্বন করা হলো না। হেড লাইটের তীব্র আলোয় ধাঁধিয়ে গেল চোখ; সগর্জনে পাশ কাটিয়ে চলে গেল একটা ট্রাক। ধাক্কাটা মাত্র সামলে উঠেছে, আরেকটা ট্রাক চলে এল–পেছনে ট্রাকের বিশাল বহর। 'খালি রাস্তাই বটে। হুঁহ!' বিড়বিড় করল কেশি। তার রোমান্টিক মুডটাই গেল নষ্ট হয়ে।

'ফিরে চলো,' চোখ ভরা জল নিয়ে আকুতি জানাল বধূ। 'আমার খুব ক্লান্ত লাগছে।'

'এটা মেইন রোড, দিন-রাত সবসময় এখানে ট্রাক আর গাড়ি চলে,' ব্যাখ্যা করল কেশি। 'এম.টি. লাইনে চলো যাই। চার্চের রাস্তাটা বেশ নিরিবিলি।'

'আমার পা আর চলছে না,' কাতর গলা তরুণীর।

বধূর কোমরে কেশির হাতের চাপ বাড়ল, খোলা রাস্তা ধরে পা বাড়াল

মিলিটারি ট্রেইনিং লাইনের দিকে।

রাস্তার দু'পাশের বাড়িঘর ভরা জোছনায় স্নান করছে। বাতাসে ফুলের গন্ধ। স্ত্রীকে নিয়ে একটা গাছের নীচে দাঁড়াল কেশি।

'তোমার সত্যি খুব ক্লান্ত লাগছে?' জিজ্ঞেস করল সে। জবাব দিল না বধূ। স্বামীর বুকে মাথা রাখল। দু'হাতের চেটোয় স্ত্রীর মুখখানা বন্দি করল কেশি, তুলে ধরল, চুমু খেল ঠোঁটে।

রাস্তার ওপাশ থেকে জ্বলে উঠল টর্চ, আলোক রেখা আছড়ে পড়ল নবদম্পতির গায়ে। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ওরা। ম্লান হয়ে গেছে কেশির চেহারা; পাঁজরের গায়ে দমাদম বাড়ি খাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। মনে পড়ে গেল এম.টি. লাইনে মাঝরাতের পরে জনসাধারণের প্রবেশ নিষেধ।

গায়ে সবুজ রঙের ইউনিফর্ম পরা একদল সৈন্য লেটেস্ট একটি হিন্দি ছবির গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে এগিয়ে এল ওদের দিকে। ওরা গাইছিল:

তুমি কি চাঁদ
নাকি সূর্যের আলো?
তুমি যা-ই হও
তুমি ঈশ্বরের সৃষ্টি এক অপরূপা

ফকফকা জোছনা, অথচ ওরা অসভ্যের মত টর্চের আলো ফেলছে কেশিদের গায়ে।

কেশি তার স্ত্রীকে বাহুডোরে বেঁধে, চোখে চোখ রেখে গাইতে চেয়েছিল গানের প্রথম লাইন ক'টি: 'তুমি কি চাঁদ নাকি সূর্যের আলো?' কিন্তু সৈন্যদের অভব্য আচরণ রোমান্টিক ইচ্ছেটাকে নষ্ট করে দিয়েছে সম্পূর্ণভাবে। একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল কেশির। তার এক বন্ধু এবং বন্ধুর বোন এম.টি. লাইনের এক বাংলোতে ডিনার শেষে বাড়ি ফিরছিল। রাত যে অনেক হয়ে গেছে বুঝতে পারেনি ওরা। রিকশা খুঁজছিল রাস্তা ধরে হাঁটছে ওরা, রাত তখন সাড়ে বারোটা, সৈনিকরা হঠাৎ পথরোধ করে দাঁড়ায়, ওদেরকে নিমন্ত্রণ কর্তার বাড়ি গিয়ে প্রমাণ করতে হয়েছে যে তারা ভাই-বোন...

বউ ফিরে যাওয়ার কথা আবার উচ্চারণ করার আগেই কেশি বাড়ির দিকে পা বাড়াল। সৈন্যরা যখন টর্চের আলো ফেলছিল তার বউয়ের মুখে, রাগে আগুন ধরে গিয়েছিল কেশির গায়ে। ইচ্ছে করছিল টর্চ হাতে সৈন্যটার কলার চেপে ধরে কষে থাপ্পড় বসিয়ে দেয় গালে। কিন্তু এমনটি করতে গেলে কেউ যদি জিজ্ঞেস করত এত রাতে জনমানবশূন্য রাস্তায় অধ্যাপক তার বউকে নিয়ে কী করছিল, তখন কী জবাব দিত কেশি? অনেক কষ্টে রাগ দমন করল সে।

দ্রুত কদমে বাড়ি ফিরছে কেশি; পেছনে তার স্ত্রী, কয়েক হাত দূরে। গেটে ঢুকে গতি মন্থর করল সে। বধূ যে রেগে গেছে চেহারা দেখে বোঝা গেল পরিষ্কার, তাকে দ্রুত পদক্ষেপে পাশ কাটাল।

কেশি বেডরুমে ঢুকে দেখল বধূ শুয়ে পড়েছে বিছানায়। শাড়ির বেশিরভাগ অংশ লুটাচ্ছে মেঝেতে। লো-কাট ব্লাউজ ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে পীনোন্নত পয়োধর। কেশির ইচ্ছে করল হাঁটু গেড়ে বসে মাথাটা রাখে বধূর কোলে। কিন্তু তার চোখ কী এক অমোঘ আকর্ষণে বধূকে ছেড়ে ঘুরে গেল মা'র ছবির দিকে।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ভাবনায় ডুবে গেল কেশি। মেয়েটি তাকিয়ে আছে ছাদে, চোখের কোণ বেয়ে গড়াচ্ছে জল। কেশি তার ঘরের দরজায় একবার তাকাল। 'এ দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করা যায় তো, না?'

'যায়,' সিলিং থেকে চোখ না সরিয়েই জবাব দিল বধূ।

কেশি বার দুই পায়চারি করল ঘরে। 'চাবি কই?'

'বোধহয় খালার কাছে। উনি ওই ঘরে সমস্ত আসবাব ঢুকিয়েছেন।'

কেশি বাড়ির অপর প্রান্তে চলে এল। মা'র বেডরুমের বাতি নেভানো। অন্যান্য মহিলারাও নিশ্চয় এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। মাকে ডেকে তুলবে কেশি? ডাক শুনে খালা যদি উঠে পড়েন, ওকে নিয়ে নির্ঘাত মস্করা শুরু করে দেবেন। শোবার ঘরে ফিরে এল কেশি। কিছুক্ষণ পায়চারি করল। চোরা চোখে দেখল স্ত্রীকে। এখনও পাথর-দৃষ্টি সিলিং-এ। কেশি নিজের বেডরুমের দরজায় গিয়ে কাঁধ দিয়ে ধাক্কা দিল। শক্ত ছিটকিনি। ধাক্কায় কাজ হলো না। খুলল না। মা দরজার নীচের দিকের ছিটকিনিটা সবসময় টেনে রাখেন। ওপরের ছিটকিনি বন্ধ থাকলে কাঁচ ভেঙে হাত বাড়িয়ে সে ছিটকিনি খুলে ফেলতে পারত।

পিছিয়ে এল কেশি। পরখ করল দরজা। দরজার দু'পাশে তিন জোড়া কাঁচ লাগানো, সেই সঙ্গে কাঠের কাজও আছে। তিন নম্বর কাঁচটা ভেঙে ফেলতে পারলে হাত বাড়িয়ে নীচের ছিটকিনির নাগাল পাওয়া সম্ভব। ঘুসি মেরে কাঁচ ভাঙার চিন্তা করল কেশি। কিন্তু কাঁচ ভাঙার শব্দে মা জেগে উঠবে ভাবতেই চিন্তার গোড়ায় ঠাণ্ডা জল পড়ল। হাত মুঠো করে ঘরে পায়চারি করতে লাগল সে। বার কয়েক পায়চারি শেষে আবার এসে দাঁড়াল দরজার সামনে। তাকাল দরজার নীচে। দরজার ডান দিকের খানিকটা অংশ ভাঙা। মেঝেতে বসে পড়ল কেশি। পিঠ ঠেকাল খাটে, গায়ের সমস্ত শক্তিতে ফাটা দরজায় পা দিয়ে চাপতে লাগল। খাট সরে গেল পেছন দিকে, কিন্তু দরজার কিছুই হলো না।

বধূ নিঃসাড় পড়ে আছে বিছানায়; সিলিং থেকে চোখ সরছে না। খাট যে সরে গেছে তাও খেয়াল করেনি। কেশি আড়চোখে দেখল বউকে। বউ ফিরল তার দিকে। চোখে চোখ পড়ল দু'জনের। বধূর চোখে রাগ এবং বিতৃষ্ণা। যেন একটা পাগল দেখছে। হঠাৎ কী হয়ে গেল কেশির জানে না, লাফ মেরে সিধে হলো। প্রচণ্ড এক ঘুসি বসিয়ে দিল দরজার মাঝখানের কাঁচে। ঝনঝন শব্দে ভাঙল কাঁচ। টুকরোগুলো পড়ে গেল ওপাশে।

দারুণ একটা ঝাঁকি খেয়ে উঠে বসল বধূ। চেহারায় বিস্ময়। বিছানা থেকে নামল সে, দাঁড়াল স্বামীর পাশে।

'করছ কী তুমি?' পরিষ্কার বিরক্তি কণ্ঠে।

জবাব দিল না কেশি। স্ত্রীর দিকে তাকাল না পর্যন্ত। ভাঙা কাঁচের ফাঁকে ঢুকিয়ে দিল হাত, ওপাশের ছিটকিনি খুলে ফেলল। ডান হাতটা ফাঁক থেকে সাবধানে বের করতে গেল কেশি, ভাঙা কাঁচে খোঁচা খেল কনুই। কেটে গেল। দরদর ধারায় ঝরতে শুরু করল রক্ত।

'সর্বনাশ, কী করলে তুমি!' আর্তনাদ করে উঠল বধূ। পাগলের মত এদিক-ওদিক তাকাল ব্যাণ্ডেজ করার মত কিছু পাওয়া যায় কি না দেখতে।

বউয়ের দিকে মনোযোগ নেই কেশির। সে দু'হাত দিয়ে ধাক্কা মারল কবাটে। ক্যাঁআআচ শব্দে খুলে গেল দরজা। ভেতরে ঢুকল কেশি। সুইচ টিপে বাতি জ্বালল। ঘর বোঝাই যৌতুক আর উপহারে–ড্রেসিং টেবিল, আলমারি, সারি সারি কাপড়, মিষ্টির হাঁড়ি, ফল। যৌতুকে পাওয়া খাটখানাও আছে বিছানাসহ। তবে বিছানা ভরে আছে জামা-কাপড়ের স্তূপে। কাপড়ের স্তূপগুলো দু'হাতে তুলে ধরে সোফায় ছুঁড়ে ফেলল কেশি।

বধূ তার স্বামীর পেছন পেছন চলে এসেছে। তার চোখে এখন বিস্ময় নেই, আছে ভয়। ঘুরল কেশি। বউয়ের কাঁধে হাত রাখল। ভয়ার্ত চোখে চোখ রাখল; তারপর টেনে নিল নিজের কাছে, চুমু খেল মুখে। ভীত বধূ স্বামীর পরিবর্তনটা টের পেল সহজেই। স্বামীর ভেতরে কিছুক্ষণ আগের সেই আড়ষ্টতা অদৃশ্য, সেখানে ভর করেছে আবেগ। বধূ টের পেল তার কানের পেছনে গরম নিঃশ্বাস পড়ছে। স্বামীর উষ্ণ আলিঙ্গনে তার পেশীতে ঢিল পড়ল, নরম হয়ে উঠল শরীর, সে কেশির চুলে হাত বোলাতে লাগল।

পরদিন সকালে কেশির মা ঘুম থেকে উঠে চলে এলেন বধূর বাসর ঘরে। দরজা খোলা দেখে পা টিপে টিপে এগোলেন। পর্দা সরিয়ে উঁকি দিলেন। দৃশ্যটা দেখে চোখ কপালে উঠল তাঁর। সুসজ্জিত ঘর খালি। তাঁর চোখ চলে গেল অপর দরজার দিকে। মেঝেতে ভাঙা কাঁচের টুকরো দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। চোরটোর আসেনি তো? তিনি পা বাড়ালেন ওদিকে। দোরগোড়ায় এসে মূর্তির মত জমে গেলেন। সোফার কুশন বিছানায় বিচ্ছিন্ন অঘোরে ঘুমাচ্ছে নবদম্পতি।

মূলঃ উপেন্দ্রনাথ আশক

হ্যাপি নিউ ইয়ার

দীর্ঘদিন টাইপ রাইটার নিয়ে মুখ বুজে কাজ করার পর কাপুরের ভাগ্য হঠাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের মাননীয় মন্ত্রীর সঙ্গে জড়িয়ে গেল। রাতারাতি সাধারণ ও সাদামাঠা কাপুর থেকে তার উন্নতি ঘটল কাপুর সাহেব-এ। মাননীয় মন্ত্রীর ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে। গর্বে কাপুরের বুক কয়েক ইঞ্চি ফুলে উঠল। সে অফিসের করিডরে বনমোরগের মত বুক চিতিয়ে হাঁটতে লাগল। তার মনে হলো করিডরটা বড্ড সরু, বুক চিতিয়ে হাঁটা যাচ্ছে না। যেসব পিয়ন টুলে বসে পান চিবোচ্ছিল কিংবা ঘুমে ঢুলছিল তারা কাপুরকে দেখে লাফ মেরে খাড়া হলো।

নতুন বছর আসার অল্প ক'দিন আগে এ ঘটনা ঘটল। এতদিন কেরানী কাপুরের কাছে 'নিউ ইয়ার্স ডে' বিশেষ কোনও তাৎপর্য বহন করত না। বছরটা বয়সের ভারে ন্যুজ হয়ে যাচ্ছে কিংবা ক'দিন বাদে নতুন একটা বছরের আগমন ঘটছে, এসব নিয়ে কাপুর কখনোই মাথা ঘামায়নি। তার কাছে একত্রিশে ডিসেম্বর ত্রিশে ডিসেম্বর থেকে আলাদা কিছু ছিল না। জানুয়ারির প্রথম হপ্তা তার কাছে মাসের অন্যান্য দিনগুলোর মতই মনে হয়। কারণ, মাসের প্রথম হপ্তায় বেতন পেয়ে তার অর্ধেকের বেশি শেষ হয়ে যায় দেনা শোধ, বাচ্চাদের স্কুলের নতুন বই, ইউনিফর্ম, পেন্সিল আর ছেঁড়া মোজার বদলে নতুন মোজা কিনে।

তবে কাপুর থেকে কাপুর সাহেবে উত্তরণ ঘটতে তার জীবন যাত্রার পদ্ধতি অনেকটাই বদলে গেল। অবশ্য পরিবর্তনটা ঘটল খুব সাধারণভাবে।

এক ব্যবসায়ী, অবশ্য শিল্পপতি বললেই ভাল শোনায়, মন্ত্রীর বাড়িতে এলেন নিউ ইয়ারের উপহার নিয়ে। তিনি এলেন ৩১ ডিসেম্বর, সকাল আটটায়। মি. কাপুরের জন্য বাইরের বারান্দায় চেয়ার পেতে বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মন্ত্রী মহোদয় শিল্পপতির আনা পার্সেলের দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, 'দুঃখিত, মদপান আমি ছেড়ে দিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী মদপানকে কীরকম চোখে দেখেন জানেনই তো। প্রধানমন্ত্রী হুকুম দিয়েছেন...'

শিল্পপতি মন্ত্রীর মাকে নিয়ে মনে মনে একটা গালি দিলেন মন্ত্রীকে। তাঁর আশঙ্কা হলো হারামজাদা মন্ত্রীটা তাঁর হাত পিছলে চলে যাচ্ছে। তিনি বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হেসে বললেন, 'ঠিক আছে, স্যার, আমি আপনার জন্য কাল বা পরশু অন্য কিছু নিয়ে আসব। তবে নিউ ইয়ার চলে এসেছে কি না, আপনাকে কিছু না দিয়ে চলে গেলে আমার খুব খারাপ লাগবে।' তিনি ব্রিফকেস খুললেন, মন্ত্রীর সামনে, টেবিলের উপর একটা ডাইরি রাখলেন। সরকারি ছাপাখানায় ছাপা সস্তা ডাইরি। ভেতরে মোটাসোটা একটা খাম। মন্ত্রী ডাইরি খুললেন, আঙুল দিয়ে

টিপে পরখ করলেন খামের ঘনত্ব। তাঁর চেহারা উজ্জ্বল দেখাল। বললেন, 'এত কষ্ট করার সত্যি কোনও দরকার ছিল না।'

'না, না, স্যর, কষ্ট কীসের!' এবার মাঢ়ীসুদ্ধ দাঁত দেখিয়ে দিলেন শিল্পপতি। 'এটা আপনার ছেলেমেয়ের মিষ্টি খাওয়ার জন্য।'

এবার মন্ত্রীর দন্ত প্রদর্শনের পালা। তিনি আড়াই ভাগ দাঁত শিল্পপতিকে দেখিয়ে টেবিলের ড্রয়ারে আলগোছে রেখে দিলেন খাম।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন শিল্পপতি। খুশি মনে বেরিয়ে এলেন মন্ত্রীর ঘর থেকে। মন্ত্রীর জন্য আনা পার্সেলটা দিয়ে দিলেন কাপুরকে। মন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিবকেও খুশি রাখতে হয়। ঘটনা এত দ্রুত ঘটে গেল যে কাপুর না পারল না বলতে, না পারল ধন্যবাদ দিতে। জীবনে এই প্রথম কেউ তাকে কিছু উপহার দিল।

শিল্পপতি মৃদু হেসে বললেন, 'এটা নিউ ইয়ারের ছোট একটি উপহার,' তিনি কাপুরকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে চলে গেলেন। মদের বোতলটা ড্রয়ারে রাখার সময় হাত কাঁপল কাপুরের। শরীর গরম হয়ে উঠেছে।

টাইপিস্ট বশিষ্ঠ কাপুরের সঙ্গে একই ঘরে বসে। সে মন্ত্রীর টাইপিস্ট। বহুদিন ধরে একই জায়গায় বসে কাজ করে আসছে। কাপুর যেদিন তার নতুন চেয়ারে বসতে গেল, বশিষ্ঠ নিজের পরিচয় দিয়ে হেসে বলেছিল, 'কিস্যু ভাববেন না, স্যর। আপনাকে গেরোর সব ফাঁক ফোকর শিখিয়ে দেব। মন্ত্রীরা আসে যায়; তাদের চাকরি স্থায়ী নয়। তবে আপনার অনুগত এই ভৃত্যটি নিজের পদে রয়েছে বহুদিন ধরে এবং সে এ ঘরের আসা-যাওয়ায় সম্পূর্ণ অভ্যস্ত। আপনার কাছে কোনও ঝামেলাই ঘেঁষতে দেব না।'

বশিষ্ঠ কাপুরের অস্বস্তির কারণ বুঝতে পারছিল। কাগজে মোড়া একটা পান খুলে টপ করে মুখে পুরল সে, হেলেদুলে এগিয়ে গেল কাপুরের কাছে। 'অভিনন্দন, কাপুর সাহেব। প্রথম উপহার নববধূর নাক ফুল সরানোর উৎসবের মত। আপনার অনুগত ভৃত্যদের দিকে একটু খেয়াল-টেয়াল করুন। আমরা আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করব।'

এসব খেলায় কাপুর একদম নতুন। সে জানে পুরো বোতল হুইস্কি একা সাবাড় করা তার পক্ষে একদম সম্ভব নয়। কাউকে সঙ্গী করতে হবে। আর টাইপিস্টের ইঙ্গিতও পরিষ্কার। সে বলে উঠল, 'অবশ্যই! অবশ্যই!'

'বেশ! বড় সাহেবরা বড় বড় হোটেলে মাঝরাতে পরস্ত্রীর সঙ্গে নাচানাচি করে নিউ ইয়ারকে স্বাগত জানাবে। আর আমরা আপনার বাড়িতে সন্ধ্যায় যাব নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে। আমি কি গুপ্তাকে নিয়ে যাব সঙ্গে?' গুপ্তা অফিসের দ্বিতীয় টাইপিস্ট। সে আরেক ঘরে বসে দু'জন কেরানীর সঙ্গে। গুপ্তা ডাকে আসা চিঠিপত্র বাছাই করে। অন্যরা ডিসপ্যাচের কাজ করে।

'অবশ্যই!' সরল গলায় বলল কাপুর।

ওইদিন অন্যান্য দিনের চেয়ে একটু তাড়াতাড়িই বাড়ি ফিরল কাপুর।

অ্যাটাচি কেসে স্কচের বোতল। তবে স্ত্রীর শাণিত জিভের ধারাল ফলার শব্দ হামলার জন্য প্রস্তুত ছিল না সে। 'তুমি এসব ছাইপাঁশ এনেছ বাড়িতে বসে খাওয়ার জন্য? বাচ্চাদের সামনে বসে খাবে! নিউ ইয়ার? কীসের নিউ ইয়ার? আজ মাসের একত্রিশ তারিখ অথচ বাড়িতে দানাপানি বলতে কিছু নেই। মুদি দোকানে আমি আর বাকি চাইতে পারব না। গতকালই ওকে বলেছি এ মাসে আর বাকি-টাকি নেব না। বলেছি হিসেবটা করে রাখতে। এক-দুই তারিখ শোধ করে দেব টাকা। দোকানে ইতিমধ্যে একশো তিরাশি টাকা বাকি পড়েছে। আবার বাকি আনতে গেলে সব তো তোমার মেহমানদের পেটে যাবে। তারা তৃপ্তির ঢেকুর তুলে বাড়ি ফিরবে। আর আমাদের কী হবে? আমরা কী খাব? সামনের মাসে গুরুদুয়ারার লঙরখানায় ছেলেমেয়ে নিয়ে বসে যাই তাই চাও তুমি? নিউ ইয়ার বটে। এসব বড় লোকদের ব্যাপার, পাঁচতারা হোটেল ছাড়া যাদের খাওয়ার রুচি হয় না। আমাদের মত গরীবদের একটা পয়সা বাড়তি খরচ করার উপায় নেই। মাসের ত্রিশটা দিন কত কষ্ট করে চালাতে হয় সে শুধু আমি জানি!'

বেচারী কাপুর এখন কী করে? কুমিরের মুখে মাথা ঢুকিয়ে দিলে কামড় তো খেতে হবেই। সে তেলানো গলায় ব্যাখ্যা করতে গেল, 'আমার সোনা বউ! নিউ ইয়ার হলো ইংরেজী উৎসব, আমাদের বৈশাখী কিংবা দিওয়ালির মত।' কিন্তু সোনা বউ তার স্বামীর কথা কানে তুলল না। রাগে গজগজ করতে লাগল।

ঠিক রাত পৌনে আটটার সময় অফিসের দুই কেরানী তাদের স্ত্রী আর বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে হাজির হয়ে গেল কাপুরের বাড়িতে। বউ আর বাচ্চারা চলে গেল অন্দর মহলে। কেরানীর সন্তান বলেই বাচ্চাগুলো তাদের মায়েদের আঁচল ধরে থাকল শক্ত করে এবং কুকুর ছানার মত মাঝে মাঝে দু'একটা কাঁইকুঁই শব্দ করল। বাইরে খুব ঠাণ্ডা। তাই মায়েরা তাদের বাচ্চাদের বাইরে খেলতে যেতে দিল না।

বৈঠকখানায় স্কচের বোতল নিয়ে বসেছে পুরুষেরা। প্লেটে কাজু বাদাম। ভেতরের ঘরে মহিলারা বাজারে আলুর দাম বৃদ্ধি নিয়ে কথা বলছে।

'প্রমোশন হওয়ার জন্য কাপুর সাহেবের কাছে আমাদের একটা খাওয়া পাওনা রইল,' বলল বশিষ্ঠ।

বেলুনের মত ফুলে উঠল কাপুর। তবে মুখে বেজার একটা ভাব ফুটিয়ে বলল, 'কীসের প্রমোশন রে, ভাই! বেতন বাড়লে না তাকে প্রমোশন বলে। আমার শুধু কাজের চাপই বেড়েছে। আগে সকাল সাড়ে দশটায় অফিসে যেতাম, বিকেল সাড়ে চারটায় চলে আসতাম। আর এখন মন্ত্রীর বাড়িতে সকাল পৌনে আটটায় হাজিরা দিতে হয়, থাকতে হয় রাত আটটা-ন'টা পর্যন্ত। আপনারা তো সবই জানেন। নতুন করে আর কী বলব।'

'কাজের গুল্লি মারেন, কাপুর সাহেব। আপনার প্রভাব প্রতিপত্তি কত বেড়ে গেছে, স্ট্যাটাস বেড়েছে তা ভাবুন,' মন্তব্য করল গুপ্তা। 'আপনার চেয়ারে যারা বসার সুযোগ পায় তাদের জীবনে অনেক কিছুই ঘটে। সুদের কথা মনে আছে?

পুরো নাম নরিন্দর সুদ। আপনার চেয়ারেই বসত সে। বছর আষ্টেক আগে বোম্বের একটা ফার্মের লাইসেন্স আটকে গিয়েছিল মন্ত্রণালয়ে। ফার্মের লোকজন মন্ত্রীর পেছনে অনেকদিন ধরে ঘোরাঘুরি করছিল। কিন্তু মন্ত্রী যেন হাঁসের মত। এক ফোঁটা জলের ছিটাও রাখতে চান না গায়ে। মন্ত্রীর নাগাল কিছুতেই না পেয়ে হতোদ্যম বোম্বাইয়া পার্টি শেষে সুদের বাড়ি আসে। তাকে প্রায় পায়ে ধরার মত অবস্থা। সুদ এমন করিৎকর্মা লোক, কীভাবে কীভাবে যেন এক মাসের মধ্যে বোম্বের ফার্মের লাইসেন্স খালাস করে দেয়। বোম্বাইয়া পার্টির প্রতিবার দিল্লি আসতে পাঁচ-ছয় হাজার রুপী খরচ হত। কাজেই সুদকে তাদের ফার্মে ভিড়িয়ে নিলেই হয়! তারা সুদকে চাকরি ছাড়তে বলে। দিল্লিতে সুদকে তারা রেসিডেন্ট এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর বানিয়ে দেয়। সুদের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অফিসের ব্যবস্থা করা হয়, সে বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট পেয়ে যায়। এখন সুদ সাহেব তার সুন্দরী সেক্রেটারিকে নিয়ে শোফার চালিত গাড়িতে ঘুরে বেড়ায়। বিভিন্ন অফিসের দাওয়াতে ডিনারে যায়। প্রতি রাতে কর্মকর্তাদের সঙ্গে ও বেরয়, তাজ-এর মত দামী হোটেলে তাকে ডিনারে দেখা যায়। প্রতি মাসে তার হাত দিয়ে লাখ লাখ টাকা লেনদেন হচ্ছে। প্রতিদিন সে আমদানী করা কাপড় দিয়ে বানানো সুট পরে অফিসে যায়।' বশিষ্ঠ এমনভাবে সুদের গল্প বলল যেন সুদ তার রক্তের ভাই।

'বন্ধু,' বলল বশিষ্ঠ। 'কেরানীরা পরের জন্মে কুকুর, বেড়াল, বিছা, কাছিম, শুয়োর ইত্যাদি রূপে পুনর্জন্ম নেয়। চুরাশি লাখ মানুষের এ দেশে মাত্র একজনের পুনর্জন্ম ঘটে দেশ শাসন করার জন্য। আর একজন কেরানীর মন্ত্রীর ব্যক্তিগত সহকারী হওয়ার সৌভাগ্য লাখে একজনেরও হয় কি না সন্দেহ। আপনি নিঃসন্দেহে সেই সৌভাগ্যবানদের একজন।'

'হতে পারে,' হাসল কাপুর। 'কিন্তু কাজের যে চাপ তা থেকে রক্ষা পাবার কোনও উপায় নেই। কাজের চাপ দিন-দিন বেড়েই চলেছে। আপনাদের বৌদি তো গত দশ দিন ধরে আমার উপর রেগে আগুন হয়ে আছে।'

'উনি আসলে আপনাকে ঠিকমত মূল্যায়ন করতে পারছেন না,' বলল গুপ্তা।

'বৌদিকে বোঝান না কেন? বলেন না কেন যে চেয়ারে আপনি বসেছেন তার দাম কতখানি? তা হলে উনি আপনাকে হালুয়া রুটি বানিয়ে খাওয়াবেন,' নিজের রসিকতায় নিজেই হাসিতে ফেটে পড়ল বশিষ্ঠ।

'বউকে কী বোঝাব,' অসহায় একটা ভঙ্গি করল কাপুর। 'সে পারলে আজ এই বোতল আমার মাথায় ভাঙত!'

বশিষ্ঠ বলল, 'তবু বৌদিকে বোঝাতে হবে।'

তাকে সমর্থন করল গুপ্তা। বলল কাপুরের বৌকে বোঝানো দরকার কত মানুষ কত তেল মেখেও কাপুর সাহেবের মত পদ পায় না। আর পদ যত বড় কাজের চাপও তত বেশি। এটা উপলব্ধি করতে হবে কাপুরের বৌকে।

'প্রধানমন্ত্রীর কথাই ধরুন,' বলল বশিষ্ঠ। 'বেচারাকে প্রতিদিন আঠারো-উনিশ ঘণ্টা খাটতে হয়। নির্বাচনের সময় তাঁকে একের পর এক গ্রামে যেতে হয়।

এর বদলে প্রধানমন্ত্রী যা পান তার মূল্য বিশাল।'

'ঠিক বলেছেন! মন্ত্রী আর রাজনীতিবিদরা খামোকা দৌড়ঝাঁপ করেন না। সময় আসুক, আপনার স্ত্রী খুশিতে নাচবেন আর গাইবেন। আপনার মাথাটা তিনি কোলে নিয়ে চুমুও খাবেন,' হাসছে বশিষ্ঠ।

বোতল প্রায় খালি হয়ে এসেছে। কাজু বাদামের দু'একটা টুকরো পড়ে আছে প্লেটে। গুপ্তা ঘড়ি দেখল। 'বন্ধুগণ, সাড়ে ন'টা প্রায় বাজে। খাওয়া দাওয়ার পাটটা সেরে ফেলা দরকার। সাড়ে দশটার পরে আর বাস পাব না। আমরা তো আর মন্ত্রী না যে হুকুম দিলেই গাড়ি চলে আসবে...'

উঠে পড়ল কাপুর। গেল ভেতরের ঘরে। একটু পর তার বাচ্চারা বাটি ভর্তি মসুর ডাল আর আলুর তরকারি নিয়ে এল। পুরুষরা বাইরের ঘরে বসে খেল; স্ত্রী আর বাচ্চারা ভেতরের ঘরে। কাপুরের বউ ব্যস্ত থাকল রুটি বানাতে; তার বাচ্চারা ছুটোছুটি করে দুই ঘরে অতিথিদের গরম রুটি পরিবেশন করল। রাত সোয়া দশটার দিকে বিদায় হলো মেহমান।

নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে কাপুরের। সে ঘরে ঢুকে বিছানা করতে লাগল। শুনল বাসনকোসন ধুতে ধুতে গজগজ করছে তার স্ত্রী। 'নিউ ইয়ার! এমন শীতের রাতের নিউ ইয়ারের খ্যাতা পুড়ি। বাসন ধুতে ধুতে হাত জমে গেল ঠাণ্ডায়। এসব নিউ ইয়ার ফিয়ার মানায় সাদা চামড়ার সাহেবদের। জাহান্নামে যাক নিউ ইয়ার!'

অনেকক্ষণ পরে নিভল ঘরের বাতি। দ্রুত ঘুমিয়ে পড়ল বাচ্চারা। কিন্তু কাপুরের বউ ঘোঁত ঘোঁত করেই চলেছে। বলল, 'এই নিউ ইয়ার দিয়ে হবেটা কী! জানুয়ারির ২ তারিখ নিউ ইয়ার হয় না কেন? তা হলে তুমি বেতনটা পেতে।'

চুপ হয়ে রইল কাপুর।

তার স্ত্রী অন্ধকারে আরও খানিকক্ষণ ঘ্যানঘ্যান করল। মাঝরাতে পাঁচতারা হোটেলে যখন নিভু নিভু হয়ে এল আলো, যাতে বড় লোকেরা পরস্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে হ্যাপি নিউ ইয়ারের গান গাইতে পারে, ওই সময় কাপুর দম্পতি পরস্পরের দিকে পিঠ ফিরিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

মূল: অজিত কাউর

বন্ধ দরজার ওপাশে

বিশ শতকের শুরুর দিকে ক্যালিফোর্নিয়ার সমুদ্র উপকূলবর্তী শহর মন্টেরিতে বাস করত রিচার্ড কোল্টার নামে এক বিপত্নীক জেলে, তার মেয়ে মারিয়াকে নিয়ে। টিনের ছাদ আর কাঠের তক্তা দিয়ে বানানো তাদের পুরানো বাড়িটি ছিল সৈকতের ধারে, শহর থেকে দূরে।

মারিয়া কোল্টার ছিল সুন্দরী এক বালিকা, তার মনোবল সাংঘাতিক শক্ত। কোন কিছুতেই সহজে ভেঙে পড়ে না। তার বাবা খুব কঠিন পরিশ্রম করত। মন্টেরি বে এবং প্রশান্ত মহাসাগরে সে সার্ডিন, স্যামন, কড, টিউনা ইত্যাদি মাছ ধরে বেড়াত। আর মারিয়া পড়ত শহরের ক্যাথলিক স্কুলে। ওখানকার ছাত্রীদের মধ্যে সে বেশ জনপ্রিয় ছিল। যদিও কোন-কোন বাবা-মা তাঁদের মেয়েদেরকে মারিয়ার সঙ্গে মিশতে দিতে চাইতেন না সে গরীব ছিল বলে।

মারিয়ার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বান্ধবী ছিল অ্যানি কেলি, সুসান কুক এবং ক্যাথেরিন হপার।

একবার বসন্তের শুরুতে বেশ কয়েকদিন ধরেই স্কুলে অনুপস্থিত মারিয়া। তার তিন বান্ধবী শিক্ষকদেরকে জিজ্ঞেস করে জানল মারিয়া এবং তার বাবা দিন তিনেক আগে মন্টেরি বেতে মাছ ধরতে গেছে। একজন জেলে ওদেরকে শেষবার দেখেছে দুপুরের দিকে, পয়েন্ট লোবোসে।

'কিন্তু ওকে তো আজ সকালেই দেখলাম স্কুলে আসার পথে,' অ্যানি কেলি বলল সুসান কুক আর ক্যাথেরিন হপারকে। 'রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। আমি ওকে হাত নাড়লাম, কিন্তু প্রত্যুত্তরে কিছুই বলল না মারিয়া। মনে হয় না আমাকে ঠিক লক্ষ করেছে। কারণ, তারপরই ও দৌড়ে চলে গেল। আর ওর দেখা পাইনি।'

তবে স্কুলে মারিয়ার ডেস্কটি খালিই পাওয়া গেল। তিন বান্ধবী বাড়ি ফেরার পথে ওর অনুপস্থিতি নিয়েই কথা বলছিল।

'হয়তো ওর বাবা অসুস্থ, তাই তার সেবাযত্ন করছে মারিয়া,' মন্তব্য করল অ্যানি।

'ও নিজেই হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়েছে,' বলল সুসান। 'হয়তো আজ স্কুলে রওনাও হয়েছিল, পরে বাড়ি ফিরে গেছে।'

'চলো, আমরা গিয়ে বরং দেখে আসি ওর কী হলো,' প্রস্তাব দিল ক্যাথেরিন।

মন্টেরি শহরের বাইরে একটি জীর্ণ বাড়িতে মারিয়া ও তার বাবা বাস করে, জানত

ওরা তিনজন। ঠিক করল স্কুল ছুটি হলেই ওখানে যাবে। তবে মারিয়ার বাসা স্কুল থেকে অনেক দূরে। হেঁটে যেতে অনেক সময় লাগল।

মারিয়ার বাড়ি পৌঁছতে-পৌঁছতে প্রায় সন্ধ্যা গড়িয়ে গেল। বাড়ি বলতে কাঠের একটি ঘর। টং ঘরের মত, জলের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

'মারিয়া নিশ্চয় বাসায় আছে,' বলল অ্যানি।

'আশা করি,' বলল সুসান। 'অনেক দেরি হয়ে গেল। সাপারের আগে আমি বাসায় ফিরতে না পারলে কপালে পিট্টি আছে।'

'আমাদের বোধহয় যাওয়া উচিত হবে না,' বলল অ্যানি।

'ঘরে কোন আলোও জ্বলছে না।'

'ওর খোঁজ না নিয়ে ফেরা ঠিক হবে না,' ঝাঁজিয়ে উঠল ক্যাথেরিন। 'এতখানি রাস্তা বয়ে এলাম!'

'কিন্তু রাত হয়ে যাচ্ছে তো!' আপত্তি করল সুসান।

'আমি শুধু দেখব মারিয়া বাড়িতে আছে কি নেই। তারপর বাড়ি ফিরব।'

ভাঙাচোরা কুটিরটির সামনে গিয়ে ওরা যখন দাঁড়াল, ততক্ষণে ঘন এবং ভেজা কুয়াশার একটা পর্দা গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে, তাতে সমুদ্রের তীব্র নোনা গন্ধ। তিন বান্ধবী হালকা পায়ে হাঁটছে আর ফিসফিস করে কথা বলছে। সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠে এল। বারান্দার অবস্থাও করুণ! একপাশে স্তূপ করে রাখা মাছ ধরার জাল, আছে কাঁকড়া রাখার ঝুড়ি, খাঁচা, নানান দড়িদড়া এবং ক্যানভাস। সবগুলো থেকেই পচা মাছের বিশ্রী গন্ধ আসছে। বাড়ির কিনারে ছোট্ট একটি জেটি চোখে পড়ল ওদের। তবে সেখানে কোন নৌকা বাঁধা নেই। সমুদ্রের ঢেউয়ের গর্জন ছাড়া আর সবকিছু আশ্চর্যরকম চুপচাপ।

'বাড়িতে কেউ আছে বলে মনে হয় না–চলো, চলে যাই,' অনুনয় করল সুসান। বাষ্প ভরা বাতাস চিরে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে উঠল একটা গাংচিল। কুয়াশা এমন ঘন হয়ে উঠেছে যে মন্টেরি শহরের বাড়িঘরের ছাদ দেখা যাচ্ছে না। কুয়াশার লম্বা-লম্বা শুঁড় পেঁচিয়ে ধরছে পাহাড়ের বুক আর পাইন গাছের সারি।

'বাচ্চাদের মত কথা বোলো না!' হিসিয়ে উঠল ক্যাথেরিন। সে সাহস করে ঠকঠক করে তিনবার দরজায় টোকা দিল, কোন সাড়া না পেয়ে জোরে ধাক্কা মারল।

'জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি চলো,' পরামর্শ দিল সুসান।

বুদ্ধি খারাপ না, যেহেতু কেউ সাড়াশব্দ করছে না। ওরা পা টিপে টিপে সবচেয়ে কাছের জানালার সামনে গিয়ে পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল ভেতরে।

প্রথমে একটি খালি ঘর চোখে পড়ল। অতি সামান্য কয়েকটি আসবাব ছড়ানো ঘরে। ঘরের মাঝখানের টেবিলের ওপর কেরোসিনের একটি লণ্ঠন। জ্বলছে না। জানালার বিপরীত দিকে একটি বন্ধ দরজা চোখে পড়ল।

হঠাৎ বন্ধ দরজার পেছনে অদ্ভুত একটা আলো জ্বলে উঠল। তারপর ধীরে

খুলে গেল কপাট, ভৌতিক আলোতে মারিয়া কোল্টারকে দেখতে পেল তিন বান্ধবী। চোখ বুজে সটান দাঁড়িয়ে আছে, যেন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই ঘুমাচ্ছে।

নিশি পাওয়ার মত মেয়েটি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এক মুহূর্ত বাদে ওরা তিনজন শুনতে পেল কাঠের বাড়িটির সামনের দরজা ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দে খুলে গেল।

অ্যানি, সুসান এবং ক্যাথেরিন পরস্পরের দিকে তাকাল। তারপর তারা খোলা দরজায় গিয়ে উঁকি দিল ভেতরে। ঘর খালি, কেবল জানালা দিয়ে হালকা ধূসর আলো আসছে। দূর প্রান্তের দরজাটি বন্ধ, যদিও চৌকাঠের নীচে অদ্ভুত আলোর রেখাটি দেখা যাচ্ছে।

তাদের বান্ধবীটি অদৃশ্য।

'ও নিশ্চয় ওই ঘরটাতে গেছে,' বলল সুসান।

'ও আমাদের সঙ্গে এমন চালাকি করছে কেন?' জিজ্ঞেস করল অ্যানি। 'এখানে আমাদের থাকা আর উচিত হবে না।'

কিন্তু ক্যাথেরিন দুপদাপ পা ফেলে ঘরে ঢুকে চেঁচিয়ে বলল, 'মারিয়া! আমরা তোমাকে হ্যালো বলতে এসেছি! তুমি বেরিয়ে এসো!' বন্ধ দরজার হাতল ঘোরাতে গিয়ে থেমে গেল সে। সমুদ্র জলের তীব্র নোনা গন্ধ বাতাসে। এতটাই প্রকট, যেন জিভেও নোনা স্বাদটা লাগছে। সে সঙ্গে মাছের তীব্র পচা গন্ধে নাক কুঁচকে গেল সুসানের। সমুদ্র গর্জনের শব্দ শোনা গেল। যেন বাইরে আছড়ে পড়ছে ঢেউ।

'ক্যাথেরিন!' কর্কশ স্বরে বলল অ্যানি। 'দেখো! দরজাটা!'

চৌকাঠের নীচ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে ভিজিয়ে দিচ্ছে মেঝের ছেঁড়া কার্পেট। জুতো ভিজে যাওয়ার ভয়ে তিন বান্ধবী পিছিয়ে গেল।

বন্ধ দরজাটির ওপাশে প্রচণ্ড শব্দ হলো। যেন উন্মত্ত শক্তিতে কপাটের গায়ে আছড়ে পড়েছে ঢেউ। তবে প্রবল ধাক্কা খেয়েও দরজাটার একটা ছিলকাও ছুটে এল না বলে ওরা সবিশেষ বিস্মিত। এক সেকেণ্ড পরে আবারও ধাক্কা। থরথর করে কেঁপে উঠল দরজা।

তিন বান্ধবীর ভয়ে শুকিয়ে গেছে আত্মা। ওরা শুধু শুনছে দরজার ওপাশে ঢেউয়ের শব্দ, একটার পর একটা আছড়ে পড়ছে কপাটের গায়ে আর দরজার ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে নামছে জল। এমন সময় একটা চিৎকার শুনতে পেল ওরা দরজার ওপাশ থেকে। কেউ যেন জলের নীচে ডুবে গিয়ে চিৎকার করছে।

'ক্যাথেরিন?' ডাকল কণ্ঠটি। 'অ্যানি! সুসান! জানতাম তোমরা আমার খোঁজ নিতে আসবে। আমি এক্ষুণি আসছি তোমাদের কাছে।'

শেষবারের মত বিকট ধাক্কার শব্দ হলো দরজায়। তারপর সুনসান নীরবতা। ঘরে শুধু নোনা জল, মাছ আর সামুদ্রিক আগাছার গন্ধ।

দরজাটি খুলতে শুরু করল। ভেতরে রূপালি আলো। মেঝেতে জল থইথই করছে। চাঁদের আলোয় মনে হচ্ছে একটা পুকুর। সেই পুকুরের নীচে ভাসছে

একটি ছোট মেয়ের হাত। হাতটা মাছের পেটের মত সাদা আর চামড়া কুঁচকানো। অনেকদিন জলের নীচে থাকলে চামড়া যেভাবে কুঁচকে পচে যায় সেরকম।

ভীত, আতঙ্কিত তিন বালিকা পড়িমরি করে দিল দৌড়। এক ছুটে বেরিয়ে এল রাস্তায় ঘন, ভেজা কুয়াশার মধ্যে। নিজেদের মহল্লায় না পৌঁছা পর্যন্ত থামল না। বাড়ির সামনে এসে হাঁপাতে-হাঁপাতে ওরা ভাবছিল মারিয়া কি সত্যি ওদের সঙ্গে চালাকি করল? ওদেরকে ভয় দেখিয়ে মজা পেতে চেয়েছে? কিন্তু কেন? ওই অদ্ভুত আলোটাই বা কীসের? আর বাড়ির ভেতরে সমুদ্রের নোনা গন্ধ, বন্ধ দরজায় ঢেউ আছড়ে পড়ার শব্দ—এর ব্যাখ্যাই বা কী?

ওরা এসব প্রশ্নের জবাব খুঁজে না পেয়ে ঠিক করল ওদের বাবা-মাকে ব্যাপারটি খুলে বলবে।

ক্যাথেরিনের বাবা ওদেরকে বললেন, 'রিচার্ড কোল্টারের নৌকা তিন দিন আগে ডুবে গেছে সাগরে। তার লাশ পাওয়া গেছে পয়েন্ট লোবোসের কাছে। তার ছোট্ট মেয়েটি, মারিয়াও বাবার সঙ্গে ডুবে মরেছে। তবে তার লাশের কোন হদিস মেলেনি এখনও।'

মূলঃ রবার্ট ডি স্যান সুসি